শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রায়ণ

প্রথম খণ্ড

শ্রীপুলিনবিহারী সেন
সম্পাদিত

বাক্‌-সাহিত্য কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

প্রাণ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়, —
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যেন গো রচিতে পারি অমর আলয়।
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে' সকাল বিকাল
নবনব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তারপরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

র বী ন্দ্র না থ

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

ক বি স ত্যে ন দ ত্ত লিখেছিলেন, 'জগৎ-কবি-সভায় মোরা তোমার করি গর্ব'। হয়তো বা সেদিন জগৎ-সভায় এমনধারা গর্ব দেখাবার একটা তাগিদ ছিল। পরাধীন জাতি। যে দূরদেশী জাতির অধীন, তাদের গোষ্ঠী কেবল অস্ত্রবলে ও যুদ্ধকৌশলে প্রবল নয়, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কাব্যে সাহিত্যে, সচল মনের বহুমুখী চেষ্টা ও বিচিত্র সৃষ্টিতে সভ্যতার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর যুগের প্রবর্তক। এমন পরাধীনতার মধ্যে প্রাচীন সভ্য ও সভ্যতাভিমানী জাতির আত্মসম্মান রক্ষা সহজ নয়। কেবল পূর্ব-পিতামহদের জ্ঞানগরিমার ইতিকথায় নিজের কাছেও মুখরক্ষা হয় না। আবার সে ইতিকথার বেশির ভাগ ঐ বিদেশী গোষ্ঠীর লোকদের প্রশংসাপত্রের অনুলিপি।

মোক্ষমূলর বলেছে 'আর্য',
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য।

এমন সংকটে রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সাহিত্য -প্রতিভাকে আমরা আত্মসম্মান বাঁচাবার দুর্গের মত ব্যবহার করেছি। পশ্চিম সভ্যজগৎকে ডেকে বলেছি, আমরা পিছিয়ে-পড়া পরাধীন জাতি ; কিন্তু তার মধ্যেও দেখ রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর সমতুল্য সাহিত্যস্রষ্টা তোমাদের নব ইউরোপেও কজন জন্মেছে? সেই রবীন্দ্রনাথের এক কাব্যকে যখন ইউরোপের বিখ্যাত জহুরী সমিতি বহুত সাচ্চা বলে ঘোষণা করল তখন রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে জাতির আনন্দ-উল্লাস আমাদের অবস্থায় অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কবির চোখে অশোভন লেগেছিল। নোবেল প্রাইজ যে কাব্যবিচারের নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি নয় সে সরল সত্য তিনি দেশবাসীকে স্মরণ করিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল তিনি যে কবি বিদেশের ছাপ দেখে তার স্বভাষাভাষীরা তা চিনতে পারল। সন্দেহের কারণ ছিল। এ আনন্দ-উৎসবে এমন-কিছু নামজাদা লোক নেতৃত্ব করেছিলেন যাঁরা নিঃসন্দেহ বিলাতী ছাপ দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশী কবিকে সম্মান দেখাতে সাহসী হয়েছিলেন। কিন্তু স্পর্শকাতর কবির মন দেশবাসীর উপর সুবিচার করে নি। রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হলে বাঙালীর পক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিকে যে অভিনন্দন দিয়েছিল তাতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঙালীর মনের মর্মকথা প্রকাশ করেছিলেন—

কবিবর, পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ব্বে এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও

বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্দ্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল; সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুমসম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইল। তোমার পূর্ব্বগামি-গণের স্নিগ্ধনেত্র তোমাকে বর্দ্ধিত করিল; অনুগামিগণের মুগ্ধনেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল; বাগ্‌দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল। তদবধি বাণীমন্দিরের মণিমণ্ডিত নানা প্রকোষ্ঠে তুমি বিচরণ করিয়াছ; রত্নবেদির পুরোভাগ হইতে নৈবেদ্যকণা আহরণ করিয়া তোমার দেশবাসী ভ্রাতাভগিনীকে মুক্ত হস্তে বিতরণ করিয়াছ; তোমার ভ্রাতাভগিনী দেবপ্রসাদের আনন্দসুধা পান করিয়া ধন্য হইয়াছে। বীণাপাণির অঙ্গুলিপ্রেরণে বিশ্বযন্ত্রের তন্ত্রীসমূহে অনুক্ষণ যে ঝঙ্কার উঠিতেছে, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ; সুপর্ণরূপিণী গায়ত্রীকর্ত্তৃক গন্ধর্ব্বরক্ষিত অমৃতরসের দেবলোকে নয়নকালে মর্ত্ত্যোপরি যে ধারাবর্ষণ হইয়াছিল, পৃথিবীর ধূলিরাশি হইতে নিষ্কাশিত করিয়া নরলোকে সেই অমৃত-কণিকার বিতরণে তোমার সহকারিতা গ্রহণদ্বারা তাঁহারা তোমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। পঞ্চাশৎ সংবৎসর তোমাকে অঙ্কে রাখিয়া তোমার শ্যামাজন্মদা তোমাকে স্নেহপীযূষে বর্দ্ধন করিয়াছেন; সেই ভুবনমনোমোহিনীর উপাসনাপরায়ণ সন্তানগণের মুখস্বরূপ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশ্বপিতার নিকট তোমার শতায়ুঃ কামনা করিতেছেন।

কবিবর, শঙ্কর তোমায় জয়যুক্ত করুন।

তখন নোবেল প্রাইজের কোনো কথা ছিল না। বাঙালী সভ্যপশ্চিমের বিচার-নিরপেক্ষই বুঝেছিল পৃথিবীর লিরিক-কবি-সভায় তিনি মহাকবি।

ভারতবর্ষ বিদেশী রাজশাসনের অধীনতা থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে প্রচার করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন আমাদের দূর হয় নি। স্বাধীন ভারতবর্ষের দরজায় অনেক সভ্যজাতি ঘা দিচ্ছে। দু শ আড়াই শ বছর যে-সব খৃস্টান শ্বেতজাতি অবাধে অন্য সকলকে মন্থন করেছে তাদেরও অনেকে আমাদের বাহবা দিচ্ছে। যা বলছে তার ভাবার্থ, 'তোমাদের দেশকে আধুনিক করে গড়ার চেষ্টাকে প্রশংসা করতে হয়। আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-টাকা ধার নিয়ে লেগে থাকলে চাই-কি অল্পদিনেই আমাদের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে।' নির্বোধ না হলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এ-সব বাহবা-বাক্যের পিছনে স্বার্থের তাগিদ রয়েছে। আমরা দুর্বল গরিব জাতি, কিন্তু আমরা প্রকাণ্ড জনসংঘ। হাতে থাকলে বর্তমানের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কুস্তিতে সুবিধার সম্ভাবনা। নইলে স্বাধীনতার কয় বছরে বিদ্যাবুদ্ধি ও সৃষ্টিক্ষমতার আমরা এমন কিছু পরিচয় দিই নি, যাতে এ-সব জাতির মনে হতে পারে যে আমরা তাদের সমকক্ষ, কি আশু সমকক্ষ হতে চলেছি। সেইজন্য পরাধীন ভারতবর্ষের কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভাকে তারা স্বীকার করেছিল, সুযোগ পেলে ও সুযোগ খুঁজে আমরা তাদের সে কথা স্মরণ করিয়ে দিই। আর সেইজন্যই মার্কিন দেশের চতুর্থ শ্রেণীর পত্রলেখক সে দেশে রবীন্দ্রনাথের 'স্টক' কেমন নেমে গেছে, ওয়াল স্ট্রীটের দর ওঠানামার কায়দায় যখন তার বর্ণনা করে, আমরা খবরের কাগজে তার প্রতিবাদ প্রয়োজন মনে করি। এক

প্রচারের উত্তর অন্য প্রচারে দিতে চাই। আবার স্বাধীন ভারতবর্ষে অ-বাংলাভাষী জাতিদের কাছে রবীন্দ্রনাথকে প্রচারের এক নূতন তাগিদ দেখা দিয়েছে। ইংরেজের ভারতবর্ষ ত্যাগের আংশিক মূল্য আমরা দিয়েছি বাংলা দেশের তিন ভাগের দু ভাগ কেটে দিয়ে। স্বাধীনতার ক-বছরের অভিজ্ঞতায় আমাদের ধারণা হয়েছে যে স্বল্পাবশিষ্ট বাঙালী জাতির ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা নেই। তাদের অবহেলা করলে কারও কোনও ক্ষতি হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যেই বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্ন বাঙালীর এক-রাজ্যে ঐক্যের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করলে কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই। এই বিপাকে আমরা অন্য ভারতবাসীদের স্মরণ করাবার চেষ্টা করছি বাঙালীর অনতিকালপূর্বের রাষ্ট্রচেষ্টার ঐতিহ্য, ভারত-বর্ষের মুক্তির জন্য লাঞ্ছনা ও দুঃখবরণের দীর্ঘ ইতিহাস। ভুলে গিয়েছি যে পলিটিক্সের পাঞ্জা লড়ায় ভূত ও ভবিষ্যৎ নেই, আছে মাত্র বর্তমান। আর যে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য আমাদের সবচেয়ে গর্বের বস্তু, উৎসাহী হিন্দীপ্রচারকের প্রচণ্ড আস্ফালনে তার ভবিষ্যৎ ভেবে আমরা শঙ্কিত হয়েছি। সংবিধানের কেন্দ্রীয় রাজকাজের রাষ্ট্রভাষাকে এরা জবরদস্তি প্রচার করছে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাষা বলে। অর্থাৎ হিন্দীভাষাই হওয়া উচিত সকল ভারতবাসীর ব্যবহারের একমাত্র ভাষা। অবস্থাগতিকে এবং অ-হিন্দীভাষীদের দুর্বুদ্ধিতে যদি তা সম্ভব নাও হয়, তবে হিন্দী ভাষা হতেই হবে সকল শিক্ষিত শিষ্ট ভারতবাসীর প্রধান ভাষা। ভারতবর্ষের আর-সব ভাষাকে এ ভাষার প্রাধান্য স্বীকার করতে হবে, ভাষার উৎকর্ষের জন্য এবং জাতীয় ঐক্যের তাগিদে। উত্তরে আমরা শোনাচ্ছি যে হিন্দী অপরিণত অপক্ক ভাষা। ওর আধুনিক সাহিত্য অকিঞ্চিৎকর। কয়েক শ বছর পূর্বের দু-চার জন ভক্ত কবির কবিতা সে দৈন্য ঢাকতে পারে না। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রতিভাশালী লেখকপরম্পরায় এবং আজ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিপ্রতিভায় যে স্তরে পৌঁচেছে তার তুলনা খুঁজতে হয় সমুদ্রপারের সভ্যজাতিদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে। বাঙালীর হিন্দী ভাষা ও হিন্দী সাহিত্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ সংস্কৃতির স্তরে অনেক সিঁড়ি নীচে নামা। এ উত্তরে মনের ঝাল কিছু মেটে, আর কোনও ফল হয় না। কারণ ভয় ও ক্রোধের সম্মোহে আমাদের বিভ্রম জন্মেছে যে এ তর্ক বুঝি ভাষা ও সাহিত্যের রুচিবোধের তর্ক। 'অনেকবাহূদরোবক্ত্রনেত্র' জনসংঘের বিশ্বরূপের সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের সম্পর্ক নেই। এ দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথের নামের দোহাই সাহিত্যকে হেয় করা, ও মহাকবির অপমান।

২

রবীন্দ্রনাথকে প্রচারের প্রলোভন আমাদের ত্যাগ করতে হবে, কি বিদেশে কি ভারতবর্ষে! নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির উৎসাহের আতিশয্যে কবির অপ্রসন্নতা একটা দিগ্‌দর্শন। যদি আমরা সাহিত্যিক সত্যদৃষ্টিতে বুঝে থাকি আধুনিক পৃথিবীতে যে দু-তিন-পাঁচজন মহাকবি জন্মেছেন রবীন্দ্র-

নাথের কাব্যসৃষ্টি সেই মহাকবিদের একজনের সৃষ্টি, তবে অপেক্ষা করতে দোষ কি? আশা করব এমন দিন আসবে যখন এক ভাষার মহাকবির কাব্য সব ভাষার কাব্যরসিকদের রসাবিষ্ট করবে। বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে কোলে নিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় দিতে হবে না। মানুষের বড়ো সৃষ্টিকে বিদেশী ব'লে যারা অগ্রাহ্য করে বঞ্চিত হয় তারাই। বড় সৃষ্টি তাতে ছোট হয় না। 'ন রত্নমন্বিষ্যতে মৃগ্যতে হি তৎ'।

অসম্পূর্ণ

অন্ধ বাউলের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ
ফাল্গুনী অভিনয়, ১৯১৬

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি গ্রন্থে সরাসরি দাবি করিয়াছেন যে, 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্য-রচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।' পরবর্তীকালে নিজের কাব্যতত্ত্ব বিচার করিতে বসিয়া এই মন্তব্যকেই তিনি সমর্থন করিয়াছেন। আবার, জীবনস্মৃতি রচনার পূর্বে যখন তিনি কাব্যতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, তখনও ইহাকেই সমর্থন করিয়াছেন। সব জায়গায় ভাষা যে এক তাহা নয়, কিন্তু ভাবটা ভিন্ন নয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ-বিবৃত সূত্রটিকে তাঁহার কাব্যতত্ত্বের মূলসূত্র বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। অন্ততঃ আমি তাহাই ধরিয়া লইয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধ এই সূত্রটিরই আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁহার কাব্যরচনার একটিমাত্র পালা সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা। এখানে কাব্যকে সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া ব্যাপক অর্থে সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে এই উক্তির অর্থ সর্বব্যাপক হইয়া উঠিবে, বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি সাধারণ সূত্র পাওয়া যাইবে। আগে বলিয়াছি যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই সূত্রটির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এবারে বিশেষ-ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শুধু আলোচনা নয়, রবীন্দ্রনাথের দাবিকে পরীক্ষা করিয়া দেখা এই প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য। কেননা, 'সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা' বলিতে মিলনসাধনের চেষ্টা বুঝাইতে পারে। পূর্বোক্ত পরীক্ষা শব্দটির সার্থকতা এখানে। রবীন্দ্রসাহিত্য এই মিলনের চেষ্টা-মাত্র, না, তাহাতে মিলনের চরিতার্থতাও ঘটিয়াছে বিচার করিতে হইবে।

তাহা ছাড়া কাব্য-আলোচনায় সিদ্ধান্তের তেমন মূল্য নয় যেমন মূল্য ঐ আলোচনা-অংশের। রবীন্দ্রনাথ অন্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

> পথের প্রান্তে আমার দেবতা নয়,
> পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

কাব্যালোচনা-প্রসঙ্গেও ইহার সার্থকতা আছে। কাব্যশাখার শেষপ্রান্তে যে অমৃতফল তাহাকে অবহেলা না করিয়াও বলা যায় যে, কাণ্ডশাখা-পুষ্পপল্লবে বিচিত্র সমগ্র তরুটিও কম সুন্দর কম মূল্যবান নয়। আবার, রবীন্দ্রনাথ-প্রদত্ত মূল সূত্রটিতে উত্থাপিত দাবির পরিণামগত মূল্য অবহেলা না করিয়াও বলা চলে যে, সীমা ও অসীমের ন্যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটিতে বিরাজমান দুটি সত্তার মধ্যে কবিচিত্তের অ্যাডভেঞ্চার বা দুঃসাহসিক পরিভ্রমণ যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি কৌতূহল ও বিস্ময়ের স্থান। রবীন্দ্র-সাহিত্যে সীমা ও অসীম শেষ পর্যন্ত যদি সমন্বিত না হইয়াই থাকে, তবে তাহাতেই বা এমন-কি

ক্ষতি। ঐ সমন্বয়ের পথে চলিতে গিয়া জীবনের যে অসীম ঐশ্বর্য, অসীম সৌন্দর্য ও অসীম বিস্ময় ও আনন্দ কবি কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার মূল্য তো সামান্য নয়। সাধকের পক্ষে সমন্বয়ের যে মূল্যই হোক রসিকের পক্ষে মূল্যবান ঐ সৌন্দর্য, আনন্দ, বিস্ময় ও ঐশ্বর্য। সমালোচককে সাধক না হইলেও চলে, রসিক হইতেই হইবে। কবির ক্ষেত্রেও অন্যথা নয়। কবির পক্ষে সিদ্ধপুরুষ হওয়া অত্যাবশ্যক নয়। সিদ্ধপুরুষ জীবনরথের অক্ষদণ্ড, সমস্ত আবর্তনের মধ্যে তিনি স্থির, সমস্ত চঞ্চলতার মধ্যে তিনি অচল, চিরভূয়মান অনিত্যের মধ্যে তিনি ধ্রুব। আর কবি হইতেছেন জীবনরথের নিত্য ঘূর্ণমান চক্রনেমি, আবর্তন-চঞ্চলতা ও ভূয়মানতার মধ্যে তিনি রত্ন কুড়াইতেছেন। সীমা ও অসীমের অসম কোটিতে মেলবন্ধন ঘটাইতে চেষ্টা করিবার ফলে রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র রত্ন সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাই বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্য। তদুপরি যদি সীমা ও অসীম সমন্বিত হইয়াই থাকে, তবে তাহা অতিরিক্ত ফল। তাহার লোভ না রাখাই ভালো।

অজিতকুমার চক্রবর্তী বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা বিশ্ববোধ। এখন, এই বিশ্ববোধ আর রবীন্দ্রনাথ-কথিত সীমা ও অসীম অর্থাৎ সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধন ভিন্ন নয়। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব সর্বব্যাপক। তাহা একই সঙ্গে সীমা-অসীমে সমন্বিত, ভূমা ও ভূমিতে গঠিত। মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম তাহার তিন চরম উপাদান। চতুর্থ আর কীই বা হওয়া সম্ভব। এই জন্যই তাহাকে সর্বব্যাপক বলিয়াছি। মায়াবাদী শুধু ব্রহ্ম বলিবেন, দ্বৈতবাদী শুধু জগৎ ও ব্রহ্ম বলিবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এভাবে ভাগ করা চলিবে না, স্পষ্টতঃ বিশ্বকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম বলিতে হইবে। কেন এমন ভাবে বলা আবশ্যক তাহা এখন বুঝাইতে পারিব না বা চেষ্টা করিব না, কেননা, তাহাই বর্তমান আলোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ধরিয়া লওয়া যাক যে, রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল প্রেরণা যে বিশ্ববোধ, সে বিশ্বের মূল উপাদান তিনটি— মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম। তিনি যখন সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা বর্ণনা করেন তখন এই তিনের লীলা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার দৃষ্টিতে মানুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের সীমার কোটি আর ব্রহ্ম বিশ্বের অসীমের কোটি। তিনি বলিতে চান যে, স্বভাবতঃ যিনি অসীম তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যে আনন্দরূপে ধরা দিতেছেন; স্বভাবতঃ যিনি নির্গুণ তিনি স্বেচ্ছায় সীমার মধ্যেই সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন; আর স্বভাবতঃ যিনি নির্বিকার তিনি সীমার মধ্যে সৌন্দর্যরূপে ধরা দিতেছেন। কেন তাঁহার এমন খেয়াল হইল কেহ বলিতে পারে না— ইহাই তাঁহার লীলা। সীমা ও অসীমের এই বিচিত্র লীলার আসর রবীন্দ্রসাহিত্য। তাহারই স্বরূপ ও সার্থকতা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু তৎপূর্বে যে-তিনটি মূল উপাদানে রবীন্দ্রবিশ্ব গঠিত তাহাদের সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার অর্থ এই নয় যে, মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে নূতন তত্ত্বের অবতারণা করিব। নূতন বলিবার আছেই বা কী। তবে মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মের বোধ রবীন্দ্রনাথের জীবনে যেভাবে স্ফুটতর হইয়া উঠিল তাহার পরিচয়দান অত্যাবশ্যক। সে আলোচনায় নামিলে দেখা যাইবে যে, রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতি একটির পর একটি তার চড়াইয়াছেন তাঁহার বীণায়; প্রথমে প্রকৃতির তারটি, তার পরে মানুষের তারটি, অবশেষে

ব্রহ্মের তারটি চড়ানো হইয়াছে। আর ক্রমে বীণার সুর অধিকতর তারের ধ্বনিতে মধুরতর গম্ভীরতর হইয়া বাজিয়াছে। সেই মধুরগম্ভীর সুর বিশ্লেষণ করিবার আগে তার-চড়ানোর ইতিহাস জানা আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে কবির জীবনে মানুষ, প্রকৃতি ও ব্রহ্মবোধের সূচনা, বিকাশ ও পরিবেশ বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

রবীন্দ্রসাহিত্যের তিন জগৎ

রবীন্দ্রনাথের জীবনে তথা সাহিত্যে তিনটি ভূখণ্ডের অপরিসীম প্রভাব। এই প্রভাবের সূত্র অবলম্বন করিয়াই কবিকে বুঝিতে হইবে, কাজেই তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।

মানুষ জন্মগ্রহণ করে বিশেষ ভূখণ্ডে, বিশেষ কালখণ্ডে। তার পর এই সাধনার বেগে বিশেষকে অতিক্রম করিয়া নির্বিশেষে পৌঁছায়, জন্মগত ভূখণ্ড ও কালখণ্ডকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বে পৌঁছায়। যাহাদের সাধনবেগের সুকৃতি আছে তাহারাই এইরূপ ভাগ্যবান। রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-বোধের মূলে এই বিশেষ ভূখণ্ড ও কালখণ্ডের বোধ। এই ভূখণ্ড ও কালখণ্ডের বিশেষ প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে একরকমভাবে গড়িয়া তুলিয়াছে— তাহাদের প্রকৃতি অন্যরকম হইলে কবির জীবন ও কাব্যও ভিন্ন রূপ গ্রহণ করিত নিঃসন্দেহ। তাই কবিকে বুঝিবার প্রস্তুতিস্বরূপ আগে এ-দুটিকে বুঝিতে হইবে। তার পর ইহাদের সঙ্গে কবির সম্বন্ধ— সর্বশেষে এ-দুটির সহিত কবির কাব্যের আপেক্ষিক সম্বন্ধ। এখানে ভূখণ্ড তিনটি আমাদের আলোচ্য বিষয়। কালখণ্ডের আলোচনা প্রসঙ্গক্রমে হইতে থাকিবে।[১]

কলিকাতা

রবীন্দ্রনাথের জন্ম সেকালের কলিকাতা শহরে। সেকালের কলিকাতা অবশ্য একালের কলিকাতা নয়— তবু ঘনতম বসতির শহর, বাংলা দেশের তো বটেই খুব সম্ভব ভারতেরও। এ হেন শহরের আবার ঘনতম বসতি অঞ্চলে তাঁহার জন্ম। শুধু তাহাই নয়, সেকালের মহর্ষিভবন পুত্রকন্যা জামাতা-দৌহিত্র আত্মীয়স্বজন দাসদাসীতে পরিপূর্ণ বিরাট প্রাসাদ। এমন পরিবারে জাতকের মানুষের সঙ্গেই

১ এখানে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কয়েকটি তারিখের উল্লেখ করিতেছি, মনে রাখিলে এই আলোচনার ক্ষেত্রে কাজে লাগিবে।—

জন্ম ১৮৬১

স্থায়ীভাবে শিলাইদহে বাস ১৮৯১

শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা ১৯০১

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা ১৯২১

মৃত্যু ১৯৪১

প্রথম পরিচয়, কালক্রমে সেই পরিচয় পাকা হইয়া উঠিবে, তাহার কলম মানুষের পদচিহ্নের পথটাই অনুসরণ করিতে শিখিবে—ইহাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু ঠিক উল্টা ফল ফলিল। মানুষ ও ইমারত-অট্টালিকার নিষেধ ডিঙাইয়া দূরাপসারিত খণ্ডিত ছায়ামূর্তি প্রকৃতির অমোঘ হাতছানি বালকের মনে আসিয়া প্রবেশ করিল। রাজপুত্র সিদ্ধার্থকে প্রাসাদের যাবতীয় সমারোহের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; তবু সে ব্যবস্থা বানচাল হইয়া গেল। রাজকীয় বাধানিষেধ ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত গণ্ডী অতিক্রম করিয়া জীবনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল তাহার সম্মুখে। এ ক্ষেত্রেও প্রায় অনুরূপ কাণ্ডটি ঘটিল। বিশ্বপ্রকৃতির দূরবিসর্পী হস্ত জনতার সন্নিবেশের মধ্যে ঢুকিয়া আপন মানুষটিকে বাছিয়া লইল। তার উপরে আবার রবীন্দ্রনাথের কবিমনের বিশেষ স্বরূপ যখন স্মরণ করি, 'এ নহে এ নহে'— যাহা কাছে আছে তাহাকে এড়াইয়া ডিঙাইয়া যাহা দূর, যাহা অনুপস্থিত তাহাকে ধরিবার পাইবার আকাঙ্ক্ষা যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি যে, এমন না হইয়া উপায় ছিল না। বেড়া যতই ঘনসন্নিবিষ্ট হোক তাহার সাধ্য হইল না বালককে আবদ্ধ করিয়া রাখে। প্রকৃতির প্রতিশোধের অনেক আগে প্রকৃতির নির্বাচন।

এখানে মনে কৌতূহল জাগে, যদি এই বালকটি ওয়ার্ডস্বার্থের মতো প্রকৃতির অবাধ আসরের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিত তবে তাহার কাব্য কী রূপ পরিগ্রহ করিত। তখন কি অব্যবহিত পরিবেশকে লঙ্ঘন করিয়া, যাহা দূর, যাহা অনায়ত্ত তাহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষাটাই প্রবল হইয়া উঠিত না? রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশ্বপ্রকৃতির যে স্থান তাহা কি মানুষে অধিকার করিয়া বসিত? প্রকৃতি ও মানুষের স্থানবিনিময় কি একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার ছিল? এখন, ইহা জল্পনামাত্র কিন্তু একেবারে বৃথা জল্পনা নয়, কেননা মানুষ ও প্রকৃতির আপেক্ষিক সম্বন্ধবিচার রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি কূটতর্কের স্থল। আলোচনার ধারায় অগ্রসর হইয়া এ তর্কের সম্মুখে আমাদের আসিতে হইবে; সম্ভব হইলে তাহার মীমাংসার চেষ্টাও করিতে হইবে, তাই কথাটা এখানে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

প্রকৃতির নির্বাচন নামে দুটা শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, অধিক অগ্রসর হইবার আগে সাধ্যমত তাহার ব্যাখ্যা করিয়া লই। রবীন্দ্রনাথ জন্মসূত্রে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এ আকর্ষণ দুর্জ্ঞেয় কেননা ইহার কারণ নির্দেশ করা সম্ভব নয়, ইহাই তাঁহার কবি-শক্তির মূলধন। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। বয়স ও অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির সঙ্গে এই মূলধন স্ফীত হইয়া প্রচুর মুনাফা দেখাইয়াছে— তাহাই রবীন্দ্রসাহিত্য। আবার বয়স ও অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির সঙ্গে এই জন্মগত মূল আকর্ষণ ক্রমে নিবিড় পরিচয় ও অবশেষে গভীর জীবনতত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। সে-সব বিবরণ ও বিবর্তনের ইতিহাস যথাসময়ে আসিবে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট প্রকৃতি যে-শিশুটিকে চিহ্নিত করিয়া সংসারে পাঠাইয়া দিয়াছিল, মানুষের কোলে জন্মিয়া সে শিশু প্রকৃতিকে ভুলিয়া গেল না, মানুষের সতর্করচিত পাহারা এড়াইয়া দূরাবস্থিত প্রকৃতির মুখে আপন মাতৃমুখ দেখিয়া মুহূর্তে তাহাকে আপন বলিয়া চিনিয়া লইল।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটাকয়েক পেয়ারাগাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা-বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে চাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি-পাড়-দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম।...প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসাযাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা-গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ সূর্যাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবন।...কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম।[২]

ইহাকে প্রকৃতির নির্বাচন বলিব না তো কী! এতদিন যে প্রকৃতি দেয়াল-ইমারতের 'ফাঁক-ফুকর' দিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া বালককে মুগ্ধ করিত, এবারে প্রথম সুযোগেই অবাধমূর্তিতে তাহার সম্মুখে আসিয়া 'অয়ম্ অহং ভোঃ' বলিয়া সাড়া দিল। বালকও তাহাকে চিনিল। কিন্তু যে অব্যবহিত মানুষের সংসারের মধ্যে তাহার জন্ম, সেই মানুষের সংসারের কি হইল? দূর নিকট হইল বটে, কিন্তু পর তখনও ভাই হইল না, অনেক বাধা।

আবার কবির শরণাপন্ন হওয়া যাক।—

বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল, কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে, পায়ের শিকল কাটিল না।[৩]

গোড়ায় খাঁচায় থাকায় বোধ করি ভালোই হইয়াছিল— শলাকার ফাঁকে ফাঁকে খাঁচার পাখি ও বনের পাখির প্রণয়রস জমিয়া উঠিয়াছিল। দাঁড়ে বসাতেও উপকার ঘটিয়াছিল, ঈষৎ স্বাধীনতায় বৃহৎ স্বাধীনতার বাসনা উগ্রতর হইয়াছিল। কিন্তু পায়ের শিকল কি অধিকবয়সেও কাটিয়াছিল? অন্ততঃ মানুষের সংসারের দিকটায় যে কাটে নাই তাহা একপ্রকার নিঃসন্দেহ। পারিবারিক আভিজাত্য, সামাজিক ধর্মমত আর তাহার বিশেষ কবিপ্রকৃতি এই তিনে মিলিয়া ঐ সূক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ শৃঙ্খলটি রচনা করিয়াছিল। নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশকে কবির সহিত মানুষ ও প্রকৃতির আপেক্ষিক সম্বন্ধের রূপক হিসাবে গ্রহণ করিলে অন্যায় হইবে না।—

একদিন আমার অভিভাবকের মধ্যে দুইজনে সকালে পাড়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। আমি কৌতূহলের আবেগ সামলাইতে না পারিয়া তাঁহাদের অগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদূর গিয়াছিলাম। গ্রামের গলিতে

২ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

৩ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

ঘনবনের ছায়ায় শেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানাপুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়ো আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে আঁকিয়া আঁকিয়া লইতেছিলাম। একজন লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিতেছিল, তাহা আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময় আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ টের পাইলেন, আমি পিছনে আছি। তখনই ভর্ৎসনা করিয়া উঠিলেন, যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও। তাঁহাদের মনে হইয়াছিল বাহির হইবার মতো সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার উপর অন্য কোনো ভদ্র আচ্ছাদন নাই— ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোশাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ আমার ছিলই না, সুতরাং কেবল সেইদিনই যে হতাশ হইয়া আমাকে ফিরিতে হইল তাহা নহে, ত্রুটি সংশোধন করিয়া ভবিষ্যতে আর-একদিন বাহির হইবার উপায়ও রহিল না।[৪]

এই ঘটনাটিকে কবিজীবনের একটি রূপক বলিয়াছি। মানুষের নিবিড়তম সান্নিধ্যে জন্মিয়াও তিনি মানুষকে জানিবার আগে অন্তরায়িত প্রকৃতিকে জানিয়াছেন। আবার যখনই তিনি মানুষের সংসারের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন তখনই কেহ-না-কেহ তাঁহাকে টানিয়া সরাইয়া দিয়াছে, কখনো সামাজিক বিশেষ ধর্মমতের অন্তরায়, কখনো পারিবারিক আভিজাত্য, কখনো বা মোজা ও ভদ্র আচ্ছাদনের অভাব। প্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিয়াও পূর্ণরূপে জানিলেন আর মানুষকে অবাধ সান্নিধ্যে দেখিয়াও আভাস-ইঙ্গিতের বেশি জানিতে পারিলেন না। জীবনস্মৃতির যুগে তিনি মানুষের সম্বন্ধে খাঁচার মধ্যে ; ছিন্নপত্রের যুগে তিনি মানুষের সম্বন্ধের দাঁড়ের উপরে বসিয়াছেন ; শিকলটা অনেকখানি দীর্ঘ হইয়াছে সত্য, কিন্তু একেবারে কাটে নাই। চলতি স্রোতের মুখে মানুষকে দেখা ছাড়া তাঁহার উপায় ছিল না, সেইজন্য তাঁহার মানুষের জগৎ গল্পগুচ্ছের ছোটো-গল্পের জগৎ। কিন্তু অদৃষ্ট নির্মম হইলেও নিষ্ঠুর নয়, এক হাতে ক্ষতি করিয়া অন্য হাতে পূরণ করে।—

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-তোলা নৌকায় যখন-তখন আমার মন বিনাভাড়ায় সওয়ারি হইয়া বসিত এবং যে-সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির হইত ভূগোলে আজ পর্যন্ত তাহাদের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।[৫]

মানুষের দিকের বাধা ঘুচিল না, কিন্তু গঙ্গার মাতৃহস্ত প্রকৃতির দিকের বাধা অপসারিত করিয়া দিল। ইহাই তাঁহার তখনকার যথার্থ মনের অবস্থা।

পূর্বোক্ত ঘটনার অনেককাল পরে জীবনস্মৃতি গ্রন্থ রচনার সময়ে কবি প্রকৃতির সহিত তাঁহার শৈশব ও বাল্যকালের যোগাযোগের সূক্ষ্ম ও শিক্ষাপ্রদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ ও নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেলগাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য বলিয়া দেখা দিত। নর্মাল স্কুল হইতে চারিটার পরে ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে— মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল, সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি

৪ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

৫ বাহিরে যাত্রা, জীবনস্মৃতি

ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল তখন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ যোগটি বাধাগ্রস্ত হইয়া গেল।[৬]

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন যে, সন্ধ্যাসংগীত কাব্যের অন্ধকার বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার যোগভঙ্গজনিত। প্রভাতসংগীতে সেই যোগ পুনরায় স্থাপিত হওয়ায় আনন্দের সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। খুব সম্ভব উপরের বিবরণটি লিখিবার সময় কবি ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত কবি-কাহিনী কাব্যের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সেই কাব্যেই কাব্যের নায়ক কবির সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ, মানবহৃদয়ের জন্য আকাঙ্ক্ষা, 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন,' এবং অবশেষে প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলনের বার্তা লিখিত হইয়াছে। সন্ধ্যাসংগীত ইহার অনেক পরে প্রকাশিত হইয়াছে।[৭] এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, কড়ি ও কোমল প্রকাশ পর্যন্ত জীবনস্মৃতির যুগ ধরিলে, কবি তাহাই ধরিয়াছেন, বিশ্বপ্রকৃতিই কবির একমাত্র নির্ভর। অবশ্য কবি-কাহিনীর নায়ক রবীন্দ্রনাথের বকলমে 'মানুষের মন চায় মানুষেরই মন' বলিয়াছে কিন্তু নায়িকা নলিনী তো তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই। সন্ধ্যাসংগীতের বিচ্ছেদ, প্রভাতসংগীতের মিলন সমস্তেরই মূলীভূত কারণ বিশ্বপ্রকৃতি। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের উপান্তে প্রকৃতির প্রতিশোধ কাব্যে রঘুর দুহিতাকে মানবসমাজের ক্ষীণ প্রতিনিধিরূপে প্রবেশ করিতে দেখিতে পাই, আর এই পর্বে অন্ত্য কাব্যে কড়ি ও কোমলে প্রথম স্পষ্টরূপে ধ্বনিত হইতে শুনি—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

এই প্রথম মানুষের সুনিশ্চিত পদধ্বনি তাঁহার কাব্যে। কথাটি কবি জানিতেন তাই কবি এখানে জীবনস্মৃতি পর্বের সীমা টানিয়াছেন। জীবনস্মৃতি গ্রন্থ বিশ্বপ্রকৃতির সহিত বিশ্বকবির পরিচয় ও পরিণয়ের কাব্য। ইহার পরেই সূচনা মানবসমাজের। অতঃপর খাসমহল বিবরণের পটোত্তোলন হইবে ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে, সেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের ইতিহাস; জীবনস্মৃতিতে যেমন দেখিতেছি মানবিক পরিবেশে প্রকৃতির লীলা। কিন্তু না, কথায় কথায় ঘটনাস্রোতকে লঙ্ঘন করিয়া আমরা অনেক আগাইয়া আসিয়াছি, এবারে ফিরিয়া যাওয়া আবশ্যক।

এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ভালোমন্দ সুখ-

৬ প্রভাতসংগীত, জীবনস্মৃতি

৭ এখানে প্রাসঙ্গিক কয়েকখানি গ্রন্থের প্রকাশকাল প্রদত্ত হইল— কবিকাহিনী ১৮৭৮; সন্ধ্যাসংগীত ১৮৮২; প্রভাতসংগীত ১৮৮৩; প্রকৃতির প্রতিশোধ ১৮৮৪; কড়ি ও কোমল ১৮৮৬।

দুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না।...অতএব খাসমহলের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।[৮]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের নিঃসঙ্গতা, শ্যাম চাকরের গণ্ডি, ভৃত্যরাজকতন্ত্রের উপরে অনেকে অকারণ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুতঃ এসব ব্যাপারের তেমন অসামান্যতা কিছুই ছিল না। সেকালে ধনী অভিজাত পরিবারের সাধারণ ছাঁচটাই ঐরকম ছিল। বয়স্ক ও বালকের মধ্যে তখন ব্যবধান খুব বেশি ছিল, আর পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের সঙ্গে এখনকার মতো মাখামাখি ছিল না। সেকালের প্রচলিত ছাঁচের মধ্যেই ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথ মানুষ হইয়া উঠিতেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এই বালকটি কল্পনাপ্রবণ ও স্পর্শগ্রাহী ছিল তাহার মন সমস্ত পরিবেশটিকে নিজ অন্তর্নিহিত কবি-প্রকৃতির পোষণের কাজে লাগাইতে সমর্থ হইয়াছিল। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' সেকালের সব বালককেই পড়িতে হইত, অধিকাংশেরই মনের উপর দিয়া ছড়াটা পিছলাইয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের কানে বিশ্বমেঘদূতের প্রথম ইশারার মতো কাজ করিল— ঐ সরল ঝংকার তাঁহার মনে যে অনুরণন তুলিল তাহা যেন ফুরাইতে চাহে না।—

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল ; এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপশব্দগন্ধ দ্বার-জানলার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।[৯]

এই 'জল পড়ে পাতা নড়ে' বিশ্বপ্রকৃতির একটা ইশারা ছাড়া আর কিছু নয়— ছবির সঙ্গে যুক্ত হইয়া ধ্বনির ইশারা।—

তখনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কী নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ, সমস্তই তখন কথা কহিত, মনকে কোনোমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই। পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেছি না, ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাক্কা দিয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কী করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রঙের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা যাইতে পারে তাহার কতই প্ল্যান ঠাওরাইয়াছি।[১০]

৮ কড়ি ও কোমল, জীবনস্মৃতি
৯ ঘর ও বাহির, জীবনস্মৃতি
১০ ঘর ও বাহির, জীবনস্মৃতি

'প্রকৃতি দেয়াল-ইমারতের ফাঁক-ফুকর দিয়া ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়া বালককে মুগ্ধ করিত'

'ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট'
শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঐ মেটে রঙের মলাটখানা খুলিয়া ফেলার ইচ্ছা দূর বাহিরকে ধরিবার ইচ্ছারই নামান্তর মাত্র। সারাজীবন তিনি ঐ আকাঙ্ক্ষাটি বহন করিয়াছেন, 'নীলিমা লইতে চাই আকাশ ছাঁকিয়া।'

ইহারই কিছু পরে বয়স যখন দশের মতো হইবে তখন তিনি প্রথম কলিকাতার বাহিরে গেলেন পেনেটির বাগানবাড়িতে, খাঁচার পাখি দাঁড়ের উপরে বসিল। কিন্তু অভাবনীয় সুযোগে দাঁড়ের শিকলটাও খুলিয়া গেল, সে পিতার সঙ্গে হিমালয়যাত্রা, পথে পড়িল সেকালের শান্তিনিকেতন।—

গাড়ি ছুটিয়া চলিল ; তরুশ্রেণীর সবুজ নীল পাড় দেওয়া বিস্তীর্ণ মাঠ এবং ছায়াচ্ছন্ন গ্রামগুলি রেলগাড়ির দুই ধারে দুই ছবির ঝরনার মতো বেগে ছুটিতে লাগিল, যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়ে বোলপুরে পৌঁছিলাম। পালকিতে চড়িয়া চোখ বুজিলাম। একেবারে কাল সকালবেলায় বোলপুরের সমস্ত বিস্ময় আমার জাগ্রত চোখের সম্মুখে খুলিয়া যাইবে এই আমার ইচ্ছা— সন্ধ্যার অস্পষ্টতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অখণ্ড আনন্দের রসভঙ্গ হইবে।[১১]

হায় রে, ভৃত্যরাজকতন্ত্রের শাসন হইতে মুক্তি পাইবামাত্র দেখা গেল বহুকালের আকাঙ্ক্ষিত-স্পর্শ বিশ্বপ্রকৃতি 'যেন মরীচিকার বন্যা বহিয়া চলিয়াছে।' আর সন্ধ্যার অন্ধকারে খণ্ডিত দৃশ্য দেখিলে চলিবে না, ভোরের আলোতে একেবারে অখণ্ড দর্শনের আনন্দলাভ করিতে হইবে। পরদিন ভোরবেলা উঠিয়া আশাভঙ্গ হইতে বিলম্ব হইল না। ছাড়া পাইবার পরেও দূর ও বাহির দূরে ও বাহিরেই রহিয়া গেল।

অবশেষে হিমালয়ে গিয়া পূর্ণ মুক্তিলাভ ঘটিল, খাঁচার শলা দাঁড়ের শিকল দুইই ঘুচিয়া গিয়াছে, তবু দূর ও বাহির এতটুকুও কাছে আসিল না।—

যেখানে পাহাড়ের কোনো কোণে পথের কোনো বাঁকে পল্লবভারাচ্ছন্ন বনস্পতির দল নিবিড় ছায়া রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত বৃদ্ধ তপস্বীদের কোলের কাছে লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো দুই-একটি ঝরনার ধারা সেই ছায়াতল দিয়া শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরগুলার গা বাহিয়া ঘনশীতল অন্ধকারের নিভৃত নেপথ্য হইতে কুলকুল করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে…[১২]

রেলগাড়িতে বসিয়া আয়ত্তপ্রায় প্রকৃতিকে 'মরীচিকার বন্যা' মনে হইয়াছিল আর এখানে করায়ত্ত প্রকৃতি মুহূর্তে অভ্যস্ত বেশ পরিবর্তন করিয়া মানবরূপ ধারণ করিল। ছিন্নপত্রের যুগেও মানব ও প্রকৃতির এই লীলাবিনিময় দেখিতে পাইব, পদ্মা সেখানে মানবী ও বিশ্বপ্রকৃতি জ্যোতির্ময়ী দেবীমূর্তিতে পরিণত হইয়াছে। 'এ কী কৌতুক নিত্য নূতন ওগো কৌতুকময়ী।' দূর ও নিকটের মালাবদল আর হইয়া ওঠে না।

হিমালয় হইতে ফিরিবার পরে বালকের অধিকারের সীমানা অনেকটা বাড়িয়া গেল, তবু সীমার শাসন ঘুচিতে চায় না।—

১১ হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি

১২ হিমালয়যাত্রা, জীবনস্মৃতি

নিঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না।[১৮]

অনেকে মনে করেন যে এই অভিজ্ঞতা হইতেই রবীন্দ্রনাথের মহাকবিজীবনের উন্মেষ। অন্ততঃ ইহা যে তাঁহার কবিজীবনের কেন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা তাহাতে সন্দেহ নাই— এই মধুকোষটিকেই কেন্দ্র করিয়া পর্বে পর্বে কাব্যে কাব্যে প্রতিভার নূতন নূতন দল বিকশিত হইয়া চলিয়াছে।[১৯] আর এই অভিজ্ঞতাতেই যে জীবনস্মৃতি-পর্বের সীমানা তাহাও একরূপ নিশ্চিত। এতদিন কবির জীবনে যে প্রকৃতির তারটি বাঁধিবার উদ্যোগ চলিতেছিল এই ঘটনায় তাহার সমাপ্তি। সেই তার বাঁধা হইলে যে সুর ধ্বনিত হইল তাহাও অভিজ্ঞতাটির মতোই অপ্রত্যাশিত। সে সুরের রহস্যটি নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির ক্রোড়ে যখন লালিত হইতেছিল তখন নির্ঝর ভাবিয়াছিল উহাতেই বুঝি তাহার জীবনের চরিতার্থতা, কিন্তু এই সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইবামাত্র সে বুঝিল এখানে থাকিলে তাহাকে চলিবে না, মানুষের সংসারের দিকে তাহাকে ছুটিতে হইবে। এ কথা কবিরই। তাঁহাকে আর আলস্যে মাধুর্যে করুণায় নির্জনবাস করিলে চলিবে না, এবারে তাঁহাকে বৃহৎ সংসারের দিকে বাহির হইয়া পড়িতে হইবে। কলিকাতার জনারণ্যের নির্জনতায় প্রকৃতি যখন তাঁহাকে লালিত করিয়া তুলিতেছিল, তখন এমন অসম্ভব কথা কেমন করিয়া মনে হইবে। কিন্তু সেই লালনপর্বের শিক্ষানবিশি শেষ হইলে প্রকৃতি সশরীরে দেখা দিয়া তাঁহাকে সেই পথটার উপরে দাঁড় করাইয়া দিল যাহার পাশ দিয়া কবির রূপকে ভগ্নস্বপ্ন নির্ঝর মানবসংসারের দিকে ছুটিয়াছে। ভাবগ্রাহী কবি বুঝিলেন যে, কবিজীবনের লক্ষ্য চোখে আঙুল দিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দেওয়া হইল। জীবনস্মৃতি-যুগের অন্য দুইখানি উল্লেখযোগ্য কাব্য প্রকৃতির প্রতিশোধ ও কড়ি ও কোমলের এখানেই প্রভেদ।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কারোয়ার নামক স্থানে প্রকৃতির প্রতিশোধ নাট্যকাব্য লিখিত হয়। ঐ নাটকের ভাবের সমর্থন ছিল কারোয়ারের সমুদ্রদৃশ্যে। 'অর্ধচন্দ্রাকার বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দিয়াছে, সে যেন অনন্তকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা।' কিন্তু ঐ ব্যাকুলতামাত্রই। অনন্ত কি কখনো সান্তর সঙ্গে মিলিত হইবে!

এই প্রসঙ্গে তিনি আবার লিখিতেছেন—

কারোয়ার হইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধের কয়েকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড়ো একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া সুর দিয়া দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

হ্যাদে গো নন্দরানী,
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও,
আমরা রাখাল বালক গোষ্ঠে যাব,
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।

১৮ প্রভাতসংগীত, জীবনস্মৃতি

১৯ প্রায় অনুরূপ বয়সেই মহর্ষির জীবনে প্রথম আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে যাইতেছে; সেই সূর্যোদয়, সেই ফুলফোটা, সেই মাঠে বিহার তাহারা শূন্য রাখিতে চায় না; সেইখানেই তাহারা তাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিত হইতে চাহিতেছে, সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি তাহারা দেখিতে চায়।...[২০]

এবারে অসীমকে মানুষের মধ্যে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। বেশ বুঝিতে পারা যায় বিশ্বপ্রকৃতি মুগ্ধ কবিকে মানুষের দ্বারের কাছে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। তাই কড়ি ও কোমল প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে তো একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, দ্বারের পরে দ্বার।...কড়ি ও কোমল মানুষের জীবন-নিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।[২১]

কবির বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, "এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল।"

বিশ্বপ্রকৃতি কলিকাতার মতো অভাবিত স্থানে কবিকে দেখা দিলেন এবং আরো অভাবিত এই যে কবির বীণায় প্রকৃতির তারটি বাঁধা হইবামাত্র তাহাতে মানুষের গানটি ঝংকৃত করিয়া তুলিলেন। আর যেন তাহারই ভূমিকা রচনার উদ্দেশ্যে বিচিত্রলীলাময় অদৃষ্ট কবিকে টানিয়া লইয়া গেল প্রকৃতির অবাধ আসরে যেখানে মানুষের সঙ্গে কবির শুভদৃষ্টি ঘটিবে।

শিলাইদহ

পিতার আদেশে রবীন্দ্রনাথকে পৈতৃক জমিদারি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে শিলাইদহে[২২] যাইতে হইবে। তিনি তো অবাক। তিনি কবি, বিষয়কার্যের কী বোঝেন— এই তাঁর মনোগত ভাব, কিন্তু না যাইয়াও উপায় নাই, পিতার ইচ্ছা। তা ছাড়া মহর্ষির সন্তানদের মধ্যে আর-কেহ এমন ছিলেন না যিনি এই ভার লইতে পারেন। জ্যেষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক, বিষয়কর্মে উদাসীন; মধ্যম সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে জজিয়তি করেন; জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীর মৃত্যুর পরে সংসার সম্বন্ধে বিবাগী; বীরেন্দ্রনাথ ও সোমেন্দ্রনাথ বায়ুরোগগ্রস্ত; জামাতা সারদাপ্রসাদ একসময়ে বিষয়কর্ম দেখিতেন, রবীন্দ্রনাথের বিবাহের দিনে তাঁহার মৃত্যু হয়। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ছাড়া গতি নাই। অতএব স্বাভাবিক সংকোচ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকেই যাইতে হইল। এ ঘটনা ১৮৯১ সালের। ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা না হওয়া অবধি তাঁহাকে একরূপ স্থায়ীভাবে শিলাইদহে থাকিতে হইল। উড়িষ্যায়

২০ প্রকৃতির প্রতিশোধ, জীবনস্মৃতি

২১ বর্ষা ও শরৎ, জীবনস্মৃতি

২২ শোনা যায় যে, এখানে শেলি নামে নীলকর সাহেব কুঠি গড়িয়া ব্যবসা করিত। শেলির দহ ক্রমে শিলাইদহে রূপান্তরিত হইয়াছে।

তাঁহাদের যে সম্পত্তি ছিল তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যে অনেক সময়ে তাঁহাকে সেখানে যাইতে হইয়াছে— অনেক সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন— কিন্তু এই দশ বছর কাল শিলাইদহ তাঁহার স্থায়ী বাসস্থান ধরিয়া লইলে অন্যায় হইবে না। শিলাইদহ, সাজাদপুর ও পতিসরকে তিনটি বিন্দু কল্পনা করিয়া একটি ত্রিভুজ অঙ্কিত করিলে ইহাই হইল তাঁহার তিনকোনা পৃথিবী। মনে মনে কবি ইহাকে হয়তো নির্বাসন ভাবিয়াছিলেন কিন্তু দেখা গেল যে, প্রকৃতপক্ষে ইহা তাঁহার স্বস্থানে আগমন। কবির অজানিতে অদৃষ্ট আর-এক নূতন লীলার আসর পত্তন করিল। এটি যে কত বড়ো আর অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য পরবর্তী রবীন্দ্রসাহিত্য সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এখানকার পদ্মা নদী কবির প্রধান মানসিক আশ্রয় ও অবলম্বন হইয়া উঠিল। কলিকাতা বাসকালে গঙ্গা নদী (পেনেটির বাগান ও চন্দননগর স্মরণীয়) যে মুক্তির স্বাদ দিত, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যরাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইত, পদ্মা নদী তাহাই বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে করিতে থাকিবে ইহাই হয়তো কবি ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ উল্‌টা ফল ফলিল। অদৃষ্টের লীলার গতি বিচিত্র।

পদ্মা নদীতে নৌকা ভাসাইয়া কবি ভাবিলেন যে, তাঁহার নৌকা প্রকৃতির কূলে ভিড়িবে, যে-প্রকৃতির ক্ষণিক ও খণ্ডিত রূপ তিনি কলিকাতায় দেখিতে পাইতেন। কিন্তু লীলাময়ী পদ্মা কবির নৌকা যে কূলে ভিড়াইয়া দিল তাহা মানুষের সংসারের কূল, তাহার এক দিকে সোনার তরী-চিত্রা-চৈতালির লৌকিক প্রেম সৌন্দর্য ও আনন্দের জগৎ, অন্য দিকে 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' খণ্ডক্ষুদ্র গল্পগুচ্ছের গল্পের জগৎ। এ জগৎ এতাবৎকাল কবির অপরিচিত ছিল। এখানে পদ্মার নায়কতায় তাঁহার মুখোমুখি পরিচয় ঘটিল মানুষের সংসারের সঙ্গে, গোষ্ঠীবদ্ধ অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষের সঙ্গে।[২৩] তাঁহার বীণায় দ্বিতীয় তারটি চড়ানো হইল, কবির রাগিণী ক্রমেই পূর্ণতর হইয়া উঠিতেছে। এই বিচিত্র-ইতিহাসবাহী গ্রন্থ ছিন্নপত্র ও তাহার পূর্ণতর সংস্করণ ছিন্নপত্রাবলী। সে ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশের আগে কবিজীবনে পদ্মার তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনা সারিয়া লওয়া আবশ্যক।

দেশভেদে একই নদীর ভিন্ন নাম হইতে পারে। গঙ্গার পরবর্তী অংশের নাম ভাগীরথী, আবার শাখাভেদে তাহাকেই পদ্মা ও মেঘনা বলা যাইতে পারে ; ব্রহ্মপুত্রের পরবর্তী অংশ যমুনা নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত কাব্যরাজ্যের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত একটি প্রবাহ বহমান, স্থানভেদে নাম ভিন্ন। প্রথম দিকে এই প্রবাহ ক্ষীণকায়, ইহা নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর ; মধ্যে ইহা বিশালোরসী পদ্মা ; শেষাংশে ইহাই বলাকার আকাশগঙ্গা বা 'চঞ্চলা'। তিন নামে একই প্রবাহ। এখানে তর্ক উঠিবে,

২৩ জীবনস্মৃতির যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কবির সান্নিধ্য ঘটিয়াছে, যেমন দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, বিহারীলাল, শ্রীকণ্ঠ সিংহ প্রভৃতি। ইহাদের অনেকেই নামান্তরে ও কাব্যোচিত রূপান্তরে তাঁহার কাব্যে স্থান করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবসমাজকে জানিবার, তাহাদের সুখদুঃখকে কল্পনার ক্ষেত্রে আয়ত্ত করিবার সুযোগ তাঁহার ঘটিয়া ওঠে নাই।

প্রথম ও শেষটি রূপক বা মানসিক ব্যাপার মাত্র, অথচ পদ্মা ভৌগোলিক জলপ্রবাহ। এ তিনে এক হয় কী প্রকারে। পদ্মার অবশ্যই ভৌগোলিক সত্তা আছে কিন্তু কবির পদ্মা ঠিক ভৌগোলিক নদী নয় —কবিকল্পনা তাহার রূপান্তর সাধন করিয়া তাহাকেও একটি রূপক বা মানসিক ব্যাপারে পরিণত করিয়াছে। এইভাবে রূপান্তরিত হইয়া পদ্মা প্রথম ও শেষাংশের সহিত মিলিত হইয়া একটি অখণ্ড প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। আর তাহারই প্রবাহ বছরে বছরে পলি নিক্ষেপ করিয়া কবির জগৎকে বিস্তৃততর করিয়া তুলিয়াছে। তাহা কোথাও শস্যে শ্যামল হইয়াছে, কোথাও জনপদে সমৃদ্ধ হইয়াছে আবার কোথাও বা নিষ্কলঙ্ক শূন্যতার উপরে সৌন্দর্যের মরীচিকা বহাইয়া দিতেছে। ইহার মধ্যে কূটস্থান পদ্মার রূপান্তরের ইতিহাসটি। তাহাই প্রথমে বলিতে চেষ্টা করি, সহায় আমাদের কবির সাক্ষ্য।

পদ্মার লৌকিক রূপের অপরূপ চিত্র ছিন্নপত্র গ্রন্থে ও তাহার পূর্ণতর সংস্করণ ছিন্নপত্রাবলী গ্রন্থে যথেষ্ট আছে ; সে-সব চোখে আঙুল দিয়া পাঠককে দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন নাই। আর তা ছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে সেগুলির সার্থকতাও নাই। পদ্মা যেখানে লৌকিক রূপের নির্মোক খসাইয়া দিব্যরূপ ধারণ করিবার দিকে চলিয়াছে সেইগুলিতেই আমাদের প্রয়োজন।—

যেদিকে ছিন্নমেঘের ভিতর দিয়ে সকালবেলাকার আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে আসছে সেদিকে অপার পদ্মা— দৃশ্যটি বড়ো চমৎকার হয়েছে। জলের রহস্যগর্ভ থেকে একটি স্নানশুভ্র অলৌকিক জ্যোতিঃপ্রতিমা উদিত হয়ে নীরব মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে ; আর ডাঙার উপরে কালো মেঘ স্ফীতকেশর সিংহের মতো ভ্রূকুটি করে ধান্যক্ষেত্রের মধ্যে থাবা মেলে দিয়ে চুপ করে বসে আছে— সে যেন একটি সুন্দরী দিব্যশক্তির কাছে হার মেনেছে, কিন্তু এখনও পোষ মানে নি, দিগন্তের এক কোণে আপনার সমস্ত রাগ এবং অভিমান গুটিয়ে নিয়ে বসে আছে।[২৪]

এ পদ্মা লৌকিক নয়, দিব্যবিভূতিভূষিতা একটি জ্যোতিঃপ্রতিমা। পদ্মা ইতিমধ্যেই বাস্তবজগৎ হইতে ভাবজগতে উন্নীত হইয়াছে। তবু এই রূপের মধ্যে বাস্তবজগতের রেশ রহিয়া গেল, পদ্মা দেবীপ্রতিমা হইলেও বিশুদ্ধ ভাবরূপিণী নয়, বলাকার 'চঞ্চলা'র সঙ্গে সমত্ব তাহার ঘটিল না। নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশ পড়িলে দেখা যাইবে যে, মানবরূপের শেষ স্পর্শটুকু পরিত্যাগ করিয়া পদ্মা বিশুদ্ধ ভাবময়ী হইয়া উঠিয়াছে।—

পদ্মাকে এখন খুব জাঁকালো দেখতে হয়েছে— একেবারে বুক ফুলিয়ে চলেছে ; ওপারটা একটিমাত্র কাজলের নীল রেখার মতো দেখা যায়। আমি এই জলের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবি, বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গতিটাকে যদি কেবল গতিভাবেই উপলব্ধি করতে ইচ্ছা করি তা হলে নদীর স্রোতে সেটি পাওয়া যায়। মানুষ পশুর মধ্যে যে চলাচল তাতে খানিকটা চলা খানিকটা না চলা, কিন্তু নদীর আগাগোড়াই চলছে— সেইজন্যে আমাদের মনের সঙ্গে আমাদের চেতনার সঙ্গে তার একটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আমাদের শরীর আংশিকভাবে পদচালনা

২৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১১। এই প্রবন্ধে শ্রাবণ ১৩৬৭ সংস্করণ অনুসৃত।

করে, অঙ্গচালনা করে, আমাদের মনটার আগাগোড়াই চলেছে। সেইজন্যে এই ভাদ্রমাসের পদ্মাকে একটা প্রবল মানসশক্তির মতো বোধ হয়— সে মনের ইচ্ছার মতো ভাঙছে চুরছে এবং চলেছে— মনের ইচ্ছার মতো সে আপনাকে বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে এবং অস্ফুট কলসংগীতে নানাপ্রকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে। বেগবান একাগ্র-গামিনী নদী আমাদের ইচ্ছার মতো, আর বিচিত্র শস্যশালিনী স্থির ভূমি আমাদের ইচ্ছার সামগ্রীর মতো।[২৫]

এ নদী লৌকিক শেষ স্পর্শটুকু পরিত্যাগ করিয়াছে— ইহা একটা 'প্রবল মানসশক্তির মতো।' ঐ 'মতো' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, ইহার মধ্যে যে ব্যঞ্জনা নিহিত তাহা হইতেছে যে মানসিক শক্তিও নদীটির সার্থক উপমা নয়— কেননা, মন দেহ ছাড়া সম্ভব নয়— অথচ অন্য কোনো উপমা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত।[২৬]

এবারে দেখা যাইবে পদ্মা আইডিয়াতে রূপান্তরিত হইয়াছে আর এই রূপান্তরের ফলেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের নির্ঝর ও বলাকার চঞ্চলার মাঝখানকার অদৃশ্য ফাঁকটুকু পূরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এখন এই আইডিয়ারূপী প্রবাহ কবিকে কোন্ কূলে ভিড়াইল দেখা যাক— ইঙ্গিত আগেই দিয়াছি।

আইডিয়া লইয়া তত্ত্বরচনা চলে কিন্তু কাব্য রচিতে মানুষের আবশ্যক। পরিচয়ের গভীরতার সঙ্গে পদ্মা ধীরে ধীরে মানবমূর্তি ধারণ করিয়া কবির কল্পনার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। কিংবা পদ্মাই যেন কবিকে মানুষের উপকূলে ভিড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজেই মানবমূর্তি ধরিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।—

বাস্তবিক, পদ্মাকে আমি বড়ো ভালোবাসি। ইন্দ্রের যেমন ঐরাবত আমার তেমনি পদ্মা— আমার যথার্থ বাহন— খুব বেশি পোষমানা নয়, কিছু বুনোরকম— কিন্তু ওর পিঠে এবং কাঁধে হাত বুলিয়ে ওকে আমার আদর করতে ইচ্ছে করে। এখন পদ্মার জল অনেক কমে গেছে— বেশ স্বচ্ছ কৃশকায় হয়ে এসেছে— একটি পাণ্ডুবর্ণ ছিপছিপে মেয়ের মতো, নরম শাড়িটি গায়ের সঙ্গে বেশ সংলগ্ন। সুন্দর ভঙ্গিতে চলে যাচ্ছে আর শাড়িটি বেশ গায়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে বেঁকে যাচ্ছে। আমি যখন শিলাইদহে বোটে থাকি, তখন পদ্মা আমার পক্ষে সত্যিকার একটি স্বতন্ত্র মানুষের মতো। অতএব তার কথা যদি কিছু বাহুল্য করে লিখি তবে সে কথাগুলো চিঠিতে লেখবার অযোগ্য মনে করিস নে। সেগুলো হচ্ছে এখানকার পার্সোনাল খবরের মধ্যে।[২৭]

২৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১১৮

২৬ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতার প্রথমে নাম ছিল 'নদী'। কিন্তু নদী বলিতে নির্দিষ্ট বস্তু তাহার গতি দুইই বোঝায়। বস্তু বাদ দিয়া বিশুদ্ধ গতিকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই পরে 'চঞ্চলা' নাম প্রদত্ত হয়। কিন্তু যেহেতু মানুষের ভাষা দেহাশ্রয়ী মানুষের সঙ্গে একত্র বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেইজন্য দেহ বা রূপের স্পর্শ-বিমুক্ত শব্দ ও উপমা বিরল, হয়তো একেবারেই অসম্ভব। কবি নদীকে 'চঞ্চলা' করিয়াছেন তৎসত্ত্বেও নটী, অপ্সরী, বৈরাগিণী প্রভৃতি শব্দকে বাদ দিতে পারেন নাই। বিশুদ্ধ আইডিয়ার যথোচিত প্রকাশের বাহন খুব সম্ভব রাগরাগিণী, শব্দ বা রেখা নয়।

২৭ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ৯৩

পুনরায়—

পদ্মা প্রভৃতি বড়ো বড়ো নদীগুলো এত বড়ো যে, সে যেন ঠিক কণ্ঠস্থ করে নেওয়া যায় না। আর, এই বর্ষা-কালের ছোটো বাঁকা নদীটি যেন বিশেষ করে আমার হয়ে যাচ্ছে— এ নদীতে স্টীমার নেই, নৌকোর ভিড় নেই, আমারই বোট এই পাড়াগেঁয়ে নদীটির উপরে যেন রাজত্ব বিস্তার করে চলে যায়। কাল থেকে আকাশ খুব মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে। সমস্ত স্নিগ্ধ এবং শ্যামল, দুই তীর শান্তিপূর্ণ। পদ্মা নদীর কাছে মানুষের লোকালয় তুচ্ছ, কিন্তু ইছামতী মানুষ-ঘেঁষা নদী— তার শান্ত জলপ্রবাহের সঙ্গে মানুষের দৈনিক কর্মপ্রবাহগুলি বেশ সুন্দরভাবে এসে মিশছে। সে ছেলেদের মাছ ধরবার এবং মেয়েদের স্নান করবার নদী— স্নানের সময় মেয়েরা যে-সমস্ত গল্পগুজব নিয়ে আসে সেগুলি এই নদীর হাস্যময় কলস্বরের সঙ্গে বেশ মিশে যায়। আশ্বিন মাসে মেনকার ঘরের মেয়ে পার্বতী যেমন কৈলাসশিখর ছেড়ে একবার তার বাপের বাড়ি দেখেশুনে যায়, ইছামতী তেমনি সম্বৎসর অদর্শন থেকে বর্ষার কয়েক মাস আনন্দহাস্য করতে করতে তার আত্মীয় লোকালয়গুলির তত্ত্ব নিতে আসে— তার পরে ঘাটে ঘাটে মেয়েদের কাছে প্রত্যেক গ্রামের সমস্ত নতুন খবরগুলি শুনে নিয়ে তাদের সঙ্গে মাখামাখি সখীত্ব করে আবার চলে যায়।[২৮]

খুব উঁচু পাড়— বরাবর দুইধারে গাছপালা লোকালয়— এমন শান্তিময়, এমন সুন্দর, এমন নিভৃত— দুইধারে স্নেহ সৌন্দর্য বিতরণ করে নদীটি বেঁকে বেঁকে চলে গেছে— আমাদের বাংলাদেশের একটি অপরিচিত অন্তঃপুর-চারিণী নদী। কেবল স্নেহ এবং কোমলতা এবং মাধুর্যে পরিপূর্ণ। চাঞ্চল্য নেই, অথচ অবসরও নেই। গ্রামের যে মেয়েরা ঘাটে জল নিতে আসে, এবং জলের ধারে বসে বসে অতি যত্নে গামছা দিয়ে আপনার শরীরখানি মেজে তুলতে চায়— তাদের সঙ্গে এর যেন প্রতিদিন মনের কথা এবং ঘরকন্নার গল্প চলে।[২৯]

কবির নৌকায় যিনি হাল ধরিয়া বসিয়াছেন তিনি আর কেহই নহেন, রহস্যময়ী বর্তমানে মানব-রূপধারিণী পদ্মা, আর তাঁহারই চালনায় নৌকা ইতিমধ্যেই মানবসংসারের কূল ঘেঁষিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, কোনো এক ঘাটে কোনো এক সময়ে ভিড়িয়া পড়িবে মনে হইতেছে। অবশ্য নৌকা এখনো কূলে ভেড়ে নাই, কিন্তু উপকূলে যে মানবসংসার তাহার ছায়া পড়িয়াছে জলে, ভাসমান কবি ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রতিবিম্বে মৎস্যচক্ষুর আভাস পাইতেছেন, তবে লক্ষ্যভেদের এখনো বিলম্ব আছে।—

আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে এর স্নেহশালিনী নদী-গুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এইসমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারি ভালোবাসি। এর মুখে ভারি একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে— যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে

২৮ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২২০

২৯ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৪

স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি— এত অসহায় অসমর্থ অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই।... [৩০]

কবির পৃথিবী মাটির পৃথিবী এবং মানুষের পৃথিবী, যে পৃথিবীর 'মুখে একটি সুদূরব্যাপী বিষাদ,' সে 'দেবতার মেয়ে' কিন্তু তাহার দেবতার ক্ষমতা নাই। এই অক্ষমতা অসহায়তা অসম্পূর্ণতাই তাহাকে কবির প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে। মাতার সমস্ত ত্রুটি সন্তানে, মানুষও অক্ষম অসহায় অসম্পূর্ণ, দুঃখ বিরহ বিচ্ছেদ ও মৃত্যুতে তাহার জীবনকন্থা শতচ্ছিদ্র। প্রকৃতিকে ভালোবাসা সহজ, মানুষকে ভালোবাসাই কঠিন, অনেক বাধা ডিঙাইয়া তবে তাহার আঙিনায় প্রবেশ করিতে হয়। কবি একে একে বাধা ডিঙাইতে চেষ্টা করিতেছেন। বাধা আছে সত্য কিন্তু পূর্বগামিনী ছায়া মানুষের রঙে তাঁহার কল্পনা ইতিমধ্যেই রাঙাইয়া দিয়াছে। কবির জগৎ মানবায়িত হইয়া উঠিবার মুখে।—

কাল সন্ধ্যাবেলায় যখন এই সান্ধ্যপ্রকৃতির মধ্যে সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হয়ে জলিবোটে করে সোনালি অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে ফিরে আসছি এমন সময়ে হঠাৎ দূরের এক অদৃশ্য নৌকো থেকে বেহালা যন্ত্রে প্রথমে পূরবী ও পরে ইমনকল্যাণে আলাপ শোনা গেল— সমস্ত স্থির নদী এবং স্তব্ধ আকাশ মানুষের হৃদয়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার, এও এক পরম সৃষ্টি—...।[৩১]

'ইতিপূর্বে আমার মনে হচ্ছিল মানুষের জগতে এই সন্ধ্যাপ্রকৃতির তুলনা বুঝি কোথাও নেই— যেই পূরবীর তান বেজে উঠল অমনি অনুভব করলুম এও এক আশ্চর্য গভীর এবং অসীম সুন্দর ব্যাপার।'— কয়েক বছর আগে এমন ভাবা একেবারেই অসম্ভব ছিল। এখন মানুষের জগৎ যে প্রকৃতির জগতের পরিপূরকমাত্র হইয়া উঠিয়াছে তাহাই নয়, প্রকৃতির জগৎ মানুষের জগতের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করিতেছে। মানুষের দুঃখের জলে প্রকৃতির সৌম্যসুন্দর প্রতিবিম্ব। তবে বুঝি কবির নৌকা মানুষের ঘাটে ভিড়িয়াছে।

লীলাময়ী পদ্মার প্রবাহ কবিকে মানুষের ঘাটে নামাইয়া দিল, 'সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ' গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সংসার কবির চোখে পড়িল, কবিকল্পনার ক্যামেরার চোখ এখানকার বিচিত্র জীবনের খণ্ড খণ্ড দৃশ্যগুলি অমর ভাষায় ধরিয়া রাখিতে লাগিল ; এতকাল যাহা ছিল পরোক্ষ এবারে সে-সব প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়া কবির জীবনে পরিণত হইতে চলিল। ইতিপূর্বে একবারমাত্র সামান্য কয়েক মাসের জন্য অনুরূপ অভিজ্ঞতা ঘটিয়াছিল কবির জীবনে গাজীপুরে বাসকালে। মানসীর সেই কয়েকটি কবিতাই সবচেয়ে পরিণত, কবির সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু মানসীতে যাহা ছিল ভূমিকা এখানে তাহা ভূমিতে পরিণত হইল, যে ভূমির উপরে সোনার তরী চিত্রা চৈতালির, গল্পগুচ্ছের প্রথম

৩০ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৩

৩১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৫২

দিককার গল্পগুলির ঐশ্বর্যময় সৌধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবির চালয়িত্রী বিশ্বপ্রকৃতি জানিত মানব-জীবনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের অভাবেই কবির কল্পনা স্ফূর্তি পাইতেছে না, এবারে সেই অভাবপূরণের ব্যবস্থা হইল। যদি কোনো সত্তাকে যথার্থভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা বলিতে হয় তবে এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই বলা উচিত। কেননা, বিশ্বপ্রকৃতিই শৈশব হইতে তাঁহাকে হাতে ধরিয়া চালনা করিতেছে। প্রথমে তাঁহাকে আপন রহস্যনিকেতন দেখাইয়াছে, এবারে দেখাইতে উদ্যত মানুষের সংসার যাহার রহস্য গভীরতর, আবার যথাসময়ে দেখিতে পাইব যে এই লীলাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দিরদ্বারে লইয়া গিয়া কবির বীণায় সমস্ত তার বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছে। তার পরে আবার যখন একে একে তার খুলিবার সময় আসিয়াছে— সেই বিশ্বপ্রকৃতিই তাঁহার সহায়। জীবনের উপান্তে যখন আর-সব তার ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে, তখনো বিশ্বপ্রকৃতির সেই প্রথম তারটির সুরসপ্তক থামে নাই, যে একতারা হাতে তিনি কবিজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন সেই একতারাখানিই হাতে করিয়া বিদায় লইয়াছেন।

ইতিপূর্বে অখ্যাত অজ্ঞাত সামান্য মানুষ বাংলা সাহিত্যে অমরপদবী লাভ করে নাই, কোথাও যদি তাহারা প্রবেশ করিয়াও থাকে তবে মাথায় মোট বহিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এতদিন তাহাদের কুণ্ঠিত স্থান যেন ছিল সাহিত্যের পাদটীকায়। এবারে তাহারা প্রধান পাত্রপাত্রীর পদপ্রাপ্ত হইল।—

আজি যার জীবনের কথা তুচ্ছতম
একদিন শুনাবে তা কবিত্বের সম।

সেই অনাগত একদিন রবীন্দ্রসাহিত্যে নিত্য হইয়া বিরাজ করিতেছে, আর ইহার মূলে আছে লীলাময়ী প্রকৃতির হস্তক্ষেপ।

এই সময়ে লিখিত নিম্নোদ্‌ধৃত একখানি পত্র হইতে কবির মনোভাব অবগত হওয়া যাইবে।—

আজ খুব ভোরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনছিলুম, ঘাটে মেয়েরা উলু দিচ্ছে। শুনে মনটা ঈষৎ কেমন বিকল হয়ে গেল, অথচ তার কারণ ভেবে পাওয়া শক্ত। বোধ হয় এই রকমের একটা আনন্দধ্বনিতে হঠাৎ অনুভব করা যায়, পৃথিবীতে একটা বৃহৎ কর্মপ্রবাহ চলছে যার অধিকাংশের সঙ্গেই আমার যোগ নেই— পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ আমার কেউ নয় অথচ তাদের কত কাজকর্ম সুখদুঃখ উৎসব আনন্দ চলছে। কী বৃহৎ পৃথিবী, কী বিপুল মানবসংসার! কত সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি প্রবাহিত হয়ে আসে— সম্পূর্ণ অপরিচিত ঘরের একটুখানি বার্তা পাওয়া যায়। মানুষ তখন বুঝতে পারে 'আমার কাছে আমি যত বড়োই হই আমাকে দিয়ে সমস্ত বিশ্ব পরিপূর্ণ করতে পারি নে, অধিকাংশ জগৎই আমার অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়, অনাত্মীয়, আমাহীন'— তখন এই প্রকাণ্ড ঢিলে জগতের মধ্যে আপনাকে অত্যন্ত খাটো এবং একরকম পরিত্যক্ত এবং প্রান্তবর্তী বলে মনে হয়; তখনি মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয় হয়।[৩২]

'কী বৃহৎ পৃথিবী! কী বিপুল মানবসংসার!' অথচ তার কতটুকুই বা জানিতে পারা যায়। সেই অতিবৃহৎ অজানিত অংশ স্মরণ করিলে 'মনের মধ্যে এই রকমের একটা ব্যাপ্ত বিষাদের উদয়

৩২ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৫৬

হয়।' এই বিষাদের ভাবটি লক্ষণীয়, কেননা, যখনই তিনি মানবসংসারের কথা লিখিতে উদ্যত হইয়াছেন, প্রকৃতির কথা সম্বন্ধেও ইহা অপ্রযোজ্য নয়, জানার ক্ষুদ্র দ্বীপটি বেষ্টন করিয়া বৃহৎ অজানার তরঙ্গমালা আক্ষেপ করিয়া উঠিয়াছে। 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' কবির জানায় আর পরিসংখ্যানের জানায় এইখানে প্রভেদ। পরিসংখ্যানকার যাহা জানে নিশ্চয় জানে, কবি যেটুকু জানে সেটুকু বৃহৎ অজানার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কবিকে ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা করিয়া দিতে থাকে। এই কারণেই ছোটোগল্পই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ক্ষেত্র। সমগ্র জানার ভিত্তির উপরে উপন্যাস গড়িয়া ওঠে, ছোটোগল্প ইঙ্গিতমাত্র। উপন্যাসে পাঠক সমগ্রকে পায়, আর ছোটগল্পে পায় আভাসকে। ছোটোগল্প ও লিরিক একই শাখার ফল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে লিরিক-অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি একান্তভাবে সার্থক সৃষ্টি।

গ্রাম্য জীবনের ছবির টুকরোগুলি একে একে কবির কল্পনার প্লেটের উপরে ছায়া নিক্ষেপ করিতে থাকে। কখনো তিনি কুঠিবাড়ির ছোট ডাকঘরের প্রবাসী পোস্টমাস্টারকে দেখিতে পান, তাহাকে কাছে ডাকিয়া লইয়া গল্প করেন, পোস্টমাস্টার গল্পের ভূমিকা রচিত হয়। কখনো দেখেন যে একদল ছেলে নদীর তীরে একটা মাস্তুল গড়াইয়া খেলা করিতেছে— ছুটি গল্পের উপাদান সংগ্রহ হয়। আবার কখনো বা শ্বশুরগৃহযাত্রী ছোটো মেয়েটিকে দেখেন, কোনো এক সময় সমাপ্তি গল্পের মৃন্ময়ী হইয়া উঠিবে সে। নদীতীরে বেদে-দলের জীবনযাপন দেখিতে পান যখন, তখন জানেন না যে চৈতালির একটি কবিতার উপকরণ সংগৃহীত হইল। এইভাবে সংকোচে সাধ্বসে মানুষ পদার্পণ করে তাঁহার কল্পনালোকে। আবার অনেক সময়ে মানবগোষ্ঠীর দারিদ্র্যের বিস্তারিত দৃশ্য দেখিয়া মানুষের আর-এক পরিচয় লাভ করেন।—

যখন গ্রামের চারিদিকের জঙ্গলগুলো জলে ডুবে পাতা লতা গুল্ম পচতে থাকে, গোয়ালঘর ও লোকালয়ের বিবিধ আবর্জনা চারি দিকে ভেসে বেড়ায়, পাট-পচানির গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত, উলঙ্গ পেটমোটা পা-সরু রুগ্ন ছেলেমেয়েরা যেখানে সেখানে জলে কাদায় মাখামাখি ঝাঁপাঝাঁপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির জলের উপরে একটি বাষ্পস্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়ায়, গৃহস্থের মেয়েরা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্নার নিত্যকর্ম করে যায়— তখন সে দৃশ্য কোনোমতেই ভালো লাগে না। ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না— এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত সহ্য হয়! সকল-রকম শক্তির কাছেই আমরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছি। প্রকৃতি উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা উপদ্রব করে তাও সই, শাস্ত্র চিরদিন ধরে যে-সকল উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।[৩৩]

---

৩৩ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১২১

বৃহৎ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দুঃখে শুধু যদি করুণার সঞ্চার হইত তবে হয়তো কর্মের দ্বারা তাহার সমাধান করা অসম্ভব হইত না— কিন্তু ঐসঙ্গেই মানুষের বৃহৎ রূপটা মানবসমাজের প্রতি একটা অনির্দিষ্ট সম্ভ্রমের ভাব জাগায় তাঁহার মনে। আকাশ সমুদ্র ধরাতল যেমন অসীম, নদীর প্রবাহ যেমন অবিচ্ছিন্ন, মানুষের স্রোতটাকে তেমনি অসীম ও অবিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে হয়, করুণার সঙ্গে মিশ্রিত হয় কল্পনা, কাব্যের নূতন উৎসের সন্ধান পান কবি।—

সন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ওপার থেকে জনকতক লোক বাঁয়া-তবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এসে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে স্ত্রীপুরুষ যারা চলেছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ওপারে সারবাঁধা মহাজনী নৌকোয় আলো জ্বলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘণ্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বসে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হৃৎস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এসে আঘাত করতে লাগল।[৩৪]

পুনরায়—

আমার বোধ হয় কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে এলেই মানুষের নিজের স্থায়িত্ব এবং মহত্ত্বের উপর বিশ্বাস অনেকটা হ্রাস হয়ে আসে। এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি; চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে, প্রতিদিন সমানভাবে যাতায়াত করছে এবং চিরকাল অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে। যেমন নানা দেশ দিয়ে নদী চলেছে, মানুষের স্রোতও তেমনি কলরব-সহকারে গাছপালা গ্রামনগরের মধ্যে দিয়ে এঁকে বেঁকে চিরকাল ধরে চলেছে— এ আর ফুরোয় না। মেন মে কাম অ্যান্ড মেন মে গো বাট্ আই গো অন ফর এভার— কথাটা ঠিক সংগত নয়। মানুষও নানা শাখাপ্রশাখা নিয়ে নদীর মতোই চলেছে— তার এক প্রান্ত জন্মশিখরে, আর-এক প্রান্ত মরণসাগরে। দুই দিকে দুই অন্ধকার রহস্য, মাঝখানে বিচিত্র লীলা এবং কর্ম এবং কলধ্বনি; কোনোকালে এর আর শেষ নেই।[৩৫]

মানুষের স্রোত যে কেবল অন্তহীন তাহা নয়—এ স্রোত যেন মানুষ ও প্রকৃতির মিলিত প্রবাহ। ইহার মধ্যে মানবের ভাগ অধিক কি প্রকৃতির ভাগ অধিক সে বিশ্লেষণ এখন থাক্, আমাদের আলোচনার ক্রম তাহার সমাধান করিবে। কবি আরো বুঝিতে পারেন যে যখন তিনি কলিকাতায় থাকেন তখন মানুষকে বড় করিয়া দেখেন, পল্লীগ্রামে আসিলে প্রকৃতি বড় হইয়া ওঠে। কিন্তু একথা বলিয়াই অজ্ঞাতসারে তিনি আপনাকে সংশোধন করিয়া লন, বলেন—

৩৪ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১০৮

৩৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৩৮

এখানে মানুষ কম এবং পৃথিবীটাই বেশি ; চারি দিকে এমন সব জিনিস দেখা যায় যা আজ তৈরি করে কাল মেরামত করে পরশু দিন বিক্রি করে ফেলবার নয়, যা মানুষের জন্মমৃত্যু ক্রিয়াকলাপের মধ্যে চিরদিন অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...পাড়াগাঁয়ে এলে আমি মানুষকে স্বতন্ত্র মানুষ ভাবে দেখি নে।

কবির চোখে মানুষ স্বতন্ত্র কিন্তু সেইজন্যই কি সে ছোট নয় ? ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুর এবং অনেক পরিমাণে নিরর্থক নয় ? পল্লীগ্রামে মানুষের অংশ পরিমাণে কম হইলেও অজর, অমর এবং অক্ষয় বলিয়াই কি বড়ো নয় ? এখানে গুণের বিচারে মানুষ এমন একটা নিত্যপদবী লাভ করিয়াছে যাহা এতকাল কবির চোখে বিশ্বপ্রকৃতির প্রাপ্য ছিল। মানুষে প্রকৃতিতে এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন ঘটিয়াছে বলিয়াই মনুষ্যসংসারের তুচ্ছতম শব্দগুলিও বিশ্বসংগীতের অন্তর্গত হইয়া বাজিয়া ওঠে।—

এখানকার এই দুই-একটা একঘেয়ে ঠক্ ঠক্ ঠুক্ ঠাক্ শব্দ, উলঙ্গ ছেয়েমেয়েদের খেলার কল্লোল, রাখালের করুণ উচ্চস্বরে গান, দাঁড়ের ঝুপ্‌ঝাপ্ ধ্বনি, কলুর ঘানির তীক্ষ্ণকাতর নিখাদ স্বর, সমস্ত কর্মকোলাহল একত্র মিলে এই পাখির ডাক এবং পাতার শব্দের সঙ্গে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য ঘটাচ্চে না— সমস্তটাই যেন একটা শান্তিময় স্বপ্নময় করুণামাখা একটা বড়ো সংগীতের অন্তর্গত— খুব বিস্তৃত বৃহৎ অথচ সংযত মাত্রায় বাঁধা। আমার মাথার মধ্যে সূর্যের আলোক এবং এই-সমস্ত শব্দ একেবারে যেন কানায় কানায় ভরে এসেছে, অতএব চিঠি বন্ধ করে খানিক ক্ষণ পড়ে থাকা যাক।[৩৬]

কিন্তু কেবল বৃহৎ সমাজের নীহারিকামূর্তি নয়— মাঝে মাঝে নীহারিকার উপরে স্বতন্ত্র তারকা দেখা দিতে থাকে, ঐ তারকায় ও নীহারিকায় মিলিয়া মানুষের বিচিত্র ও পূর্ণ পরিচয় কবি লাভ করেন। এখানে মানুষের কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্র উদ্‌ধৃত করিতেছি।—

কাল আমাদের এখানে পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল। বিস্তর প্রজা এসেছিল। আমি বসে বসে লিখছিলুম, এমন সময় প্রজারা দলে দলে রাজদর্শন করতে এল— ঘর বারান্দা সমস্ত পূর্ণ হয়ে গেল। আমার একটি বুড়ো ভক্ত আছে তার নাম রূপচাঁদ ম্রেধা— সে একটি ডাকাত-বিশেষ, লম্বা জোয়ান সত্যবাদী অত্যাচারী রাজভক্ত প্রজা। আমাকে যেন সে পরমাত্মীয়ের মতো ভালোবাসে— সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার চাঁদমুখ দেখতে এসেছি।' চাঁদমুখ এ কথায় বোধ করি কিঞ্চিৎ রক্তিমবর্ণ হবার উপক্রম করলে। রূপচাঁদ বললে, 'কতদিন পরে দেখা— এক বৎসর তোমায় দেখি নি !' মেয়েদের ভালোবাসা অবশ্য খুব মধুর লাগতে পারে, কিন্তু এই রকম সরল সবল পুরুষমানুষের অকৃত্রিম অটল নিষ্ঠা এরও একটি অপূর্ব সৌন্দর্য আছে। এর মধ্যে মানব-প্রকৃতির একেবারে অবিমিশ্র আদিম সহৃদয়তাটুকু প্রকাশ পায়— এর সঙ্গে সঙ্গে যে-একটা বল এবং কাঠিন্য আছে, যে-একটা ঋজুতা এবং directness প্রকাশ পায়, সেইটের জন্যেই এই সরস সুন্দর অনুরক্তি আরও এমন বহুমূল্য বোধ হয়।[৩৭]

৩৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৯০

৩৭ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২১৯

আবার—

প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কি মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভাণ করছি যেন এই-সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তা কর্তা বিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কী হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরবার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গোরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না। সেই ভুলটি রক্ষে করবার জন্যে কত সরঞ্জাম রাখতে এবং কত আড়ম্বর করতে হয়।[৩৮]

পুনরায়—

এক-এক সময় এক-একটি সরল ভক্ত বৃদ্ধ প্রজা আসে, তাদের ভক্তি এমনি অকৃত্রিম! বাস্তবিক এর সুন্দর সরলতা এবং আন্তরিক ভক্তিতে এ লোকটি আমার চেয়ে কত বড়ো। আমিই যেন এ ভক্তির অযোগ্য, কিন্তু এ ভক্তিটি তো বড়ো সামান্য জিনিস নয়। ছোটো-ছেলেদের উপর যেরকম ভালোবাসা এই বৃদ্ধ-ছেলেদের উপর অনেকটা সেইরকম— কিন্তু কিছু প্রভেদ আছে। এরা তাদের চেয়েও ছোটো। কেননা তারা বড়ো হবে, এরা আর কোনো কালেও বড়ো হবে না— এদের এই জীর্ণ শীর্ণ কুঞ্চিত বলিত বৃদ্ধ দেহখানির মধ্যে কী-একটি শুভ্র সরল কোমল মন রয়েছে। শিশুদের মনে কেবল সরলতা আছে মাত্র, কিন্তু এমন স্থির বিশ্বাসপূর্ণ একাগ্রনিষ্ঠা নেই।[৩৯]

পুনরায়—

আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারি মায়া করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো নিরুপায়। তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে— কোনোমতে একটুখানি ক্ষুধা ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়।[৪০]

এই কয়েকটি পত্রখণ্ডে আর-একটি নূতন রসের পরিচয় পাওয়া যাইবে। সংঘবদ্ধ মানুষ কবির মনে বিস্ময় জাগাইয়াছে যেমন বিস্ময় জাগায় নিসর্গ, কিন্তু এবারে দেখা গেল নিঃসম্বল হতভাগ্য প্রজার দল তাঁহার মনে জাগাইয়াছে একটি সম্ভ্রমমিশ্রিত ভক্তির ভাব। এই ভক্তির জোয়ারে অভিজাত জমিদারের হৃদয়ে শূন্য শুক্তিগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কল্পনার ক্ষেত্রে উভয়ের দুস্তর ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে।

৩৮ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৫

৩৯ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮২

৪০ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৮১

এখানে ঐ প্রসঙ্গে আর দুখানি পত্র উদ্‌ধৃত করবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ভক্তির জোয়ারের পরিবর্তে এখানে দুঃখের বন্যা। কখনো ভক্তিতে, কখনো দুঃখে, কখনো বিস্ময়ে, কখনো সম্ভ্রমে বারে বারে কবিতে মানুষে ভেদ ঘুচিয়া যাইতেছে, মনে রাখিতে হইবে এ সমস্তই লীলাময়ী প্রকৃতির নেপথ্যবিধানের পরিণাম—

আজ সকালে দেখছিলুম একজন মেয়ে তার একটি ছোটো উলঙ্গ শীর্ণ কালো ছেলেকে এই খালের জলে নাওয়াতে এনেছে। আজ ভয়ংকর শীত পড়েছে— জলে দাঁড় করিয়ে যখন ছেলেটার গায়ে জল দিচ্ছে তখন সে করুণস্বরে কাঁদছে আর কাঁপছে, ভয়ানক কাশিতে তার গলা খন্‌খন্‌ করছে। মেয়েটা হঠাৎ তার গালে এমন একটা চড় মারলে যে আমি আমার ঘর থেকে তার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলুম।…ছেলেটা বেঁকে পড়ে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল, কাশিতে তার কান্না বেধে যাচ্ছিল। তার পরে ভিজে গায়ে সেই উলঙ্গ কম্পান্বিত ছেলের নড়া ধরে টেনে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেল। এই ঘটনাটা এমন নিদারুণ পৈশাচিক বলে বোধ হল! ছেলেটা নিতান্ত ছোটো, আমার খোকার বয়সী। এ রকম একটা দৃশ্য দেখলে হঠাৎ মানুষের যেন একটা idealএর উপর আঘাত লাগে, বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে খুব একটা হুঁচোট লাগার মতো। ছোটো ছেলেরা কী ভয়ানক অসহায়![৪১]

আরো একখানি—

মনে আছে, সাজাদপুরে থাকতে সেখানকার খানসামা একদিন সকালে দেরি করে আসাতে আমি ভারি রাগ করেছিলুম; সে এসে তার নিত্যনিয়মিত সেলামটি করে ঈষৎ অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'কাল রাত্রে আমার আট বছরের মেয়েটি মারা গেছে।' এই বলে সে ঝাড়নটি কাঁধে করে আমার বিছানাপত্র ঝাড়পোঁচ করতে গেল। আমার ভারি কষ্ট হল— কঠিন কর্মক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ শোকেরও অবসর নেই। কিন্তু সে অবসরটা নিয়ে ফল কী? কর্ম যদি মানুষকে বৃথা অনুশোচনার বন্ধন থেকে মুক্ত করে সম্মুখে প্রবাহিত করে নিয়ে যেতে পারে তবে তার চেয়ে ভালো শিক্ষা আর কী আছে! যা হবার নয় সে তো আয়ত্তের অতীত, যা হতে পারে তা সংসারে যথেষ্ট এবং তা এখনি হাতের কাছে প্রস্তুত। যে মেয়ে মরে গেছে তার জন্যে শোক ছাড়া আর কিছুই করতে পারি নে, কিন্তু যে ছেলে বেঁচে আছে তার জন্যে রীতিমত খাটতে হবে। কল্পনানেত্রে এই পৃথিবী-ব্যাপী পুরুষের কর্মক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—সংসারের রাজপথের দুই ধারে সকলে কঠিন পরিশ্রমে কাজ করছে —কেউ চাকরি করছে কেউ ব্যাবসা করছে, কেউ চাষ করছে, কেউ মজুরি করছে— অথচ এই কর্মক্ষেত্রের নীচে দিয়ে প্রত্যহই কত মৃত্যু কত শোক দুঃখ নৈরাশ্য গোপনে অন্তঃশিলা বয়ে যাচ্ছে, যদি তারা জয়ী হতে পারত তা হলে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কর্মচক্র বন্ধ হয়ে যেত। ব্যক্তিগত শোকদুঃখ নীচে দিয়ে চলে যায় এবং তার উপরে কঠিন পাথরের ব্রীজ বেঁধে লক্ষলোকপূর্ণ কর্মের রেলগাড়ি আপন লৌহপথে হুহুঃ শব্দে চলে যায়— নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া কারও খাতিরে কোথাও থামে না। কর্মের এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে একটা কঠোর সান্ত্বনা আছে।[৪২]

৪১ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৬

৪২ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২২৪

'কোথায় বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় ভাইমার রাজসভার রাজকার্য এসে'

শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীহারিকারূপেই হোক আর তারকারূপেই হোক মানুষ একেবারে হৃদয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছায় না। মানুষ কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, বিস্ময় ভক্তি করুণা ও সম্ভ্রম জাগায় কিন্তু হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শখানি আনিয়া দেয় না, অন্ততঃ কবির হৃদয় উপবাসী থাকে। রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় আর মানুষের প্রকৃতি এ দুয়েরই দায়িত্ব এই ব্যবধানের জন্য। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে তো বুকে চাপিয়া ধরা যায় না— তাহার জন্য চাই কয়েকটি সমধর্মী সমভাবী সহৃদয় সুহৃদ। কিন্তু কোথায় তেমন সুহৃদ্‌বর্গ এই পল্লীগ্রামে। আসেন বটে মাঝে মাঝে জগদীশচন্দ্র, জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রিয়নাথ সেন প্রভৃতি, তাঁহাদের রসগ্রাহিতা আলোবাতাসের মতো কাজ করে কবিপ্রকৃতির উপরে। এ সবই সত্য। কিন্তু যখন তিনি গ্যেটের জীবন পড়িতে বসেন তখন কর্মবহুল রাজসভায় গ্যেটে যে বন্ধুহৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শ পাইয়াছিলেন সেই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া যেন একপ্রকার সূক্ষ্ম ঈর্ষার মতো অনুভব করেন—

গেটের পক্ষেও যদি শিলারের বন্ধুত্ব আবশ্যক ছিল তা হলে আমাদের মতো লোকের পক্ষে একজন যথার্থ খাঁটি ভাবুকের প্রাণসঞ্চারক সঙ্গ যে কত অত্যাবশ্যক তা আর কী করে বোঝাব! আমাদের সমস্ত জীবনের সফলতাটা যে জায়গায় সেইখানে একটা প্রেমের স্পর্শ, একটা মনুষ্যসঙ্গের উত্তাপ সর্বদা পাওয়া আবশ্যক— নইলে তার ফুলফলে যথেষ্ট বর্ণ গন্ধ এবং রস সঞ্চারিত হয় না।[৪৩]

শুধু ঈর্ষা নয়, গ্যেটের পরিবেশের সঙ্গে নিজ পরিবেশের বৈসাদৃশ্য তুলনা করিয়া একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেন তিনি— 'কোথায়…ভাইমার রাজসভার রাজকবি গ্যেটে'…আর 'কোথায় বোটের মধ্যে আমি।'—

এই আমার সমস্ত জগৎ। এরা দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, স্নান করছে, কাপড় কাচছে, ছোটো ডোঙায় চড়ে হাত দিয়ে জল কেটে ছোটো নদী পার হচ্ছে, অপরাহ্ণে গৃহভিত্তির যে দিকটাতে ছায়া পড়ে সেই দিকে দীর্ঘকাল স্থিরভাবে বসে দুই-একটি কর্মহীন মেয়ে সম্মুখজগতের চলাচল দেখে বেলা কাটিয়ে দিচ্ছে, গ্রাম্য পাঠশালার ছেলেরা মলিন খাতাপত্রের পুঁটুলি হাতে বাড়ি ফিরছে— সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আলো জ্বালছে, গোয়ালে ধোঁওয়া দিচ্ছে, দুটি গ্রাম দুটি নীড়ের মতো নিস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে— আমি খড়্‌খড়েগুলো তুলে দিয়ে ভাইমার রাজসভায় গেটের কীর্তিকাহিনী অধ্যয়ন করছি। কোথায় নদীতীরে পতিসর, বোটের মধ্যে আমি, আর কোথায় বিচিত্র কর্ম-সংকুল ভাইমার রাজসভার রাজকবি গেটে![৪৪]

ব্যক্তিমানুষের অনায়ত্ত তপ্ত হৃদয়ের স্পর্শের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন। নীহারিকারূপী মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন, নক্ষত্ররূপী মানুষকে তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু এই দুটিই মানুষের সাকুল্য রূপ নয়। আর-একটি রূপ আছে যাহার মূল্য পূর্বোক্তগুলির চেয়ে বেশি বই কম নয়। দীপশিখা-রূপী মানুষ। নীহারিকা ও নক্ষত্র দুই-ই দূরের, তৃতীয়টি ঘরের। ঐ শিখাটিই তাহার একান্ত আপন। বিলাসে ও ব্যসনে, সুখের স্বচ্ছ তিমিরে এবং দুঃখের দ্বিগুণিত অন্ধকারে ঐ অচঞ্চল শিখা মানুষের

৪৩ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১৪৩

৪৪ ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ২৪৪

নিত্যসুহৃদ। দীপশিখারূপী এই মানুষটির জন্য রবীন্দ্রনাথের নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার আর অন্ত নাই। যখন সে দীপ জ্বলিয়া ওঠে তখন বাতায়নবর্তী নক্ষত্রের জন্য তাঁহার আকূতি আবার যখন সে দীপ নিবিয়া যায় তখন সে কী আকুলতা। এখানে গ্যেটের সৌভাগ্যপ্রসঙ্গে সেই দীপশিখাকেই তিনি স্মরণ করিতেছেন।

মানুষ যতই কাছে আসিয়া পড়ুক-না কেন কবির হৃদয়ের উপরে প্রকৃতির এতটুকু অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় নাই, বরঞ্চ দুয়ে মিলিয়া কবির বীণায় উদারতর মধুরতর রাগিণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা আগে বলিয়াছি যে শিলাইদহে বাসকালে নূতন একটি তার চড়ানো হইয়াছে কবির বীণায়, সেটা এই মানুষের তার। এখন দুই তারে বীণা বাজিতে শুরু করিয়াছে। সোনার তরী চিত্রা ও চৈতালি ও তৎকালে লিখিত গল্পগুলি এই দুই তারে ধ্বনিত সংগীত।—

বসে বসে 'সাধনা'র জন্যে একটা গল্প লিখছি— খুব একটু আষাঢ়ে গোছের গল্প। একটু একটু করে লিখছি এবং বাইরের প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি আমার লেখার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আমি যে-সকল দৃশ্য লোক ও ঘটনা কল্পনা করছি তারই চারি দিকে এই রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম, এই জলধারাপ্রফুল্ল শস্যের ক্ষেত ঘিরে দাঁড়িয়ে তাদের সত্যে ও সৌন্দর্যে সজীব করে তুলছে।[৪৫]

'প্রকৃতির সমস্ত ছায়া আলোক বর্ণ ধ্বনি' এবং 'রৌদ্রবৃষ্টি নদীস্রোত এবং নদীতীরের শরবন, এই বর্ষার আকাশ, এই ছায়াবেষ্টিত গ্রাম' প্রভৃতির নিগূঢ় রসটি যে না পাইবে তাহার কাছে গল্পগুলি সার্থক না মনে হওয়া অসম্ভব নয়।

আবার নিম্নে উদ্‌ধৃত অংশটিতে কবির সঙ্গে নদীর যে মানবসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, প্রণয়ী-যুগলোচিত যে সংকোচ সাধ্বস অভিমানের লীলা চলিতেছে তাহা যে বুঝিতে পারিবে তাহার পক্ষে এইসময়কার কবিতাগুলির রসগ্রহণ সম্ভব নয়।—

কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে, কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদীটি পার হবার সময় দেখতে পাব, আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে; কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে; যেন তার মনে হচ্ছে একেবারে এতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল। তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো কাছাকাছির জিনিস।[৪৬]

আবার, নীচের অংশে 'সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা'র যে বধূবেশিনী মূর্তি প্রকট তাহার তাৎপর্য বুঝিলে তবেই কবির নবার্জিত ব্যক্তিত্বের অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।—

৪৫ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৪৪

৪৬ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ৪২

কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী— আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার-চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্তপদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তার পতিগৃহ![৪৭]

প্রকৃতির হস্তক্ষেপে কবি মানুষের কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন, শুধু তাই নয় প্রকৃতিও মানব-ব্যক্তিত্ব গ্রহণ করিয়া কবির চোখে নূতন মাধুর্য ও নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। কিন্তু তবুও কবি ও মানুষের দুরপনেয় ক্ষীণ ব্যবধানটুকু কিছুতেই ঘুচিতে চায় না। সেই উলুধ্বনি মাঝে মাঝে কবিকে স্মরণ করাইয়া দেয় বৃহৎ পৃথিবীর বিপুল মানবগোষ্ঠীর অধিকাংশই তাঁহার জ্ঞানের বাহিরে, অভিজ্ঞতার বাহিরে তো বটেই। শুধু একটা নিরুদ্দিষ্ট আকুলতা কবির হৃদয়ে তোলপাড় করিতে থাকে। কিন্তু তাহাতেই কি প্রমাণ হয় না যে নূতন একটি তার তাঁহার বীণায় চড়ানো হইয়াছে?

শান্তিনিকেতন

এবারে কবিজীবনের পটোত্তোলন হইল সেকালের শান্তিনিকেতনের প্রান্তরে। একালের শান্তিনিকেতন দেখিয়া ষাট বৎসর আগেকার সেকালের শান্তিনিকেতনের রূপ বুঝিতে পারা যাইবে না। একালের শান্তিনিকেতন বহুহর্ম্যরাজিসুশোভিত বৃহৎ জনপদ, সুরুলের শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের ব্যবধান-স্বরূপ যে শূন্য প্রান্তর তাহা লোপ পাইয়াছে, আবার বোলপুর শহরের সীমানা বাড়িতে বাড়িতে শান্তিনিকেতনের সীমানাকে প্রায় স্পর্শ করিয়াছে। তার উপরে আছে মনুষ্যরোপিত বহুবিধ উদ্ভিদ যাহার অধিকাংশই বনস্পতিরূপে জনপদটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ষাট বৎসর আগেকার ক্ষুদ্র পল্লী কল্পনায় আনিতে হইলে এসব ভুলিতে হইবে। গোটা দুই পাকা বাড়ি, খানকতক চালাঘর, এই তো মানুষের বাসস্থান। মানুষের সংখ্যাও কুড়ি-পঁচিশের বেশি হইবে না। আর আজকার বনস্পতিমালার সমস্তই ভবিতব্যের গর্ভে ছিল, কল্পনার মধ্যেও ছিল কিনা সন্দেহ। একটি শালগাছের শ্রেণী, ক্ষুদ্র একটি আম্রকুঞ্জ, কিছু তালগাছ— আর এই প্রান্তরের আদিমতম অধিবাসী দুটি ছাতিম বৃক্ষ, এই তো তৎকালীন উদ্ভিদ্-সম্পদ্। এবারে কবিজীবনের পূর্ববর্তী দুটি স্থানের সঙ্গে ইহার প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। কলিকাতায় ছিল জনসমুদ্রে কোটালের জোয়ার, শিলাইদহে ছিল 'সবুজ পাথারে' বান ডাকা— এখানে তাহাদের ন্যূনতম রূপ। এখানে উপরে একখানি প্রকাণ্ড আকাশ আর নীচে একখানি প্রকাণ্ড প্রান্তর, সে প্রান্তরের পুবে পশ্চিমে দিগ্‌বলয়ের রেখাটুকু অবধি নাই, অকস্মাতের গর্ভ হইতে সূর্যের উদয়, আবার অকস্মাতের গর্ভে তাহার বিলয়। মাঝখানে মানুষের

৪৭ ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা ১৫৩

নীড়টি কতকটা যেন প্রক্ষিপ্ত। মানুষের বিচিত্র রূপ ছিল কলিকাতায়, প্রকৃতির বিচিত্র রূপ ছিল শিলাইদহে, এখানে মানুষ ও প্রকৃতি ন্যূনতম স্থান অধিকার করিয়া অসীম শূন্যতাকে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। মানুষের জগৎ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়া কবি প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয় পাইয়াছিলেন, প্রকৃতির জগৎ শিলাইদহে স্থানান্তরিত হইয়া তিনি মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করিলেন ; এবারে তিনি এমন এক স্থানে আসিলেন যেখানে মানুষ ও প্রকৃতির লীলা অপ্রকট। এবারে আরম্ভ হইল নূতন পরিচয়ের ভূমিকা। এতদিন যে বিশ্বগ কল্পনা বাহিরের দিকে প্রসারিত ছিল, এবারে বাহিরের ঐশ্বর্যের অভাবে সেই বহির্মুখী কল্পনা ভিতরের দিকে নিবিষ্ট হইল। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার ও ভগবৎ-জিজ্ঞাসার যথার্থ সূত্রপাত এখানে।

মহর্ষি-পরিবারের সন্তান রবীন্দ্রনাথ ধর্মচিন্তা ও ভগবৎ-জিজ্ঞাসার সহজ পরিবেশের মধ্যেই বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেকালের অনেক মনীষীর জীবনে এসব বিষয়ে যেমন একটা প্রতিকূলতা ছিল, এ ক্ষেত্রে তাহা ছিল না, অনুকূলতাই ছিল বলিতে হয়। কিন্তু এ এমন একটা বিষয় যাহা পিতার হাত হইতে বা গুরুর হাত হইতে সম্যক্ ভাবে পাওয়া সম্ভব নয়, সকলকেই নিজ চেষ্টায় এ রত্ন আবিষ্কার করিতে হয়, গুরু বা পিতা সাহায্য করিতে মাত্র পারেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও গুরুরূপী পিতার সাহায্য মিলিয়াছে। কিন্তু সাহায্য ও আবিষ্কার এক নয়। এতদিন দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি প্রকৃতি ও মানুষকে আবিষ্কার করিয়াছেন, এবারে তৃতীয় সত্তাটি আবিষ্কারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। আমাদের বর্ণনানুসারে এই তারটি বাঁধা হইলে তাঁহার বীণার সংগীত পূর্ণ হইয়া ওঠে।

ভগবৎ-সাধনায় অনেক বাধা। এ ক্ষেত্রেও তাহার অভাব হইল না। সেই বাধার ও বাধা উত্তীর্ণ হইবার ইতিহাসের সহিত শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্বের ইতিহাস জড়িত। শান্তিনিকেতনের প্রথম পর্ব বলিতে গীতাঞ্জলি-রচনার কাল পর্যন্ত বুঝি। এই পর্বের শেষ সীমানাকে টানিয়া বলাকা-কাব্য-রচনার আগে পর্যন্ত লওয়া যাইতে পারে। তার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার রূপ ও শান্তিনিকেতনের রূপ দুইই বদলাইতে শুরু করিয়াছে।

শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার সময়টি কি রবীন্দ্রকাব্যসাধনার ইতিহাসের পক্ষে কি বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে একটি সংকটের কাল। দুটি সংকট পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রকাব্যসাধনা সামাজিক সংকটকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে নির্ণয় করা সহজ নয়, কিন্তু সামাজিক সংকট যে রবীন্দ্রকাব্যসাধনাকে বহুলপরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছে তাহা অনায়াসে একনজরে দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলা দেশ এইসময় আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছিল। এই চেষ্টার একটা ফল দেখা গেল ইংরেজি সভ্যতার স্পর্শবর্জন-আকাঙ্ক্ষা (গোরা উপন্যাসের গোরার প্রয়াস স্মরণীয়)। আর-একটা ফল আমাদের যাহা কিছু ধর্ম ও সমাজ, এক কথায় বর্ণাশ্রমকে স্বীকার করিয়া লইবার আগ্রহ (আবার গোরার প্রয়াস স্মরণীয়)। যাঁহারা পৌরাণিক ধর্ম মানেন, হিন্দুসমাজকেই আঁকড়াইয়া আছেন তাঁহাদের ক্ষেত্রে ইহা অনেকটা প্রত্যাশিত হইলেও রবীন্দ্রনাথের মতো লোকের ক্ষেত্রে ইহা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। লিখিত প্রমাণ না থাকিলে অবিশ্বাস্য বলিয়াই পরিগণিত হইত।

রবীন্দ্রনাথের মতো মহামনীষী ব্যক্তির পক্ষেও যে এমন ভ্রম হইয়াছিল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় সংকট কী গুরুতর, সংকটের উলটোমুখী ঝঞ্ঝা কী প্রবলবেগেই-না বহিতেছিল।—

মাঝে মাঝে আমি কল্পনা করি, পূর্বকালে ঋষিরা যেমন তপোবনে কুটির রচনা করিয়া পত্নী, বালকবালিকা ও শিষ্যদের লইয়া অধ্যয়ন-অধ্যাপনে নিযুক্ত থাকিতেন, তেমনি আমাদের দেশের জ্ঞানপিপাসু জ্ঞানীরা যদি এই প্রান্তরের মধ্যে তপোবন রচনা করেন, তাঁহারা জীবিকাযুদ্ধ ও নগরের সংক্ষোভ হইতে দূরে থাকিয়া আপন-আপন বিশেষ জ্ঞানচর্চায় রত থাকেন, তবে বঙ্গদেশ কৃতার্থ হয়। অবশ্য অশনবসনের প্রয়োজনকে খর্ব করিয়া জীবনের ভারকে লঘু করিতে হইবে। উপকরণের দাসত্ব হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রকার বেষ্টনহীন নির্মল আসনের উপর তপোনিরত মনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেমন শাস্ত্রে কাশীকে বলে পৃথিবীর বাহিরে, তেমনি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এই একটুখানি স্থান থাকিবে যাহা রাজা ও সমাজের সকলপ্রকার বন্ধনপীড়নের বাহিরে। ইংরেজ রাজা হউক বা রুশ রাজা হউক, এই তপোবনের সমাধি কেহ ভঙ্গ করিতে পারিবে না। এখানে আমরা খণ্ডকালের অতীত— আমরা সুদূর ভূতকাল হইতে সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত করিয়া বাস করি। সনাতন যাজ্ঞবল্ক্য এবং অনাগত যুগান্তর আমাদের সমসাময়িক। কে আমাদের স্টেট সেক্রেটারি, কে আমাদের ভাইস্‌রয়, কে কোন্ আইন করিল এবং কে সে আইন উলটাইয়া দিল, আমরা সে খবর রাখি না। আকাশ তাহার গ্রহতারকা-মেঘরৌদ্রে এবং প্রান্তর তাহার তৃণগুল্মে ও ঋতুপর্যায়ে আমাদের প্রাত্যহিক খবরের কাগজ। আমাদের তপোবনবাসীদের জন্মমৃত্যুবিবাহের অনুষ্ঠানপরম্পরা এখানকার নিভৃত শান্তি ও সরল সৌন্দর্যের চিরন্তন সমারোহে সম্পন্ন হইতে থাকে। আমাদের বালকেরা হোমধেনু চরাইয়া আসিয়া পড়া লইতে বসে এবং বালিকারা গোদোহনকার্য সারিয়া কুটিরপ্রাঙ্গণে গৃহকার্যে শুচিস্নাত কল্যাণময়ী মাতৃদেবীর সহিত যোগ দেয়।

জানি, আলোকের সঙ্গে ছায়া আসে, স্বর্গোদ্যানেও শয়তানের গুপ্তসঞ্চার হইয়া থাকে— কিন্তু তাই বলিয়া কি আলোককে রোধ করিয়া রাখিব, এবং স্বর্গের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে নালন্দা অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়াম'এর দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে। আমি আমার এই কল্পনাকে নিভৃতে পোষণ করিয়া প্রতিদিন সংকল্প-আকারে পরিণত করিয়া তুলিতেছি। ইহাই আমাদের একমাত্র মুক্তি, ইহাই আমাদের স্বাধীনতা। ইহাই আমাদের সর্বপ্রকার অবমাননা হইতে নিষ্কৃতির একমাত্র উপায়— নহিলে আমরা আশ্রয় লইব কোথায়, আমরা বাঁচিব কী করিয়া। আমাদের মাথা তুলিবার স্থান তো নাই-ই, মাথা রাখিবার স্থানও প্রত্যহ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে। প্রবল য়ুরোপ বন্যার মতো আসিয়া আমাদের সমস্তই পলে পলে তিলে তিলে অধিকার করিয়া লইল। এখন নিরাসক্ত চিত্ত, নিষ্কাম কর্ম, নিঃস্বার্থ জ্ঞান এবং নির্বিকার অধ্যাত্মক্ষেত্রে আমাদিগকে আশ্রয় লইতে হইবে, সেখানে সৈনিকদের সহিত আমাদের বিরোধ নাই, বণিকদের সহিত আমাদের প্রতিযোগিতা নাই, রাজপুরুষদের সহিত আমাদের সংঘর্ষ নাই— সেখানে আমরা সকল আক্রমণের বাহিরে, সকল অগৌরবের উচ্চে।—

আমার এই চিঠি পড়িয়া অনেকের মনে অনেক বিতর্ক উঠিতে পারে তাহা আমি জানি। তাঁহারা বলিবেন, 'বর্তমানকাল যদি আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া থাকে তবে অতীতকালের মধ্যে পলায়ন করিয়া আমরা বাঁচিব, ইহা কাপুরুষের কথা।'

এ প্রবন্ধে কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে এরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া চলে না। সংক্ষেপে এইটুকু বলিব, ভারতবর্ষের

নিত্যপদার্থটি যে কী, বাহির হইতে প্রবল আঘাত খাইয়া তবে তাহা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি। এমন অবস্থায় সেই নিত্য আদর্শের দিকে আমাদের অন্তরের একান্ত যে একটা আকর্ষণ জন্মে তাহাকে উপেক্ষা করে কাহার সাধ্য!

আর-একটিমাত্র কথা আছে। আমি যে তপোবনের আদর্শকে অতীতকাল হইতে সঞ্চয় করিয়া মনের মধ্যে দাঁড় করাইতেছি, সে তপোবনে সমস্ত ভারতবর্ষ আশ্রয় লইতে পারে না— ত্রিশ কোটি তপস্বী কোনো দেশে হওয়া সম্ভবপর নহে, হইলেও বিপদ আছে। এ কথা সত্য বটে। কিন্তু সকল দেশের আদর্শই সে দেশের তপস্বীর দলই রক্ষা করিয়া থাকেন। ইংরেজেরা যাহাকে স্বাধীনতা বলিয়া জানেন তাহার সাধনা ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কয়েকজনেই করিয়া থাকেন। বাকি অধিকাংশই আপন-আপন কর্মে লিপ্ত। অথচ কয়েকজনের সাধনাই সমস্ত দেশকে সিদ্ধিদান করে। ভারতবর্ষও আপন শ্রেষ্ঠ সন্তানের মুক্তিতেই মুক্তিলাভ করিবে— কয়েকটি তপোবন সমস্ত দেশের অন্তরের দাসত্বরজ্জু মোচন করিয়া দিবে।

যাহাই হউক, আমার সংকল্পটিকে এতক্ষণ কেবলমাত্র কল্পনার দিক হইতে দেখা গেল। বলা বাহুল্য কাজের দিক হইতে যাহা প্রকাশ পাইতেছে তাহা এরূপ মনোরম এবং সুষমাবিশিষ্ট নহে। কোথায় তপস্বী, কোথায় তপস্বীর শিষ্যদল, কোথায় সার্থক ব্রহ্মজ্ঞানের অপরিমেয় শান্তি, কোথায় একনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যের সৌম্যনির্মল-জ্যোতিঃপ্রভা। তবু ভারতবর্ষের আহ্বানকে কেবল বাণীরূপে নহে, কর্ম আকারে কোথাও বদ্ধ করিতেই হইবে। বোলপুরের প্রান্তরের প্রান্তে সেই চেষ্টাকে আমি স্থান দিয়াছি। এখন ইহা রূপান্তরিত বাক্যমাত্র, ইহা আহ্বান।[৪৮]

শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার প্রায় সমকালে লিখিত এই চিত্রের সমর্থনে বহুপরবর্তীকালে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সমান উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে[৪৯] শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী হইয়াছে, তাহা আর ব্রহ্মবিদ্যালয় বা তপোবন নয়, তবু দেখা যাইবে যে তপোবনের আদর্শ একেবারে পরিত্যাজ্য বলিয়া তিনি মনে করেন না। ১৯৩৬ সালে যদি তাঁহার মনের এই অবস্থা হয় তবে সহজেই অনুমেয় ১৯০১ সালে তাহা কিরূপ ছিল।—

প্রাচীন ভারতের তপোবন জিনিসটির ঠিক বাস্তব রূপ কী তার স্পষ্ট ধারণা আজ অসম্ভব। মোটের উপর এই বুঝি যে আমাদের যাঁদের ঋষিমুনি বলে থাকি অরণ্যে ছিল তাঁদের সাধনার স্থান। সেই সঙ্গেই ছিল স্ত্রীপরিজন নিয়ে তাঁদের গার্হস্থ্য। এই সকল আশ্রমে কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষের আলোড়ন যথেষ্ট ছিল, পুরাণের আখ্যায়িকায় তার বিবরণ মেলে।

কিন্তু তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মলসুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করে তুলেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তীকালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়,

৪৮ রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকা। 'গুরুদক্ষিণা', সতীশচন্দ্র রায়

৪৯ আষাঢ় ১৩৪৩=১৯৩৬ সাল

কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্তসুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁচেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিক কালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপরচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল— কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে-একটা যন্ত্র তৈরি হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানবশিশুর শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না। এই শিক্ষার জন্যে আশ্রমের দরকার, যেখানে আছে সমগ্রজীবনের সজীব ভূমিকা।

তপোবনের কেন্দ্রস্থলে আছেন গুরু। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ। নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনে তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান্ ধারায় শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যদের জীবন এই যে প্রেরণা পাচ্ছে সে তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্য-জাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিসটিই আশ্রমের শিক্ষায় সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান— অধ্যাপনার বিষয় নয়, পদ্ধতি নয়, উপকরণ নয়। গুরুর মন প্রতিমুহূর্তে আপনাকে পাচ্ছে বলেই আপনাকে দিচ্ছে। পাওয়ার আনন্দ দেওয়ার আনন্দেই নিজের সত্যতা সপ্রমাণ করে; যেমন যথার্থ ঐশ্বর্যের পরিচয় ত্যাগের স্বাভাবিকতায়।[৫০]

ধনীর সন্তান রবীন্দ্রনাথের কলিকাতা-বাস এবং জমিদারি-পরিদর্শন পরিত্যাগ করিয়া হঠাৎ নির্জন প্রান্তরে তপোবনের অনুরূপ আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তাঁহার গুণগ্রাহী অনেকে ভাবিলেন যে ইহা আর-কিছুই নয়, ইংরেজি সভ্যতার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথও সেই ধারার অনুবর্তন শুরু করিলেন। বাহির হইতে দেখিলে এরূপ ভাবা অসম্ভব নয়। বিষয়টি লইয়া অজিত-কুমার চক্রবর্তী যে নিপুণ আলোচনা করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।—

তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতাপ্রভাবের প্রতিক্রিয়াবশতঃ কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রম খাড়া করিতেছেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণতঃ সত্য নহে। নিজের জীবনের একটা বড়ো সামঞ্জস্য স্থাপনের বেদনাতেই এই বিদ্যালয়-স্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে— সে একটা আত্মার গভীর অভাবমোচনের গূঢ় ইচ্ছার কাজ, শুদ্ধ য়ুরোপীয় আইডিয়ার সঙ্গে লড়াইয়ের বাহাদুরি করিবার জন্য এত দুঃখ এত ত্যাগের ভিতর দিয়া এত দুঃসহ বিরোধ কাটাইয়া কোনো মানুষ যাইতে পারিত না। অবশ্য আত্মার সাধনার সঙ্গে অনেক বাহিরের জিনিস জড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সে সমস্তই বাহিরের, তাহারা আসে, যায়, পরিবর্তিত হইতে থাকে; কিন্তু যে জিনিসটা সমস্ত ভাঙাচোরার ভিতরে, বাধা-বিঘ্নের ভিতরে একনিষ্ঠ হইয়া কোনো মঙ্গলকে গড়িয়া তুলিতে থাকে তাহা আত্মার অন্তরের জিনিস। সেই আত্মা আপনার পরমার্থকে পাইবার জন্য সন্ধানে বাহির হইয়াছে বলিয়াই সত্য ক্ষণে ক্ষণে মূর্তিমান হইয়া পথ দেখাইতেছে, এইটেই আসল কথা। সত্যই পথ দেখাইতেছে বলিয়াই, কোনো একটা স্থানে সে স্থির হইয়া নাই,

৫০ রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ গ্রন্থে 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩৪৩

ভিন্ন ভিন্ন নানা অবস্থার ভিতর দিয়া সন্ধানীকে কেবলই সম্মুখে টানিতেছে— বাধাবিঘ্ন ভাঙাচোরা তাহার পথে চালাইবার বড়ো বড়ো বাহন। আপনাকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য আত্মার যে বেদনা, সে বেদনা একলা কাহারও নহে, সে ন্যূনাধিক পরিমাণে সকলেরই। যখন আমাদের মধ্যে তাহা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখন আমাদের কাজও ম্লান হয়, আবার যখন তাহা উজ্জ্বল হয় তখনই কাজ সত্য হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিমাণে তাহার ক্রিয়া চলিতেছে, সেই ক্রিয়াশক্তিই এই বিদ্যালয়ের মূল শক্তি। এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্বই তাই। যাহাই হউক, স্বাদেশিক উত্তেজনা নহে, আত্মার বেদনাই কবিকে ধাক্কা দিয়া বাহির করিয়াছিল ইহা নিশ্চিত সত্য।[৫১]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর বক্তব্য এই যে, এরূপ আচরণকে প্রতিক্রিয়া মনে করিলেও কবির শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠাকে সেরূপ মনে করা উচিত হইবে না। কবির ক্ষেত্রে ইহার কারণ বাহিরের ভাবসংঘাতের প্রতিক্রিয়াজাত নয়— ইহার কারণ তাঁহার অন্তরের মধ্যেই নিহিত ছিল। এখানেও আবার অজিতকুমার চক্রবর্তীর শরণাপন্ন হইতে হইল। এই দুটি অংশ মিলাইয়া পড়িলে কবির মানসিক পরিবর্তন ও শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার সম্যক্ কারণ উপলব্ধি হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।—

তাঁহার কাব্যজীবনের ভিতর দিয়াই তাঁহার একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল— পদ্মাবক্ষে নৌকাবাসে প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে গূঢ়নিবিষ্ট কেবলমাত্র ভাবময় জীবন তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্তি দিতেছিল না; আপনার বেষ্টন ছাড়াইয়া একটা বড়ো ত্যাগের জীবনের জন্য তাঁহার বেদনা জাগিতেছিল। কাব্যের পথ দিয়াই তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে ধর্মনীতিতে প্রবেশ করিলেন; সর্বত্রই দেখিলেন, আপনাকে ক্রমাগত খর্ব করিয়া পূর্ণরূপে ত্যাগের আদর্শই কেবলই প্রকাশ পাইয়াছে।[৫২]

পুনরায়—

কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে, রামায়ণে মহাভারতে পুরাণে এইভাবের পরিচয় পাইয়া কবি মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কালিদাসের মতো তাঁহার মাথাতেও তপোবনের কল্পনা ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইল যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মতো জীবনযাত্রার এমন পূর্ণাদর্শ আর হইতেই পারে না। এ আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া তোলা যায়— বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্যপালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড়ো দিক হইতে আনন্দের দিক হইতে দেখিতে শিক্ষা করা, যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গলসাধন, বার্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারবন্ধনকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোকে প্রয়াণ— শিক্ষাকে সংসারকে বিষয়ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মতো আদর্শ আর কোথায়। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ়বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।

৫১ ব্রহ্মবিদ্যালয়, অজিতকুমার চক্রবর্তী

৫২ ব্রহ্মবিদ্যালয়, অজিতকুমার চক্রবর্তী

ষ ও প্রকৃতি অসীম শূন্যতাকে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে· · ·

শিল্পী শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

ভারতবর্ষের এই আদর্শ তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি ইহারই ঝোঁকে ভারতবর্ষের সমস্তই আশ্চর্য ও রমণীয় করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার চারিদিকেই তখন প্রবল প্রতিক্রিয়ার স্রোত বহিতেছিল। তাহার কারণ কতকটা রাজনৈতিক ছিল, তাহা ভিক্ষুকের নৈরাশ্য; কিন্তু আসল কারণটা ছিল স্বাভাবিক— আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিমেই যে সব আছে, সে যে সর্ববিষয়েই আমাদের গুরু এবং প্রভু— এ কথাটা সবলে অস্বীকার করিবার ও ইহার উল্‌টা কথাটা বলিবার একটা জেদ তখন শিক্ষিত সমাজে প্রকাশ পাইতেছিল। সেটা স্বদেশীর পূর্বরাগ। আত্মপ্রতিষ্ঠা আমাদের চাই-ই কিন্তু তাহার ভিত্তিটা যে কোথায় তাহা খুঁজিবার জন্য প্রাচীনকালের মধ্যে ডুব দিবার একটা উদ্যোগপর্ব চলিতেছিল। আমাদের সবই ছিল এবং পশ্চিমের চেয়ে অনেকাংশে ভালোই ছিল— এই জয়ঘোষণার উৎসাহ।[৫৩]

অজিতকুমার চক্রবর্তী দুটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস দুটি কারণের বৃন্ত একটি, অর্থাৎ কারণ দুটি নয় একটি। আগে বলিয়াছি, আবার বলিলে ক্ষতি নাই যে এই সময়ের কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ 'প্রাচীন ভারতে' মানসপর্যটনে বাহির হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সেই প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কঙ্কাল ও কবির কল্পনায় গঠিত, কল্পনার অংশটাই প্রধান। এই মায়াপুরী তাঁহাকে সর্বতোভাবে মুগ্ধ করিল। আর, ইহার 'তপোবন' নামে প্রতিষ্ঠানটি তাঁহাকে মুগ্ধ করিল সবচেয়ে বেশি। এই তপোবনের আইডিয়াটি তিনি সংগ্রহ করিলেন প্রধানতঃ কালিদাসের কাব্য হইতে— রবীন্দ্রনাথের তপোবন প্রবন্ধ ও তপোবন সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন উপলক্ষে উল্লেখ হইতে তাহা সুনিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায়। প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির অঙ্কিত চিত্র পরবর্তী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির বর্ণনিষেকে দ্বিগুণ মনোরম হইয়া উঠিল। কবি শুধু মুগ্ধ নয়, অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নিম্নে উদ্‌ধৃত দুটি অংশ পড়িলে বুঝিতে পারা যাইবে যে কবি 'তপোবন' প্রতিষ্ঠানটিকে 'মৃত' মনে করেন নাই— অদ্যাপি তাহার কাছ হইতে শিক্ষণীয় কিছু আছে ধারণা করিয়াছেন, আর এই ধারণাই কবিকে বিভ্রান্তির পথে চালিত করিয়াছে।—

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এ দেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি। তখন চীন হূণ শক পারসিক গ্রীক রোমক সকলে আমাদের চার দিকে ভিড় করে এসেছে; তখন জনকের মতো রাজা এক দিকে স্বহস্তে লাঙল নিয়ে চাষ করছেন, অন্য দিকে দেশদেশান্তর হতে আগত জ্ঞানপিপাসুদের ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিচ্ছেন, এ দৃশ্য দেখবার আর কাল ছিল না। কিন্তু সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন আমাদের দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনও কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।[৫৪]

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্ছে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম সমাধা করে

৫৩ ব্রহ্মবিদ্যালয়, অজিতকুমার চক্রবর্তী

৫৪ তপোবন, শান্তিনিকেতন

তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগস্থাপন করেছে এবং তরুলতা-পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে—সর্বভূতেষু চাত্মানং— আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।[৫৫]

এ কথা সত্য কালিদাস তাঁহার প্রায় সব কাব্যে তপোবন নামে প্রতিষ্ঠানটিকে বারংবার তৎকালীন শ্রোতার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন ; তপোবন প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি জীবনের একটি পরিপূর্ণ আদর্শ মনে করিতেন সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হইবে না। কিন্তু তিনি কাব্যই লিখিয়াছেন, সরেজমিনে তপোবন প্রতিষ্ঠা করেন নাই বা তাঁহার প্রভুকেও সে পথে প্ররোচিত করেন নাই। তিনি জানিতেন যে তপোবন একটি মনোরম কবিকল্পনা, ইংরেজিতে যাহাকে ইউটোপিয়া বলা হইয়া থাকে তাহাই। ইউটোপিয়া যে বাস্তবসিদ্ধ নহে, কালিদাসের বাস্তবঘেঁষা কল্পনা তাহা কখনো ভোলে নাই, আর কল্পনার বস্তুকে ধূলামাটিতে রূপ দিতে গেলে যে-পরিণাম অবশ্যম্ভাবী তাহাও তিনি জানিতেন।[৫৬] আর সত্য কথা বলিতে কি, খুব সম্ভব ইহাও তিনি জানিতেন যে, তপোবন কোনোকালেই কোথাও ছিল না, না বৈদিক যুগে, না বৌদ্ধ যুগে, না পৌরাণিক যুগে। সর্বকালের মনীষীরাই অতীতের দিকে তাকাইয়া মনশ্চক্ষে তপোবন দর্শন করিয়াছেন। তপোবন কবিকল্পনার একটি মনোরম সৃষ্টি, যেভাবে তাহা চিত্রিত হইয়াছে কোনোকালে তাহার অস্তিত্ব ছিল মনে হয় না।[৫৭] গোড়াতে রবীন্দ্রনাথের দুটি ভুলের উল্লেখ করিয়াছি। প্রথম ভুলটির সূত্রপাত এখানে। তিনি কল্পনার বস্তুকে প্রাকৃত এবং আদর্শকে বাস্তব মনে করিয়া সেই কল্পনাগত আদর্শকে একটি বাস্তব ভিত্তি প্রদানের চেষ্টা করিলেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পনাও বাস্তবঘেঁষা, তৎসত্ত্বেও যে এমন ভুল হইল তাহাতে বুঝিতে পারা যায় 'প্রাচীন ভারত' ও 'তপোবন' তাঁহাকে কতখানি অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমের মূলে আধার ও আধেয় অভেদবোধ। তপোবন আধার, তপোবনের ফলশ্রুতি আধেয়। তাঁহার ধারণা হইয়াছিল আধার সৃষ্টি করিতে পারিলেই আধেয় করায়ত্ত হইবে। মরুভূমিতে গোটাকতক গাছ পুঁতিলেই কি মরুভূমি শস্যশ্যামল হইয়া ওঠে। সেকালে তপোবন যদি সত্যই থাকে তবে তাহার সমর্থন কালের মধ্যেই ছিল। একালে সে সমর্থন কোথায় ? 'যদি বৈদিককালে তপোবন থাকে, যদি বৌদ্ধযুগে নালন্দা অসম্ভব না হয়, তবে আমাদের কালেই কি শয়তানের একাধিপত্য হইবে এবং মঙ্গলময় উচ্চ আদর্শমাত্রই 'মিলেনিয়াম'এর দুরাশা বলিয়া পরিহসিত হইতে থাকিবে।' 'মিলেনিয়াম'এর দুরাশা কেন ? তপোবন যদি সাত্ত্বিক জ্ঞানের ক্ষেত্র হয় তবে একালেও তাহা সম্ভব, শুধু সম্ভব নয় একালেও তাহা ভিন্নরূপে অবশ্যই আছে। কিন্তু তাহা তপোবন নহে। বৈদিক তপোবন ও বৌদ্ধযুগের নালন্দার রূপ ভিন্ন বলিয়াই দুটিই সার্থক।

৫৫ আশ্রম, শান্তিনিকেতন

৫৬ প্লেটোর রিপাবলিক গঠন-প্রচেষ্টার শোচনীয় ব্যর্থতা স্মরণীয়।

৫৭ তুলনীয় একালের বাঙালি কবি ও সাহিত্যিকদের সৃষ্ট 'সোনার বাংলা'

একালে তপোবন সৃষ্টি করিতে গেলে তাহাকে কালোচিত রূপ দিতে হইবে, প্রাচীনের নকলে ব্রহ্মচর্যাশ্রম সৃষ্টি করিলে চলিবে না। শান্তিনিকেতন-প্রতিষ্ঠার অল্পকয়েক বছর পরেই তিনি ভুল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেইজন্য মূলের ব্রহ্মচর্যাশ্রম পরে বিদ্যালয় ও ক্রমে বিশ্বভারতী -রূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রম নিত্যধর্ম ও লৌকিক ধর্মের মধ্যে অভেদবোধ। কাব্যে যখন তিনি নিত্যধর্ম ও লৌকিক ধর্মের প্রভেদ ব্যাখ্যা করিতেছিলেন[৫৮] ঠিক তখনই বাস্তবক্ষেত্রে লৌকিক ধর্মকে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্মকে সমর্থন করিতেছিলেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম কী তাহা বুঝাইবার জন্যই বঙ্গদর্শনের সম্পাদকপদ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজাকে জানাইয়াছিলেন, আদিযুগের শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমও বর্ণাশ্রম-সমর্থনের ভিত্তিতে গঠিত। সাহিত্যক্ষেত্রে যখন তিনি 'প্রাচীন ভারতের একঃ' প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিতেছেন বাস্তবক্ষেত্রে তখন বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্থন সত্যই বিস্ময়কর। বস্তুতঃ ভ্রম দুটি নয় একটিই। প্রাচীন তপোবন বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তিতে গঠিত বলিয়াই তাঁহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম সমর্থন করিতে হইয়াছে। এ ভুলটিও তিনি অচিরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর একই সঙ্গে দুটি ভুলকেই তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই ভ্রম ও ভ্রম নিরসনের ইতিহাস গোরা উপন্যাসে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। গোরার সমস্যা ও সমাধান লেখকের নিজের জীবনেরই সমস্যা ও সমাধান। এই ভ্রম-নিরসনের পরেই তাঁহার সত্যকার ধর্মচিন্তা ও ভগবদনুভূতির সূত্রপাত হইয়াছে। গোরা উপন্যাস ও 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশাবলীর ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়া তবে তিনি গীতাঞ্জলির আনন্দলোকে উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার ধর্মচিন্তার স্বরূপ কী, ভগবদভিজ্ঞতার মর্ম কী, এখানে তাহা ব্যাখ্যার স্থান নয়। শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ঐ দুটি ভ্রম তাঁহার স্বকীয় অভিজ্ঞতালাভের পথে অন্তরায় ছিল। সেই অন্তরায় দূর হইতেই সাধনার স্বকীয় ক্ষেত্রে প্রবেশ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইল। সে ইতিহাস 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশাবলীতে, সে ইতিহাস গীতাঞ্জলিতে। এই অভিজ্ঞতালাভের ফলে তাঁহার বীণায় তৃতীয় তারটি প্রথম দুটির সঙ্গে যুক্ত হইল। বীণা এবারে পূর্ণাঙ্গ, বীণার সংগীত এবারে পূর্ণাঙ্গ। কলিকাতা, শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতন, বাংলা দেশের এই তিন ভূখণ্ড রবীন্দ্রনাথকে যথাক্রমে প্রকৃতি, মানুষ ও ভগবানের রহস্যে দীক্ষিত করিল। এবার তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া বৃহৎ পৃথিবীতে বাহির হইতে সক্ষম— হইয়াছেনও তাই।

৫৮ গান্ধারীর আবেদন, মালিনী, সতী, কর্ণকুন্তীসংবাদ, নরকবাস প্রভৃতি

উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ সত্য কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না, একেবারে স্বতঃপ্রকাশ। একেবারে প্রথমযুগের কাব্য-কবিতা-সংগীত ও গদ্যরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্যন্ত সব লেখার মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে, কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট। স্পষ্ট পরিচয় যেখানে রহিয়াছে তাহার পরিমাণও এত প্রচুর যে কোনো আলোচনা ব্যতীতই নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতির সঙ্গে বহু স্থলে অজ্ঞাতে উপনিষদের সত্যানুভূতির সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, জ্ঞাতে তাঁহার অনুভূতিতে এবং ভাবে-ভাবনায় উপনিষদের ছোঁওয়া লাগিয়াছে; প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঔপনিষদিক প্রকাশভঙ্গি দেখা দিয়াছে প্রচুর লেখায়— জ্ঞাতেও অজ্ঞাতেও। রবীন্দ্রনাথের শুধু ধর্মসম্পর্কিত গদ্য লেখায় নহে, অন্যান্যবিষয়ক গদ্য লেখাতেও উপনিষদের ভাব ভাষা অনুবাদ উদ্ধৃতি কেবলই ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার 'শান্তিনিকেতন'-পর্যায়ে প্রকাশিত ভাষণ ও লেখন -সমূহ অনেক স্থলে নিজের জীবনের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া উপনিষদের ব্যাখ্যা— শুধু ব্যাখ্যা বলিব না, উপনিষদের বাণীকে বাস্তবজীবনের সকল আনন্দ-উৎসব, সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা। উপনিষদের কয়েকটি বাণী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সংগীতে গদ্য লেখায় বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে ধ্রুবপদের মত; তানের সকল বিস্তার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ঐ ধ্রুবপদেই। ঈশ-উপনিষদের একটি বাণী রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন একেবারে যেন 'ভূতে পাওয়া'র মত পাইয়া বসিয়াছিল। বাণীটিতে বলা হইয়াছে যে, একটি হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হইয়া আছে; জগৎ-সবিতা ও জগৎপোষক সূর্যের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, হে পূষন্, তুমি তোমার রশ্মিসমূহ সংবরণ করো, তবেই সত্যের মুখ হইতে এই হিরণ্ময় আবরণ দূর হইয়া যাইবে, এবং সেই আবরণ দূর হইলে দেখা যাইবে, ঐ জগৎ-প্রসবিতার ভিতরে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষই রহিয়াছেন আমার মধ্যেও। উপনিষদের এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গদ্য লেখায় প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক পর্যায়েই আসিয়া দেখা দিয়াছে— এক অর্থেও দেখা দিয়াছে, ভাবের বিচিত্র সম্প্রসারণেও দেখা দিয়াছে; কথাটাকে বার বার বলিয়াও যেন শেষ করা যায় নাই; আসলে কথাটা ঠিক বলার কথা নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্রজীবনব্যাপী একটি অনির্বচনীয় অনুভূতি, তাই তাহাকে শ্রান্তিহীনভাবে বার বার বলিয়াও মনে হইয়াছে, 'যে কথা বলিতে চাই বলা হয় নাই'।

আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে ঔষধে 'ভাবনা' দিবার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। কাজটি হইল

কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো রসের মিশান দেওয়া। রস যাহাতে বস্তুটির প্রতি অণুপরমাণুর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে, এজন্য দিনে বস্তুটির সহিত রস মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, রাত্রিতে আবার শিশিরে রাখিতে হয়। এইরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া রৌদ্রে শুকানো এবং শিশিরে ভিজানোর মধ্য দিয়া রসের বিশোষণ ঘটে, বস্তুটি তখন রসে 'ভাবিত' হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবন উপনিষদের রসে এইভাবেই 'ভাবনা' লাভ করিয়াছিল। শৈশব হইতে এই উপনিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, কৈশোরে তিনি উপনিষদের শ্লোকগুলি বার বার বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতেন। পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে চারিদিকে এই উপনিষদের প্রভাব। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনের সংকল্প লইয়া এই ঔপনিষদিক সত্যে হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই হইতে এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল উপনিষদে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে রবীন্দ্রনাথের নিকটে এই উপনিষদের বাণীর জীবন্ত প্রেরণা ছিলেন। সুতরাং প্রথমজীবন হইতেই এই উপনিষদ্‌কে তিনি পাইয়াছিলেন প্রচুর-ভাবে, প্রকৃতির সহজ দাক্ষিণ্যের মতই। কিন্তু কৈশোরে একবার শুধু পাইলেন না, সারা জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাহাকে পাইলেন; শুধু পাইলেন না, তাহাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দিবসের কর্মকোলাহলের ভিতর দিয়া, সকল আশা-উৎসাহের উৎসব-আনন্দের উত্তাপের মধ্য দিয়া, বাস্তব-জীবনের রূঢ় কঠোরতার প্রাখর্যের ভিতর দিয়া; আবার তাহাকে গ্রহণ করিলেন নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া, অশ্রুসিক্ত সকল অভিজ্ঞতা-অনুভূতির ভিতর দিয়া। এইভাবে দীর্ঘদিনের 'ভাবনা'র ভিতর দিয়া উপনিষদ্ শুধু তাঁহার মনে প্রবেশ করিল না, অনুপ্রবিষ্ট হইল তাঁহার সত্তার সকল সূক্ষ্ম উপাদানের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের এই প্রভাব বুঝিয়া লইবার একটি সহজপন্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে কিভাবে উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিভাবে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোথায় রবীন্দ্রনাথের কোন্ বাণীর সঙ্গে উপনিষদের কোন্ বাণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার একটা পরিসংখ্যান অতি সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার কবিতা এবং সংগীতের ক্ষেত্রেও এই পন্থা গ্রহণ করা তেমন কোনো দুঃসাধ্য কার্য নয়। এই পরিসংখ্যানই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের লেনদেনের মোটামুটি একটা পরিমাণগত পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে পন্থাটিকে অতিমাত্রায় বাহ্য বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের পাশে পাশে উপনিষদের বাণী বসাইয়া সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার কবিতার ভিতরেই তো কত স্থানে উপনিষদের পঙ্‌ক্তি হুবহু তুলিয়া দিয়াছেন। গদ্য লেখায় তো কত স্থানে তিনি ইচ্ছা করিয়াই উপনিষদের বচনভঙ্গিটি পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাজমহলের প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'কিন্তু, ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।' এই বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যে উপনিষদের তাহা তো আর কোনো গবেষণাদ্বারা লাভ করিতে হয় না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের মিল লক্ষ্য করিবার অন্য একটা দিক্ আছে; প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে, দিক্‌টা শুধু প্রভাব বিচার করিবার নয়, দিক্‌টা হইল বিশেষ করিয়া মিল লক্ষ্য করিবার; অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রকাশিত যে মন আর রবীন্দ্রনাথের যে মন, এই উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে একটা অত্যন্ত সহজ এবং আশ্চর্য মিল; সে মিল আশ্চর্য এই জন্য যে অন্ততঃ তিন সহস্রাধিক বৎসর কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়াও এ মিল দেখা দিয়াছে অতি ঘনিষ্ঠ অথচ সহজ ভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই মিলকে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং স্পষ্টভাবেই আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই মিল সর্বত্র সচেতন-অনুকরণজাত বা প্রভাবজাত নয়, অচেতনভাবেই এই ঘনিষ্ঠ মিল গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি অনেকবার সগর্বে নিজের পরিচয় দিয়াছেন বৈদিক ঋষিকবিগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের সত্য দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সহিত বৈদিক ঋষিকবিগণের মিলের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না; উত্তরাধিকারের সম্পদের সত্য অস্বীকার করিবার নহে, রবীন্দ্রনাথও তাহা অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু উত্তরাধিকারের মিল অস্বীকার না করিয়াও বলিব— সেই মিলের অতিরিক্তও লক্ষ্য করা যায় চিত্তধাতুর উপকরণে ও সংগঠনে একটা মৌলিক মিল, সেই মিলটাকেই আমরা একটু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব।

কথাটা লইয়া প্রথমেই একটা কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে যতই বড় কবি বা মনীষী বলিয়া স্বীকার করি-না কেন এবং তাঁহাকে যতই শ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকি-না কেন, তাঁহাকে একেবারে বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে সমান করিয়া দেখা জিনিসটাকে খানিকটা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। বৈদিক ঋষি বলিতে এখানে আমি সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ্ — সব-জাতীয় বৈদিক মন্ত্রের ঋষির কথাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে বৈদিক ঋষির তুল্য করিয়া দেখিতে মনে যদি দ্বিধা জাগে তবে সে দ্বিধার মুখ্য কারণ হইল বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে আমাদের একটা ধর্মীয় সংস্কার। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের এতদিনে একটা বিশেষ হিন্দু সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে এই যে, বৈদিক সাহিত্য সবটাই হইল ধর্মশাস্ত্র। এই সংস্কারটাকে একটু নড়াইয়া লইতে পারিলেই দেখিব, বৈদিক ঋষিগণও মানুষ ছিলেন, তাঁহারা কবি ছিলেন, বেদ-আরণ্যক-উপনিষদ্ সবই তাঁহাদের দিব্যপ্রেরণাময় কবিতা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গানও এইরূপ দিব্যপ্রেরণাময় কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যদি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ না করিয়া আর তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং বাংলা ভাষায় কবিতা-গান রচনা না করিয়া তখনকার দিনের আর্যভারতীয় ভাষায় রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন তবে ইহার অনেক অংশকেই আমরা অবাধে দিব্যমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহার উপরে টীকা-ভাষ্য-অনুভাষ্য রচনা করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিতে পারিতাম। কালের এই ব্যবধানের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ও কৃতি অনেকখানি রহস্যাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে নাই বলিয়াই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে বৈদিক ঋষির সমতুল্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সংস্কার-বিজড়িত মনে বাধা পাইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, আরণ্যক-উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই কিছু সংসারত্যাগী বনবাসী যতিধর্মাবলম্বী ছিলেন না; তাঁহারা কৃষিকর্ম করিয়া

গোপালন করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেন। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তা বহু স্থলে আরণ্যক ঋষি নহেন, ব্রাহ্মণও নহেন— ব্রাহ্মণগণ দেশ-দেশান্তর হইতে শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইতেন ক্ষত্রিয় রাজার নিকট, তিনিই ব্রহ্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ দিয়াছেন। বক্তা সেই সেই রাজাগণ বা শ্রোতা সেই সেই ব্রাহ্মণগণই উপনিষদ্গুলি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন এমন নাও হইতে পারে; অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিজেদের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার প্রেরণায় যাঁহারা এগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কবি— সত্যদ্রষ্টা বলিয়াও কবি, ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে তাঁহাদের অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের চিত্তের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিবার মত উপযুক্ত প্রকাশের জন্যও তাঁহারা কবি। রবীন্দ্রনাথকে সেই সত্যদ্রষ্টা কবিগণের সহিত এক করিয়া দেখিতে কোনো বাধা দেখিতেছি না।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শনের পন্থা বৈদিক কবিগণের পন্থার একান্ত অনুরূপ। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি তিনসহস্রাধিক বর্ষের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির সহিত এই বৈদিক কবিগণের প্রকাশভঙ্গিরও একটি একান্ত অনুরূপতা রহিয়াছে। উদ্ধৃতির বাহুল্য বর্জন করিবার জন্য ইতস্তত দুই-চারিটি নমুনা লইতেছি। 'বিচিত্রিতা'র 'দান' কবিতায় কবি উষার একটি বর্ণনা দিয়াছেন—

হে উষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্ত্রস্বর শুনি
যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন্ মহা-অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর।

বৈদিক উষা-বর্ণনার সঙ্গে যাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার নিকটে বুঝাইয়া বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই উষার এই বর্ণনার সহিত বৈদিক উষা-বর্ণনার কি ঘনিষ্ঠ যোগ; আবার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-কবিতা-গানের সঙ্গে যাঁহার পরিচয় রহিয়াছে তাঁহাকেও বলিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন নাই যে বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথের হাতে উষার এ-জাতীয় একটি বর্ণনা কত সহজেই আশা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্মে'র অন্তর্গত 'দিন ও রাত্রি' লেখাটির মধ্যে রাত্রির একটি বর্ণনা দিয়াছেন—

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে— সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক— স্তব্ধ

অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষ দৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

এই বর্ণনা সর্বাংশে বৈদিক রাত্রিসূক্তের অনুরূপ নয়, কারণ এখানে রাত্রি নিজে নিখিলমাতা নহেন, রাত্রি নিখিলমাতার কাছে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দেন ; কিন্তু এইটুকু পার্থক্যসত্ত্বেও মনে হয়, এই বর্ণনাকেও একটি 'রাত্রিসূক্ত' নাম দিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ় মিলের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। বৈদিক সকল-জাতীয় প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়িলেই মনে হয়, এই বর্ণনার পিছনে আর একটা বড় জিনিস রহিয়াছে— তাহা হইল, সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকৃতির সর্বত্র একটি দেবতার সত্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই দেবতার সহিত ব্যক্তিগত একটা যোগ স্থাপনের চেষ্টা। এখানে দেবতা শব্দের অর্থ দ্যোতনশীল প্রকাশবান্ নিত্য সত্য। এই জিনিসটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রথমাবধিই ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথম-জীবনের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—

> সেই দিনগুলির দিকে যখন ফিরিয়া তাকাই তখন মনে হয়, অজ্ঞাতসারে আমি আমার বৈদিক পূর্বসূরি-গণের পথই অনুসরণ করিয়াছি ;—গ্রীষ্মমণ্ডলের আকাশের যে দ্যোতনা রহিয়াছে সকলের পিছনকার সত্যের দিকে, তাহা দ্বারাই আমি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বর্ষণহীন জলভরা মেঘগুলির ঘনসমাবেশ, সারি সারি নারিকেলগাছের মধ্যে ভঙ্গিময় আবেগের সাড়া জাগাইয়া দিয়া ঝড়ের আকস্মিক আগমন, প্রজ্বলন্ত নিদাঘমধ্যাহ্নের ভীতিপ্রদ নির্জনতা, শরতের শিশিরসিক্ত যবনিকার অন্তরালে সূর্যের নিঃশব্দ উদয়— ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে যে বিস্ময় ছিল তাহা সর্বব্যাপী একটি সত্যের সহিত যোগের নিবিড়তায় আমার মনকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এই সত্য শুধু প্রথম জীবনেরই সত্য নহে, তাঁহার সর্বজীবনেরই সত্য।

উপনিষদ্গুলির মধ্যে অধ্যাত্মসত্যানুভূতির যে প্রকাশ তাহা মুখ্যতঃ অনুভূতিদীপ্ত চিত্তের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দিব্যপ্রেরণার স্বতঃ-উৎসারণ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দিব্যপ্রেরণার এইজাতীয় স্বতঃ-উৎসারণের আর সংখ্যা নির্দেশ করিবার উপায় নাই। ইহার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার চেতনা উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত ; কিন্তু আরো অসংখ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে তাঁহার স্বধর্মেই এইজাতীয় দিব্যানুভূতি অজস্রভাবেই উৎসারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিত্তধর্ম হইতে উৎসারিত হইয়াই সেগুলি উপনিষদের এইজাতীয় উৎসারণ বা উচ্চারণের সঙ্গে প্রকৃতিতে একেবারে এক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আলোকোজ্জ্বল একটি প্রভাতের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন—

> আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
> দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।

আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে—
দেখেছি চিরজনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।

তখন আমরা সেই ঋষিরই বাণী লাভ করি, সূর্যালোক-উদ্ভাসিত একটি প্রভাত যাঁহার শুধু হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, যাঁহার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিশ্বের সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যে আসীন এক সত্যের আনন্দ ও জ্যোতির স্পন্দন জাগাইয়া দিয়াছে। ইহাকে উপনিষদের কোনো প্রভাব বলিব না; ইহা সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভূতি। সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের নিজের হইয়াও ইহা প্রকৃতিতে যে সবখানিই ঔপনিষদিক এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের প্রকৃতিগত গভীর মিলের প্রশ্ন। বীথিকার 'আদিতম' কবিতাটির মধ্যে যখন দেখি—

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অশথের মজ্জায় করিতেছে বিচরণ,
তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন;
মোর শিরা তন্তুতে বাজে তাই;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি ওংকার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

এ কথা রবীন্দ্রনাথের চিত্তে উপনিষদের প্রতিধ্বনিমাত্র নয়; রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কথার সঙ্গে এই কথা মিলাইয়া লইলে দেখিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মর্মকথা। এই কথা যেমন তাঁহার সমগ্র জীবনের মর্মকথা, এই প্রকাশও তাঁহার নিজস্ব প্রকাশ; এক স্থলে নূতন আসিয়া নিজেকে এমন করিয়া প্রকাশ করেন নাই— এইভাবেই হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন দীর্ঘ জীবনের কবিকর্মে।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' উপনিষদের এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর অনুরণন

তুলিয়াছিল। তিনি 'শান্তিনিকেতনে'র লেখার মধ্যে একটি লেখায় এই বাণীটিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে অপূর্ব রূপ দিয়াছেন। অন্যত্রও বহু স্থলে তিনি এই বাণীটিকে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন ' কিন্তু 'আরোগ্যে'র নবম-সংখ্যক কবিতাটিতে যখন দেখিতে পাই—

> বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
> আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে
> সূর্যতারা লয়ে
> যুগযুগান্তের পরিমাপে।
> অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
> ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
> এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।...
>
> দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
> ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
> রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
> দেখিলাম চাহি
> শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
> নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

তখন কি এই কথাই বলিব যে ইহা রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই উপনিষদের বাণীরই অনুরণন মাত্র? ইহা কি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী অনুভূতির দ্বারা সত্যমূল্য লাভ করে নাই? ইহার যে প্রকাশ তাহাকেও রবীন্দ্রনাথের কবিচিত্তের বিশেষ প্রকাশ বলিবার কি কোনো যৌক্তিকতা নাই? এই সকল 'বিশেষত্ব' লইয়াও প্রেরণায় ও প্রকাশে উপনিষদের সঙ্গে যে গভীর মিল তাহার প্রতিই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই মিলকেই আমি মৌলিক মিল বা ধাতুগত মিল বলিয়াছি।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের সকল ধর্মানুভূতিকে এবং অধ্যাত্মচিন্তাকে যেভাবে বার বার উপনিষদের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শুধু গদ্য লেখায় বা ভাষণে নহে, কবিতা-রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বহু ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই যেরূপ নিজের ভাব ও ভাষাকে উপনিষদের ভাব ও ভাষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অতি স্বাভাবিক-ভাবেই মনে হইতে পারে, এখানে প্রকৃতিগত মিলের প্রশ্নটা অনেকখানি অবান্তর, এখানে আবাল্য উপনিষদের রসে পুষ্ট কবিমানসেরই প্রকাশ দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সমগ্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, প্রভাবের কথা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিজের অনুভূতি ও মননের সঙ্গে তিনি উপনিষদের বাণীর 'সায়' পাইয়াছেন। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে অনুভূতি ও মননের এই সায় তাঁহাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়াছে, প্রত্যয় দিয়াছে;

উপনিষদের বাণীর সঙ্গে মিলে তিনি নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার আজীবন গভীর শ্রদ্ধা। ফলে নিজের কথাকেও রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া উপনিষদের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়াই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদের বাণীকে অবলম্বন করিয়া তিনি যেখানে যেখানে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সর্বত্রই তাঁহার মন উপনিষদের একান্ত অনুগামী নহে; কোথাও উপনিষদের সূক্ষ্ম একটি ব্যঞ্জনাকে বিস্তার করিয়া তিনি তাহাতে নূতন ব্যঞ্জনা সংযোজিত করিয়াছেন, কোথায়ও দেখিব, নিজের অনুভূতি-মননকে তিনি খানিকটা উপনিষদের উপরে আরোপ করিয়াছেন। উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল দেখাইয়া কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়াই উপনিষদ্‌কে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা যেখানে করিব সেইখানিই আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রসঙ্গক্রমে, অপর একটি তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিতে চাই; রবীন্দ্রনাথের কৈশোর এবং প্রথমযৌবনের অনেক কবিতার ভিতর দিয়া কবিমনের যে অপটু আত্ম-প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার উপরে উপনিষদের প্রভাব ছিল না, অথচ পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া এগুলিকে যখন গ্রহণ করিতে চাই তখন ভাবধারার অন্তর্নিহিত একতানতা আমাদিগকে বিস্মিত করে, কবি নিজেও এই আবিষ্কারে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত এবং চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

২

উপনিষদ্‌গুলি কোনো এক ঋষিকবির রচনা নয়। বেদের উত্তরাংশ বলিয়া এগুলি সাধারণভাবে বেদান্ত নামে অভিহিত; আমরা সাধারণতঃ এই বেদান্তের একটা রচনাকাল মোটামুটিভাবে স্থির করিয়া লইলেও সব উপনিষদের রচনাকাল খুবই কাছাকাছি এ কথা সত্য না হইবারই সম্ভাবনা। উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ হইলেও এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং শুশ্রূষা সর্বক্ষেত্রে এক নহে। পরবর্তী যুগের বিভিন্ন কালেও অনেক উপনিষদ্ রচিত হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে যে-কয়খানি উপনিষদ্ প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত তাহাদের ভিতরকার রচনার কালগত ব্যবধান এবং বিষয়-বস্তুকে উপস্থাপিত এবং আলোচনা করিবার ভঙ্গিবৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে আমরা একটা গভীর ঐক্য দেখিতে পাই, যে ঐক্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা উপনিষদের বাণী, উপনিষদের সুর প্রভৃতি সাধারণীকৃত কথা বলিয়া থাকি। এই ঐক্য কোথায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে গেলেই লক্ষ্য পড়ে সব উপনিষদের মধ্যেই প্রধানভাবে দুইটি জিনিসের প্রতি— একটি হইল গভীর জিজ্ঞাসা, অপরটি হইল দর্শন; দর্শন এখানে একমাত্র বুদ্ধিনির্ভর বা মুখ্যভাবে বুদ্ধিনির্ভর কোনো মত-সিদ্ধান্ত নহে, দর্শন এখানে গভীর অনুভূতি এবং তাহার সানন্দ উচ্চারণ। আমরা আধুনিক কালে যাহাকে 'দার্শনিক মতবাদ' বলিয়া অভিহিত করি সমস্ত উপনিষদের মধ্যে এইরূপ কোনো একটি দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। উপনিষদ্‌গুলিকে লইয়া বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে পরবর্তী কালে। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, পরস্পরবিবদমান দার্শনিক

মতাবলম্বিগণের এক পক্ষ একটি বিশেষ মতবাদকে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিবার জন্য উপনিষদের যে-সব বাণীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন অপর পক্ষ সেই মতবাদ নিরসন করিবার জন্যই আবার সেই বাণীগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মতবাদে মতবাদে তর্ক এবং বিবাদ হইতেছে— মাঝখানে উপনিষদের বাণীগুলি স্থির রহিয়াছে ; মূলে যে 'মতবাদ' গড়িয়া তোলা তাহাদের কাজ নয়— তাহারা হইল মানুষের মনের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলির উত্তরে বিভিন্ন সত্যদর্শী ঋষির বিভিন্নকালে লব্ধ অনুভূতির দিব্য-প্রেরণাময় সোল্লাস উচ্চারণ। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া সর্বত্র একইভাবে একই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা বলা যায় না, সে কাজ করিবার প্রতিজ্ঞাদ্বারাও নিজেদের তাঁহারা আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করিয়া লন নাই। দার্শনিক মতৈক্যের কঠোরতা আরোপ করিতে গিয়া উপনিষদের বাণীগুলির উপরে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ যে অনেক সময় বুদ্ধির অত্যাচার করিয়াছেন এ কথাও আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

উপনিষদের মধ্যে আমরা একটা নিত্যনবীনতা আবিষ্কার করি যাহা আমরা অন্য কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্তের বেড়াজালের মধ্যেই লাভ করিতে পারি না। মানুষের মন এখানে যেমন একটা আদিম বিস্ময় এবং সেই বিস্ময়জনিত অফুরন্ত জিজ্ঞাসা লইয়া দেখা দিয়াছে এমন আর কোথাও দেখা যায় না। সত্যও এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নহে, বিশ্বাসলব্ধ কোনো সনাতন ভগবৎ-প্রত্যাদেশ নহে— সত্য এখানে মানুষের জ্যোতিরুদ্ভাসিত এবং আনন্দস্পন্দিত হৃদয়ের মধ্যে নানাভাবে হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে— সেই হইয়া উঠিবার সকল ইঙ্গিত সকল ব্যঞ্জনা বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি পরম একের দিকে। মানুষের মনে বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা এখানে অন্ধকারের পরপার হইতে স্বর্ণকিরণোদ্‌ভাসিত সবিতার নিঃশব্দ আবির্ভাবে, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা রাত্রির আকাশে চন্দ্র-তারকা-গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ঐ যে সূক্ষ্ম বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম এবং তাহার ক্রমবিবৃদ্ধিতে বিরাট্‌ ন্যগ্রোধবৃক্ষটির বনভূমিব্যাপী বিকাশ তাহা লইয়া, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা এই দেহটি লইয়া, দেহের কর্ম-সাধক ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া, দেহের যাহাতে প্রতিষ্ঠা সেই অন্ন লইয়া— অন্নে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ লইয়া, প্রাণে প্রতিষ্ঠিত মন, মনে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ লইয়া ; এই যে মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে, এই যে প্রাণ অফুরন্ত ধারে বহিয়া চলিতেছে, এই যে চক্ষু দেখিতেছে, এই যে কান শুনিতেছে— ইহার প্রতিটিই যে পরম বিস্ময়, প্রতিটিকে লইয়াই অনন্ত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দিবে কে ? বুদ্ধি ? সেও তো ইন্দ্রিয়েরই কাজ— তাহাকে লইয়াও তো বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। উত্তর জাগিতে লাগিল শুধু বন্ধনহীন আবরণহীন হৃদয়ের মধ্যে, চিত্তের জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় উদ্‌ভাসনের মধ্যে। সে উদ্‌ভাসন কখনো উচ্চারণ করিল, অনন্ত মহিমা ঐ জ্যোতির্ময় সবিতার, অন্ধকারের পরপারে ঐ জ্যোতির্ময় সবিতাকে দেখো— ঐ ব্রহ্ম ; ঐ অগ্নি— দ্যুলোকে অগণিত জ্যোতিষ্ক হইয়া আছে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ হইয়া আছে, ভূলোকে যজ্ঞের হবি গ্রহণ করিতেছে, দেহের মধ্যে অন্নাদরূপে সব সোমকে গ্রাস করিতেছে পরিপাক করিতেছে— অনন্ত মহিমা এই অগ্নির— এই অগ্নিই ব্রহ্ম ; এই যে বায়ু, যে অন্তরিক্ষে মরুদ্‌রূপে সঞ্চরমাণ, ভূলোকে স্পর্শরূপে প্রতীয়মান, দেহ মধ্যে প্রাণকে ধারণ

করিয়া আছে— এই বায়ুই ব্রহ্ম ; এই যে বিশ্বজৈবিক-প্রবাহের প্রতিষ্ঠা অন্ন— এই অন্নই ব্রহ্ম, এই যে অনন্তকালে প্রবাহিত মহাপ্রাণ— এই প্রাণই ব্রহ্ম! এই যে মহাকাশে পরিব্যাপ্ত মহা-আনন্দ— এই আনন্দই ব্রহ্ম! প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থিত এই আত্মা ব্রহ্ম! এই সব মহিমা জুড়িয়া এক সত্য— সেই সত্যই পরম সত্য, সকল সত্যের অন্তর্নিহিত সত্য! সেই সত্য মহত্তম, সেই সত্য বৃহত্তম, সেই সত্যই ব্রহ্ম।

উপনিষদের সর্বত্র এই একের সন্ধান, এই একের উপলব্ধি। ভূলোকে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে, বিশ্বপ্রকৃতির সকল দৃশ্যে ঘটনায়, মানুষের দেহে মনে আত্মায়, সর্বত্র গূঢ় হইয়া রহিয়াছে যেন একটি বাণী— সর্বত্র বিশ্বজীবনের এবং ব্যক্তিজীবনের সেই বাণীটি লাভ করিবার চেষ্টা। সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্রে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, অগ্নিতে বায়ুতে সলিলে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, তৃণে লতায় বনস্পতিতে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, মানুষের অন্নে প্রাণে মনে আত্মায় যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল সেখানেই পরম আনন্দের সংবেগ— সেই সংবেগের স্বতঃপ্রকাশ দীপ্তিময় ভাষায় ছন্দে। কবিপ্রেরণা এবং ধর্মপ্রেরণায় এখানে কোনো দ্বৈতত্ব নাই, ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক।

উপনিষদের ভিতরকার এই যে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ইহাকে বর্তমান যুগে একটি বিশেষ অর্থে আমরা 'আদিম' বলিয়া আখ্যাত করি, সেই অর্থের মধ্যে মানবমনের অপরিণতির প্রতি একটি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু বার বার উপনিষদ্ পড়িয়া মনে হইয়াছে উপনিষদের ভিতরকার যে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা তাহাকে আজিকার দিনেও আমরা অতিক্রম করিতে পারিয়াছি কি? ইহা তো মানবমনের নিত্য-কালের বিস্ময়, নিত্যকালের জিজ্ঞাসা। কোন্ শক্তির কি ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে, প্রথম প্রাণকে কে সঞ্চারিত করিয়াছিল? বাক্ কি শক্তিতে কথা বলে, কোন্ দেবতা নিয়োগ করেন এই চক্ষুকে শ্রোত্রকে? কোন্ দেবতা দীপ্যমান জ্যোতিষ্মান্ আদিত্যের মধ্যে— কোন্ দেবতা দীপ্যমান আমার সমস্ত দেহে মনে আত্মায়— কি সম্পর্ক ঐ আদিত্যের অন্তর্বর্তী ও অন্তর্যামী পুরুষ এবং আমার অন্তর্বর্তী ও অন্তর্যামী পুরুষের মধ্যে? সূক্ষ্ম বীজ হইতে কি করিয়া জাগিয়া উঠিল এই ন্যগ্রোধ বনস্পতি! ইহার সব বিষয়েই বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আমরা প্রচুরভাবে লাভ করিয়াছি— তথাপি আমাদের বিস্ময়ের অবধি নাই, জিজ্ঞাসার কিছুমাত্র পরিসমাপ্তি নাই। আদিম শব্দের তাৎপর্য এখানে তাই প্রাথমিক— মানুষের সেই নিত্যকালের প্রাথমিক বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা এখানে আশ্চর্য সহজ সরল রূপ লাভ করিয়াছে।

এই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার পরিণতি যে সত্যোপলব্ধিতে, নিত্য অনির্দেশ্য সেই সত্যের স্বরূপ। সর্বপ্রকারের 'না'-দ্বারা তাহাকে বর্ণনা কর সে বর্ণনাও ঠিক— সর্বপ্রকারের 'হাঁ'-দ্বারা তাহাকে বর্ণনা কর তাহাও ঠিক। আমাদের নিকটে সুনির্দেশ্য সত্য কোন্টা? হয় যাহাকে বুদ্ধির বেড়াজালে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিলাম, অথবা বুদ্ধি যেখানে নাগাল পাইল না তখন একটি বিশ্বাসের দ্বারা একটা কিছুকে অনড়ভাবে গ্রহণ করিলাম। উপনিষদের সত্য এই দুইয়ের কোনোটিই নয়, আলংকারিকের ভাষায় এ সত্য হইল বিশ্বজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের 'ধ্বনি'। বিশ্বজীবনের যত

গভীরে প্রবেশ করা যাইতেছে, ব্যক্তিজীবনের গভীর সত্তায় যত প্রবেশ করা যাইতেছে ততই সেই ধ্বনি, সেই এক সৎ-চিৎ-আনন্দের অনুরণন অমোঘভাবে অনুভূত হইতেছে। এই যে সকল দেখার ভিতর দিয়া চোখে দেখিলাম, এই যে সকল শোনার অন্তস্তলে কানে শুনিলাম, এই যে দেহের অণু-পরমাণু আলোকে উদ্ভাসিত আনন্দে স্পন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল 'আছে আছে আছে', সৎ-স্বরূপে আছে, অনন্ত চৈতন্যরূপে আছে, নিখিলপ্লাবী আনন্দরূপে আছে। যাহা আমাতে আছে তাহা তৃণে আছে বনস্পতিতে আছে, তাহা অগ্নিতে আছে জলে আছে, তাহা আদিত্যে আছে চন্দ্রমায় আছে, তাহা বিশ্বভুবনকে আবিষ্ট করিয়া আছে, চলমান জগতের চলমান জীবনের যাহা কিছু তাহার সবই ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই সত্যকে রসস্বরূপ 'সঃ' বলিয়া নির্দেশ করিতেও আপত্তি নাই, শুধুমাত্র 'তৎ' বলিয়া নির্দেশ করিতেও আপত্তি নাই, আবার সর্বভূতে অনুস্যূত অনির্দেশ্য 'অসৎ' বলিয়া উল্লেখ করিতেও আপত্তি নাই। ইহাই বটে, আর ইহা কিছুতেই নয়— এ কথা পরবর্তী কালের মতবাদিগণের; উপনিষদ্ বলিবে অনন্তবিচিত্র আমার অনুভূতি এই সত্যের, তাই আমি এ-ভাবেও ইঙ্গিত দিয়াছি, ও-ভাবেও ইঙ্গিত দিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের পরিণতি এই উপনিষদের ধারায়। সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, ধর্মপ্রেরণা ও কবিপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সমগ্রজীবনে এক এবং অবিচ্ছেদ্য। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে পৃথক্‌ভাবে ধর্মের কথা বা দর্শনের কথা বলিবার জন্য যখন আহ্বান জানান হইয়াছে তিনি তখন মহা অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন। 'হিবার্ট লেক্‌চারস্' দিতে গিয়া তাই তিনি অতিস্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

আমার ধর্ম হইল একজন কবির ধর্ম— এ ধর্ম কোনো নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনো ধর্মতত্ত্ববিশারদের ধর্মও নয়। আমার গানগুলির প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করিয়াছি। আমার কবিজীবন যে রহস্যময় ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে আমার ধর্মজীবনও ঠিক সেই একধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে; এ মিলন গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক দিনের উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া, সে তথ্যটা সম্বন্ধে আমি নিজে কখনই সচেতন ছিলাম না।

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রেরণা এবং ধর্মের স্পর্শ, এই উভয়ের সঞ্চরণের চিহ্নহীন গোপন পথটি কি? তাহা হইল পরম বিস্ময়ের পথ, যে পথে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি পথিক হইয়াছিলেন চিত্তবিকাশের প্রথম ক্ষণ হইতে। জীবনকে ও জগৎকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়া কখনও খুশী হইতে পারেন নাই, কেবলই মুগ্ধ হইয়াছেন বিস্মিত হইয়াছেন। সেই অনন্ত মুগ্ধতা ও বিস্ময় চিত্তের মধ্যে অনুক্ষণ জাগাইয়াছে বিচিত্র অনুভূতি, সেই অনুভূতি হৃদয়ে আনিয়াছে সত্যের স্পর্শ, কণ্ঠে জাগাইয়াছে গান। শুধু বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা বা বিরল দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া নয়।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,

ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা— সেই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

—বলাকা

এই পথেই আসিয়াছে গানও ধর্মও। পরমবিস্ময় রূপের মধ্যে আনিয়া দিয়েছে অরূপের বীণা, সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অসীমের লীলা, সান্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অনন্তের স্পর্শ। সেই অনন্তের স্পর্শকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরও বলিয়াছেন, সত্যও বলিয়াছেন। সুন্দরের পথ দিয়া তাই নিরন্তর সত্যের আনাগোনা, সত্যের স্পর্শেই আবার সুন্দরের অভিব্যক্তি। এই পরমবিস্ময় কবির হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কেবলই রম্যবীণার মত ঝংকৃত করিয়া দিয়াছে; শৈশবাবধি চিত্তের এই রম্যবীণার ঝংকার তাঁহার বিশ্বভুবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে; নিজের জীবনে এবং বিশ্বভুবনে তাই তিনি শুধু 'রূপের আড়ালে লুকিয়ে-বাজা' একটি রম্যবীণার ঝংকারই শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝংকৃত হচ্ছে— বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে, বীণ-রণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালংকার নয়— আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সংগীত বেজে উঠেছে।...

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে

তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই রম্যবীণার ধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যও আসিয়াছে, সুন্দরও আসিয়াছে; কোনো এক বিশেষ দিনেই আসে নাই, অল্পবিস্তর জীবনের প্রতিদিনেই আসিয়াছে; আর তাহাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন সমগ্র সত্তা দিয়া; তাহাকে প্রতিদিন চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, কান দিয়া শুনিয়াছেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ করিয়াছেন, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই, সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনোদিনই একেবারে কাটাছাঁটা একটি অনড় সিদ্ধান্ত নহে, সত্য কোনোদিন তাঁহার নিকটে 'মতবাদে'র কঠোর রূপ ধারণ করে নাই। আজীবন অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে সে সত্য সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া কেবলই হইয়া উঠিয়াছে। অনন্ত বিচিত্রানুভূতির সমগ্রতা লইয়াই সত্য তাঁহার কাছে সত্য। অনুভূতি বিচিত্র — কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি একটি ঐক্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার মতে এইখানেই সত্যের যাথার্থ্য। অনুভূতির মধ্যে এই ঐক্যলাভের জন্য অনুভূতির সকল বিচিত্রতার রং-রেখা খাঁচ-কোণ প্রভৃতিকে ঘষিয়া মাজিয়া বা সাধারণীকারক বুদ্ধির শান লাগাইয়া এক ছাঁচের সাদা-মাটা করিয়া লইবার কোনো প্রয়োজন হয় নাই। পাঠকের পক্ষেও এই ঐক্যকে তাই সবটা মনে মনে গ্রহণ করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বিশেষ মতবাদরূপে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই বিপত্তি দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, দীর্ঘজীবনের প্রতিদিবসের ভিতর দিয়া তিনি নিজেও নিরন্তর 'হইয়া উঠিয়াছেন'—তাঁহার সত্যও তাঁহার ভিতরে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা অনুভূতিতে হইয়া উঠিয়াছে—

আমার জীবন তাহার ধর্মকে লাভ করিয়াছে একটা বাড়িয়া উঠিবার প্রবাহের ভিতর দিয়া, কোনো উত্তরাধিকারের ভিতর দিয়াও নয়, বাহির হইতে আমদানির দ্বারাও নয়। —*The Religion of Man*, ষষ্ঠ অধ্যায়

সব-কিছুর ভিতর দিয়াই যে একই বিষয়বস্তু প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই আমার নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যে 'মানুষের ধর্ম' আমার মনের মধ্যে একটা ধর্মের অনুভূতিরূপেই দিনে দিনে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনো দার্শনিক বিষয়বস্তুরূপে গড়িয়া ওঠে নাই। বস্তুত, আমার অপরিণত যৌবনের প্রথম দিককার রচনাগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্তের রচনাসমূহের একটা মস্তবড়ো অংশের ভিতরেই এই গড়িয়া উঠিবার প্রায় একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আজ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার সকল আরব্ধ কর্ম এবং উচ্চারিত বাণী— ইহারা সকলই আমার একটা প্রেরণার ঐক্যে গভীরভাবে বাঁধা রহিয়াছে; এই ঐক্যের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা যে কি তাহা আমার নিজের কাছেও অনেক সময় অজ্ঞাত রহিয়াছে। —ঐ, প্রাক্‌কথন

এই কথাটাকেই অন্যত্র এইভাবে বলিয়াছেন—

ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক

সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরেন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,— আমার সুখদুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। —আত্মপরিচয় গ্রন্থে উদ্ধৃত চিঠি

এইখানেও আবার তাই দেখিতে পাই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ধাতুগত মিল। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসায় অনুভূতিতে যে সত্যকে পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে ঐক্যকে বেশ বোঝা যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে দার্শনিক মতবাদের কোনো বিশেষ খাঁচায় পুরিতে গেলেই টানিয়া ছিঁড়িয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া দুমড়াইয়া বাঁকাইয়া অত্যাচার করিতে হইতেছে। ন্যায়-শাসিত দার্শনিকতার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চিত্তকে যদি সহজভাবে পাতিয়া দেওয়া যায়, উপনিষদের বাণী ও রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা দুইই যোগ্য আসন অধিকার করিয়া বসিতে পারে।

৩

উপনিষদের বাণী কি? 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। জগতে যাহা কিছু চলমান পরিবর্তনশীল বিকারশীল তাহার সব কিছুই যে এক পরমসত্যের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ বিধৃত এবং পরিচালিত, সেই কথাটিই উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যে বহুর মধ্যে ব্যাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ইহাকে চঞ্চল বা বিকারশীল বলিয়া ধিক্কৃত করিতে হইবে না, তাহাকে গ্রহণ করো, ভোগ করো— কিন্তু 'ত্যক্তেন', ত্যাগের দ্বারা। কোন্ ত্যাগের দ্বারা? যে বোধের দ্বারা 'সব-কিছু' যে একের মধ্যে বিধৃত হইয়া এক হইয়া আছে এই চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে সেই চিত্তাবরক বোধের ত্যাগের দ্বারা। চিত্তের সেই আবরণ দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন একটি অহংকে জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে, সেই অহং-এর ধর্মই হইল বিশ্বপ্রবাহের অখণ্ড সত্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা ও 'ইদং সর্বং'-এর ভিতরকার সব-কিছুকেও পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। প্রথমে এই পরস্পর-ব্যবচ্ছেদক 'অহং'টিকে ত্যাগ করিতে হইবে; এই 'অহং'এর আবরণমুক্ত হইলেই দেখা যাইবে, আমার সকল সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে যে সত্য সেই সত্যই বিরাজমান সুদূর আকাশে স্থিত ঐ জ্যোতির্ময় আদিত্যে। 'অহং' চারিদিকে কেবল সৃষ্টি করে সোনার আবরণ, সেই সোনার আবরণের দ্বারাই আবৃত হইয়া থাকে সত্যেরও মুখ; সেই আবরণ অপসারিত হইলেই দেখা যাইবে ঐ সূর্যের মধ্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— আমিই সেই। ঐ যে দ্যুলোকের সূর্য-চন্দ্র-তারকা, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ, ভূলোকের অগ্নি— ইহার কিছুই আপনা-আপনি ভাসমান নয়, সকলের অন্তর্নিহিত এক সত্যই শুধু ভাসমান— সেই একের ভাসকে অবলম্ব করিয়াই অপর সকলে দীপ্তিমান। আবার যে ভাস ঐ সূর্যের মধ্যে, চন্দ্র-তারকার মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে— সেই ভাসই সক্রিয় ব্যক্তির মধ্যে, তাহার ইন্দ্রিয়ে তাহার চিত্তে তাহার বুদ্ধিতে তাহার আত্মার আনন্দে জ্যোতিতে।

তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসংগীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।

এই রম্যবীণার ধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যও আসিয়াছে, সুন্দরও আসিয়াছে; কোনো এক বিশেষ দিনেই আসে নাই, অল্পবিস্তর জীবনের প্রতিদিনেই আসিয়াছে; আর তাহাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন সমগ্র সত্তা দিয়া; তাহাকে প্রতিদিন চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, কান দিয়া শুনিয়াছেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ করিয়াছেন, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই, সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনোদিনই একেবারে কাটাছাঁটা একটি অনড় সিদ্ধান্ত নহে, সত্য কোনোদিন তাঁহার নিকটে 'মতবাদে'র কঠোর রূপ ধারণ করে নাই। আজীবন অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে সে সত্য সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া কেবলই হইয়া উঠিয়াছে। অনন্ত বিচিত্রানুভূতির সমগ্রতা লইয়াই সত্য তাঁহার কাছে সত্য। অনুভূতি বিচিত্র — কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি একটি ঐক্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার মতে এইখানেই সত্যের যাথার্থ্য। অনুভূতির মধ্যে এই ঐক্যলাভের জন্য অনুভূতির সকল বিচিত্রতার রং-রেখা খাঁচ-কোণ প্রভৃতিকে ঘষিয়া মাজিয়া বা সাধারণীকারক বুদ্ধির শান লাগাইয়া এক ছাঁচের সাদা-মাটা করিয়া লইবার কোনো প্রয়োজন হয় নাই। পাঠকের পক্ষেও এই ঐক্যকে তাই সবটা মনে মনে গ্রহণ করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বিশেষ মতবাদরূপে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই বিপত্তি দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, দীর্ঘজীবনের প্রতিদিবসের ভিতর দিয়া তিনি নিজেও নিরন্তর 'হইয়া উঠিয়াছেন'—তাঁহার সত্যও তাঁহার ভিতরে প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা অনুভূতিতে হইয়া উঠিয়াছে—

আমার জীবন তাহার ধর্মকে লাভ করিয়াছে একটা বাড়িয়া উঠিবার প্রবাহের ভিতর দিয়া, কোনো উত্তরাধিকারের ভিতর দিয়াও নয়, বাহির হইতে আমদানির দ্বারাও নয়। —*The Religion of Man*, ষষ্ঠ অধ্যায়

সব-কিছুর ভিতর দিয়াই যে একই বিষয়বস্তু প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই আমার নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যে 'মানুষের ধর্ম' আমার মনের মধ্যে একটা ধর্মের অনুভূতিরূপেই দিনে দিনে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনো দার্শনিক বিষয়বস্তুরূপে গড়িয়া ওঠে নাই। বস্তুত, আমার অপরিণত যৌবনের প্রথম দিককার রচনাগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্তের রচনাসমূহের একটা মস্তবড়ো অংশের ভিতরেই এই গড়িয়া উঠিবার প্রায় একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আজ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার সকল আরব্ধ কর্ম এবং উচ্চারিত বাণী— ইহারা সকলই আমার একটা প্রেরণার ঐক্যে গভীরভাবে বাঁধা রহিয়াছে; এই ঐক্যের ঠিক ঠিক সংজ্ঞা যে কি তাহা আমার নিজের কাছেও অনেক সময় অজ্ঞাত রহিয়াছে। —ঐ, প্রাক্‌কথন

এই কথাটাকেই অন্যত্র এইভাবে বলিয়াছেন—

ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠছে, তা অনেক

সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়— একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরেন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,— আমার সুখদুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। —আত্মপরিচয় গ্রন্থে উদ্ধৃত চিঠি

এইখানেও আবার তাই দেখিতে পাই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ধাতুগত মিল। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসায় অনুভূতিতে যে সত্যকে পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে ঐক্যকে বেশ বোঝা যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে দার্শনিক মতবাদের কোনো বিশেষ খাঁচায় পুরিতে গেলেই টানিয়া ছিঁড়িয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া দুমড়াইয়া বাঁকাইয়া অত্যাচার করিতে হইতেছে। ন্যায়-শাসিত দার্শনিকতার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চিত্তকে যদি সহজভাবে পাতিয়া দেওয়া যায়, উপনিষদের বাণী ও রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা দুইই যোগ্য আসন অধিকার করিয়া বসিতে পারে।

৩

উপনিষদের বাণী কি? 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। জগতে যাহা কিছু চলমান পরিবর্তনশীল বিকারশীল তাহার সব কিছুই যে এক পরমসত্যের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ বিধৃত এবং পরিচালিত, সেই কথাটিই উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যে বহুর মধ্যে ব্যাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ইহাকে চঞ্চল বা বিকারশীল বলিয়া ধিক্কৃত করিতে হইবে না, তাহাকে গ্রহণ করো, ভোগ করো— কিন্তু 'ত্যক্তেন', ত্যাগের দ্বারা। কোন্ ত্যাগের দ্বারা? যে বোধের দ্বারা 'সব-কিছু' যে একের মধ্যে বিধৃত হইয়া এক হইয়া আছে এই চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে সেই চিত্তাবরক বোধের ত্যাগের দ্বারা। চিত্তের সেই আবরণ দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন একটি অহংকে জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে, সেই অহং-এর ধর্মই হইল বিশ্বপ্রবাহের অখণ্ড সত্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা ও 'ইদং সর্বং'-এর ভিতরকার সব-কিছুকেও পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। প্রথমে এই পরস্পর-ব্যবচ্ছেদক 'অহং'টিকে ত্যাগ করিতে হইবে; এই 'অহং'এর আবরণমুক্ত হইলেই দেখা যাইবে, আমার সকল সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে যে সত্য সেই সত্যই বিরাজমান সুদূর আকাশে স্থিত ঐ জ্যোতির্ময় আদিত্যে। 'অহং' চারিদিকে কেবল সৃষ্টি করে সোনার আবরণ, সেই সোনার আবরণের দ্বারাই আবৃত হইয়া থাকে সত্যেরও মুখ; সেই আবরণ অপসারিত হইলেই দেখা যাইবে ঐ সূর্যের মধ্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— আমিই সেই। ঐ যে দ্যুলোকের সূর্য-চন্দ্র-তারকা, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ, ভূলোকের অগ্নি— ইহার কিছুই আপনা-আপনি ভাসমান নয়, সকলের অন্তর্নিহিত এক সত্যই শুধু ভাসমান— সেই একের ভাসকে অবলম্ব করিয়াই অপর সকলে দীপ্তিমান। আবার যে ভাস ঐ সূর্যের মধ্যে, চন্দ্র-তারকার মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে— সেই ভাসই সক্রিয় ব্যক্তির মধ্যে, তাহার ইন্দ্রিয়ে তাহার চিত্তে তাহার বুদ্ধিতে তাহার আত্মার আনন্দে জ্যোতিতে।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে ঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যে ঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

কঠ, ২।২।১২-১৩

যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সর্বনিয়ন্তা একস্বরূপ, সেই একই তাঁহার এক রূপকে বহুধা করিয়া দিতেছেন; সেই একই সকল অনিত্যের ভিতরে নিত্য, চেতনগণের চেতন, সেই একই বহুর কামনার বিধান করিতেছেন; সেই এককে কোথায় দেখিতে হইবে? 'আত্মস্থং', নিজের মধ্যে। কাঁহারা নিজের মধ্যে সেই এককে দেখিতে পারেন? যাঁহারা ধীর তাঁহারা। ধীর কাঁহারা? 'অহং'-এর আবরণাত্মক সকল ভেদচাঞ্চল্য যাঁহাদের হৃদয় হইতে ঘুচিয়া গিয়াছে। 'অহং' চলিয়া গেলেই 'ইদং'ও চলিয়া যায়, তখন 'সর্বমিদং' সেই একের মধ্যে তাৎপর্য লাভ করে। মুণ্ডক উপনিষদের মধ্যে (২।২।৫) তাই দেখিতে পাই, এক দিকে যাঁহার মধ্যে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ মিলিয়া রহিয়াছে, অন্য দিকে যাঁহার মধ্যে সকল প্রাণের সঙ্গে মন সমর্পিত হইয়া আছে, সেই 'এক'কেই জানিতে হইবে। কিরূপে কোথায় সেই এককে 'তমেবৈকং' জানিতে হইবে? 'আত্মানম্', আত্মরূপে নিজের মধ্যে অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে। এখানে তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আত্মার মধ্যে আত্মার সহিত অভিন্ন করিয়া যে 'এক'কে জানিতে হইবে তাহার ভিতরে এক দিক হইতে মিশিয়া গিয়াছে সকল বেদ্য, অপর দিক হইতে মিশিয়া নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে বেত্তা। মাণ্ডূক্যে (২) বলা হইয়াছে 'সর্বং হ্যেতদ্‌ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এই সকলও, অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম, আর ভিতরের এই আত্মাও ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়ে (৩।১০।৪) বলা হইয়াছে, 'স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।' 'সেই যিনি এই পুরুষে, আর সেই যিনি ঐ আদিত্যে— তিনি উভয়ত্রই এক।' উপনিষদের সর্বত্রই এইরূপ বর্ণনা। এক দিকে যেমন দেখি, 'যে দেবতা অগ্নিতে জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবকে বারংবার নমস্কার।' (শ্বেতাশ্বতর, ২।১৭); ইহার সঙ্গেই দেখিতে পাই, 'এক দেবতা সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন গূঢ় হইয়া, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা; তিনিই সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থল, সাক্ষিস্বরূপ, চৈতন্যদায়ক, কেবল এবং নির্গুণ।' (ঐ, ৬।১১)

ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, যিনি এই সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বাক্-রহিত উদাসীন— তিনিই আমার আত্মা, তিনিই আমার হৃদয়ের

অভ্যন্তরে— এই-ই ব্রহ্ম।' (৩।১৪।৪)। আবার বলা হইয়াছে, 'তমসার পরে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি সেই জ্যোতিকে নিজের মধ্যে দেখিতে পাইয়া দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্যকে লাভ করিয়াছি— উত্তম এই জ্যোতি, উত্তম এই জ্যোতি।' (৩।১৭।৭)। উদ্দালক আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া একটি ন্যগ্রোধবীজকে ভাঙিয়া তাহার সূক্ষ্মতম অংশকে লইয়াও বলিয়াছিলেন, 'স য এষো হৃণিমৈ তদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' (৬।১২।৩)। 'এই যে এই অণিমা— ইহাই (পরিদৃশ্যমান) এই সকলের আত্মা ; ইহাই সত্য, সে-ই আত্মা, তুমিই সেই হে শ্বেতকেতু।' বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (১।৪।১০) বলা হইয়াছে, 'এইজন্য এখনও যিনি এইরূপ জানেন যে 'আমিই ব্রহ্ম' তিনি এই সব হন,'— য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি। বৃহদারণ্যকের সুপ্রসিদ্ধ 'মধুবিদ্যা'র (২।৫) মধ্যে দেখিতে পাই, 'এই পৃথিবী সমুদায় ভূতের মধু, সর্বভূত(ও) এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় শারীর পুরুষ— এই (উভয়েই) তাহা, যাহা হইল এই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই এই সব-কিছু।' এইরূপে দেখিতে পাই, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ রহিয়াছেন জলের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, আদিত্যের মধ্যে, দিক্‌সমূহের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, মেঘগর্জনের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে, সত্যের মধ্যে— সেই একই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ রহিয়াছেন এই দেহের মধ্যে ; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম— ইহাই এই যাহা-কিছু তাহার সব। আবার বৃহদারণ্যকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যেখানে গৌতমের নিকটে অন্তর্যামী আত্মার বর্ণনা করিয়াছেন (৩।৭) সেখানেও পৃথিবী দিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে— 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন ইনিই তোমার আত্মা— তিনি অন্তর্যামী, তিনি অমৃত।' এইরূপে যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, দিক্‌সমূহে, চন্দ্র-তারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে— ইহার সব-কিছুর ভিতরে থাকিয়াও ইহার সব-কিছু হইতে পৃথক্, এই সব-কিছু যাঁহাকে জানে না, অথচ এই সব-কিছুই যাঁহার শরীর, এবং এই সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ইহার সব-কিছুই নিয়মিত করিতেছেন তিনিই হইলেন প্রত্যেক জীবেরও আত্মা— ইনিই সর্বান্তর্যামী ইনিই অমৃত।

অমৃত কামনা করিয়াছিলেন যে মৈত্রেয়ী তাঁহাকে উপদেশ দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬), পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না— এইরূপ বিত্ত পশু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোকসমূহ দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ — ইহার কিছুর জন্যই কিছু প্রিয় হয় না, আত্মার কামনায়ই সব-কিছু প্রিয় হয়। সুতরাং— 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্।' 'এই আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, ইহারই মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে

হইবে। হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন করিলে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সকলই বিদিত হয়।' এই প্রসঙ্গে আরো বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ব্রাহ্মণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে লোকসমূহকে দেবগণকে বেদসমূহকে ভূতসমূহকে, যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে— ইহার সমুদায় বস্তুই তাহাকে পরিত্যাগ করে। ইহার সবই আত্মা— এ কথা যে জানে সে ইহার সকলকেই জানে সকলকেই পায়।

'অহং'-এর সঙ্গে 'একে'র যখন তাদাত্ম্য ঘটিল তখন 'অহং' আর ব্যক্তিকেন্দ্রে অবচ্ছিন্ন অল্প বা ক্ষুদ্র আমি নয়; 'অহং' সেখানে ভূমা— 'অহং' সেখানে সর্বব্যাপী 'অহং'। তৈত্তিরীয়ের এক স্থানে (১।১০) এই 'এক'-তাদাত্ম্যের পরে নির্ভীক উদাত্ত উচ্চারণ দেখিতে পাই— 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। উর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।' 'আমিই হইলাম সংসারবৃক্ষের প্রেরয়িতা। আমার কীর্তি পর্বতের পৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত। আদি কারণে আমার সত্তা ও স্মৃতি। সূর্যের মধ্যে রহিয়াছে যেমন সু-অমৃত, আমিও সেইরূপ।' তৈত্তিরীয়ের অন্যত্র (৩।১০।৬) বলা হইয়াছে, 'আমিই হইলাম প্রথমজ, আমি মূর্তামূর্ত জগতের এবং সকল দেবগণের পূর্ববর্তী। আমাতেই অমৃতের নাভি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা।' এখানে ভাবটি হইল এই, 'একে'র সঙ্গে যোগে এবং সেই অদ্বয়-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং'-এর সঙ্গে যোগে 'আমি' বৃহত্তম মহত্তম; সেই যোগ হইতে বিচ্যুত আমি ক্ষুদ্র, আমি মর্ত্য, আমি ক্ষয্য, আমি অসত্য।

আমরা উপরে উপনিষদের বাণীর যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম ইহা হইতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা রহিয়াছে, একটি তাহার নিত্যকালের 'অহং', যেটি তাহার আত্মা, তাহার অমৃতরূপ, তাহার শাশ্বতরূপ; অপরটি তাহার দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র 'অহং', প্রাত্যহিকতার দ্বারা যে আবৃত এবং ক্লিন্ন; সে বৃহৎ হইতে সমগ্র হইতে নিজেকে সংকুচিত রাখে, ভেদবুদ্ধিদ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, সেই ভেদাত্মক আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে আসে যত পাপ, মানুষ হয় গৃধ্নু। কোথাও উপনিষদে এই দুইটি 'অহং'কে দুইটি পাখি বলা হইয়াছে, একই দেহ-বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া এই দুইটি পাখি অবস্থান করে; একটি গাছের স্বাদু ফল খায়, অপরটি ফল না খাইয়া শুধু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। ইহার একটি পাখি আত্মা, অপরটি জীব। জীবরূপে খণ্ড ক্ষুদ্র মর্ত্য 'অহং'-এর প্রকাশ; সেই অংশটা খসিয়া গেলেই অমৃত আত্মার স্পর্শ। চিত্তবিশুদ্ধি দ্বারা লাভ করিতে হয় সত্যের অনুভূতি; চিত্তবিশুদ্ধির প্রধান কথাই হইল, মর্ত্য 'অহং'-এর সর্বপ্রকার আবরণ-ক্লিন্নতা হইতে মুক্ত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাইলাম, উপনিষদের মধ্যে নানাভাবে এই একটি বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ এবং ভূলোক জুড়িয়া জড় ও চেতনের যত বিকাশ ও লীলা— ইহার সব জুড়িয়া অনন্ত কালে অনন্ত দেশে রহিয়াছে একটিমাত্র প্রবাহ; সকল ধারা মিলিয়া বিশ্বপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড।

তৃতীয়তঃ দেখি, এই এক বিশ্বপ্রবাহের পিছনে যে সত্য রহিয়াছে তাহাও অনাদি অসীম অনন্ত সর্বব্যাপী 'এক'। সেই একেই সকল বিধৃত, এবং সেই একেক জানিলেই সব-কিছু জানা হয়।

চতুর্থতঃ, আমার ভিতরকার মর্ত্য, ক্ষয্য 'আমি'টি দূর হইয়া গেলে আমার ভিতরে যে শাশ্বত সত্যকে আত্মারূপে অনুভব করি, সেই আত্মা সর্বব্যাপী একের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং যে আত্মাকে লাভ করে, সে সেই পরম এককে লাভ করে; যে সেই পরম এককে লাভ করে সে সেই একের ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং'কেই লাভ করে— সে 'ইদং সর্বং'ই হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, এই একের ভিতরে যে মানুষের নিত্য অবস্থিতি এইখানেই মানুষের অমৃতত্ব অমরত্ব।

ষষ্ঠতঃ, মানুষ যেখানে পরমঅদ্বয়যোগে প্রতিষ্ঠিত সেখানে সে যে 'অহং'কে লাভ করে সে 'অহং' পরম মহিমায় মহিমান্বিত, সে 'অহং' বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উপনিষদের বাণীগুলিকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে তাহাদিগকে এখানে উপস্থিত করিলাম, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপস্থাপিত হইবার মত সেগুলি পরস্পরবিশ্লিষ্ট নয়, প্রত্যেক কথাই প্রত্যেক কথার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত; শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা উপনিষদের প্রতিপাদ্যগুলিকে এইভাবে ভাগ করিয়া লইলাম।

৪

উপনিষদের বাণীর যে-সকল দিকের কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোথায় মিল, এক-এক করিয়া তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এই তুলনাত্মক আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত একটি কথার পুনরুল্লেখ করিয়া লইতে চাই। উভয়ের ভিতরে যেখানে যত মিল দেখা যাইবে তাহার সবটাই রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব এই দৃষ্টিতে জিনিসটিকে গ্রহণ করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিমন গড়িয়া উঠিবার কাজে উপনিষদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবকে কোনো অংশেই খর্ব করিতে চাহিতেছি না; কিন্তু তাহা খর্ব না করিয়াও বিষয়টিকে দেখিবার যে আরো একটি মস্তবড় দিক্ রহিয়াছে তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ইহা হইল মানসিক কাঠামোর মিল, যাহাকে আমি ধাতুগত মিল বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ যদি ছেলেবেলা হইতে অমন করিয়া উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত না হইতেন, সারা জীবন উপনিষদের রসে দেহ-মনকে যেভাবে 'ভাবনা' দিয়াছেন তাহা নাও দিতেন তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে ও অন্যান্য লেখায় এমন অনেক উপাদান পাইতে পারিতাম যাহার সঙ্গে উপনিষদের নিগূঢ় মিল আমাদিগকে আশ্চর্য করিয়া দিত। মিলের এই দিকটিকেই আমি গভীরতর মিল বলিয়াছি। *The Religion of Man* গ্রন্থের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ধর্মবিশ্বাস তাঁহার নিজের বিশেষ প্রকৃতি হইতেই প্রসূত হইয়াছে।

ইহা বাল্যকাল হইতেই আমার প্রকৃতির ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; তাহার পরে সহসা একদিন ইহা একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিতর দিয়া আমার মানসে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। It has followed the

current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my consciousness with a direct vision. —প্রথম অধ্যায়

উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখিতে পাই মানুষের মধ্যে তাহার দ্বৈত সত্তা, একটি আত্মা, অপরটি হইল এই আত্মার সহচর 'অহং'; একদিকে তাহাকে বলা চলে আত্মার বহিশ্চর রূপ, কারণ তাহা আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই দেশে কালে বার বার উদ্‌ভূত হইতেছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনে'র 'নদী ও কূল' শীর্ষক লেখায় বলিয়াছেন—

অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে।

এই আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন নদীর চিরন্তন ধারা, অহং হইল দেশে দেশে কালে কালে যত রকমের আবর্জনার স্তূপকে লইয়া গড়িয়া-ওঠা নিয়তপরিবর্তনশীল চরের মত, এ চর নদীর চিরন্তন আনন্দস্রোতে কেবলই বাধার সৃষ্টি করিতে চাহে। অন্যত্র ('আত্মার প্রকাশ', শান্তিনিকেতন) তিনি বলিয়াছেন—

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।

'শান্তিনিকেতনে'র 'জাগরণ' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্‌গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।

উপনিষদের মতন রবীন্দ্রনাথও এই কথা বার বার করিয়া বলিয়াছেন এই যে ক্ষুদ্র অহং ইহা আত্মধর্মেই নিত্য পরস্পরব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ জগতের যেখানে যাহা কিছু তাহার প্রত্যেকটিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়, আর নিজেকেও রাখিতে চায় বিশ্বসংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া। এই অহং-এর কাজ কেবল আবরণ-পাত্র সৃষ্টি করিয়া সত্যের মুখ আবৃত করিয়া রাখা, সে পাত্র একান্ত স্থূল ব্যাবহারিক জীবনের পঙ্কপ্রলেপযুক্ত পাত্রও হইতে পারে, ঝক্‌ঝকে বুদ্ধিদ্বারা রচিত সোনার পাত্রও হইতে পারে। সত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইলে সত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিতে হইলে এই সংকোচনধর্মী 'অহং'-এর হাত হইতে প্রথমে নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে। এই মুক্তি লাভ

করিতে পারিলেই দেখা যায়, সত্য স্বপ্রকাশ, তাহাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; যাহা কিছু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তাহার ভিতর দিয়াই সত্য আবির্ভূত হইতেছে, চিত্তকে আলোকে আনন্দে উদ্‌ভাসিত করিয়া দিতেছে। এই কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কালে নানারকম করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার ভাষণে, দেশে এবং বিদেশে ; এই কথাটা নানারকম করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার বিভিন্ন বয়সের কবিতায়— বিশেষ করিয়া তাঁহার শেষের দিকের কবিতায়। উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' কথাটির ভিতরকার ত্যাগ শব্দকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সংকোচনধর্মী ভেদধর্মী অহংকে ত্যাগ করিবার সত্য রূপে। 'মানুষের ধর্মে'র এক স্থানে কবি তাঁহার একটি শৈশবস্মৃতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরালের থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।

গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাকে স্থানে স্থানে উপস্থিত করিয়াছেন খানিকটা তত্ত্বরূপে কবিতার মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন কবি-অনুভূতিরূপে। সেই কবি-অনুভূতি তাঁহার সত্যানুভূতি। অহং সম্বন্ধে কবির এই মনোভাব কোনো এক সময়ে স্পষ্ট তত্ত্বরূপে কবির কাছে প্রতিভাত হয় নাই। 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতায় যখন কবির 'অস্ফুটবাক্‌ মন বিনা চেষ্টায় যেমন ক'রে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে' সেখানেও দেখিতে পাই কবিচিত্তের বিজড়িত অস্পষ্ট ভাবোচ্চারণের মধ্যেও এই দুই 'অহং'-এর অনুভূতি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'মানুষের ধর্মে'র মধ্যে প্রভাতসংগীত হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়া সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান ;
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।

এই অবস্থাকেই কবি প্রভাতসংগীতের 'আহ্বান-সংগীতে' বর্ণনা করিয়াছেন 'লুকায়, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস!' এই ক্ষুদ্র আমির কোটর হইতে কবির প্রথম মুক্তির বার্তা সহসা বাঁধভাঙা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারা 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। এই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র অনুভূতিকেই কবি বলিয়াছেন তাঁহার জীবনের প্রথম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি-অনুভূতি এবং অধ্যাত্ম-অনুভূতি। কিন্তু স্পষ্টতঃই এ অনুভূতি তাঁহার নিজস্ব অনুভূতি— ইহাতে কোনো উপনিষদের প্রভাব খুঁজিতে যাওয়া বৃথা; অথচ ইহার ভিতরেই তাঁহার কবিমানসের অনেকখানি পরিচয় রহিয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করা যায় না।

কড়ি ও কোমলের 'স্বপ্নরুদ্ধ' কবিতায় কবির যে ক্রন্দন—

আমি গাঁথি আপনার চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

এ ক্রন্দনও সেই আমির মধ্যে বন্ধনের ক্রন্দন; ইহার মধ্যে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট অধ্যাত্মচেতনার যোগ ঘটে নাই, কিন্তু কবির অধ্যাত্মজীবনবোধের সঙ্গে এ ক্রন্দন নিবিড়ভাবে যুক্ত, ইহাকে তাই বলিতে পারি তাঁহার অধ্যাত্মজীবনেরই 'অবোধপূর্ব' ক্রন্দন।

শেষবয়সের কবিতাগুলির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা এবং তৎসঙ্গে উপনিষদের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কবি-অনুভূতির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইলেও এখানে একটা সচেতনতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই যুগে কবি অনেক সময়ই অনুভব করিয়াছেন, চেতনা যখন সর্ব-আবরণবিযুক্ত হইয়া একেবারে বিশুদ্ধ হইয়া ওঠে তখন ভুবনজোড়া বিশুদ্ধ আলো-প্রবাহের সহিত এই চেতনা-প্রবাহের কোনো পার্থক্য থাকে না। শ্যামলীর 'কালরাত্রে' কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে কবির সেই অনুভূতির—

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত-সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ;
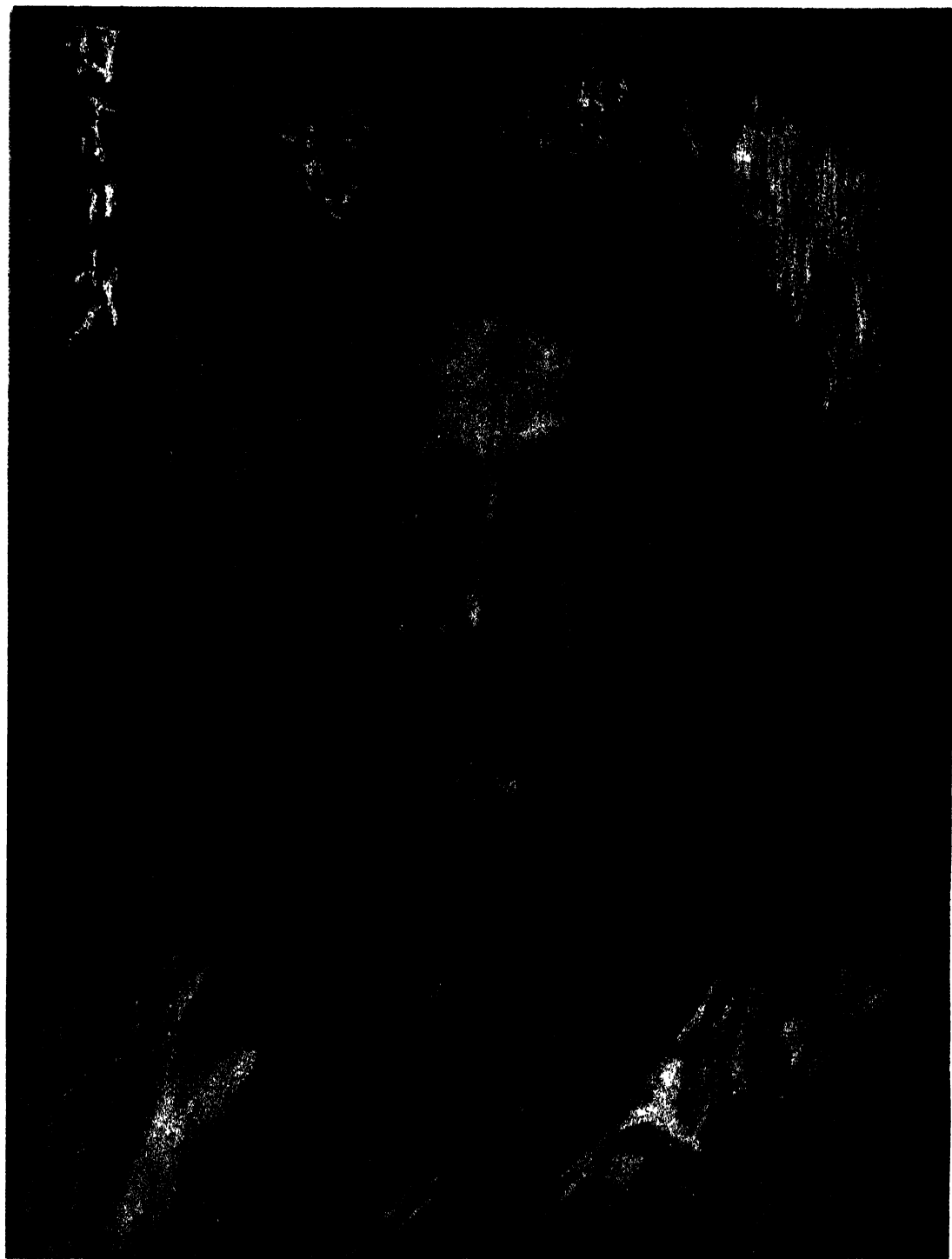
'আমাদের পাকবে না চুল'

শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাইনে কিছু চাইনে",
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

আলোর স্পর্শে চেতনাকে এইরূপে নির্মল করিয়া লওয়া কবির ছিল একটি প্রাত্যহিক সাধনা। শৈশবে শীতের শেষরাত্রে কম্বল জড়াইয়াও তিনি কি করিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন অন্ধকারের যবনিকার আড়াল হইতে উদীয়মান নবীন সূর্যের আলোতে চেতনাকে জাগ্রত করিয়া লইবার জন্য তাহার বর্ণনা নিজেই করিয়া গিয়াছেন বহু প্রসঙ্গে। রাত্রির ঐ অন্ধকার যেন এই দেহকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত একটা স্বার্থসংকুচিত আমিকে অবলম্বন করিয়া ঘনীভূত হইয়া ওঠা আবরণ; তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছে আমাকেও— বিশ্বের দূর দূর স্থিত দিগ্‌বলয়কেও। আলোকস্নাত প্রভাতের আবির্ভাব সেই আবরণকে অপসারিত করিয়া, সকলের সঙ্গে এক হইয়া সত্য হইয়া উঠিবার আহ্বান লইয়া। এই 'আলোর মন্ত্রে'র দীক্ষা এবং চিরজীবন সেই আলোর মন্ত্রের সাধনার স্পষ্ট ইতিহাস কবি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার পত্রপুটের কয়েকটি কবিতায়।—

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,—
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।—১৫

কবির এই 'আলোর মন্ত্র' এবং সেই সাধনার রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে পূরবীর সুপ্রসিদ্ধ 'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও। পত্রপুটের ১০-সংখ্যক কবিতায় কবি শেষরাত্রির ধীরে ধীরে গলিয়া-পড়া অন্ধকারকে স্পষ্ট করিয়াই সমান করিয়া দেখিয়াছেন আত্মার আবরণ দেহবদ্ধ আমি রূপে।

এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ, ভয়ভাবনা
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্তরূপ।...

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।...

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।

'রোগশয্যায়' বসিয়াও কবির মনে হইয়াছে—

তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্‌ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।—৩৬

অনেক সময় কবি এই অনুভূতি লাভ করিয়াছেন চেতনার ঘনীভবনের দ্বারা। চেতনার সেই ঘনীভবন চিত্তে যে একতানতা আনয়ন করিয়াছে সেই একতানতাতেই চিত্ত বহিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে। কবি ইংরেজি লেখায় এবং ভাষণেও বহু স্থানে deepening of the consciousness কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং deepening of the consciousness-এর ভিতর দিয়াই তিনি

সকল অধ্যাত্মসত্যের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। এই-জাতীয় একটি চিত্তাবস্থানই প্রকাশ করিয়াছেন কবি পত্রপুটের ৭-সংখ্যক কবিতায়—

যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।

এই ঘাটটিতে কবির মনের তার এমনভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঐ একই ঘাটে নানা ছলে আসিয়া তাঁহার সুর পৌঁছিত। পরবর্তী জীবনের কবিতার ফাঁকে ফাঁকে এ সুরের প্রকাশ অতিসহজলক্ষ্য। এ যেন মুক্তিলোভী দুরন্ত বালকের মন, সুযোগ পাইলেই গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যতদূর খুশি বাহিরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা। বাহিরের প্রকৃতির ভিতর হইতে কোনো এক সাথী যেন একবার আসিয়া একটু ডাক দিলেই হইল—

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে। —আরোগ্য, ৫

প্রান্তিকের মধ্যে এই অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে ১২-সংখ্যক কবিতায়।—

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে।

এই 'নগ্নচিত্ততা'ই হইল অহং হইতে মুক্তি ; 'সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন' যখন অপসারিত হইল এবং যখন 'সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল' তখনই দেখা গেল, সত্য প্রতিভাত যাহা-কিছু

সম্মুখে আসে তাহার সব-কিছুর ভিতর দিয়া— 'অক্লান্ত বিস্ময় যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়' ; আর সত্যের অনুভূতি সেখানেই যেখানে এই প্রমাতৃ-স্বভাবের বিগলনের মধ্য দিয়া চিত্ত 'মগ্ন হল সমস্তের মাঝে'।

কবির এই-জাতীয় আর একটি অনুভূতি দেখিতে পাই 'রোগশয্যায়'-এর ২২-সংখ্যক কবিতায়—

আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত

'জন্মদিনে'র ২৩-সংখ্যক কবিতায় বলিয়াছেন—

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায় জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

আবার—

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।—ঐ, ২৫

এই-জাতীয় অনুভূতির বর্ণনায় স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, বাহিরের প্রকৃতি যেখানে তাহার রূপের বহুবৈচিত্র্য এবং শব্দের বিভিন্ন ধারা একের মধ্যে সমাহিত করিয়া দিয়াছে সেখানে কবি নিজের বহিঃসত্তাকেও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন, সেই বহিঃসত্তার বিলীনতার ভিতর দিয়া কবি এক সত্যের সঙ্গে আনন্দে আলোকে নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াছেন। এ-জাতীয় একটি অনুভূতির চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই প্রান্তিকের ৯-সংখ্যক কবিতায়—

দেখিলাম— অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া, ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

এখানে দেহ বিলীন হইয়া যাওয়া শব্দের অর্থই হইল দেশ-কালে ধৃত প্রাত্যহিকের আবরণযুক্ত সত্তার বিলীন হইয়া যাওয়া। কবিতাটির মধ্যে বেশ লক্ষ্য করিতে পারি, একটি কবি-অনুভূতি স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া কিভাবে একটি ধর্মানুভূতির রূপ লাভ করিতেছে। গীতাঞ্জলির যুগে যেখানে 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'র কথা দেখিতে পাই, অথবা দেখি—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

অথবা গীতালিতে দেখি-

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।

অথবা—

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।

সেখানে ইহা বিশেষ কোনো একটি কবি-অনুভূতির অপেক্ষা করে নাই; প্রচলিত বিশ্বাসপ্রবণতার পথেই এ-সব কথা দেখা দিয়াছে; কিন্তু পরবর্তীকালের কবিতায়— এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসপ্রবণতার ভিতরেও কবি-অনুভূতির যোগ লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

৫

উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেও দেখিলাম, একটা বহিরাবরণের মত চারিদিক হইতে আমার স্বরূপকে আবৃত করিয়া থাকে যে স্থানকালের সঙ্গে ভাসিয়া-বেড়ানো একটা অহং তাহা অপসারিত হইলে বা বিগলিত হইলেই আমার মধ্যে দেশকালাতীত যে অমৃতস্বরূপ আমিকে বা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় তাহাতেই ঘটে মানুষের সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই সত্যপ্রতিষ্ঠায় আরো জানা গেল, আমার ভিতরকার জন্মজন্মান্তরের বহু নানাখানার ভিতর দিয়া সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইল যে 'এক', এই একই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত 'এক'। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কতভাবে প্রকাশ এবং প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধের সঙ্গে যুক্ত আর-একটি বোধ বা বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইল উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বিশ্বৈক্যবোধ, এ বোধ কবির বিশ্বাত্মবোধের সঙ্গেই জড়িত। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কবিতার ভিতর দিয়াই এই বোধ প্রকাশিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড; ইহার মধ্যে জড়ের যত বিকাশ বিকার আবর্তন-বিবর্তন, প্রাণের যত চঞ্চল আবেগ ও বঙ্কিম প্রচরণ, চৈতন্যের যত বিকাশ ও বিস্তার— ইহার সকল ধারা, সকল আবর্তন, সকল কলরব— সবই এক পরিকল্পনায় এবং প্রবাহে বিধৃত। একটি সংগীতের মধ্যে যেমন সকল কথা অর্থ ভাব সুর তাল মান লয় সর্বাংশে অটুটভাবে বিধৃত থাকে এই বিশ্বপ্রবাহও সেইরূপ একটি অনাদি অনন্ত বিশ্বসংগীত। দ্যুলোকের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা যেমন করিয়া এই সংগীতের তানবিস্তারমাত্র, অন্তরিক্ষের মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা যেমন করিয়া এই সংগীতের স্বরতরঙ্গমাত্র— ঠিক তেমন করিয়াই পৃথিবীর সকল বন-অরণ্যানী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-সিন্ধু, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী— এবং অনন্ত মানুষ— দেশে দেশে কালে কালে তাহার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস— ইহার সকলই সেই একই বিশ্বমহাসংগীতের স্বরপ্রবাহমাত্র। ইহার কোনোটা হইতেই কোনোটা পৃথক্ নয়, স্বতন্ত্রভাবে ইহার কেহই সত্য নয়; সত্য নিহিত ইহার সমগ্রতায়। সেই সমগ্রতার ভিতরে নিহিত যে এক সত্য সেই এক সত্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগেই প্রতিটি বস্তুর সত্য, সেই যোগে ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণাও সত্য; আর সেই অখণ্ডতার যোগ যেখানে হারাইয়া গেল সেইখানেই শুধু ধরণীর ধূলিকণা নয়, নিখিলশূন্যে ঘূর্ণমান জ্যোতিষ্কপুঞ্জও তাহাদের সকল জ্যোতি লইয়াই উদ্দেশ্য-

হীনতার চরমমিথ্যাত্বের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। শুধু আমার সত্যই যে আমিকে অতিক্রম করিয়া সকল কিছুর সঙ্গে যোগে তাহা নয়, সকলের সত্যই আবার আমার সঙ্গে যোগে, অখণ্ডতার সঙ্গে নিরন্তর যোগে। প্রতিটি বস্তুর যাহা কিছু অর্থ তাহাকেও লাভ করিতে হইবে সব-কিছুর ভিতরে প্রসারিত এক সত্যের স্পর্শ লাগাইয়া। নিখিলপ্রবাহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে এক উদ্দেশ্য এক অর্থ, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া বলিয়াছেন একটি 'অনাদি স্বপ্ন'।

বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মূলতঃ উপনিষদের প্রভাব-জনিত নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রকৃতিগত বা সহজাত বিশ্বাস, এবং এ বিশ্বাস উপনিষদের দ্বারা উত্তরোত্তর কেবলই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে কবির প্রভাতসংগীতের কবিতাগুলিতে। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই অখণ্ডতার বোধ প্রভাত-সংগীতের মধ্যে কবির অপরিণত মনকে যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। প্রভাতসংগীতের 'অনন্ত-জীবন' কবিতাটির মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু'পরে।

ইহার সহিত 'মুণ্ডক-উপনিষদে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিকে বেশ মিলাইয়া লওয়া যায়—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৩।২।৮

"প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" কিন্তু প্রভাতসংগীতের 'অনন্ত জীবন' কবিতাটি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, এই ভাব ও কথা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কবিচিত্তে কতকগুলি নিজস্ব জীবনজিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করিয়া নিজস্ব ধারায় এবং নিজস্ব ভঙ্গিতেই ভাসিয়া উঠিয়াছে। এখানে কবি বিশ্বজীবনের একটি অখণ্ডতার কথাই বলিলেন; কিন্তু এই অখণ্ড বিধান স্বভাবতঃই একটি অখণ্ড বিধাতার মূর্তি জাগাইয়া তুলিবে, এবং এই অখণ্ড বিধাতা ও অখণ্ড বিধানের সঙ্গে অনাদি

সম্পর্কের প্রশ্ন তুলিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিধান ও বিধাতার ভিতরকার এই সম্পর্কটির ইঙ্গিত করিয়াছেন কবি একটি 'মহাস্বপ্নে'র ধারণার দ্বারা। কবির এই ধারণাই ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রভাত-সংগীতের 'মহাস্বপ্ন' কবিতাটির ভিতর দিয়া।

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ-উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে।
একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।

'মহাস্বপ্ন' কবিতায় কবির যে ভাব ও ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই নানাভাবে বিস্তার দেখিতে পাই আবার প্রভাতসংগীতের 'স্রোত' কবিতাটির মধ্যে। এই কবিতাটিতে শুধু বিশ্বপ্রবাহের কোনো এক মহাদেবের মহাস্বপ্নে বিধৃত অখণ্ডতার কথাই পাই না, সেই অখণ্ড ধারার সঙ্গে ব্যক্তি-ধারাটিকে মিলাইয়া দিবার ব্যাকুল আগ্রহও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবির স্বীকৃতিতেই এখানকার কথা ও ছন্দ অত্যন্ত 'নড়বড়ে', কিন্তু ইঙ্গিতটি স্পষ্ট।

শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়,
সে স্রোতমাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়,
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
জীবন মাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায়।...
অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী।...
জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।
আমার নাহি সুখ-দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।...

সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বসৃষ্টিকে কোথাও 'মহাস্বপ্ন' বলিয়াছেন, কোথাও 'মহাসংগীত' বলিয়াছেন, কোথাও ইহাকে 'বিশ্বনৃত্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে যে 'মহাস্বপ্ন', বা 'মহাসংগীতে'র ধারণা ইহা গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক ; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনের সহিত ইহার যোগ আছে, অথবা এ কথাও বলা যায় যে এই ধারণার উপরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন গ্রথিত। এই ধারণাগুলির তাই পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত আলোচনা হইবার প্রয়োজন, এই প্রসঙ্গে সে আলোচনায় প্রবেশ করা সংগত হইবে না। সংক্ষেপে এখানে এই তথ্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে উপনিষদের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের মিলের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে। উপনিষদে এই বিশ্বসৃষ্টির অখণ্ডপ্রবাহের পিছনে 'একে'র প্রশাসনের কথা রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ ॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, সূর্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া আছে।'

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ ॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে।'

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি ॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষসমূহ, মুহূর্তসমূহ, অহোরাত্রসকল, অর্ধমাসগুলি, মাসসমূহ, ঋতুসমূহ সংবৎসরসমূহ— সব বিধৃত হইয়া আছে।'

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যো২ন্যাঃ ॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, প্রাচ্য দিকস্থ অনেক নদী শ্বেতপর্বতসমূহ হইতে স্যন্দমান হয়, পশ্চিম দিকের শ্বেতপর্বতসমূহ হইতেও স্যন্দমান হয়।'

তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃ শ্রুতং শ্রোতৃ মতং মন্তৃ বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ ;...এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ৩।৮।১১

'হে গার্গি, সেই যে এই অক্ষর ইনি সকলের অদৃষ্ট, কিন্তু ইনি সকলের দ্রষ্টা ; ইনি সকলের অশ্রুত, কিন্তু ইনি সকলের শ্রোতা ; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের মনন করেন ; কেহ তাঁহাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হয় নাই, তিনি সকলকে বিশেষরূপে জ্ঞাত। এই অক্ষরেই, হে গার্গি, আকাশ ওতপ্রোত হইয়া আছে।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই যে এক অক্ষরের ভিতরে বিধৃত হইয়া একতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এখানে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু লক্ষণীয় ঐ 'প্রশাসনে'র কথা। উপনিষদের অন্যত্র বলা হইয়াছে ভয়ের কথা ; অগ্নি ইহার ভয়ে তাপ দিতেছে, সূর্য ইহার ভয়ে তাপ দিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু— ইহারা সকলেই ইহার ভয়ে ধাবিত হইতেছে। কোথাও সর্বব্যাপী প্রাণরূপ সর্বনিয়ন্তা এই

অক্ষরকে বলা হইয়াছে 'মহদ্‌ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্‌', উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহৎ ভয়! রবীন্দ্রনাথ এই প্রশাসন বা ভয়ের দিকটি গ্রহণ করিলেন না। উপনিষদে সৃষ্টিপ্রবাহের পশ্চাতে যে একটা আনন্দের দিক রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটিই গ্রহণ করিলেন। উপনিষদে বলা হইয়াছে, আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল জাত হয়, জাতসমূহ আনন্দের দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, আনন্দেই ফিরিয়া যায়, তাহাতেই অভিসংবিষ্ট হয়। ভয়ের তো কোনো প্রশ্নই নাই, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌ ন বিভেতি কুতশ্চন— ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি তো আর কোন কিছু হইতেই ভয় পান না। যে অক্ষরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই অক্ষর যে রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি—তিনি রসস্বরূপ, সেই রসকে জানিয়া সকলে আনন্দস্বরূপই হইয়া যায়। ঐ যে বলা হইল, আকাশে এক অক্ষর ওতপ্রোত হইয়া আছেন, সেই অক্ষর সম্বন্ধেই তো অন্যত্র বলা হইয়াছে— কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি ; কে চেষ্টা করিত, কে বাঁচিয়া থাকিত যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিত!

রবীন্দ্রনাথ এইখানেই তাঁহার অন্তরে গভীর মিল অনুভব করিয়াছেন। সৃষ্টির একটা অখণ্ডরূপ যখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই ইহার মূলসত্তায় তিনি একটা আনন্দরূপ অনুভব করিয়াছেন ; এই অনুভূতিই কবিকে নিয়ত প্রেরণা দান করিয়াছে এই সৃষ্টিকে আনন্দপ্রাচুর্যে উদ্ভূত 'অনাদি মহাস্বপ্নে'র রূপ দিতে, অথবা মহাসংগীত বা মহানৃত্যের রূপ দিতে। সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় তাই দেখি, এই আনন্দময় অক্ষর মহারহস্যের অন্তস্তলে বসিয়া যেন এক মহাসংগীতের সুর আপনমনে বসিয়া বাজাইতেছেন— সেই সুরে সুরে তালে তালে সৃষ্টিপ্রবাহ বিচিত্ররূপে আবর্তিত হইতেছে।—

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শোনা যায়,
মহারহস্যে বসিয়া,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বসিয়া।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়,
না জানি কী মহা রাগিণী!
ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।

ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে—
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মরে দিনযামিনী।···

পশু-বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহা খেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্বুদসম ফুটিছে।

সোনার তরীর এই কবিতারই পরিণতি গীতিমাল্যের গানে

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে,
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।

এখানেও দেখি, আলোক-ধেনু শুধু দ্যুলোকের 'সূর্যতারা দলে দলে' নয়, আলোক-ধেনু পৃথিবীর প্রাঙ্গণেও—

তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

আবার সেই একই রাখালের সুর সমানভাবে সক্রিয় মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষায়—

আশা-তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে॥

সুতরাং সেই 'একে'র সুরেই বিশ্বজীবন বিধৃত।

নৈবেদ্যের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে যে অদ্বয়বোধ তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র কাব্যধারার ভিতর

দিয়াই জাগিয়া উঠিতেছিল; নৈবেদ্যে আসিয়া মনে হয়, কবি-অনুভূতি এখানে উপনিষদের সঙ্গে মিল খুঁজিয়া পাইয়াছে; অনুভূতির প্রকাশে তাই উপনিষৎ-সচেতনতার চিহ্ন আছে। নৈবেদ্যে যখন দেখি—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

অথবা—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে— বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

তখন কবির অনুভূতির সঙ্গে উপনিষৎ-সচেতনতা স্পষ্ট। কিন্তু জীবনের কোনো মুহূর্তেই এই উপনিষৎ-সচেতনতা কবির কবি-অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। এখানেও নৈবেদ্যের প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে যে 'স্তব্ধতা'র কথা বলা হইয়াছে— যে স্তব্ধতার ভিতর দিয়া হৃদয়ে সত্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে— সে স্তব্ধতা কবির চিত্তে নামিয়া আসিয়াছে কি উপায়ে?

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিতনয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত।

যে স্তব্ধতার ভিতর দিয়া কবিচিত্তে উপনিষদের সত্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সেই স্তব্ধতার এই পটভূমিটিকে ভালো করিয়া স্মরণে না রাখিলে রবীন্দ্রনাথের চিত্তানুভূতির সঙ্গে এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে উপনিষদের ঋষিগণের চিত্তানুভূতি ও কণ্ঠস্বরের মিলের স্বরূপ এবং তাৎপর্য ভালো করিয়া বোঝা যাইবে না। কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া চিত্তে যে সত্য উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, উপনিষদের আবৃত্তি এবং গায়ত্রীমন্ত্রের বিধিপূর্বক জপের মধ্য দিয়াও চিত্তে সেই সত্যই উদ্‌ভাসিত হইয়াছে। সত্যের এই দুই উদ্‌ভাসের মধ্যে কবি কোনোদিনই কোনো পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তিনি বার বার বলিয়াছেন, তাঁহার কবিজীবন এবং ধর্মজীবন জীবনের প্রথম লগ্ন হইতেই অবিচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বারো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে গায়ত্রীমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার তখনকার অনুভূতির কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ— এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে। —মানুষের ধর্ম

বহুদিনের অনুভূতি ও মনন শেষে গিয়া কবিচিত্তে দেখা দিয়াছে একটা সহজ প্রত্যয়রূপে। এ প্রত্যয় যে একজন কবির মনে কতখানি সহজ হইয়া উঠিতে পারে, একই 'প্রাণপ্রেতি'কে যে প্রাণবন্ত সকল কিছুর ভিতর দিয়া কিভাবে অনায়াসে অথচ অসংদিগ্ধভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার উজ্জ্বল পরিচয় রহিয়াছে কবির বনবাণীর প্রতিটি কবিতার ভিতর দিয়া। উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রায় সবগুলি কবিতাই উদ্ধৃত করিয়া দিতে হয়। শুধু প্রাণের স্পন্দন নয়, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে সৃষ্টির আদিমযুগের ভাষায় ভাব-বিনিময়। সেই একই সর্বব্যাপী প্রাণের উপলব্ধি দেখিতে পাই আকাশপ্রদীপের 'স্কুল-পালানে' কবিতায়—

যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।

'রোগশয্যায়' শুইয়া বসিয়াও কবির মনে হইয়াছে সেই অখণ্ডের কথা—

অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।—২৫

আবার 'আরোগ্যে'র দিনেও বলিতে পারিয়াছেন—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই যে অদ্বয়বোধ উপনিষদের সহিত ইহার গভীর যোগ এবং মিল থাকিলেও এই উভয় সর্বত্র এবং সর্বাংশে অনুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কবি-অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া হইয়া এই অদ্বয়বোধ কবিমানসে বিভিন্ন রূপান্তর এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই সকল রূপান্তর এবং পরিণতির মূলে একটা গভীর ঐক্য আছে বটে, কিন্তু ঐক্যের মধ্যেও যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। এই অদ্বয়বোধ কোনো কোনো স্থানে স্পষ্টতঃ উপনিষদের অধ্যাত্মবোধের অনুরূপ অথবা তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়বোধের মধ্যে একটি ধারা দেখিতে পাই যে ধারাটিকে নাম দিতে পারি Nature Mysticism বা প্রকৃতি-রহস্যবাদ। মিস্টিসিজ্‌ম্ বা রহস্যবাদের এখানে মুখ্য লক্ষণ হইল দুইটি, প্রথমতঃ, একটা পরম-ঐক্যের দিকে অনিবার্য প্রবণতা, দ্বিতীয়তঃ, সে প্রবণতা বুদ্ধিজাত প্রবণতা নয়, অনুভূতির স্নিগ্ধালোকে প্রাপ্ত বা উদ্বুদ্ধ প্রবণতা। এখানকার যে ঐক্যবোধ তাহাকে কবির মূল অধ্যাত্মবোধের সঙ্গেও যুক্ত করা যায়, আবার ইহাকে কোনো অধ্যাত্মবোধরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া নিছক একটি কবি-অনুভূতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের বহু কবিতা ও লেখার ভিতরে আমরা বসুন্ধরার সঙ্গে এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ জাতীয় ঐকাত্মবোধের পরিচয় পাই। এই ঐকাত্মবোধের স্পষ্ট পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের মধ্যে।—

এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনী-শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে কাঁপছে।

রবীন্দ্রনাথের মানসীর 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই ভাবের আভাস আছে; সোনার তরীর 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় শুধু পৃথিবী নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই যোগ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় একই ভাবের রূপায়ণ দেখিতে পাই। পূরবীর 'মাটির ডাকে'র মধ্যে ইহার আরও নিবিড় রূপ দেখিতে পাই। এই ভাবটি টুকরা টুকরা হইয়া কবির বিভিন্ন যুগের আরও অনেক কবিতার ভিতরে ছড়াইয়া আছে। এ-জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি পূর্বস্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া। সেই পূর্বস্মৃতির সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়া আছে একটি বিবর্তনবাদ। এই বিবর্তনবাদে

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সকল সত্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই বিবর্তনের ভিতরে বহিঃপ্রকৃতিরই বিবর্তন ঘটে নাই, কবির ব্যক্তিসত্তারও বিকাশ এবং বিবর্তন চলিতেছে সৃষ্টির সেই আদিকাল হইতে বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্তনের সকল স্তরভেদের ভিতর দিয়া। কবির ব্যক্তিসত্তা একদিন ধূলির সঙ্গে ধূলি হইয়া ছিল, তৃণগুল্ম-বনস্পতির সঙ্গে তৃণগুল্ম-বনস্পতি হইয়া ছিল, সকল প্রাণিপর্যায়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে প্রাণের খেলা— তাহার পরে প্রবেশ মনোরাজ্যে— শেষ অভিব্যক্তি চেতনার বিকাশের অসীম সম্ভাবনা লইয়া মানুষরূপে। মনের ভেদাত্মক বুদ্ধিতে আজ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, সেই ঐকাত্ম্যের চেতনার উপরে আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। চিত্তের মধ্যে গভীর অবগাহনের ভিতর দিয়া যুগযুগান্তর-জন্মজন্মান্তরের সেই পূর্বস্মৃতি আজ আবার যেন চেতনার মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

এই জাতীয় একটি একাত্মক কবি-অনুভূতিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহাকে কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া বুদ্ধি হইতে মনে, মন হইতে সহজাত-বৃত্তিতে পুনরাবর্তনের চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মনঃসমীক্ষণবাদিগণের ভাষায় ইহাকে ব্যক্তিচেতনার অচেতনের মধ্যে নিমজ্জন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অথবা ব্যক্তিচেতনার সাময়িক বিলীনতার সুযোগে সমগ্র অবচেতন এবং অচেতনের একটা সবেগ বাঁধভাঙা উৎসারণ করিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কবি এই সব কবিতার ভিতরে বা উক্তির ভিতরে মাঝে মাঝে যে একটি 'যেন' ব্যবহার করিয়াছেন সেই 'যেন'টি এই-জাতীয় সব ব্যাখ্যা গ্রহণে আমাদিগকে আরো উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জন্মদিনে'র নবম সংখ্যক কবিতায় যেখানে বলিয়াছেন—

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী।
শুধু ছলছল কলকল ;
শুধু সুর শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল ;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা

অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।

তখন মনঃসমীক্ষণবাদিগণ বলিবেন, আসল কথা চেতনার ঐ দুইটি দিক, একটি হইল 'নিরন্তর স্রোতোধারা', যেটা বহির্বস্তুর অবলম্বনে বা বহির্বস্তুর রূপকল্প অবলম্বনে ভাসমান চৈতন্যে বা মগ্নচৈতন্যে চিন্তা-চেষ্টার আলোড়ন জাগাইয়া চলিতেছে ; অপরটি হইল ঐ 'স্তব্ধ মৌনী অচল', যেখানে সব-কিছু এক হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। চেতনার এই 'নিরন্তর স্রোতোধারা'র অংশটা লইয়াই হইল রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র বিশ্বলীলা, আর ঐ 'স্তব্ধ মৌনী অচল' অংশটা লইয়াই হইল বহুবিচিত্র লীলার অতলে শায়িত 'এক'। সেই 'একে'র পরিচয় কবির নিজের নিকটেই অত্যন্ত দুরবগাহ, চিত্তের অনেক স্তর পার হইয়া গিয়া শেষ স্তরে সেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'। কিন্তু জীবনে দুর্লভ শুভক্ষণ আসে— সকল আবরণ ভগ্ন করিয়া মুক্তি পায় সেই চিত্তগুহাহিত 'এক'— অতলের সেই স্তব্ধ মৌনী অচল, তখনই কবি-অনুভূতিতে জাগিয়া ওঠে এক ও বহুর লীলা।

এই পথে আরো অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লাভ নাই ; তাহাতে শুধু পাশাপাশি দুইটি সমান্তরাল রেখা ধরিয়াই চলা হইবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মনকে যেভাবে বিশেষ করিয়া বলিতে চান সেই কথাটিকে বিশেষ করিয়া শোনা হইবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বার বার বলিয়াছেন যে তাঁহার এ-জাতীয় সকল কবিচেতনাও তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গেই যুক্ত সে কথার তাৎপর্য কবির কবিতার ভিতর দিয়াই বুঝিয়া লওয়া যায়। সমস্ত প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার ব্যক্তিসত্তাও যুগযুগান্তর ধরিয়া সেই পরম একের সুপরিকল্পনাতেই আবর্তিত এবং অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং এই ক্রমাভিব্যক্তির যে একটি বিশেষ প্রয়োজন এবং অর্থ আছে ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের একটি প্রধান বাণী। এই-জাতীয় কবিতার ভিতরেও সেই বাণী নিহিত আছে, ইঙ্গিতটি হয়তো অত্যন্ত গূঢ়। কিন্তু এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কবির উৎসর্গের ভিতরকার একটি কবিতায়। কবিতাটিতে যেখানে দেখি—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।

নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি;
চির দিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

সে পর্যন্ত কবিতাটি পূর্বোল্লিখিত এই-জাতীয় কবিতাগুলির সহিত এক সুরে গাঁথা; সেই সৃষ্টির আদিম যুগে সৃষ্টির সকল বস্তুসত্তার সহিত কবির ব্যক্তিসত্তার একটা সম্ভাবনামাত্র রূপে এক হইয়া মিলিয়া থাকিবার কথা, তাহার পরে দীর্ঘদিনের আবর্তন ও বিবর্তন, আজ স্মৃতির অতল হইতে যেন সেই লক্ষ-যুগের সঞ্চিত কথারই আভাস। কিন্তু একটু পরেই গিয়া দেখিতে পাই—

ধুলা সাথে আমি ধুলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুল মাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পূজারতি-বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাঁহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাহা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।

এখানকার অধ্যাত্মসুর অনস্বীকার্য। এখানকার এই যে অধ্যাত্মসুর তাহাকে পূর্বোল্লিখিত সব কবিতার ভিতরেই প্রসারিত করিয়া দেওয়া চলিতে পারে, এবং এইভাবেই এ জাতীয় কবিতার ভিতরেও অদ্বয়বোধের মধ্যে 'একে'র সত্যকে গূঢ় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সে-জাতীয় গ্রহণ সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়, এ-জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে যে-জাতীয় একটা বিশেষ অনুভূতি এবং বিশেষ বোধ রহিয়াছে তাহা উপনিষদের মধ্যে কোথাও নাই। আমার ব্যক্তিসত্তার সম্ভাবনা নিখিলপ্রকৃতির লক্ষ লক্ষ যুগের বিবর্তনের ভিতর দিয়া যে একদিন মানুষের মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে ইহা কবি রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিশেষ অনুভূতি। এই অনুভূতি আপনার খাতেই বিভিন্ন যুগে নানাপ্রকারের বিস্তার লাভ করিয়াছে। উপনিষদের 'এক'-এর বিশ্বাস বা অনুভূতি হইতে এই

অনুভূতি বা বোধ উৎসারিত হয় নাই, অভিজ্ঞতা-অনুভূতি হইতে গড়িয়া ওঠা বোধের মধ্যে অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার ঘটিয়াছে।

৬

এ পর্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতর দিয়া কবির সীমাবদ্ধ আমিকে অতিক্রম করিয়া একটি অখণ্ড জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হইবার কথাই দেখিলাম না, দেখিলাম এই অখণ্ডধারার সহিত যুক্ত আছেন যে এক অবিকারী সত্য তাহারই সহিত যুক্ত হইবার কথা। এ ক্ষেত্রে উপনিষদের সত্যানুভূতির মধ্যে দেখিতে পাই, হয় প্রথমে বহির্বিশ্বের মধ্যে বিরাজিত এক সত্যকে আবিষ্কার করা এবং তাঁহাকে নিজের ভিতরকার আত্মার সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করা ; অথবা, প্রথমে নিজের মধ্যে সেই এককে অনুভব করা, তাহার পরে বাহিরের যাহা-কিছু সকলের ভিতরে সেই এককে আবিষ্কার করা। উভয় ক্ষেত্রেই এক ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া আত্মা ও অনাত্মা এক হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখি, সেই পরম একের সঙ্গে যোগে হয় নিজের মধ্যে তিনি বিশ্বকে অনুভব করিয়াছেন অথবা বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অনুভব করিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যেমন দেখিতে পাই, অহং যেখানে ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করে তখন সেই অহংই এত মহিমান্বিত হইয়া উঠে যে তখন সেই অহংই বিশ্বসংসারের স্থিতি হইয়া দাঁড়ায় ; উপনিষদের ভিতরে এ-জাতীয় শ্লোক লইয়া আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা স্থানে স্থানে এই-জাতীয় পরম সত্যের সহিত অভিন্ন অহং-এর সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা দেখিতে পাই।

ইহা তো গেল সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস-ধারণার কথা ; সঙ্গে সঙ্গে সাধনার কথাও কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। উপনিষদের সাধনা কি ? প্রথমে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করা। এই আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির বা ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় কি ? সে উপায়ের জন্য উপনিষদে স্থানে স্থানে 'আবৃতচক্ষুঃ' হইবার কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু বর্ণনার ভিতরে দেখিতে পাই, ঋষিগণ সত্যকে লাভ করিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নয়, মনকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত করিয়া নয়— বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সদাজাগ্রত রাখিয়া, বিমল চিত্তকে যথাসম্ভব সকলের মধ্যে প্রসারিত করিয়া ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাঁহাদের জাগ্রতও হইয়াছে প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়াইয়া— জিজ্ঞাসার উত্তরও অনেক সময় মিলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকামের উপাখ্যানের উল্লেখ করিতে পারি। জাবাল সত্যকামের উপাখ্যানের প্রথম অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার ভিতর দিয়া সকলেরই জানা আছে, কিন্তু উপাখ্যানটির পরবর্তী অংশগুলিকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ঋষি গৌতম সত্যকামকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া 'উপনীত' করাইলেন বটে, কিন্তু তাহার পরে নিজের কাছে রাখিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বা মুখে উপদেশের দ্বারা সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন না, তাঁহাকে কতকগুলি কৃশ গো দিয়া আদেশ করিলেন সেগুলিকে পালন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট করিতে এবং

তাহাদের সংখ্যা বাড়াইতে। সত্যকাম বহুবর্ষ যাবৎ এই গো-সমূহ লইয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে মাঠে মাঠে গোচারণ করিল; একদিন এই মাঠের বৃষই সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল— শোনো সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদের কথা বলিতেছি। এই যে পূর্ব দিক্, ইহাই ব্রহ্মের এক কলা, এই যে পশ্চিম দিক্, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, এই যে দক্ষিণ দিক্ ইহা হইল আর-এক কলা; আর এই যে উত্তর দিক্ ইহা আর-এক কলা। এই যে তোমাকে ঘিরিয়া চারিটি দিক্, ইহা লইয়াই ব্রহ্মের 'প্রকাশবান্' এক পাদ। গৃহাভিমুখে সন্ধ্যায় গো-সকল লইয়া ফিরিয়া আসিল সত্যকাম; গো-সমূহকে আবদ্ধ করিল, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করিল। সায়ংকালে প্রজ্বলিত সেই অগ্নি সত্যকামকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল— শোনো সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের অপর এক পাদের কথা বলিতেছি। এই যে পৃথিবী, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, ঐ অন্তরিক্ষ ব্রহ্মের আর-এক কলা, ঐ দ্যুলোক ব্রহ্মের আর-এক কলা, ঐ সমুদ্র ব্রহ্মের আর-এক কলা; এই ভূলোক-দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ-সমুদ্র জুড়িয়া ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' আর-এক পাদ বিরাজিত। পরের দিন সায়ংকালে আকাশ হইতে উড়িয়া-আসা হংস সত্যকামকে বলিল— সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের আর একটি পাদের কথা বলিব। শুশ্রূষু-সত্যকাম বলিল— বলুন ভগবন্। হংস তাহাকে বলিল— সত্যকাম, অগ্নি সেই ব্রহ্মের এক কলা, সূর্য ব্রহ্মের এক কলা, চন্দ্র এক কলা, বিদ্যুৎ এক কলা। এই অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র এবং বিদ্যুৎ লইয়া হইল ব্রহ্মের 'জ্যোতিষ্মান্' অপর পাদ। অপর দিবস জলচর মদ্‌গু (পানকৌড়ি) পাখি উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল— সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের অপর পাদের কথা বলিব। শুশ্রূষু সত্যকাম বলিল— বলুন ভগবন্। মদ্‌গু পাখি বলিল— এই যে প্রাণ, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, এই যে চক্ষু ইহা এক কলা, এই শ্রোত্র এক কলা, আর এই মন এক কলা; এই প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন— ইহা লইয়া হইল ব্রহ্মের 'আয়তনবান্' চতুর্থ পাদ।

অতঃপর সত্যকাম একদিন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য সত্যকামকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন, বিস্মিতকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন— ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি, কোন্নু ত্বানুশশাস— 'তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, হে সৌম্য, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে?'

বিনয়কণ্ঠে সত্যকাম উত্তর করিল— 'অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ'— মনুষ্যের নিকট হইতে আমি উপদেশ পাই নাই, মনুষ্য ছাড়া অন্যের নিকট হইতে পাইয়াছি।

(উপনিষদের সাধনার আনুষ্ঠানিক যে কোনো দিক ছিল না, এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু এও মস্ত বড় একটা দিক ছিল— চিত্তকে সত্যান্বেষী করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত রাখিয়া নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতি-বিশ্বজীবনের মাঝখানে আনিয়া রাখো— স্বপ্রকাশ সত্য ইহার সব-কিছুর ভিতর দিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিতেছে— সেই স্বপ্রকাশ সত্যকে বীর্যের দ্বারা, মেধার দ্বারা, ধী দ্বারা, শুশ্রূষার দ্বারা হৃদয়ে গ্রহণ করো। উপনিষদের সাধনার এই ধারাটির সহিত রবীন্দ্রনাথের ছিল সারাজীবন প্রকৃতিগত মিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন— 'The first stage of my realization was through my feeling of intimacy with Nature'.)

'আমার ধর্মানুভূতির প্রথম স্তর দেখা দিয়াছিল প্রকৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতার উদ্বোধে।' শুধু প্রথম স্তর নয়, সকল স্তরেই দেখিতে পাই, এক দিকে বিশ্বপ্রকৃতি, আর-এক দিকে বিশ্বমানবজীবন— এই উভয়ের সঙ্গে পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতায়ই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনা তাঁহার কিছুই ছিল না তাহা নয়, কিন্তু তাহাও ছিল যেন কবির এই বৃহত্তর সাধনার ভিত্তিকে দৃঢ় রাখিবার জন্যই।

উপনিষদের সাধনার আরো একটি লক্ষণীয় দিক আছে। উপনিষদে যে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে সে আত্মা কোনো অসঙ্গ কেবল আত্মা নয়, এ আত্মা হইল পরমাত্মা বা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত যুক্ত এবং অভিন্ন আত্মা। মোক্ষ বা মুক্তি এখানে আত্মাকে বহির্বিশ্ব হইতে কোনো রকমে নির্লিপ্ত করিয়া ফেলা নয়— মোক্ষ হইল জীবাত্মাকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সহিত সর্বাংশে যুক্ত করিয়া সেই পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং', বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু, তাহার সকলের সঙ্গেই এক হইয়া যাওয়া। উপনিষদের সাধনার এই দিক্‌টিকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইলে প্রাচীন ভারতীয় সাধনপন্থার আর একটি প্রধান ধারাটিকেও একটু বুঝিয়া লইতে হইবে, এই ধারাটি হইল সাংখ্যযোগের ধারা। পণ্ডিতগণ মনে করেন উপনিষদের যুগেই সাংখ্যমতের একটি ধারা চলিয়া আসিয়াছিল, পরবর্তী কালে ইহার সহিত সমজাতীয় যোগমতের মিলন ঘটিয়া সাংখ্যযোগের একটি মোটামুটি মিলিত মতের সৃষ্টি করে। সাংখ্যমতে দেখিতে পাইতেছি, পুরুষ স্বরূপে 'কেবল' এবং অসঙ্গ। প্রাচীন সাংখ্যমত নিরীশ্বর ছিল বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং স্বরূপাবস্থিত যে পুরুষ তাহার যে প্রকৃতির সহিতই কোনো যোগ নাই তাহা নহে— কোনো পরমপুরুষ বা বিশ্বপুরুষের সঙ্গেও তাহার কোনো যোগের কল্পনা নাই। প্রতিটি জীবই একটি একটি স্বতন্ত্র পুরুষ; এই পুরুষের বন্ধন হয় শুধু প্রকৃতিসান্নিধ্যে প্রকৃতির কতকগুলি গুণ পুরুষে উপচারিত হয় বলিয়া; সে ক্ষেত্রে মুক্তির একমাত্র আদর্শ হইল প্রকৃতি হইতে এই পুরুষকে একেবারে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা; প্রকৃতি হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলেই পুরুষ শুধু আপনাতে আপনি রহিল, ইহাই পুরুষের পরম অসঙ্গতা বা কৈবল্য — ইহাই পুরুষের মুক্তি। যোগমতের মধ্যেও দেখিতে পাই, চিত্তকে বৃত্তিহীন করিয়া একেবারে নির্বীজ করিয়া জীবের ভিতরকার বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত করিয়া ফেলা; সেই পরা নির্লিপ্তি বা পরম ঔদাসীন্যই হইল দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। এই স্বরূপাবস্থিতিতেই সর্বপ্রকার ক্লেশের ক্ষয়— ইহাই মোক্ষ। যোগমত একেবারে নিরীশ্বর কিনা ইহা লইয়া তর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু যোগমত সেশ্বর হইলেও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা এখানে ভালো করিয়া বোঝা যায় না; এই ঈশ্বর কোনো সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি সর্বকালে প্রকৃতির স্পর্শ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহার বন্ধন কোনোদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু জীবের যে ব্যক্তি-পুরুষ তাহার প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই পুরুষের সহিত যুক্ত হইবার বা তাঁহার সহিত এক হইয়া উঠিবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতীয় বৌদ্ধমতের মধ্যে এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো স্থান নাই, জৈনমতেও এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো স্থান নাই।

কিন্তু আমাদের উপনিষদ্ হইতে আগত যে ধারা তাহার ভিতরে জীবাত্মার এই রূপ সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গ বা কেবল হইয়া থাকিবার কোনো কথা নাই— এখানে জীবাত্মাকে পরম একের সহিত যোগে এক হইয়া উঠিতে হইবে। এই যে প্রবহমান জগৎ ইহার সব-কিছুকে ক্ষণিক মায়িক মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিয়া শুধু একের সঙ্গে নিঃশেষে এক হইয়া মিলিয়া যাওয়াই কি তাহা হইলে একমাত্র আদর্শ? মায়াবাদী বেদান্ত-উপনিষদ্কে সেইভাবেই গ্রহণ করিবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্কে কোনোদিন সেভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্য মায়াবাদী বেদান্তমতের সহিত রবীন্দ্রনাথের আজন্মবিরোধ। এ সম্বন্ধে তিনি 'মানুষের ধর্মে' বলিয়াছেন—

আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন··মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে-অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে-আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তার মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবল-ক্রিয়া চ— যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।

এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ— 'যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি— সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'

দেখা যাইতেছে, মোক্ষের দ্বারা যে আত্মায় স্থিতি বা ব্রহ্মে স্থিতি আমাদের কাম্য তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও আবার 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'— তিনি হইলেন সেই সত্য 'যস্মিন্ লোকা নিহিতাঃ', তিনি যে 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি', তিনি যে 'সর্বভূতগুহাশয়ঃ', 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। এইখানে উপনিষদের ব্যাখ্যায় এবং গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটা গভীর মিল দেখিতে পাই। শ্রীঅরবিন্দও বলিয়াছেন, উপনিষদ্কে একদল মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ভুলভাবে পড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, উপনিষদ্ শুধু নেতিবাদ প্রচার করিয়াছে— সত্য ইহা নয়, সত্য উহা নয়, সত্য আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি জানি তাহার কিছুই নয়। বস্তুরূপে বহুভাবে প্রতিভাত বিচিত্র জগতের মধ্যে কোথাও কোনো সত্য নাই, আমাদের রক্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দবেদনার মধ্যে সত্য নাই, সত্য হইল সর্বপ্রকারের অস্তিত্ববর্জিত এক 'অসদ্'রূপী সত্য! শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, উপনিষদে সত্য যে এইরূপে বর্ণিত হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু শুধু এইরূপেই বর্ণিত হয় নাই। শুধু এইটুকু জানা হইল সত্যকে অর্ধেক করিয়া জানা, বাকি অর্ধেক না জানিলে সত্যকে পূর্ণ করিয়া জানা হয় না। উপনিষদের বর্ণনা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইল সত্যের অর্ধেক বর্ণনা; এই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাণীকে উপনিষদের অপর একটি বাণীর সঙ্গে একসঙ্গে উচ্চারণ এবং অনুধাবন করিতে হইবে— তাহা

হইল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সুতরাং শুধু নিজেকে জানিলে হইবে না— প্রথমে নিজেকে সর্বব্যাপী একের সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিজের ভিতরকার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'কে জানিতে হইবে, কিন্তু সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেখা যাইবে, সেই এককে লইয়া আবার সকলের ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছি, একের সৌন্দর্যে সব-কিছুর সৌন্দর্য, একের মাধুর্যে সব-কিছুর মাধুর্য— একের আনন্দে প্রেমে সব-কিছুর আনন্দ ও প্রেম।

(উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বেদান্তসাধনার যে ধারা তাহার সহিতও এই জন্য রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগ ছিল না। এককে চাই বটে, কিন্তু সর্বনাশী সর্বগ্রাসী কোনো এককে চাই না, 'সর্বং ইদং'-এর মধ্যে সৌন্দর্যে মাধুর্যে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ এককে চাই। তাই অধ্যাত্মানুভূতি বলিতে বেদান্ত যেখানে সর্বপ্রকারের জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব-বর্জিত আনন্দোপলব্ধির মধ্যে নিঃশেষে আত্ম-নিমজ্জনের কথা বলেন তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো লোভ ছিল না; তিনি ইহাকে পরিপূর্ণ ধর্মানুভূতি বলিয়া স্বীকারও করিতেন না। *The Religion of Man*-এর মধ্যে এক স্থানে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—Without disputing its truth I maintain that it may be valuable as a great psychological experience but all the same it is not religion— একটি মানসিক অভিজ্ঞতারূপে ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়।) অদ্বৈতবাদী বেদান্তি-গণের সঙ্গে সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ মিল ছিল না, দ্বৈতবাদী বেদান্তের সঙ্গেও সেইরূপ মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরম সত্য এক দিকে যেমন অক্ষর, অপর দিকে তেমনই আবার অনন্ত লীলাময়। এই লীলাময়ত্বের দিক্ হইতে দ্বৈত বেদান্তবাদিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহাও মোটেই হইল না; কারণ, দ্বৈতবাদী বৈদান্তিগণ যেখানে লীলার কথা বলিয়াছেন সে লীলা হইল এক বিশেষ প্রকারের লীলা, অপ্রাকৃত ধামে বসিয়া নিজের স্বরূপের মধ্যে তাঁহার লীলা; প্রাকৃত জগৎ এবং প্রাকৃত জীবনের মধ্যে কোথাও কোনো লীলা নাই। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও জগতের সৃষ্টিকারিণী মায়াকে অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন না বটে, সেই মায়াকে ব্রহ্মাশ্রিতা শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া জীব এবং জগৎকে সত্য বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহাদের সাধনায় জীব এবং জগতের কোনো সত্যমূল্য দিলেন না। তাঁহারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে বা বৃন্দাবনে, যাঁহারা লীলা আস্বাদ করিতে চাহিলেন তাঁহারা পরিকরত্ব লাভ করিতে চাহিলেন সেইখানে। এই জাতীয় ভগবৎ-লীলাও রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই আকৃষ্ট করে নাই। তিনি যে লীলার কথা বলিয়াছেন তাহার সবটাই এই পরিদৃশ্যমান জগতে— অনাদিকালে এবং অসীম দেশে বিস্তৃত অনন্ত জীবকুলের বিচিত্র জীবনলীলায়, তাহাকেই তিনি জীবন ভরিয়া দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন; সীমার মধ্যে যে অসীমের বিচিত্র লীলা তাহা আস্বাদন করাই হইল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা।

আসলে কবিধর্মই হইল রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম; সেই কবিধর্মের মূলকথা ছিল বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম; তাঁহার ভিতরে যে অধ্যাত্মস্পৃহা গড়িয়া উঠিতে লাগিল তাহাও

বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের প্রতি সেই নিবিড় প্রেম লইয়াই গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'একে' প্রতিষ্ঠিত হইয়া না লইতে পারিলে এই লীলাদর্শনের যোগ্যতাই জন্মে না, কারণ, সেই একে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশ্বজীবনের যে আনন্দলীলা-রূপ তাহা চোখেই পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই এই একের মধ্যে প্রতিষ্ঠার অর্থ একের মধ্যে আত্মবিসর্জন নয়, একে প্রতিষ্ঠা হইল বহুর ভিতর দিয়া বিচিত্রলীলাকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার জন্য। তাঁহার ধর্মবোধ তাঁহার আপনার মধ্যে নিজে নিজে যেমন গড়িয়া উঠিতেছিল তাঁহার ধর্মসাধনাও তেমন করিয়াই আপনা আপনি তাঁহার ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছিল; ধর্মবোধ সম্বন্ধেও পরে সহসা যেমন সচেতন হইয়া উঠিলেন, ধর্মসাধনা সম্বন্ধেও তিনি সেইভাবে সচেতন হইয়া উঠিলেন। যেদিন সচেতন হইলেন তখন উপনিষদের সঙ্গে তাঁহার গভীর মিল তাঁহাকে সচকিত করিয়া দিল। এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার নিজের সাধনাই যে উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল তাহা নহে, নিজের বিশেষ সাধনপ্রবৃত্তি দ্বারাও তিনি উপনিষদ্‌কে তাঁহার সাধনার অনুরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন, উপনিষদের সাধনাকেও সেইভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপনিষদ্ যেমন তাঁহার মধ্যে অনেকখানি সৃষ্টি করিয়া লইল, তিনি নিজে আবার তেমনই উপনিষদ্‌কে অনেকখানি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লইলেন। এই সকল গ্রহণ এবং রচনের মূলীভূত কথা হইল উপনিষদের সেই বাণী— 'য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি'— যে এইভাবে জানে যে আমিই ব্রহ্ম— সে এই সব হইয়া যায়।

সকলের ভিতর দিয়া একের স্পর্শলাভ করিবার স্পৃহা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'র পথকে নিজের জীবনে অস্বীকার করিয়াছিলেন, 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ'কেই জীবনের পরমকাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসনে'র যে পন্থা সে হইল একেবারে নিবৃত্তির পন্থা; রবীন্দ্রনাথ যে চান প্রবৃত্তির পন্থা; 'এক'কে ছাড়িয়া যে প্রবৃত্তি তাহা পলে পলে বন্ধন, কিন্তু এককে লইয়া যে প্রবৃত্তি তাহাতেই হইল পলে পলে মুক্তি।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

এইজন্যই কবির চিরজীবনের প্রার্থনা—

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে ॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে ॥

শুধু বাহিরের প্রকৃতির ভিতর দিয়া 'এসো' তাহাই নয়, জীবনের সব-কিছুর মধ্য দিয়া সর্বানুভূতির মধ্য দিয়াও 'এসো'— জীবনের ভিতর দিয়াও 'এসো'— মরণের ভিতর দিয়াও 'এসো'—

এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকল কর্ম-অবসানে ॥

সোনার তরীর 'দেউল' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত ধর্মসাধনার বিরুদ্ধে চিত্ত-প্রতিক্রিয়া চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে দেবতার নিভৃত আরাধনার জন্য যে দেউল রচিত হইয়াছিল তাহাতে

রাখি নি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

সেই অন্ধকার দেউলের মধ্যে একাকী দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই দিকে সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা গেল।—

বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে।

মোটের উপরে—

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি

মন্ত্র পড়ি দিবসরাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

কিন্তু সহসা—

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণের বাধা টুটিয়া গেল, অন্ধকার গৃহের মাঝখানে দিবস প্রবেশ করিল, নীরব ধ্যান চূর্ণ করিয়া 'সংসারের অশেষ সুর' ভিতরে ছুটিয়া আসিল ; দেবতার পানে চাহিয়া দেখা গেল, আলোক আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িয়া নূতন মহিমারাশি উদ্‌ভাসিত করিয়া দিয়াছে ; সেদিন দেখা গেল—

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দহারে।

কবি এক সময়ে কিছুকালের জন্য সমাজপ্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সে ধর্মমত সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মমত ছিল না বটে, তথাপি তাহার মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রথাবদ্ধতা ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল কবিচিত্তে একটা প্রতিক্রিয়া। সেই প্রথাবদ্ধ উপাসনার পথ ছাড়িয়া দিয়া আবার তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিলেন। মনে হয়তো কিছু সংশয় দেখা দিয়াছিল, সেই সংশয়ের উত্তর মিলিয়াছিল নিজের মনেই আবার এক রাত্রিবেলা 'নির্জন শয়ন-মাঝে' ; নিজের মধ্যেই বাণী শুনিতে পাইলেন—

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা ;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম !

—নৈবেদ্য, ৩২

এই জন্যই চৈতালির একটি ক্ষুদ্র কবিতায় কবিকে একেবারে 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' হইয়া উঠিবার জন্য পরম উৎসুক দেখিতে পাই—

যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

সত্যের এই অনুসন্ধিৎসায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই কবি সব-কিছুর সহিত যুক্ত হইয়াই মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলেন— 'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'। কবি অনুভব করিয়াছিলেন উপনিষদের মধ্যে যে 'যোগ' তাহাই সত্যকারের যোগ— কারণ, এই যোগপন্থা সবার সঙ্গেই যুক্ত করিয়া দেয়; মাঝখানে ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসের যোগপন্থার যে দীর্ঘদিনের একটা ধারা কবি সেই যোগপন্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন কেবলই বিয়োগ-পন্থা; এই জন্য তিনি এই প্রচলিত যোগপন্থা হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
—গীতাঞ্জলি

বলিলেন—

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।
—গীতালি

এই কবি-সাধনা লইয়াই কবি বলিয়াছেন-

ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে কালিদাস

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন

'প্রাচীন ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে অসামান্যতা ছিল সন্দেহ নাই।' এই অভিমতের সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন—

> সকল সভ্যদেশই আপন সাহিত্যে ইতিহাস, জীবনী ও উপন্যাস আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে তাহার চিহ্ন দেখা যায় না ; যদি-বা ভারতসাহিত্যে ইতিহাস-উপন্যাস থাকে, তাহার মধ্যে আগ্রহ নাই।
>
> —প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরীচিত্র (১৮৯৯)

আধুনিক কালের ঐতিহাসিকরাও বলেন, ভারতবর্ষে ইতিহাসচেতনা দুর্বল ছিল বলেই এ দেশের সাহিত্যে ইতিহাস বা জীবনচরিতের এমন নৈরাশ্যকর বিরলতা। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করতে আধুনিক পণ্ডিতদের বহুজনসাধ্য ও দীর্ঘকালব্যাপী উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু সে ইতিহাস আজও পূর্ণাঙ্গরূপ ধারণ করতে পারেনি, কখনও পারবে বলে আশাও করা যায় না।

কিন্তু এই যে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস উদ্ধারের ঐকান্তিক প্রয়াস, সে কোন্ আদর্শের ইতিহাস? বলা বাহুল্য ভারতীয় সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শের ইতিহাসের অভাবই পণ্ডিতদের আক্ষেপ বা অভিযোগের হেতু। এই প্রসঙ্গে দীর্ঘকাল পূর্বে মনীষী ভূদেব মুখোপাধ্যায় আমাদের স্বপ্রকৃতি-সচেতন করবার অভিপ্রায়ে বলেছিলেন—

> জাতিভেদে সর্বপ্রকার সাহিত্য-রচনার রীতি ভিন্ন হয়। ইতিবৃত্ত-প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়।…ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্রাদি তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রকাশ করে।…ভারতবাসী-দিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থনিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয় ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, এ কথাও অসংগত।…আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে।
>
> —সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), ৪র্থ অধ্যায় : ঐতিহাসিক প্রকৃতিভেদ

পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই-জাতীয় কথাই বলেছেন আমাদের আত্মসংবিৎ ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে।—

> ইতিহাস সকল দেশে সমান হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়। যে ব্যক্তি রথচাইলডের জীবনী পড়িয়া গেছে, সে খ্রীস্টের জীবনীর বেলায় তাঁহার হিসাবের খাতাপত্র ও আপিসের ডায়ারি তলব করিতে পারে ; যদি সংগ্রহ করিতে না পারে তবে তাহার অবজ্ঞা জন্মিবে।…তেমনি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় দফতর হইতে তাহার

রাজবংশমালা ও জয়পরাজয়ের কাগজপত্র না পাইলে যাঁহারা ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে হতাশ্বাস হইয়া পড়েন এবং বলেন যেখানে পলিটিক্‌স্‌ নাই সেখানে আবার হিস্ট্রি কিসের, তাঁহারা ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে যান এবং না পাইলে মনের ক্ষোভে ধানকে শস্য বলিয়াই গণ্য করেন না। সকল ক্ষেতের আবাদ এক নহে, ইহা জানিয়া যে ব্যক্তি যথাস্থানে উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ।

যীশুখ্রীস্টের হিসাবের খাতা দেখিলে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা জন্মিতে পারে, কিন্তু তাঁহার অন্য বিষয় সন্ধান করিলে খাতাপত্র সমস্ত নগণ্য হইয়া যায়। তেমনি রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভারতবর্ষকে দীন জানিয়াও অন্য বিশেষ দিক্‌ হইতে সে দীনতাকে তুচ্ছ করিতে পারা যায়।

—ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৯০২)

ভূদেব-রবীন্দ্রনাথের এ-সব উক্তি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে কালনিষ্ঠ ও বিষয়নিষ্ঠ ইতিহাস না থাকার ফলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ ও কৌতূহল অতৃপ্ত রয়ে গেছে। সকল সভ্য দেশই নিজেদের ইতিহাস ও কীর্তিমান্‌ পুরুষদের জীবনচরিত আপন সাহিত্যে আগ্রহের সহিত সঞ্চয় করে রাখে, কিন্তু ভারতবর্ষের সে আগ্রহ ছিল না, এটা আমাদের 'অসামান্যতা' হতে পারে, কিন্তু এই অসামান্যতা আমাদের দৈন্যেরও পরিচায়ক, ফলে দুঃখেরও কারণ। কালধর্মবশে আজ ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্বন্ধে আমাদের মনে যখন সে আগ্রহ জাগল, তখন দেখলাম আমাদের পিতামহরা সে ভাণ্ডারে কোনো ধনই সঞ্চিত করে রাখেন নি, আর সেই ইতিহাসজিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করবার কোনো উপায়ও নেই। তাই তো আমাদের প্রত্নজিজ্ঞাসুরা লুপ্তরত্নোদ্ধারের আশায় মাটি খুঁড়ে ও পুরাতত্ত্বের গহন বনে দীর্ঘকাল বিচরণ করে প্রাচীন ইতিহাসের ছিন্নপত্র কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু ওই ছিন্নাংশগুলিকে অতি কষ্টে জোড়া দিয়েও একটি সমগ্র ও সুসংবদ্ধ কাহিনী উদ্ধার করা সম্ভব নয় বলে আক্ষেপ করছেন।

আমাদের বর্তমান আক্ষেপ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে নয়, জীবনচরিত সম্বন্ধে। কেননা প্রাচীন ভারতের যেমন ইতিহাস নেই, তেমনি জীবনচরিতও নেই। অথচ পুরাকালে এদেশে যে অসাধারণ প্রতিভাশালী ও মহৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল তার প্রচুর আভাস পাই। তাঁদের কীর্তির ভগ্নাবশেষও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের বা চারিত্রমহিমার পরিচয় লাভের কোনো উপায় আজ নেই। প্রত্যেক সভ্যদেশেরই আকাশ উজ্জ্বল হয় সে-সব দেশের মহাপুরুষের চারিত্রমহিমার দীপ্তিতে। ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্ধকার হয়ে আছে ও-রকম চারিত্রদীপ্তির অভাবে। অভাবে বলা ঠিক হল না; কারণ ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অভাব কখনও ঘটে নি, কিন্তু ওই জ্যোতিষ্করাজির অধিকাংশই আমাদের ইতিহাসহীনতার মেঘাবরণে আচ্ছন্ন থাকাতে আধুনিক কালের দৃষ্টিগোচর হতে পারছে না। ওই মেঘাবরণের আড়াল সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের যে-কয়টি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের আভাস আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে তাঁদের মধ্যে তিন জনের নাম সর্বাগ্রগণ্য— বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস।

২

বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস, এই তিনজনই হচ্ছেন প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক। আরও বহু শক্তিমান্ পুরুষের কীর্তির আভাস বা অবশেষ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে; কিন্তু তাঁদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাই না, কালের ব্যবধানে ও জীবনচরিতের অভাবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের কীর্তিকলাপের মধ্যেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব সুপরিস্ফুট নয়। বুদ্ধ, অশোক, কালিদাসেরও ইতিহাস বা জীবনচরিত আমরা পাই নি। এ কথা সত্য যে, বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধ ও অশোকের জীবনচরিতজাতীয় বহু আখ্যান পাওয়া যায়, যেমন ললিতবিস্তরে ও অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে পাই বুদ্ধের আখ্যান আর অশোকাবদানে আছে অশোকের আখ্যান। কিন্তু এগুলিকে কখনও যথার্থ জীবনচরিত বলা যায় না, এগুলিতে বুদ্ধ বা অশোকের ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। এগুলি হচ্ছে আসলে জনশ্রুতির সংকলন মাত্র; অজ্ঞ জনসাধারণের বিস্ময়বিমূঢ় ও ভক্তিমুগ্ধ চিত্তে এঁদের অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বমহিমা যে অলৌকিকতার রঙে রঞ্জিত ও বিকৃত হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল তারই পরিচয় পাই ওই জনশ্রুতিগুলিতে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতকে অবশ্য ঠিক জনশ্রুতির পর্যায়ে ফেলা যায় না, ও-কাব্যে অতি উঁচুস্তরের কবিপ্রতিভা জনশ্রুতিকেই কবিকল্পনার দিব্য আভায় মণ্ডিত করে বুদ্ধচরিতকে অমরলোকে উন্নীত করেছে। অর্থাৎ এ গ্রন্থও জীবনচরিত নয়, মহৎ কাব্য মাত্র। কালিদাসের ভাগ্য বুদ্ধ-অশোকের চেয়েও মন্দ। তাঁর ভাগ্যে ললিতবিস্তর বা অশোকাবদানের ন্যায় আখ্যানও রচিত হয় নি। কিন্তু কালিদাসের সম্বন্ধে জনশ্রুতির অপ্রতুলতা নেই, বস্তুতঃ সমগ্র বৌদ্ধজগৎ যেমন বুদ্ধ-অশোকের কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কালিদাসবিষয়ক জনশ্রুতিতেও তেমনি ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্ত ছেয়ে আছে বহু শতাব্দী যাবৎ।

জীবনচরিত না থাকুক, জনশ্রুতি আছে। জনশ্রুতির বাহুল্যই প্রমাণ করে তার লক্ষ্যীভূত পুরুষরা অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি কখনও জীবনচরিতের অভাব পূরণ করতে পারে না। জনশ্রুতি জনতার ছোটখাট কতকগুলি অতি সাধারণ রকমের কৌতূহল নিবৃত্ত করে মাত্র, সত্যসন্ধিৎসুর জিজ্ঞাসা তৃপ্ত করতে পারে না। মহাপুরুষদের ব্যক্তিত্বের তথা জনতার ভক্তি বা শ্রদ্ধার প্রকৃতিভেদে জনশ্রুতিরও প্রকৃতিভেদ ঘটে। বুদ্ধ অশোক ও কালিদাস, এই তিনজনের কীর্তি ও ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি ছিল তিন রকমের। তাই এঁদের সম্বন্ধে যে কিংবদন্তীর উদ্‌ভব ঘটেছে তাও স্বভাবতই হয়েছে তিন ধরণের।

কিন্তু কিংবদন্তী অবলম্বনে যদি এঁদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যায় তা হলে কারও প্রতিই সুবিচার করা হবে না। কেননা জনশ্রুতি নির্ভর করে জনতার স্বতঃসংকীর্ণ বোধশক্তি ও রুচির উপরে। সত্য প্রকাশের শক্তি জনশ্রুতির নেই।

তাই তো পুরাব্রতীরা আত্মনিয়োগ করেছেন বুদ্ধ অশোক ও কালিদাসের ইতিহাস-উদ্ধারে। বস্তুতঃ বুদ্ধ ও অশোকের ইতিহাস আজ আর অজানা নয়; তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রায় পরিপূর্ণ চিত্রই রচিত হয়েছে ইতিহাসব্রতীদের সাধনায়। এই দুইজনই মুখ্যতঃ কর্মযোগী, মানবসমাজই এঁদের

কর্মক্ষেত্র; তাঁদের কর্মকীর্তি বিপুল এবং তাঁদের ইতিহাস রচনার উপাদানও অপ্রচুর নয়। এই কর্মকীর্তি ও ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে তাঁদের ব্যক্তিত্বচিত্র রচনা সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধ নিজে তাঁর চরিতরচনার কোনো প্রত্যক্ষ উপাদান রেখে যান নি। কিন্তু পালি ত্রিপিটকে যে পরোক্ষ উপাদান পাওয়া যায় তার পরিমাণ ও মূল্য দুই-ই খুব বেশি; তার উপরে নির্ভর করেই বুদ্ধচরিতের অপূর্ব মহিমময় চিত্র অঙ্কন সম্ভব হয়েছে। অশোকচরিতের উপাদান পরিমাণে কম, কিন্তু তার মূল্য অপরিসীম, কেননা সে উপাদান রক্ষিত হয়েছে তাঁর আপন বাণীতেই অক্ষয় শিলালিপিতে। সে উপাদানের সহায়তায় অশোকচরিতের যে বাণীমূর্তি রচনা সম্ভব হয়েছে, তার স্থায়িত্ব ও রূপমহিমার কাছে মর্মরমূর্তিও হার মানতে বাধ্য। কিন্তু কালিদাসের ইতিহাস বা জীবনচরিত রচনায় ইতিবৃত্তকাররা অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছেন, এই অক্ষমতার হেতু নাকি উপাদানের বিরলতা। ফলে আজও 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন লয়ে তারিখ-সাল'। কালিদাসের কর্মকীর্তি নেই, তার কোনো পাথুরে নিদর্শন নেই, এমন কি তাঁর পিতৃপরিচয় পর্যন্তও নেই। তাই তাঁর জীবনচরিত রচনাও সম্ভব নয়। এইখানেই বুদ্ধ ও অশোকের কাছে কালিদাসের হার। অথচ তাঁর জিতও এখানেই। সে কথা পরে বলছি।

৩

বেদ-উপনিষদ্ এবং রামায়ণ-মহাভারতকে বাদ দিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর কাছে গৌরবান্বিত বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস এই তিনজনের জন্য। আর রবীন্দ্রনাথের কাছে এই তিনজন যে মহৎ অর্ঘ্য লাভ করেছেন, প্রাচীন ভারতের আর কেউ তা পান নি।

রবীন্দ্রনাথ প্রথমবয়সেই বলেছিলেন—

> জগতে যত মহৎ আছে,
> হইব নত সবার কাছে।
>
> —মানসী, দেশের উন্নতি (১৮৮৮)

আর জীবনের প্রায় শেষপ্রান্তে এসেও বলেছেন—

> তাদের সম্মানে মান নিয়ো
> বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।
>
> —জন্মদিনে, ১৮

এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই চারিত্রপূজারি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ, অশোক ও কালিদাস, প্রাচীন ভারতের এই তিন মহৎ ব্যক্তিত্বকে অভিবন্দনা জানাতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কিন্তু মহত্ত্বের বৈশিষ্ট্যভেদে তিনজনকে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে। বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে কি গভীর ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করেছেন তা কারও অজানা নেই। অশোককে তিনি যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন তা সুপরিজ্ঞাত না হলেও তার মূল্য কম নয়। অন্যত্র সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা

করেছি। কালিদাসের ব্যক্তিত্বকে তিনি কি দৃষ্টিতে দেখেছেন ও আমাদের কাছে কিভাবে উপস্থাপিত করেছেন, বর্তমানে তাই আমাদের বিচার্য বিষয়।

ভারতবর্ষ আপন অসামান্যতাবশতঃ কালিদাসের জীবনচরিত সম্বন্ধে উদাসীন। কিন্তু সাধারণ মানুষ অসামান্য নয়। তাই কালিদাসের আবির্ভাবকাল, জন্মস্থান, জীবনযাত্রা ও চারিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। আধুনিক পণ্ডিতেরা সাল-তারিখ নিয়ে বিবাদ করেও সে কৌতূহল চরিতার্থ করতে সমর্থ হন নি। কিন্তু আধুনিক ভারতের অসামান্য কবি প্রাচীন ভারতের অসামান্য কবিকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন, আর তাও করেছেন অসামান্য উপায়েই। তিনি কালিদাসের জীবনচরিত রচনায় ব্রতী হন নি, ব্রতী হয়েছেন তাঁর ব্যক্তিত্বনিরূপণে। অর্থাৎ কালিদাসের বহির্জীবনের বিবরণ-সংকলন নয়, তাঁর অন্তর্জীবনের স্বরূপনির্ণয়ই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

এবার রবীন্দ্রনাথের নিজের বক্তব্যের আশ্রয় নেওয়া যাক। তিনি বলেন—

আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের কোনো কবির জীবনচরিত নাই। আমি সেজন্য চিরকৌতূহলী, কিন্তু দুঃখিত নহি। বাল্মীকি সম্বন্ধে যে গল্প প্রচলিত আছে তাহাকে ইতিহাস বলিয়া কেহই গণ্য করিবেন না। কিন্তু আমাদের মতে তাহাই কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত।...

কালিদাস সম্বন্ধে যে গল্প আছে তাহাও এইরূপ। তিনি মূর্খ অরসিক ও বিদুষী স্ত্রীর পরিহাসভাজন ছিলেন। অকস্মাৎ দৈবপ্রভাবে তিনি কবিত্বরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। বাল্মীকি নিষ্ঠুর দস্যু ছিলেন এবং কালিদাস অরসিক মূর্খ ছিলেন, এই উভয়ের একই তাৎপর্য। বাল্মীকির রচনায় দয়াপূর্ণ পবিত্রতা এবং কালিদাসের রচনায় রসপূর্ণ বৈদগ্ধ্যের অদ্ভুত অলৌকিকতা প্রকাশ করিবার জন্য চেষ্টামাত্র।

এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। কবির জীবন হইতে যে-সকল তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত, কবির কাব্যের সহিত তাহার কোনো গভীর ও চিরস্থায়ী যোগ থাকিত না।

—সাহিত্য, কবিজীবনী (১৯০১)

এই শেষ উক্তিটি বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। কালিদাসের জীবনচরিত থাকলেও তাতে তাঁর বাহ্যজীবনের তথ্যাবলীরই সন্ধান পাওয়া যেত, কিন্তু তাঁর সেই মানসসত্তার পরিচয় থাকত না যার শিখরচূড়া থেকে তাঁর কাব্যমন্দাকিনীর উদ্‌ভব। কবির কাব্য তাঁর মানস স্বরূপেরই প্রতিরূপ ; তাঁর দৈহিক জীবনের সঙ্গে কাব্যের কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই, থাকলেও তার মধ্যে চিরন্তনতা নেই। এই অভিমতই প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ ভাষাতেও—

মানুষ-আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে,
ভূমিতে লোটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতিনিন্দার জ্বরে,
কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।

—উৎসর্গ (১৯১৪), ২১

যে সাধারণ মানুষটি স্থানকালের সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ এবং ক্ষণিক সুখদুঃখের আবেগে বিচলিত, সে সাধারণ মানুষটির জীবনযাত্রার বিবরণের মধ্যে, কবির যে সত্তা স্থানকালের অতীত তার পরিচয় মেলে না, এ কথা সত্য। কিন্তু ওই সাধারণ মানুষটির বহির্জীবনের গণ্ডীর মধ্যে তার কবিসত্তা যেমন ধরা দেয় না, তেমনি তার ব্যক্তিসত্তাও তার মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় না। প্রতিভাবান্ মানুষ-মাত্রেরই ব্যক্তিত্ব তার দেহযাত্রার সীমাকে প্রতি মুহূর্তেই অতিক্রম করে যায়। কবিত্বও প্রতিভারই প্রকাশভেদ। আবার, কবিত্ব বা প্রতিভা ব্যক্তিত্ব-আশ্রয়ী, দেহযাত্রা-আশ্রয়ী নয়। পক্ষান্তরে মানুষের ব্যক্তিসত্তা তথা কবিসত্তা নিছক জীবনযাত্রানিরপেক্ষ হলেও তার মননযাত্রানিরপেক্ষ নয়। সুতরাং কবিকে তথা তার ব্যক্তিত্বকে তার জীবনচরিতে পাওয়া না গেলেও তার মননচরিতে নিশ্চয় পাওয়া যায়।

কালিদাসের জীবনচরিতের উপাদান পাওয়া যায় না বলে দুঃখ নেই। কিন্তু তাঁর মননপ্রকৃতি নির্ণয়ের উপাদান পাওয়া গেলে নিশ্চয়ই সুখের বিষয় হত, রবীন্দ্রনাথও সুখী হতেন। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বলেছিলেন, কবিতা বুঝে লাভ আছে, কবিকে বুঝলে আরও লাভ, তখন কবির নিছক বাহ্যজীবনের পরিচয়ই তাঁর অভিপ্রেত ছিল না; কবির অন্তর্জীবন ও মননপ্রকৃতির স্বরূপ-উপলব্ধিই ছিল তাঁর অভিপ্রেত। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে পরস্পরবিরোধী মনে করবার হেতু নেই। অর্থাৎ 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে' এ কথা যেমন সত্য, কবিতাকে বুঝতে গেলে কবিকেও বোঝা চাই এ কথাও তেমনি সত্য।

কিন্তু কবিসত্তা বা ব্যক্তিত্বও নিরালম্ব বস্তু নয়, অর্থাৎ দেশ ও কাল -গত পরিবেশনিরপেক্ষ নয়। কালিদাসের কবিত্ব তাঁর ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব তৎকালীন পরিবেশনিয়ন্ত্রিত। সুতরাং ওই পরিবেশের প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় ছাড়া কালিদাসের কবিত্বস্বরূপের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। কেননা কালিদাসের যুগপ্রভাব তথা তাঁর ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে রাখা চাই। কবির যুগ ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন তাঁর কাব্যের অন্তঃস্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক, তেমনি কাব্যের স্বরূপবিশ্লেষণের দ্বারা কবির যুগ ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যনির্ণয়ও অনেকাংশে সম্ভব। শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্বন্ধেই এ কথা বিশেষভাবে সত্য। কেননা শ্রেষ্ঠ কবিরাই যুগের যথার্থ প্রতিনিধি।

কালিদাস তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ও একমাত্র প্রতিনিধি। তখনকার দিনের কোনো সম্রাট্, রাষ্ট্রনায়ক বা সমাজনেতা ওই প্রতিনিধিত্বের অধিকারী নন। তখনকার যুগচরিত্রের পরিচয় জানা থাকলে কালিদাসের কাব্য বোঝা সহজ হয়। তেমনি ওই কাব্য থেকেই ওই যুগের প্রকৃতিনির্ণয়ও সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কালিদাস ও তাঁর কাব্যকে এই দুই দিক্ থেকেই বিচার করেছেন।

৪

কালিদাসের ব্যক্তিত্বনির্ণয়ের একমাত্র উপাদান তাঁর কাব্যগুলি। অন্য কোনো বাহ্য উপাদান নেই। কিন্তু যে উপাদানগুলি আমরা পেয়েছি তার মূল্য অপরিমেয়। বুদ্ধচরিত বা অশোকাবদানের ন্যায়

কালিদাসচরিত-জাতীয় কোনো আখ্যান আমরা যে পাই নি তা ভালোই হয়েছে। ওরকম আখ্যান কালিদাসের ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্নই করত, প্রকাশ করত না। বুদ্ধচরিত ও অশোকাবদানও বুদ্ধ এবং অশোকের স্বরূপকে বহু শতাব্দী যাবৎ উত্তরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেই রেখেছিল। আধুনিক কালে বহুযুগসঞ্চিত জনশ্রুতির বা কবিকল্পনার স্তর অপসারণ করে অন্য নির্ভরযোগ্য উপাদানের সাহায্যে বুদ্ধ ও অশোকের চরিত্রকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। বুদ্ধচরিতের উপাদান আছে পালি ত্রিপিটকে, এগুলিকে প্রত্যক্ষ সাক্ষী বলে গ্রহণ করা না গেলেও অনেকাংশে নির্ভরযোগ্য। অশোক-চরিতের উপাদান তাঁর শিলালিপিগুলি, সমকালীন, প্রত্যক্ষ ও কার্যতঃ অশোকের স্বমুখনিঃসৃত। তাই এগুলির মূল্য ও নির্ভরযোগ্যতা অপরিসীম, কিন্তু পরিমাণে স্বল্প। এখানেই কালিদাসের জিত। কেননা তাঁর কাব্যগুলি গুণেও কম নয়, পরিমাণেও অল্প নয়। বস্তুতঃ কাব্যেই কবির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

আধুনিক কালের পণ্ডিতেরা কালিদাসের জীবনকাহিনী রচনার বাহ্য উপাদান না পেয়ে হতাশ হয়েছেন। তাঁরা তাঁর কাব্যগুলিকে আশ্রয় করে তাঁর ব্যক্তিত্বনির্ণয়ে প্রয়াসী হন নি। কিন্তু জনশ্রুতি সেই পথেই অগ্রসর হয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই গল্পগুলি জনগণ কবির জীবন হইতে সংগ্রহ করে নাই, তাঁহার কাব্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছে'। আর এজন্যই রবীন্দ্রনাথ ওই জনশ্রুতিগুলিকেই 'কবির প্রকৃত ইতিবৃত্ত' বলে মেনে নিয়েছেন, কিন্তু অজ্ঞ জনগণের পক্ষে কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার বা উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তাই লোকশ্রুতিতে শ্রেষ্ঠ পুরুষদের ব্যক্তিত্ব বিকৃত হয়েই প্রকাশ পায়। কালিদাসের বেলায় যে তা ঘটেছে সে কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন।—

> কালিদাস একান্তই সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এ মত লোকের মধ্যে প্রচলিত। সেইজন্য লৌকিক গল্পে-গুজবে কালিদাসের চরিত্র কলঙ্কে মাখানো। এই গল্পগুলি জনসাধারণকর্তৃক কালিদাসের কাব্যসমালোচনা। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, জনসাধারণের প্রতি আর যে-কোনো বিষয়ে আস্থাস্থাপন করা যাক, সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সেই অন্ধের উপরে অন্ধ নির্ভর করা চলে না।
>
> —প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (১৯০১)

কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্বনির্ণয় প্রতিভার কাজ, অজ্ঞ জনগণের কাজ নয়। ঐতিহাসিকগণ এ কাজে হাত দেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই কালিদাসের কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিত্ব বা মনঃপ্রকৃতির স্বরূপনির্ণয়ে প্রয়াসী হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর একটি উক্তি এই।—

> মনে আছে, বহুকাল হল, রোগশয্যায় কালিদাসের কাব্য আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলুম। যে আনন্দ পেলুম সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ। সেই কাব্যে আমার মন আপন বিশেষ স্বত্ব উপলব্ধি করবার বাধা পেল না। বেশ বুঝলুম, এ কাব্য আমি যে-রকম করে পড়লুম, দ্বিতীয় আর কেউ তেমন করে পড়ে নি।
>
> —পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি, ৩০।৯।১৯২৪

কালিদাসের কাব্য পড়ে তিনি যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে হচ্ছে সেই কাব্যের মধ্যে কালিদাসের ব্যক্তিস্বরূপকে, তাঁর যুগকে ও সে যুগের ভারতবর্ষকে আবিষ্কারের আনন্দ। তবে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে শুধু আবিষ্কার নয়, সৃষ্টিও করেছেন; তেমন যে তাঁর পূর্বে বা পরে আর কেউ করেন নি তাতে সন্দেহ নেই।

কালিদাসের কাব্য কখন তিনি আগাগোড়া সমস্ত পড়েছিলেন তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবু অনুমান করবার কতখানি অবকাশ আছে তা বিচার করে দেখার সার্থকতা আছে। সন্ধান করলে হয়তো কোনোদিন তার প্রমাণও পাওয়া যেতে পারে।

৫

জীবনস্মৃতি গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বালক-বয়সেই কালিদাস-সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বেশ ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধিত হয়েছিল। বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের মুখে মেঘদূত এবং কালিদাসের কাব্যপ্রেমিক কবি বিহারীলালের মুখে কুমারসম্ভব আবৃত্তির কথা রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সেও ভুলতে পারেন নি। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে তিনি কুমারসম্ভব পড়েছিলেন আর রামসর্বস্ব পণ্ডিত তাঁকে পড়াতেন শকুন্তলা। কুমারসম্ভবের কিছু অংশ তিনি বাংলা ছন্দে অনুবাদও করেছিলেন, তার প্রমাণ আছে।

কালিদাসের সাহিত্যের সঙ্গে অল্প বয়সের এই পরিচয় যে পরবর্তী কালে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল, তার প্রমাণ রবীন্দ্রসাহিত্যে বিকীর্ণ হয়ে আছে। ১৮৮৭ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে আছে—

> কুমারসম্ভবের মহাদেবের সহিত অন্নদামঙ্গলের তুলনা কর। কল্পনার দারিদ্র্য যদি দেখিতে চাও, অন্নদামঙ্গলের মদনভস্ম পাঠ করিয়া দেখ।
>
> —আলস্য ও সাহিত্য, সাহিত্য (১৯৫৮ সং), পৃ ১৮৯

কালিদাসের কাব্যপাঠের প্রথম সুস্পষ্ট ছায়াপাত দেখতে পাই মানসী কাব্যের তিনটি কবিতায়। 'একাল ও সেকাল' কবিতাটিতে (১৮৮৮। বৈশাখ ২১) আছে—

যক্ষনারী বীণাকোলে ভূমিতে বিলীন
বক্ষে পড়ে রুক্ষ কেশ
অযত্নশিথিল বেশ;
সেদিনো এমনিতরো অন্ধকার দিন।

এখানে উত্তরমেঘের 'উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং' ইত্যাদি বর্ণনার আভাস সুস্পষ্ট। তার পরের দিন রচিত 'কুহুধ্বনি' কবিতাটিতে (১৮৮৮। বৈশাখ ২২) আছে—

লতাকুঞ্জে তপোবনে
বিজনে দুষ্যন্তসনে
শকুন্তলা লাজে থরথর।

বোঝা যাচ্ছে ১৮৮৮ সালেই মেঘদূত ও শকুন্তলা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে অনেকখানি অধিকার করেছিল। ১৮৯০ সালে রচিত বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতাটি তারই পরিণতি। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ কালিদাসের কাব্যসৌন্দর্যেই মুগ্ধ ছিলেন। কালিদাসের ব্যক্তিত্ব বা প্রাচীন ভারতের বৈশিষ্ট্য-চিন্তা তখনও তাঁর মনে প্রাধান্য পায় নি। উক্ত কবিতাটি সম্বন্ধে তিনি সে সময়ে প্রমথ চৌধুরীকে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন তাতেও রসগ্রাহিতারই প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এ সময় থেকেই যে তাঁর মনে প্রাচীন ভারতের ছবি জাগতে শুরু করেছে তার একটু আভাস আছে ওই পত্রেও।—

যে সময়ে কালিদাস লিখেছিল সে সময়ে কাব্যে লিখিত দেশদেশান্তরের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উজ্জয়িনী রাজধানীতে বাস করত, তাদেরও ত বিরহব্যথা ছিল।

—চিঠিপত্র ৫, পৃ ১৩৮-৪৪

প্রাচীন ভারতের এই যে আভাস, তার পূর্ণতর চিত্ররূপ প্রকাশ পেয়েছে পরের বৎসরে প্রকাশিত 'মেঘদূত' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে। সে চিত্র যেন কবির কল্পনাচক্ষে স্বপ্নের মোহাঞ্জন মাখিয়ে দিয়ে সেই বিগত দিনের জন্যে তাঁর হৃদয়ে এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা জাগিয়ে তুলেছে।—

রামগিরি হইতে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে দীর্ঘ এক খণ্ডের মধ্য দিয়া মেঘদূতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে জীবনস্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে চিরকালের মত আমরা নির্বাসিত হইয়াছি।···মনে হয় ঐ রেবা সিপ্রা নির্বিন্ধ্যা নদীর তীরে, অবন্তী বিদিশার মধ্যে, প্রবেশ করিবার কোনো পথ যদি থাকিত, তবে এখনকার চারিদিকের ইতর কলকাকলি হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যাইত।

—প্রাচীন সাহিত্য, মেঘদূত (১৮৯১)

এই যুগে যে কালিদাসের কাব্য, বিশেষতঃ মেঘদূতের প্রতি কবিচিত্তে বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছিল, তার অন্য প্রমাণও আছে। এই সময়ে এক পত্রে তিনি লেখেন—

অন্যবার বরাবর আমার বৈষ্ণব কবি এবং সংস্কৃত বই আনি; এবার আনি নি, সেই জন্যে ঐ দুটোরই প্রয়োজন বেশি অনুভব হচ্ছে। যখন পুরী খণ্ডগিরি প্রভৃতি ভ্রমণ করছিলুম, তখন যদি মেঘদূতটা সঙ্গে থাকত ভারী সুখী হতুম। কিন্তু মেঘদূত ছিল না।

—ছিন্নপত্র, পত্র ৭৪ (১৮৯৩ মার্চ)

ছিন্নপত্র গ্রন্থের ৭১-সংখ্যক পত্রেও (১৮৯৩ ফেব্রুআরি ১৪) মেঘদূতের উল্লেখ আছে একটি স্বচ্ছতোয়া শীর্ণা নদীর বর্ণনাপ্রসঙ্গে। শুধু মেঘদূত নয়, কালিদাসের অন্য কাব্যের প্রতিও তাঁর আগ্রহের নিদর্শন আছে এই সময়ের রচনায়।—

সেই রাত্রে আবার রঘুবংশ নিয়ে পড়লুম। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর পড়ছিলুম। সভায় সিংহাসনের উপর সারি সারি সুসজ্জিত সুন্দর-চেহারা রাজারা বসে গেছেন, এমন সময় শঙ্খ এবং তুরীধ্বনির মধ্যে বিবাহবেশ পরে সুনন্দার হাত ধরে ইন্দুমতী তাঁদের মাঝখানে সভাপথে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটি মনে করতে এমনি সুন্দর লাগে। তার পরে সুনন্দা এক-এক জনের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে আর ইন্দুমতী অনুরাগহীন এক-একটি প্রণাম করে চলে

যাচ্ছেন। এই প্রণাম-করাটি কেমন সুন্দর। যাকে ত্যাগ করছেন তাকে যে নম্রভাবে সম্মান করে যাচ্ছেন এতে কতটা মানিয়ে যাচ্ছে। সকলেই রাজা, সকলেই তাঁর চেয়ে বয়সে বড়ো, ইন্দুমতী একটি বালিকা, সে যে তাঁদের একে একে অতিক্রম করে যাচ্ছে এই অবশ্যরূঢ়তাটুকু যদি একটি একটি সুন্দর সবিনয় প্রণাম দিয়ে না মুছে দিয়ে যেত তা হলে এই দৃশ্যের সৌন্দর্য থাকত না।

—ছিন্নপত্র, পত্র ৬০ (১৮৯২ জুন ২৯)

এখানেও সৌন্দর্যের স্বপ্নমাখা দৃষ্টি, বিশুদ্ধ রসগ্রাহিতার নিদর্শন।

বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লেখা একখানি পত্রে (১৮৯২) কাব্যে কবির ব্যক্তিত্বের ছাপ যে না থেকে পারে না তা বোঝাতে গিয়ে তিনি লিখলেন—

কালিদাসের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এবং মহাভারতকারের দুষ্মন্ত-শকুন্তলা এক নয়, তার প্রধান কারণ কালিদাস এবং বেদব্যাস এক লোক নন, উভয়ের অন্তরপ্রকৃতি ঠিক এক ছাঁচের নয়; সেইজন্য তাঁরা আপন আপন অন্তরের ও বাহিরের মানবপ্রকৃতি থেকে যে দুষ্মন্ত-শকুন্তলা গঠিত করেছেন তাদের আকারপ্রকার ভিন্ন রকমের হয়েছে। তাই বলে বলা যায় না যে, কালিদাসের দুষ্মন্ত অবিকল কালিদাসের প্রতিকৃতি, কিন্তু তবু এ কথা বলতেই হবে তার মধ্যে কালিদাসের অংশ আছে, নইলে সে অন্যরূপ হত।

—সাহিত্য (১৯৫৮), সাহিত্য (১২৯৯ বৈশাখ), পৃ ২০২-০৩

কালিদাসের কাব্যে যে তাঁর আত্মপ্রকৃতির প্রতিফলন ঘটেছে, পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তা বিশদভাবেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধে (১৯০৯)। যথাস্থানে সে প্রসঙ্গের আলোচনা করা যাবে।

৬

অতঃপর চৈতালির যুগে (১৮৯৬) এসে দেখি রবীন্দ্রনাথের প্রাচীনভারতবোধ এবং আগ্রহ গভীরতর ও ব্যাপকতর হয়েছে। কবির দৃষ্টির সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে মনীষীর দৃষ্টি। এই দৃষ্টির ফলে এক দিকে ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য এবং অপর দিকে কালিদাসের ব্যক্তিত্ব তাঁর চিত্তে ধীরে ধীরে অঙ্কিত হতে থাকল। সভ্যতার প্রতি, তপোবন, প্রাচীন ভারত, এই তিনটি সনেটে অতীত ভারতের প্রতি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুল আগ্রহ সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন ভারতের যে দিকটি তাঁকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছে তা এই।—

দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর,
হে নব-সভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি, ··
মগ্ন হয়ে আত্মমাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি।

—চৈতালি, সভ্যতার প্রতি (১৩০২ চৈত্র ১৯)

এই যে তপোবনের প্রতি আগ্রহ, তার একটি পূর্ণচিত্র দেখা দিয়েছে কবির কল্পনামুগ্ধ দৃষ্টিতে। এই চিত্র ফুটে উঠেছে অন্য দুটি কবিতায়।—

মনশ্চক্ষে হেরি যবে ভারত প্রাচীন—
পূরব পশ্চিম হতে উত্তর দক্ষিণ
মহারণ্য দেখা দেয় মহাচ্ছায়া লয়ে।
…স্রোতস্বিনী তীরে
মহর্ষি বসিয়া যোগাসনে, শিষ্যগণ
বিরলে তরুর তলে করে অধ্যয়ন
প্রশান্ত প্রভাতবায়ে।…
প্রবেশিছে বনদ্বারে ত্যজি সিংহাসন
মুকুটবিহীন রাজা পক্ককেশজালে
ত্যাগের মহিমাজ্যোতি লয়ে শান্ত ভালে।

—চৈতালি, তপোবন (১৩০২ চৈত্র ১৯)

তপোবনের এই চিত্র তিনি পেয়েছিলেন প্রধানতঃ কালিদাসের শকুন্তলা ও রঘুবংশ কাব্যে। শকুন্তলার সুস্পষ্ট ছাপ আছে এই তিনটি লাইনে—

ঋষিকন্যাদলে
পেলব যৌবন বাঁধি পরুষ বল্কলে
আলবালে করিতেছে সলিল সেচন।

চিত্রের বাকি অংশ পাওয়া যায় রঘুবংশে। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের একটি সামগ্রিক রূপের চিত্রও তিনি পেয়েছিলেন মুখ্যতঃ রঘুবংশ কাব্যেই।—

দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট্,
অযোধ্যা, পঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধতললাট।…
ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা।

—চৈতালি, প্রাচীন ভারত (১৩০৩ শ্রাবণ ১)

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মহিমামণ্ডিত এই যে প্রাচীন ভারত, তার আদর্শায়িত ভাবরূপ পরবর্তী কালে দেখা দিয়েছে নৈবেদ্য কাব্যে (১৯০১), আর তার মোহনীয় সৌন্দর্যময় কাব্যরূপ দেখা দিয়েছে কল্পনা (বর্ষা-মঙ্গল, স্বপ্ন, মদনভস্মের পূর্বে, মদনভস্মের পরে, প্রকাশ ইত্যাদি কবিতায়) এবং ক্ষণিকা (সেকাল) কাব্যে (১৯০০)। আর তার কর্মময় বাস্তবরূপ দেখা দেয় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। এস্থলে তার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। চৈতালি কাব্যের সময়ে শুধু প্রাচীন ভারতের রূপ ও আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে স্বপ্নমুগ্ধ ও কর্মোন্মুখ করে নি, কালিদাসের ব্যক্তিত্বও তাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করেছিল। কালিদাসকে তিনি দেখেছেন দুই রূপে— এক তাঁর সৌন্দর্যভোগাসক্ত কবিরূপ, আর তাঁর সমস্ত তুচ্ছতার উর্ধ্বে অবস্থিত অনাসক্ত ব্যক্তিরূপ। চৈতালি কাব্যে কালিদাসের কবিসত্তাই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে বেশি, তাঁর ব্যক্তিসত্তার পরিচয় আছে একটিমাত্র সনেটে। 'কালিদাসের প্রতি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

আজ তুমি কবি শুধু, নহ আর কেহ—
কোথা তব রাজসভা, কোথা তব গেহ,
কোথা সেই উজ্জয়িনী।...আজ মনে হয়
ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
অলকার অধিবাসী।

'মানসলোক' কবিতাটিতেও এই ভাবটির অনুবৃত্তি চলেছে। কালিদাসকে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

আজিও মানসধামে করিছ বসতি ;
চিরদিন রবে সেথা, ওহে কবিপতি।...
নৃপতি বিক্রমাদিত্য, নবরত্নসভা,
কোথা হতে দেখা দিল স্বপ্ন ক্ষণপ্রভা।
সে স্বপ্ন মিলায়ে গেল, সে বিপুলচ্ছবি,
রহিলে মানসলোকে তুমি চিরকবি।

এই যে কবিস্বরূপের চিত্রখানি, তারই দৃষ্টান্ত বহন করছে অপর তিনটি কবিতা। কবিতা-তিনটি কালিদাসের তিনখানি কাব্য অবলম্বনে রচিত। 'ঋতুসংহার' কবিতায় (১৩০২ চৈত্র ২১) সৌন্দর্য-ভোগাসক্ত কবির চিত্র ফুটে উঠেছে।—

হে কবীন্দ্র কালিদাস, কল্পকুঞ্জবনে
নিভৃতে বসিয়া আছ প্রেয়সীর সনে
যৌবনের যৌবরাজ্যে সিংহাসন 'পরে।...
নাই দুঃখ নাই দৈন্য, নাই জনপ্রাণী,
তুমি শুধু আছ রাজা, আছে তব রানী।

এই মিলনচিত্রের পরেই বিরহের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'মেঘদূত' কবিতাটিতে (১৩০২ চৈত্র ২১)।—

মিলনের মরীচিকা,
যৌবনের বিশ্বগ্রাসী কত অহমিকা
মুহূর্তে মিলায়ে গেল...বিশ্বসভামাঝে
তোমার বিরহবীণা সকরুণ বাজে।

ঋতুসংহার এবং মেঘদূতের ঐতিহাসিক পৌর্বাপর্যও এই দুটি কবিতায় অভ্রান্তরূপে প্রতিফলিত হয়েছে। অতঃপর কুমারসম্ভব গান (১৩০৩ শ্রাবণ ১৫)।—

যখন শুনালে কবি, দেবদম্পতিরে
কুমারসম্ভব গান···কভু স্মিত হাসে
কাঁপিল দেবীর ওষ্ঠ, কভু দীর্ঘশ্বাস
অলক্ষ্যে বহিল, কভু অশ্রুজলোচ্ছ্বাস
দেখা দিল আঁখিপ্রান্তে,— যবে অবশেষে
ব্যাকুল সরমখানি নয়ননিমেষে
নামিল নীরবে,— কবি, চাহি দেবীমুখপানে
সহসা থামিলে তুমি অসমাপ্ত গানে।

এই অপূর্ব সুন্দর কল্পনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ এককালেই এই কাব্যখানির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ও এটির অসম্পূর্ণতার কারণ নির্দেশ করলেন এবং কালিদাসের রুচিবোধ ও ব্যক্তিত্বেরও আভাস দিলেন।

কালিদাসের ব্যক্তিত্বসন্ধানের আগ্রহ আর-একটু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে 'কাব্য' নামক সনেটটিতে (১৩০৩ শ্রাবণ ১১)। পূর্বে বলা হয়েছে কালিদাস মানসলোকের চিরকবি, চিরানন্দময় অলকার অধিবাসী, যেখানে নাই দুঃখ, 'নাই দৈন্য'। তার পরেই মনে হল ব্যক্তি কালিদাসের কথা। তাই তাঁকে সম্বোধন করে আধুনিক কবির এই উক্তি—

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মত,
হে অমর কবি ? ছিল নাকি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন ?···
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য আঘাতের কোনো চিহ্ন নাই।
জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

এখানে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের পরিবেশ ও তৎকালীন জীবনসংঘাতের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কিন্তু তাঁকে তিনি এ সকলের ঊর্ধ্বে অবস্থিত সৌন্দর্য ও আনন্দের কবিরূপেই দেখছেন।

৭

অতঃপর রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে কাব্য ও কল্পনার উপজীব্য না করে প্রবন্ধ ও আলোচনার বিষয়রূপেই উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমেই পাই গৌণভাবে কাদম্বরীচিত্র এবং কাব্যের উপেক্ষিতা

প্রবন্ধ-দুটিতে (১৯০০)। দুটিরই উদ্দেশ্য কাব্যসৌন্দর্যবিশ্লেষণ। কাদম্বরীচিত্রে তিনি স্পষ্ট করেই বললেন— "আনন্দদানকে উদ্দেশ্য করিয়া কাব্যরচনা সংস্কৃতসাহিত্যে কালিদাসে প্রথম দেখা গেল"। অতঃপর তিনি একে একে ঋতুসংহার, মেঘদূত, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ এই সবগুলি কাব্য যে 'চিত্তবিনোদনের জন্য লিখিত' সে কথা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। কেবল কুমারসম্ভব প্রসঙ্গে কালিদাসের যুগপরিবেশের কথা উত্থাপন করলেন।—

কালিদাসের কুমারসম্ভবে গল্প নাই; যেটুকু আছে…তাহাও অসমাপ্ত। দেবতারা দৈত্যহস্ত হইতে কোনো উপায়ে পরিত্রাণ পাইলেন কি না-পাইলেন সে সম্বন্ধে কবির কিছুমাত্র ঔৎসুক্য দেখিতে পাই না; তাঁহাকে তাড়া দিবার লোকও নাই। অথচ বিক্রমাদিত্যের সময়ে শকহূণরূপী শত্রুদের সঙ্গে ভারতবর্ষের খুব একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছিল এবং স্বয়ং বিক্রমাদিত্য তাহার একজন নায়ক ছিলেন। অতএব দেবদৈত্যের যুদ্ধ এবং স্বর্গের পুনরুদ্ধার-প্রসঙ্গ তখনকার শ্রোতাদের নিকট বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইবে এমন আশা করা যায়। কিন্তু কই? রাজসভার শ্রোতারা দেবতাদের বিপৎপাতে উদাসীন।…রাজশ্রোতারা যদি গল্পলোলুপ হইতেন তবে কালিদাসের লেখনী হইতে তখনকার কালের কতকগুলি চিত্র পাওয়া যাইত।

—প্রাচীন সাহিত্য, কাদম্বরীচিত্র (১৩০৬ মাঘ)

কালিদাস তাঁর যুগপরিবেশ সম্বন্ধে একান্তই উদাসীন ছিলেন, তাই তাঁর হাত থেকে তখনকার কালের কোনো চিত্র পাওয়া গেল না— এটাই রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপের বিষয়। কালিদাসের কাছ থেকে সেকালের পরিবেশ সম্বন্ধে গভীরতর কোনো চিন্তার প্রত্যাশা তখনও তাঁর মনে জাগে নি। ফলে কালিদাসের ব্যক্তিত্ববৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কোনো অভিমত তিনি প্রকাশ করেন নি।

'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'নববর্ষা' (১৩০৮ শ্রাবণ) রচনাটিতেও কালিদাসের পরিবেশের উল্লেখ আছে।—

মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়— বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

এখানেও রসবিচারেরই অবতারণা। তার বেশি আর অগ্রসর হন নি।

এর কয়েক মাস পরেই দেখি রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে ব্যাপকতর পটভূমিকায় চিত্রিত করে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছেন এবং কালিদাসের কাব্যের গভীরতর বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তার প্রমাণ আছে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে (১৩০৮ পৌষ)। ওই প্রবন্ধে তিনি কালিদাসকে দেশকালনিরপেক্ষ চিরন্তন কবি বলে অঙ্কিত করেন নি। রামায়ণ-মহাভারতের কবিদের ন্যায় কালিদাসও প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, তৎকালীন মহত্তম জীবনাদর্শের ধারক ও বাহক; নিছক সৌন্দর্যরসপিপাসু কবিমাত্র নয়, উচ্চতর জীবনতত্ত্ব ও ধর্মবোধের প্রেরণা তাঁর কাব্যকে নিয়ন্ত্রিত ও শান্ত মহিমায় মণ্ডিত করেছে— এই অভিমতই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে।—

মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম এবং বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের ও ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে। তাঁহার কাব্য সৌন্দর্যবিলাসেই শেষ হইয়া যায় না, তাহাকে অতিক্রম করিয়া তবে কবি ক্ষান্ত হইয়াছেন।··· তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে, তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে।···

ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ·· ভারতবর্ষীয় সংহিতায় নরনারীর সংযত সম্বন্ধ কঠিন অনুশাসনের আকারে আদিষ্ট, কালিদাসের কাব্যে তাহাই সৌন্দর্যের উপকরণে গঠিত।

—প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা

অর্থাৎ কালিদাসের জীবনাদর্শ তদানীন্তন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রেরই অনুবর্তী। উভয়েরই লক্ষ্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও সমাজকল্যাণ।

দেখা গেল, এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে সৌন্দর্যসর্বস্ব কবি বলে মনে করেন নি, তাঁর কাব্য-প্রেরণাকেও কল্যাণমুখী বলেই অনুভব করেছেন। এখানেই কালিদাসের ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের চোখে অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

পরবর্তী 'শকুন্তলা' প্রবন্ধেও (১৩০৯ আশ্বিন) এই তত্ত্বই পরিস্ফুট হয়েছে বিশদতর বিশ্লেষণের মধ্যে।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রাচীন ভারতসংস্কৃতির ইতিহাসের পটভূমিকায় স্থাপন করে কালিদাসকে শুধু রসের দৃষ্টিতে নয়, সত্যের দৃষ্টিতেও দেখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রবন্ধটিতে (১৩০৯ শ্রাবণ)।—

কুমারসম্ভব প্রভৃতি কাব্য পড়িলে দেখিতে পাই, শিব যখন ভারতবর্ষের মহেশ্বর তখন কালিকা অন্যান্য মাতৃকাগণের পশ্চাতে মহাদেবের অনুচরীবৃত্তি করিয়াছিলেন। ক্রমে কখন তিনি করাল মূর্তি ধারণ করিয়া শিবকে অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইলেন তাহার ক্রমপরম্পরা নির্দেশ করার স্থান ইহা নহে, ক্ষমতাও আমার নাই। কুমারসম্ভব কাব্যে বিবাহকালে শিব যখন হিমাদ্রিভবনে চলিয়াছিলেন তখন তাঁহার পশ্চাতে মাতৃকাগণ এবং

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।

তাঁহাদেরও পশ্চাতে কপালভূষণা কালী প্রকাশ পাইতেছিলেন। এই কালীর সহিত মহাদেবের কোনো ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ ব্যক্ত হয় নাই।

মেঘদূতে গোপবেশী বিষ্ণুর কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু মেঘের ভ্রমণকালে কোনো মন্দির উপলক্ষ্য করিয়া বা উপমাচ্ছলে কালিকাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। স্পষ্টই দেখা যায়, তৎকালে ভদ্রসমাজের দেবতা ছিলেন মহেশ্বর।

—সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৩০৯ শ্রাবণ)

এ প্রসঙ্গে 'কালিদাস' নামটার ঐতিহাসিক তাৎপর্যও বিবেচনার যোগ্য। যা হক, কালিদাসের কাব্য অবলম্বনে তৎকালীন ইতিহাস জানবার আগ্রহ এখানে সুস্পষ্ট। এই আগ্রহ পরে কালিদাসের ব্যক্তিত্ব নিরূপণের চেষ্টায় পরিণত হয়েছিল। সে কথা যথাস্থানে আলোচিত হবে।

অতঃপর কয়েক বৎসরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা প্রবন্ধে কালিদাসের উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ দেখা যায় না। অবশ্য সৌন্দর্যবোধ (১৯০৬), সাহিত্যসৃষ্টি (১৯০৭) প্রভৃতি নানা প্রবন্ধেই বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি কালিদাসের কথা উত্থাপন করেছেন। কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গের উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব নেই, অন্ততঃ বর্তমান আলোচনার পক্ষে।

৮

সুতরাং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের কালিদাসচর্চার প্রথম পর্যায় এখানেই শেষ হল। মোটামুটি হিসাবে এই পর্যায়ের আরম্ভ ১৮৮৭ সালের কাছাকাছি সময়ে এবং শেষ ১৯০২ সালে। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই কালিদাস-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং জীবনস্মৃতিতে তার উল্লেখ করেছিলেন। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর কালিদাসচর্চার পর্যায় নির্ণয়ে সে সময়ের কথা গণনায় আনা হল না। এই প্রথম পর্যায়েরও দুই ভাগ। এক ভাগ চৈতালিকাব্য-রচনার (১৮৯৬) পূর্ববর্তী, আর-একভাগ তার পরবর্তী। রবীন্দ্রনাথ যে এক সময়ে কালিদাসের সব কাব্য এক সঙ্গে আগাগোড়া পড়েছিলেন, তা সম্ভবতঃ এই দ্বিতীয় পর্বের কথা। পূর্বে দেখেছি কালিদাসের কাব্য পড়ে রবীন্দ্রনাথ যে আনন্দ পেয়েছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'সে তো আবৃত্তির আনন্দ নয়, সৃষ্টির আনন্দ'। সে আনন্দ ধরা দিয়েছে তাঁর রচিত কাব্যে— চৈতালিতে কল্পনায় ক্ষণিকায়। এই কাব্যগুলিতেই দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথ কবি কালিদাসকে তাঁর কাব্যকে ও তাঁর কালের ভারতবর্ষকে নূতন করে সৃষ্টি করেছেন বাস্তবের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে। যে-সব বিশেষ রচনায় তাঁর এই নূতন সৃষ্টির আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে সেগুলির কথা যথাস্থানেই বলা হয়েছে। এগুলি সম্বন্ধে অনায়াসেই বলা যায়, অর্ধেক বাস্তব সে যে অর্ধেক কল্পনা। বস্তুতঃ কালিদাসের কাব্য পড়ে আমরা তাঁকে, তাঁর কাব্যকে ও তাঁর ভারতবর্ষকে যে রূপে পাই, রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় অভিরঞ্জিত হয়ে তাই আমাদের কাছে প্রকাশ পায় নূতন আলোকে, নূতন রূপে ও রঙে। এইখানেই তাঁর সৃষ্টি-আনন্দের সার্থকতা। 'আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা', এই কবিবাক্যটি কালিদাস ও তাঁর দেশকাল সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বস্তুতঃ কালিদাসের ব্যক্তিত্ব ও কাব্য অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে মানসজগৎ সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক কালে আমরা সেই কল্পলোকেরই অধিবাসী।

> প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
> সুখের দুখের কাহিনী ;
> পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
> অতীতের যত রাগিণী।

পুরাতন সেই গীতি,
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নীতি।
—উৎসর্গ, ১৩

এই অনুভূতি নিয়েই রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের জগৎকে নূতন করে সৃষ্টি করে তাকে এক অপূর্ব কল্পলোকে রূপান্তরিত করেছেন। কিন্তু একা রবীন্দ্রনাথই সেই কল্পলোকের অধিবাসী নন, আমরা সকলেই তার অধিবাসী। কেননা, কবি নিজেই বলেছেন—

সে আমি সবারে বিশ্বজনারে করেছি দান ;···
বলেছি যে কথা করেছি সে কাজ,
আমার সে নয় সবার সে আজ।

তাই আমরা আজ রবীন্দ্রসৃষ্ট কালিদাসলোকের উত্তরাধিকারী এবং 'এই আনন্দে গর্বে বেড়াই নেচে'।

৯

এই তো গেল সৃষ্টি-আনন্দের কথা, তার পরে আসে আবিষ্কারের আনন্দ। সে প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বে কালিদাস ও তাঁর কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ও কল্পনা কতখানি প্রেরণা পেয়েছিল সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা অসংগত হবে না। কালিদাসের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা শুধু কাব্যকল্পনার সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, স্পর্শ করেছিল তাঁর জীবন ও কর্মাদর্শকেও।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনা কালিদাসের দ্বারা কিভাবে উদ্রিক্ত হয়েছিল তার কিছু পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। এই প্রেরণা যে পরবর্তী কালেও বিরত হয় নি তার প্রমাণ হিসাবে বিভিন্ন সময়ের রচনা থেকে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।

উৎসর্গ কাব্যের আটচল্লিশ-সংখ্যক কবিতাটির (১৩০৯)

যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন,
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
তাঁর কতমত ছিল আয়োজন,
ছিল কতশত উপকরণ।

কিংবা পূরবী কাব্যের 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির (১৩৩০)

তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি তব তপোবনে।

অথবা মহুয়া কাব্যের 'উজ্জীবন' কবিতাটির (১৩৩৬)

ভস্ম-অপমান-শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
রুদ্রবহ্নি হতে লহো জ্বলদর্চি-তনু।

ইত্যাদি কল্পনার পিছনে রয়েছে কুমারসম্ভব কাব্যের পরোক্ষ প্রেরণা। শেষ সপ্তক কাব্যের (১৩৪২) আটত্রিশ-সংখ্যক কবিতায় যক্ষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

আজ তুমি হয়েছ কবি,
ধ্যানোদ্ভবা প্রিয়া
বক্ষ ছেড়ে বসেছে তোমার মর্মতলে
বিরহের বীণা হাতে।
আজ সে তোমার আপন সৃষ্টি
বিশ্বের কাছে উৎসর্গ-করা॥

সানাই কাব্যের 'যক্ষ' কবিতায় (১৯৩৮) আছে—

যক্ষের বিরহ চলে অবিশ্রাম অলকার পথে
পবনের ধৈর্যহীন রথে…
সমুৎসুক বলাকার ডানার আনন্দ-চঞ্চলতা,
তারি সাথে উড়ে চলে বিরহীর আগ্রহ-বারতা
চিরদূর স্বর্গপুরে,
ছায়াচ্ছন্ন বাদলের বক্ষোদীর্ণ নিঃশ্বাসের সুরে॥

কালিদাসের কাব্য-উৎস থেকে উৎপন্ন হয়ে রবীন্দ্রনাথের কল্পনাধারা যে কত বিচিত্র পথে প্রবাহিত হয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ এই কয়টি দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু কল্পনা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবনাকেও কালিদাস কতখানি প্রেরণা জুগিয়েছেন তার নিদর্শন-স্বরূপ প্রথমেই উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথের প্রেমাদর্শের কথা। কালিদাস-নির্দিষ্ট যে প্রেমাদর্শ, তা প্রতিষ্ঠিত ধর্মানুগ যথার্থ মনুষ্যত্বের উপরে ; প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা নয়, তার চরম পরিণতি কল্যাণে —এ কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যেও এই আদর্শই প্রতিফলিত হয়েছে বহু বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে। চিত্রাঙ্গদা নাটকের (১৮৯২) প্রেমাদর্শে যে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যেরই প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রচ্ছন্ন নয়। 'বিদায়-অভিশাপে'ও (১৮৯৩) এই আদর্শই দেখা দিয়েছে নূতন রূপে। বস্তুতঃ 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) থেকে 'তপতী' পর্যন্ত (১৯২৯) সর্বত্রই এই ধর্মনিষ্ঠ প্রেমই প্রকাশ পেয়েছে নব নব অবস্থায় ও নব নব রূপে।

এই প্রেমাদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত শিবের আদর্শ। কালিদাস ছিলেন শিবের উপাসক, রবীন্দ্রনাথও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে শিব যে বিস্ময়কর বিচিত্র মূর্তিতে প্রকাশিত হয়েছে তা

কালিদাসের কল্পনারও অতীত। রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় নাটকে ও প্রবন্ধে ক্ষণে ক্ষণেই শিবের বিচিত্র বিভূতি প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যকে উদ্‌ভাসিত করে তুলেছে।—

হে রুদ্র, তোমার ললাটের যে ধ্বক্ ধ্বক্ অগ্নিশিখার স্ফুলিঙ্গমাত্রে অন্ধকার গৃহের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে সেই শিখাতেই লোকালয়ে সহস্রের হাহাধ্বনিতে নিশীথরাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শম্ভু, তোমার নৃত্যে তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য ও মহাপাপ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।... পাগল, তোমার এই রুদ্র আনন্দে যোগ দিতে আমার হৃদয় যেন পরাঙ্মুখ না হয়।...নৃত্য করো, হে উন্মাদ, নৃত্য করো। এই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ কোটি যোজনব্যাপী উজ্জ্বলিত নীহারিকা যখন ভ্রাম্যমাণ হইতে থাকিবে তখন আমার বক্ষের মধ্যে ভয়ের আক্ষেপে যেন রুদ্রসংগীতের তাল কাটিয়া না যায়। হে মৃত্যুঞ্জয়, আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই জয় হউক।

—বিচিত্র প্রবন্ধ, পাগল (১৯০৪)

শিবের এই যে অপূর্ব অভিব্যক্তি ও অপূর্ব বন্দনা, তা কালিদাসের যুগে ভাবনার অতীত ছিল। মহুয়া কাব্যের

কুহেলি গেল, আকাশে আলো দিল যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।

—সাগরিকা (১৯২৭)

এরূপ কল্পনা কালিদাসের পক্ষে অভাবনীয় ছিল না। তাঁর পক্ষে অভাবনীয় ছিল, এরূপ শিবকল্পনা রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রচুর। এখানে কয়েকটিমাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হবে।—

ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা বাছা!
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা!

—বলাকা, ১ (১৯১৪)

কালীরে রহে বক্ষে ধরে শুভ্র মহাকাল,
বাঁধে না তাঁরে কালো কলুষজাল।

—পরিশেষ, মোহানা (১৯২৭)

প্রলয়-নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে।

—তপতী (১৯২৯)

রবীন্দ্রনাথের শিবকল্পনা বোধ করি চরম পরিণতি লাভ করেছে তাঁর নটরাজ নাট্যকাব্যখানিতে। এই কাব্যের মর্মকথা বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হয়ে প্রকাশ পায়, তার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হতে থাকে। অন্তরে বাহিরে

মহাকালের এই বিরাট্ নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।

—নটরাজ (১৯২৭), ভূমিকা

এই কাব্যের উদ্‌বোধন-কবিতায় নটরাজকে 'তুমি মোর গুরু' বলে সম্বোধন করে তিনি বলছেন—

নটরাজ, আমি তব
কবিশিষ্য, নাটের অঙ্গনে তব মুক্তিমন্ত্র লব

তার পরেই আছে—

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র-ভানু।···
মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।···
জীবনমরণ-নাচের ডমরু
বাজাও জলদমন্দ্র হে।
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিতবিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

এস্থলে এ কথা উল্লেখ করা উচিত যে, এই শেষ গানটির মূলভাবের সঙ্গে প্রথম বয়সের রচনা প্রভাত-সংগীত কাব্যের (১৮৮৩) 'মহাস্বপ্ন' এবং 'সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়' কবিতা-দুটির মূলভাবের আশ্চর্য মিল দেখা যায়। আর, পূর্বোদ্ধৃত 'কালীরে রহে বক্ষে ধরি কালো কলুষজাল' এই লাইনটি স্মরণ করিয়ে দেয় কবির কিশোর বয়সের লেখা 'হরহৃদে কালিকা' কবিতাটির কথা।

রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার বিস্তৃততর পরিচয় আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক। তবে এ কথা বলা প্রয়োজন যে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ই শিবাদর্শের অনুরাগী, উভয়ই তৎকালপ্রচলিত শিবাদর্শকে অনেক ঊর্ধ্বে উন্নীত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে সর্বতোভাবেই কালিদাসের অনুবর্তী নন।

এ প্রসঙ্গে এ কথাও স্মরণীয় যে, মধ্যযুগে বাংলাদেশের সংস্কৃতি যখন পতনের চরমসীমায় উপনীত তখন শিবাদর্শও বিকৃত হয়ে জনচিত্তকে কলুষিত করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মহৎ শিবাদর্শ লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত ও তৎস্থলে অতি নীচু স্তরের জনসংস্কৃতির জয় ঘোষিত হয়েছে— এজন্য রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষেই আন্তরিক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আজ তাঁরই কাব্যপ্রেরণার ফলে বাংলার সংস্কৃতিতে শিবাদর্শ শুধু যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নয়, কালিদাসকল্পিত আদর্শের চেয়েও ঊর্ধ্বতর স্তরে উন্নীত হয়েছে।

কালিদাসের কাব্যপাঠের অন্যতম অনিবার্য ফল পাঠকচিত্তে সামগ্রিক ভারতবোধ ও ইতিহাস-চেতনার জাগরণ। কুমারসম্ভবে পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ পূর্বাপর-তোয়নিধি-বগাঢ় দেবতাত্মা হিমালয়ের

বর্ণনা, মেঘদূতে রামগিরি থেকে হিমালয় পর্যন্ত ভারতখণ্ডের বর্ণনা, রঘুবংশে লঙ্কা থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত ভারতভূমির নদী-গিরি-অরণ্যের বর্ণনা (ত্রয়োদশ সর্গ) এবং রঘুর দিগ্‌বিজয় (চতুর্থ সর্গ) ও ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভার (ষষ্ঠ সর্গ) বর্ণনাপ্রসঙ্গে সমগ্র ভারতের জনপদ-পরিচয়— এইসব বিভিন্ন উপলক্ষে কালিদাস তৎকালীন ভারতের যে সামগ্রিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তা শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, যে-কোনো মনোযোগী পাঠকের চিত্তকেই ভারতসচেতন করে তোলে। রবীন্দ্রসাহিত্যে যে প্রাচীনভারতবোধ ও ইতিহাসদৃষ্টির অজস্র নিদর্শন পরিকীর্ণ হয়ে আছে, তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রেরণা-উৎস হচ্ছে কালিদাসের কাব্য :—

> হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
> অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারবার
> শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরেছিল বিচিত্র মূরতি।
> ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
> দুর্গম দুঃসহ মৌন।
>
> —উৎসর্গ, ২৮

ইত্যাদি রচনাটির কল্পনাপ্রবাহ উৎসারিত হয়েছে কুমারসম্ভব কাব্যের তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে। রবীন্দ্রনাথের ভারতচেতনা ও কালিদাসের কাব্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের অধিকতর বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এই একটি দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত।

প্রাচীনভারতচেতনা ও ইতিহাসবোধের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনাও অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। একটি আর-একটির অপরিহার্য পরিণাম। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই সংস্কৃতিচেতনারও অন্যতম মুখ্য উৎস কালিদাসের কাব্য। এককালে রবীন্দ্রনাথ যে তপোবন ও ব্রাহ্মণ্যমহিমার আদর্শের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার কারণও তাই। কেননা, কালিদাসের সাহিত্যের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তা মূলতঃ তপোবনের আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্যমহিমা নিয়েই গঠিত। তাই দেখতে পাই, চৈতালির সময় থেকেই রবীন্দ্রসাহিত্যে তপোবন-প্রশস্তি নানা উপলক্ষ্যেই উদ্‌ঘোষিত হয়েছে। চৈতালির 'তপোবন' কবিতাটির (১৮৯৬) কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তারও বহু পূর্বে বালক রবীন্দ্রনাথ যখন গৃহশিক্ষকদের কাছে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার প্রথম পাঠ গ্রহণ করছিলেন তখনই তাঁর কিশোর-চিত্তে তপোবনের একটি স্বপ্নময় চিত্র অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর প্রথম-প্রকাশিত রচনা 'অভিলাষ' কবিতাটিতেই (১৮৭৪)।—

> নিরজন তপোবনে বিরাজে সন্তোষ।
> পবিত্র ধর্মের দ্বারে সন্তোষ-আসন ॥
>
> —অভিলাষ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১২৮১ অগ্রহায়ণ)

'কল্পনা'র 'ভারতলক্ষ্মী' গানের 'প্রথম সামরব তব তপোবনে' লাইনটি সকলেরই সুবিদিত। উৎসর্গ কাব্যের প্রাচীনভারত-প্রশস্তির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,—
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।
—উৎসর্গ, ১৬

সর্বশেষে কবির নববর্ষের গানটি স্মরণ করি।—

যে-জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে-জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥
—গীতবিতান (১ম সং), পৃ ২৪৬

এই তপোবনের আদর্শের মূলে রয়েছে ব্রাহ্মণের তপস্যা।—

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক্ গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।
হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয়গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণমহিমা॥
—চৈতালি, প্রাচীন ভারত (১৮৯৬)

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ তপোবনকে ব্রাহ্মণ্যমহিমার তথা ভারতসংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাভূমিরূপেই উপলব্ধি করেছিলেন। আর, কালিদাস যে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিকেই ভারতসংস্কৃতি বলে মেনে নিয়েছিলেন, তা বিদেশী ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিও এড়ায় নি।—

Kalidasa appears to us as the embodiment in his poems, as in his dramas, of the Brahmanical ideal of the age of the Guptas...We must rather be grateful that we have preserved in such perfection the poetic reflex of the Brahmanical ideal.

—Keith, *History of Sanskrit Literature*, pp. 98, 100

কীথ সাহেব তাঁর সংস্কৃত নাটকের ইতিহাস গ্রন্থেও কালিদাসের unfeigned devotion to the Brahmanical creed of his time-এর কথা উল্লেখ করেছেন (পৃ ১৬০)।

সুতরাং কালিদাসপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথও যে এককালে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি আন্তরিকভাবেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু কালিদাস-অনুরক্তিই তার একমাত্র হেতু এ কথা মনে করা হয়তো সংগত হবে না। তদানীন্তন যুগধর্মের প্রেরণাও এর মূলে সক্রিয় ছিল।

কালিদাস লিখেছেন, 'তদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য চাপলায় প্রণোদিতঃ'। অনুরূপভাবেই তপোবন ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের আদর্শে প্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথও তাকে কর্মসাধনার রূপ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারই পরিণতি ঘটে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। সে বিবরণ পাওয়া যায় 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তকে আর তাঁর জীবনচরিতে।

শুধু আশ্রমজীবনে নয়, আমাদের সমাজজীবনেও ব্রাহ্মণ্য আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ব্রতী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রচারের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল বঙ্গদর্শন (নব পর্যায়) পত্রিকা। তার নিদর্শন রয়েছে 'ভারতবর্ষ' গ্রন্থের 'ব্রাহ্মণ' ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধে। কিন্তু এ বিষয়ের অধিকতর অনুসরণ আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এস্থলে বলা প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতি এই আসক্তি রবীন্দ্রনাথের মন থেকে কালক্রমে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তপোবন সম্বন্ধে বোধ করি সে কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না।

১০

এবার কালিদাসের ব্যক্তিত্ব-আবিষ্কারের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ব্যক্তিত্বের বিকাশ স্বভাবতই ঘটে বয়স ও মননক্ষমতার বৃদ্ধির সঙ্গে। সাহিত্যবিচারের প্রমাণে ঐতিহাসিকরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, ঋতুসংহার কাব্য ও মালবিকাগ্নিমিত্র নাটক কালিদাসের অল্প বয়সের রচনা, আর শকুন্তলা নাটক ও রঘুবংশ কাব্য তাঁর পরিণত বয়সের লেখা। সুতরাং এই সাহিত্যিক ক্রমপরিণতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বেরও বিকাশ ঘটেছিল এ কথা মনে করা অসংগত নয়। এই ব্যক্তিত্ববিকাশের একটি দিকের (বোধ করি সব চেয়ে গুরুত্বময় দিকের) প্রতি রবীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।—

> এ কথা মনে রাখতে হবে, যাঁরা যথার্থ গুণী তাঁরা একটি সহজ কবচ নিয়ে পৃথিবীতে আসেন। ফরমাশ তাঁদের গায়ে এসে পড়ে, কিন্তু মর্মে এসে বিদ্ধ হয় না। এইজন্যেই তাঁরা মারা যান না, ভাবী কালের জন্য টিঁকে থাকেন। লোভে পড়ে ফরমাশ যারা সম্পূর্ণ স্বীকার করে নেয়, তারা তখনই বাঁচে, পরে মরে। আজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অনেকগুলিকেই কালের ভাঙাকুলো থেকে খুঁটে বের করবার জো নেই। তাঁরা রাজার ফরমাশ পুরোপুরি খেটেছিলেন, এইজন্যে তখন হাতে-হাতে তাঁদের নগদ-পাওনা নিশ্চয়ই আর-সকলের চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু কালিদাস ফরমাশ খাটতে অপটু ছিলেন বলে দিঙ্‌নাগের স্থূলহস্তের মার তাঁকে বিস্তর খেতে হয়েছিল। তাঁকেও দায়ে পড়ে মাঝে মাঝে ফরমাশ খাটতে হয়েছে, তার প্রমাণ পাই মালবিকাগ্নিমিত্রে। যে দুই তিনটি কাব্যে কালিদাস রাজাকে মুখে বলেছিলেন, 'যে আদেশ, মহারাজ, যা বলছেন তাই করব' অথচ সম্পূর্ণ আরএকটা কিছু করেছেন, সেইগুলির জোরেই সেদিনকার রাজসভার অবসানে তাঁর কীর্তিকলাপের অন্ত্যেষ্টিসংকার হয়ে যায় নি—চিরদিনের রসিকসভায় তাঁর প্রবেশ অবারিত হয়েছে।
>
> —পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ২৪. ৯. ১৯২৪

এই কথাগুলির ইঙ্গিত এই যে, রাজাদের রুচি ও রসবোধ সাধারণতঃ যে স্তরে থাকে, কালিদাসের রুচি ছিল তার অনেক উপরে এবং তাঁর শেষ জীবনের অন্ততঃ দুই-তিনখানি কাব্যকে তিনি রাজরুচির

স্তরে নামিয়ে আনতে সম্মত হন নি বলেই সে কাব্যগুলি কালের দরবারে স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়েছে। তার জন্যে তাঁকে অবশ্য যথেষ্ট দামও দিতে হয়েছে— নিজের জীবনকালে তাঁকে সম্ভবতঃ জনপ্রিয়তা তথা রাজপ্রসাদ থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত থাকতে হয়েছিল। জনপ্রিয়তা তথা রাজার প্রসন্নতা অর্জনের লোভ সংবরণ করেও এই যে নিজের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা, বলা বাহুল্য এ অতি দুঃসাধ্য কাজ। এই দুঃসাধ্য কাজে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি স্বকালে সম্ভবতঃ উপেক্ষিত, এমন কি লাঞ্ছিত, হয়েও উত্তরকালে অমরতা লাভ করেছেন। এতেই বোঝা যায়, তিনি কতখানি দুর্জয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। এই প্রসঙ্গে চৈতালি কাব্যের পূর্বোল্লিখিত 'কাব্য'নামক কবিতাটি পুনঃস্মরণযোগ্য। কিন্তু কালিদাসও যে রাজসন্তোষবিধানের দায় একেবারে এড়িয়ে চলতে পারেন নি তার প্রমাণ রয়েছে মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার প্রভৃতি অপরিণত বয়সের রচনাগুলিতে। এগুলিতে যে রুচি ও জীবনাদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় তা অল্পাধিক পরিমাণে রাজানুকূল্য তথা জনপ্রসন্নতা অর্জনের উপযোগী সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যে দুই-তিনখানি কাব্য কালিদাসের নামকে ক্ষণকালীনতার কবল থেকে রক্ষা করেছে সেই কুমারসম্ভব, রঘুবংশ ও শকুন্তলার মধ্যে রাজতুষ্টিলাভের প্রয়াসমাত্র নেই, বরং আছে এমনই উচ্চাঙ্গের আদর্শনিষ্ঠা যা তদানীন্তন রাজচরিত্রের একান্তই প্রতিকূল ছিল। কাব্যের সুহৃৎসম্মিত বেশে দেখা দিয়েছিলেন বলেই কালিদাস রাজরোষের বিপদ্ এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। কেননা ও-সব কাব্যে চিত্রিত জীবনাদর্শের মধ্যে তৎকালীন ভোগাসক্ত রাজচরিত্রের তিরস্কারবাণীই ধ্বনিত হয়েছিল অনতিপ্রচ্ছন্ন-রূপে। কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন। এখন সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

এই বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যাত হয়েছে 'তপোবন' প্রবন্ধটিতে (১৯০৯)। তাতে আছে—

ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্য যখন রাজা, উজ্জয়িনী যখন মহানগরী, কালিদাস যখন কবি, তখন এদেশে তপোবনের যুগ চলে গেছে। তখন মানবের মহামেলার মাঝখানে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি ; তখন চীন, শক, হূণ, পারসিক, গ্রীক, রোমক, সকলে আমাদের চারিদিকে ভিড় করে এসেছে।…সেদিনকার ঐশ্বর্যমদগর্বিত যুগেও তখনকার শ্রেষ্ঠ কবি তপোবনের কথা কেমন করে বলে গেছেন তা দেখলেই বোঝা যায় যে, তপোবন যখন দৃষ্টির বাহিরে গেছে তখনো কতখানি আমাদের হৃদয় জুড়ে বসেছে।

কালিদাস যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের কবি তা তাঁর তপোবনচিত্র থেকেই সপ্রমাণ হয়। এমন পরিপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে তপোবনের ধ্যানকে আর কে মূর্তিমান্ করতে পেরেছে ?

—শিক্ষা, তপোবন (১৩১৬ পৌষ)

এই তপোবননিষ্ঠা কালিদাসের পরিণত চিত্তপ্রবণতারই পরিচায়ক। তাই এই আদর্শের মাপে তাঁর কাব্যের পৌর্বাপর্যনির্ণয়ও সম্ভব। এদিকে লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে বলেছেন—

ঋতুসংহার কালিদাসের কাঁচা বয়সের লেখা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মধ্যে তরুণতরুণীর যে মিলনসংগীত আছে তাতে স্বরগ্রাম লালসার নিচের সপ্তক থেকেই শুরু হয়েছে, শকুন্তলা-কুমারসম্ভবের মতো তপস্যার উচ্চতম সপ্তকে গিয়ে পৌছয় নি।

এই মন্তব্য মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্বশী এবং মেঘদূত সম্পর্কেও অল্পাধিক পরিমাণে প্রযোজ্য। এগুলি তপোবন-আদর্শের ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত নয়। পক্ষান্তরে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ, এই তিনটিরই ভিত্তিভূমি তপোবন। কালিদাসের চিত্তে তপোবনের প্রতি এই যে আকর্ষণ তার মূলগত হেতু কি, রবীন্দ্রনাথ তা-ই দেখিয়েছেন উক্ত প্রবন্ধটিতে।—

সমস্ত কুমারসম্ভব কাব্যটি একটি বিশ্বব্যাপী পটভূমিকার উপরে অঙ্কিত। এই কাব্যের ভিতরকার কথাটি একটি গভীর এবং চিরন্তন কথা। যে পাপদৈত্য প্রবল হয়ে উঠে হঠাৎ স্বর্গলোককে কোথা থেকে ছারখার করে দেয় তাকে পরাভূত করবার মতো বীরত্ব কোন্ উপায়ে জন্মগ্রহণ করে?

এই সমস্যাটি মানুষের চিরকালের সমস্যা। প্রত্যেক লোকের জীবনের সমস্যাও এই বটে, আবার এই সমস্যা সমস্ত জাতির মধ্যে নূতন নূতন মূর্তিতে নিজেকে প্রকাশ করে।

কালিদাসের সময়েও একটি সমস্যা ভারতবর্ষে অত্যন্ত উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা কবির কাব্য পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে জীবনযাত্রায় যে-একটি সরলতা ও সংযম ছিল তখন সেটি ভেঙে এসেছিল, রাজারা তখন রাজধর্ম বিস্মৃত হয়ে আত্মসুখপরায়ণ ভোগী হয়ে উঠেছিলেন।[১] এদিকে শকদের আক্রমণে ভারতবর্ষ বারম্বার দুর্গতি প্রাপ্ত হচ্ছিল।[২]

তখন বাহিরের দিক্ থেকে দেখলে ভোগবিলাসের আয়োজনে, কাব্য-সংগীত-শিল্পকলার আলোচনায়, ভারতবর্ষ সভ্যতার প্রকৃষ্টতা লাভ করেছিল। কালিদাসের কাব্যকলার মধ্যেও তখনকার এই উপকরণবহুল সম্ভোগের সুর যে বাজে নি তা নয়। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যের বহিরংশ তখনকার কালেরই কারুকার্যে খচিত হয়েছিল। এইরকম একদিকে তখনকার কালের সঙ্গে তখনকার কবির যোগ আমরা দেখতে পাই।

কিন্তু এই প্রমোদভবনের স্বর্ণখচিত অন্তঃপুরের মাঝখানে বসে কাব্যলক্ষ্মী বৈরাগ্যবিকলচিত্তে কিসের ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন? হৃদয় তো তাঁর এখানে ছিল না। তিনি এই আশ্চর্য কারুবিচিত্র মাণিক্যকঠিন কারাগার হতে কেবলই মুক্তিকামনা করছিলেন।

কালিদাসের কাব্যে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের, অবস্থার সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার একটা দ্বন্দ্ব আছে। ভারতবর্ষে যে তপস্যার যুগ তখন অতীত হয়ে গিয়েছিল, ঐশ্বর্যশালী রাজসিংহাসনের পাশে বসে কবি সেই নির্মল সুদূর-কালের দিকে একটি বেদনা বহন করে তাকিয়ে ছিলেন।

—শিক্ষা, তপোবন

কালিদাসের অন্তরস্থিত কবিসত্তার এই চিত্র অনিবার্যভাবেই স্মরণ করিয়ে দেয় বিলাসপুরী অলকার মণিহর্ম্যে বন্দিনী বিরহিণী যক্ষপত্নীর কথা।—

অসীম সম্পদে নিমগনা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ-বেদনা।

---

১ অনুরূপ সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী তথা তপতী নাটকের কেন্দ্রগত সমস্যা।

২ কালিদাসের যুগের এই ঐতিহাসিক পরিবেশ 'কাদম্বরীচিত্র' রচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের মনে যে ভাবের উদ্রেক করেছিল তার সঙ্গে 'তপোবন' রচনার সময়কার মনোভাব তুলনীয়। তাতে রবীন্দ্রচিত্তের ক্রমপরিণতির আভাস লক্ষিত হবে।

বিক্রমাদিত্যের আমলে উজ্জয়িনীর বিলাসপুরীতে কালিদাসও 'অনন্তসৌন্দর্যমাঝে একাকী জাগিয়া' নিশিদিন যাপন করছিলেন বিগতদিনের তপোবনচিন্তায় নিমগ্ন হয়ে।

কিন্তু কালিদাস কি শুধু সুদূর কালের দিকে তাকিয়ে বেদনা বহন করেই ক্ষান্ত ছিলেন? তিনি কি তৎকালীন জাতীয় জীবনসমস্যার কোনো সমাধানের উপায় নির্দেশ করেন নি? তাও করেছিলেন। সে কথা রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে সুস্পষ্ট হয়েই প্রকাশ পেয়েছে। কালিদাসের অন্তর ও বাহির এবং অবস্থা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য এই।—

কালিদাসের অধিকাংশ কাব্যের মধ্যেই এই দ্বন্দ্বটি সুস্পষ্ট দেখা যায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান কোথায় কুমারসম্ভবে তাই দেখানো হয়েছে। কবি এই কাব্যে বলেছেন, ত্যাগের সঙ্গে ঐশ্বর্যের, তপস্যার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্যের উদ্ভব; সেই শৌর্যেই মানুষ সকলপ্রকার পরাভব হতে উদ্ধার পায়।

অর্থাৎ, ত্যাগের ও ভোগের সামঞ্জস্যেই পূর্ণ শক্তি। ত্যাগী শিব যখন একাকী সমাধিমগ্ন তখনো স্বর্গ-রাজ্য অসহায়, আবার সতী যখন পিতৃভবনের ঐশ্বর্যে একাকিনী আবদ্ধ তখনো দৈত্যের উপদ্রব প্রবল।

প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগ ও ভোগের সামঞ্জস্য ভেঙে যায়।

এ কথার তাৎপর্য এই যে—সত্য ও শিবের মিলনেই কল্যাণের উদ্‌ভব, ভোগের মধ্যেও ত্যাগকে জয়ী করা চাই, কর্মের মধ্যেও অনাসক্ত থাকা চাই, ব্যক্তিগত ভাবেই হক আর সমাজগত ভাবেই হক রিপুর হাত থেকে রক্ষা পাবার এই একমাত্র উপায়। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। কিন্তু এই সামঞ্জস্যস্থাপনের পথ সহজ নয়। দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কবি কালিদাসও এই দুর্গম পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন কুমারসম্ভব কাব্যে।

অতঃপর শকুন্তলা নাটক সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উদ্‌ধৃত করি।—

সমস্ত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের মধ্যে ভোগলালসানিষ্ঠুর রাজপ্রাসাদকে ধিক্‌কার দিয়ে যে একটি তপোবন বিরাজ করছে, তারও মূল সুরটি ওই।

বহুকাল পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

কুমারসম্ভব এবং শকুন্তলাকে একত্র তুলনা না করিয়া থাকা যায় না। দুইটিরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক।
—প্রাচীন সাহিত্য, কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা (১৯০১)

কিন্তু একটু পার্থক্যও আছে। কুমারসম্ভবে দেবসমাজকে আসন্ন পরাভব থেকে রক্ষা করার যে সমস্যা তার সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়েছে অনাসক্ত দেবচরিত্রকে কেন্দ্র করে। পক্ষান্তরে বিক্রমাদিত্যদের আমলে ভারতবর্ষের মানবসমাজ যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তার থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় নির্দেশ করা হয়েছে অত্যাসক্ত রাজচরিত্রকে কেন্দ্র করে। পৌরাণিক ভারতের অধীশ্বর দুষ্যন্তের চরিত্রকে উপলক্ষ্যমাত্র করে শকুন্তলা নাটকে তৎকালীন ঐতিহাসিক রাজচরিত্রের প্রতি যে ধিক্‌কারবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, দীর্ঘকালের ব্যবধানে আজও তা অস্পষ্ট হয়ে যায় নি। এই ধিক্‌কার-বাণীর যদি কোনো তাৎপর্য থাকে তা হলে স্বীকার করতে হবে তৎকালে বাইরের শত্রুর আক্রমণই

ভারতবর্ষের বড় সমস্যা বলে কালিদাসের মনে হয় নি, সিংহাসনারূঢ় সমাজপতি রাজচরিত্রের অধোগতিই বড় সমস্যা বলে গণ্য হয়েছিল। কালিদাসের মতে প্রাচীনকালে অর্থাৎ তপোবনের যুগে দেশের বড় সমস্যা ছিল অতিবৈরাগ্য, আর তাঁর নিজের কালের সব চেয়ে ভয়ের কারণ হয়েছিল মানুষের অতিসম্ভোগ।

অবশ্য কুমারসম্ভব কাব্যে এই ব্যঞ্জনাও আছে যে, দেবচরিত্রের অনাসক্তিসমস্যার নিরাকরণের যথার্থ উপায় পঞ্চশরের সহায়তাগ্রহণ নয়; পঞ্চশরের কাছে আত্মসমর্পণে কল্যাণের উদ্‌ভব হতে পারে না। এই দিক্ থেকে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলার তাৎপর্য মূলতঃ এক। কুমারসম্ভবে দেবচরিত্রের অনাসক্তিই সমস্যা, তাই সেখানে মন্মথের অবতারণা অত্যাবশ্যক। শকুন্তলার রাজচরিত্রের অন্তরেই মন্মথের ঐকান্তিক প্রভুত্ব। তাই এই নাটকে মদনভস্মের বাহ্য অবতারণা করতে হয় নি। কিন্তু নিগূঢ়ভাবে এই নাটকেও ওই ঘটনা আছে – ঋষিরোষাগ্নি ও অনুতাপানলে ভিতরের দিক্ থেকে পঞ্চশরকে ভস্মসাৎ করা হয়েছে।

তা ছাড়া, উভয় ক্ষেত্রেই নিষ্কৃতিলাভের উপায়ও এক— ভোগ ও ত্যাগের সামঞ্জস্যবিধান। কিন্তু কুমারসম্ভব ও শকুন্তলায় কবি এই যে মুক্তির পথ নির্দেশ করলেন, তার ফল হল কি? এই সুহৃৎসম্মিত কবিবাণী কি তদানীন্তন রাজচরিত্রকে কল্যাণের পথের পরিচালিত করতে পেরেছিল? মনে হয় পারে নি। তারই পরিচয় আভাসিত হয়েছে রঘুবংশ কাব্যে।—

রঘুবংশের তাৎপর্যবিচার-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বিশেষভাবে স্মরণীয়:—

কালিদাস তাঁর রাজপ্রভুদের কাছে এই কথাটি নানা কাব্যে নানা কৌশলে বলেছেন যে, কঠিন তপস্যার ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো মহৎ ফললাভের কোনো সম্ভাবনা নেই। যে রঘু উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত রাজাকে বীরতেজে পরাভূত করে পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজত্ব বিস্তার করেছিলেন তিনি তাঁর পিতামাতার তপঃসাধনার ধন। আবার যে ভরত বীর্যবলে চক্রবর্তী সম্রাট্ হয়ে ভারতবর্ষকে নিজ নামে ধন্য করেছেন তাঁর জন্মঘটনায় অবারিত প্রবৃত্তির যে কলঙ্ক পড়েছিল, কবি তাকে তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ এবং দুঃখের অশ্রুজলে সম্পূর্ণ ধৌত না করে ছাড়েন নি।

যে অমিতবীর্য দেবসেনাপতির পরাক্রমে স্বর্গরাজ্যে অসুরদের আক্রমণ প্রতিহত হয়েছিল তাঁর আবির্ভাবও সম্ভব হয়েছিল কন্দর্পের পরাভব ও তপস্যার জয়ঘোষণার মধ্যে।

রঘুবংশের প্রসঙ্গ আবার অনুসরণ করা যাক।—

সংযমে তপস্যায় তপোবনে রঘুবংশের আরম্ভ, আর মদিরায় ইন্দ্রিয়মত্ততায় প্রমোদভবনে তার উপসংহার। এই শেষ সর্গের চিত্রে বর্ণনার উজ্জ্বলতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু যে অগ্নি লোকালয়কে দগ্ধ ক'রে সর্বনাশ করে সেও তো কম উজ্জ্বল নয়। এক পত্নীকে নিয়ে দিলীপের তপোবনে বাস শান্ত এবং অনতিপ্রকট বর্ণে অঙ্কিত, আর বহু নায়িকা নিয়ে অগ্নিবর্ণের আত্মঘাতসাধন অসংবৃত বাহুল্যের সঙ্গে যেন জলন্ত রেখায় বর্ণিত।

…তপস্যার দ্বারা সুসমাহিত রাজমাহাত্ম্য…স্নিগ্ধ তেজে এবং সংযত বাণীতেই মহোদয়শালী রঘুবংশের সূচনা করেছিল।…কবি…কাব্যের শেষ সর্গে বিচিত্র ভোগায়োজনের ভীষণ সমারোহের মধ্যেই রঘুবংশজ্যোতিষ্কের নির্বাপণ বর্ণনা করেছেন।

কাব্যের এই আরম্ভ এবং শেষের মধ্যে কবির একটি অন্তরের কথা প্রচ্ছন্ন আছে। তিনি নীরব দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বলছেন, ছিল কী, আর হয়েছে কী! সেকালে যখন সম্মুখে ছিল অভ্যুদয় তখন তপস্যাই ছিল সকলের চেয়ে প্রধান ঐশ্বর্য, আর একালে যখন সম্মুখে দেখা যাচ্ছে বিনাশ তখন বিলাসের উপকরণরাশির সীমা নেই আর ভোগের অতৃপ্ত বহ্নি সহস্র শিখায় জ্বলে উঠে চারি দিকের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে।

—শিক্ষা, তপোবন (১৯০৯)

কবি কালিদাসের এই যে অন্তরবেদনা, তাঁর তদানীন্তন রাজপ্রভুদের চারিত্রিক অধোগতিই যে তার হেতু, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। সমগ্র রঘুবংশের উনবিংশ সর্গে কাব্যের রসাচ্ছাদনে কবির যে অভিপ্রায়টি নিহিত রয়েছে তার মূলে আছে

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

— এই শাস্ত্রবাক্য। মেঘদূতের ভর্তৃশাপ, শকুন্তলার ঋষিভর্ৎসনা ও কুমারসম্ভবের দেবরোষ রঘুবংশ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে রাজপ্রভুদের প্রতি কবিচিত্তের প্রচ্ছন্ন অভিসম্পাতরূপে।

যে তিনখানি কাব্যে কালিদাস রাজপ্রভুদের মুখে বলেছিলেন, 'যে আদেশ, মহারাজ, যা বলছেন তাই করব', অথচ করেছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কিছু, সে তিনখানি যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ তাতে সন্দেহ নেই। এই তিনখানি কাব্যে রাজাভিপ্রায়পূরণের অর্থাৎ রাজপ্রসন্নতা অর্জনের কিছুমাত্র প্রয়াস নেই, বরং আছে রাজচরিত্রের প্রতি কবির অনতিপ্রচ্ছন্ন ভর্ৎসনাবাণী। যে কল্যাণনিষ্ঠার প্রেরণায় কবিপ্রাণ রাজপ্রসাদের প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল সেই কল্যাণনিষ্ঠাই কবির প্রতি আকর্ষণ করেছে চিরন্তনতার প্রসন্ন দৃষ্টিপাত।

রাজচ্ছন্দানুসরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কালিদাসের এই যে স্বচ্ছন্দাচার, তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে রঘুবংশ কাব্য। এই কাব্যের অবতারণাপ্রসঙ্গে কবি প্রথমেই বলেছেন, যাঁরা আজন্ম পবিত্রতায় ত্যাগে বীর্যে ধর্মনিষ্ঠায় অসামান্যতা অর্জন করেছিলেন সেই রঘুদের গুণাকৃষ্ট হয়েই তিনি তাঁদের বংশ-গাথা কীর্তন করতে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু কার্যতঃ তিনি করলেন কি? তিনি রঘুবংশের জ্ঞানী কর্মী ধর্মনিষ্ঠ গুণবান্ নৃপতিদের গুণকীর্তন করেই ক্ষান্ত হন নি, ক্ষান্ত হয়েছেন ওই বংশেরই নির্গুণ অধর্ম-পরায়ণ ভোগাসক্ত দুর্বল উত্তরাধিকারীদের পতনকাহিনী বিবৃত করে। এই প্রতিশ্রুতিলঙ্ঘনের হেতু সুস্পষ্ট। সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এ স্থলে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের একটু তুলনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কুমারসম্ভব কাব্যের কাহিনী-অংশ অর্ধপথেই সমাপ্ত হয়েছে, তাকে প্রত্যাশিত পরিণতি পর্যন্ত টেনে নেওয়া হয় নি। দেব-দম্পতির মিলনলীলা বর্ণনায় কবিচিত্তের স্বাভাবিক কুণ্ঠাই এর হেতু, এই ইঙ্গিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ চৈতালির 'কুমারসম্ভব গান' কবিতায়। তাতে কালিদাসের অন্তরের শালীনতাবোধই সূচিত হয়। পক্ষান্তরে রঘুবংশের কীর্তিকাহিনীকে কবি তাঁর প্রতিশ্রুত সীমানার বাইরেও অনেকখানি টেনে

নিয়েছেন। এরও হেতু গর্হিতের প্রতি কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক জুগুপ্সা। যা-কিছু গর্হিত, যা-কিছু অশালীন, একান্ত বিনষ্টির মধ্যেই যে তার চরম পরিণতি, এই সত্য স্থাপনের আগ্রহেই কালিদাস রঘুবংশের কাহিনীকে পতনের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে নিতে প্রণোদিত হয়েছিলেন।

রঘুবংশ কাব্যের শেষ সর্গে এসে দেখি, সূর্যপ্রভব বংশের আসমুদ্রক্ষিতীশানাং উজ্জ্বল অভ্যুদয়-মহিমা অবশেষে অগ্নিবর্ণ বিনাশের মধ্যেই অস্তমিত হল।

এর থেকে কি মনে হয় না যে, হিতৈষী কবি কালিদাস রাজপ্রভুদের আত্মহননের পথ থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন নি বলেই তিনি রঘুবংশের এই চরম অশুভ পরিণামের কথা তাঁদের শোনাতে বাধ্য হয়েছিলেন? বস্তুতঃ কালিদাসের কালের ইতিহাসেও দেখি সমুদ্রগুপ্তপ্রমুখ সম্রাট্‌গণের গৌরব-সূর্য হূণ-আক্রমণের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অগৌরবের অন্ধকারের মধ্যে তিরোহিত হল। এটাও কি তৎকালীন ঐকান্তিক ভোগবিলাস তথা রাজচরিত্রের অধোগতিরই অনিবার্য পরিণাম নয়?

যা হক, রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব, শকুন্তলা ও রঘুবংশ অবলম্বনে তৎকালীন ভারতবর্ষের তথা কবি কালিদাসের অন্তঃস্বরূপের যে অপূর্ব চিত্র উদ্‌ঘাটন করেছেন, কোনো ঐতিহাসিকের লেখনী থেকে সে রকম চিত্রের প্রত্যাশাও করা যায় না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো কবির পক্ষেই অন্য কবির কাব্য থেকে তাঁর ব্যক্তিরূপ তথা তদানীন্তন সমাজের সত্যরূপ আবিষ্কার করা সম্ভব।

১১

দেখা গেল, কালিদাস যে ঐতিহাসিক কালপরিবেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে পরিবেশে তাঁর চিত্ত তৃপ্ত ছিল না। তাঁর চিত্ত পিপাসিত ছিল, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের মতে, সুদূর বিগতকালের তপোবন-পরিবেশের জন্য। তপোবনের কাল থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁর বিরহী চিত্ত স্বকালের গণ্ডীর মধ্যে যেন নির্বাসনবেদনায় বিধুর হয়ে উঠেছিল। এই নির্বাসিতচিত্তের আর্তবাণীই যেন ধ্বনিত হয়েছে রঘুবংশ প্রভৃতি কাব্যে।

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী।
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত,
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার স্বভাষী।
সে সুদূর, আমি প্রবাসী।

এ যেন তপোবনকালের উদ্দেশে স্বকালপ্রবাসী কালিদাসের অন্তরের বেদনাসংগীত। 'তপোবন' প্রবন্ধ রচনার বহুকাল পরেও রবীন্দ্রনাথ কালিদাসচিত্তের এই নির্বাসনদুঃখের প্রসঙ্গে বলেন—

It was not the physical home-sickness from which the poet suffered, it was something more fundamental, the home-sickness of the soul. We feel from almost all his works the oppressive atmosphere of the kings' palaces of those days, dense with things of luxury, and also with the callousness of self-indulgence, albeit an atmosphere of refined culture based on an extravagant civilization.

The poet in the royal court lived in banishment-- banishment from the immediate presence of the eternal. He knew it was not merely his own banishment, but that of the whole age to which he was born, the age that had gathered its wealth and missed its well-being, built its store-house of things and lost its background of the great universe. What was the form in which his desire for perfection appeared in his drama and poems? It was the form of the *tapovana*......How the tortured mind of Kalidasa in the prosperous city of Ujjaini, and the glorious period of Vikramaditya, closely pressed by all-obstructing things and all-devouring self, let his thoughts hover round the vision of a *tapovana* for his inspiration of life!

—*The Religion of Man* (1931), ch. XII, pp. 166-68

কালিদাস-যুগের ইহসর্বস্ব ঐশ্বর্যময় সভ্যতাসংস্কৃতির এবং কালিদাসচিত্তের বেদনামাখা আকৃতির এই যে চিত্র উপরের পংক্তি-কয়টির মধ্যে অঙ্কিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তারই প্রতিভাস দেখতে পেয়েছিলেন স্বযুগের সংস্কৃতিপরিবেশ ও স্বচিত্তের গভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্যে। তাই তিনি উক্ত *The Religion of Man* গ্রন্থে (পৃ ১৬৮) কালিদাসপ্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই নিজের অন্তরের অনুরূপ নির্বাসনদুঃখের কথা জানালেন।—

It was not a deliberate copy but a natural coincidence that a poet of modern India also had the similar vision when he felt within him the misery of a spiritual banishment.

আরও পরবর্তী কালে জীবনের শেষ দশকে উপনীত হয়েও রবীন্দ্রনাথ এ কথারই পুনরাবৃত্তি করেন তাঁর একটি বাংলা প্রবন্ধে। কেননা তখনও তাঁর হৃদয় থেকে ওই নির্বাসনবেদনার নিরসন ঘটে নি। তিনি বলেন—

তপোবনের যে চিত্রটি স্থায়ীভাবে রয়ে গেছে পরবর্তী ভারতের চিত্তে ও সাহিত্যে, সেটি হচ্ছে কল্যাণের নির্মল সুন্দর মানসমূর্তি, বিলাসমোহমুক্ত বলবান্ আনন্দের মূর্তি। অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের জটিলতা আবিলতা অসম্পূর্ণতা থেকে পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা এই কাম্যলোক সৃষ্টি করেছিল ইতিহাসের অস্পষ্ট স্মৃতির উপকরণ নিয়ে। পরবর্তী কালে কবিদের বেদনার মধ্যে যেন দেশব্যাপী একটি নির্বাসনদুঃখের আভাস পাওয়া যায়, কালিদাসের রঘুবংশে তার সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। সেই নির্বাসন তপোবনের উপকরণবিরল শান্ত সুন্দর যুগের থেকে ভোগৈশ্বর্যজালে বিজড়িত তামসিক যুগে।

কালিদাসের বহুকাল পরে জন্মেছি, কিন্তু এই ছবি রয়ে গেছে আমারও মনে। যৌবনে নিভৃতে ছিলুম

পদ্মাবক্ষে সাহিত্যসাধনায়। কাব্যচর্চার মাঝখানে কখন এক সময়ে সেই তপোবনের আহ্বান আমার মনে এসে পৌঁছেছিল। ভাববিলীন তপোবন আমার কাছ থেকে রূপ নিতে চেয়েছিল আধুনিক কালের কোনো একটি অনুকূল ক্ষেত্রে। যে প্রেরণা কাব্যরূপ-রচনায় প্রবৃত্ত করে, এর মধ্যে সেই প্রেরণাই ছিল— কেবলমাত্র বাণীরূপ নয়, প্রত্যক্ষরূপ।

—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, আশ্রমের শিক্ষা (১৯৩৬)

অতীত ভারতের সঙ্গে বর্তমান ভারতের আত্মিক মিলন ঘটাবার জন্যে কবিচিত্তের এই যে প্রেরণা, তাই প্রত্যক্ষ রূপ পেয়েছে শান্তিনিকেতনের আশ্রমবিদ্যালয়ে। সর্বশেষ বক্তব্য এই যে—

শুনিনু তোমার স্তবের মন্ত্র
অতীতের তপোবনেতে,
অমর ঋষির হৃদয় ভেদিয়া
ধ্বনিতেছে ত্রিভুবনেতে।

কিংবা

যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে
চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ
দাও সে মন্ত্র তব॥

এই প্রার্থনাগীতি উৎসারিত হয়েছিল কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েরই কণ্ঠ থেকে, এই আকাঙ্ক্ষা পরিচালিত করেছিল উভয়েরই অন্তর্জীবনকে। তপোময় জীবনাদর্শ থেকে দূরবর্তী হবার ফলে, কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সারাজীবন ভোগ করে গেছেন নির্বাসনদুঃখ। দৃশ্যতঃ তাঁদের কল্পিত তপোবনকাল থেকে স্ব-কালে নির্বাসন, বস্তুতঃ নিত্যকাল ও সর্বদেশের উদার প্রশস্ততা থেকে স্ব-কাল ও স্ব-দেশের খণ্ডতার মধ্যে নির্বাসন॥

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষাব্যবহার

শ্রীসুকুমার সেন

বাংলা ভাষা শিখবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় শ্রম ও যত্ন করেছিলেন। সে শ্রম ইস্কুলের পড়া তৈরির তাড়নায় নয়, সে যত্ন পরীক্ষায় পাশের জন্য নয়। সে শ্রম ও যত্ন নিজের কৌতূহলের বশে, নিতান্ত ভাষা-জিজ্ঞাসার প্রেরণায়।

রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে পড়েছিলেন তবে দীর্ঘদিন ধরে নয়। তার চেয়ে ঢের বেশিদিন তিনি বাড়িতে মাস্টারের কাছে পাঠ নিয়েছিলেন। ইস্কুলের পড়াও গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে হত। সুতরাং ইস্কুলে থেকে তিনি অতিরিক্ত কিছু শিখেছিলেন বলে মনে হয় না। ইস্কুলে প্রায় পাঁচ-ছ ঘণ্টার বন্দীদশা বালক রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত অরুচিকর ছিল, এবং অপরিচিতের সঙ্গের লোভ তাঁর ছিল না। তাই জীবনস্মৃতিতে ও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ নিজের ইস্কুল-জীবনকে কোনো মূল্য দেন নি। তবে তাঁর ইস্কুলে যাওয়া যে একেবারেই নিষ্ফল হয়েছিল সে কথা বলতে পারি না। কয়েকজন শিক্ষকের কথা রবীন্দ্রনাথ বেশি বয়সেও ভোলেন নি। সাতকড়ি দত্ত বা ফাদার ডি পেনেরাণ্ডার মতো শিক্ষকের স্নেহ ও সৌজন্য বালক রবীন্দ্রনাথের মনে অজ্ঞাতসারে দাগ টেনেছিল। গোবিন্দবাবুর মতো শিক্ষকের উৎসাহ শিশু কবির কাব্যপদচালনায় হস্তাবলম্ব দিয়েছিল।

ইস্কুলের পাঠ্যের চেয়ে অনেক বেশি কিছু তাঁদের বাড়িতে পড়ানো হত। সব চেয়ে জোর দেওয়া হত বাংলায়। কলকাতার অভিজাতসমাজের মধ্যে এ ব্যাপার দেবেন্দ্রনাথের পরিবারের বিশেষত্ব হতে পারে। কিন্তু তখনকার দিনে ইস্কুলের উপরের তিন-চার শ্রেণী বাদে সর্বত্র বাংলার উপর ঝোঁক বেশি দেওয়া হত কেননা তখনও মাইনর স্কুলের পাঠ্যের সঙ্গে হাই স্কুলের পাঠ্যের বিভেদ পরবর্তী কালের মতো গুরুতর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নর্মাল স্কুলে যা পড়েছিলেন, তা মাইনর পরীক্ষারই পাঠ্য।

তখনকার দিনের পাঠযোগ্য প্রায় সমস্ত বাংলা বই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষকের কাছে অথবা নিজে নিজে পড়েছিলেন। বড়োরা যা পড়তেন না এমন বইও যা হাতের কাছে মিলত তা পড়ে ফেলতেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষাদীক্ষা-প্রসঙ্গে 'এহো বাহ্য'।

রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলে থাকতে কতটুকু সংস্কৃত পড়েছিলেন অথবা ইস্কুলে সংস্কৃত মোটেই পড়েছিলেন কিনা জানি না। তিনি যদি আমাদের সময়কার থার্ড-ফোর্থ ক্লাস (এখনকারদিনের ক্লাস এইট-সেভেন) অবধি পড়ে থাকেন তবে সম্ভবত ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ ইস্কুলেই আরম্ভ করে থাকবেন। যাই হোক, বাড়ির পড়ায় বাংলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু এবং বাংলা শেষ করে তার পর বেশি করে সংস্কৃত এবং (বোধ হয় কিছু কম জোর দিয়ে) ইংরেজি পড়া চলতে থাকে। বাড়ির গৃহশিক্ষকের কাছেই

রবীন্দ্রনাথ ঋজুপাঠ তিন ভাগ, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা প্রভৃতি পড়েছিলেন। সর্বাগ্রে মুগ্ধবোধ পড়াবার চেষ্টা হয়েছিল, সৌভাগ্যের বিষয় তা বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। যাই হোক, ঘরে ভালো করে (—পরীক্ষার জন্য নয়—) সংস্কৃত পড়া রবীন্দ্রনাথের ভাষাদীক্ষা-প্রসঙ্গে যদিও 'এহো হয়' তবু আগে কইবার আছে।

বাংলায় বেশ অনেকটা এগিয়েছেন কিন্তু যাকে বলে হাতেখড়ি তা সংস্কৃতে তখনো তাঁর হয় নি, এমন বয়সে রবীন্দ্রনাথ একদা পিতৃদেবের সঙ্গে গঙ্গার ধারে বোটে দিনকতক ছিলেন। পড়বার বস্তুর সন্ধানে কামরার আলমারি ঘাঁটিতে ঘাঁটতে একটা পুরোনো ছাপা গীতগোবিন্দ পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, বইটা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রকাশিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষ কখনো গীতগোবিন্দ ছাপিয়েছিলেন কিনা জানি না তবে বটতলা ছাপিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বইটা গদ্যের মতো টানা লাইনে ছাপা। (সেকালের বটতলার বইও— সংস্কৃত শ্লোক অথবা বাংলা পদ্য যাই হোক-না কেন— গদ্যের মতো টানা লাইনে ছাপা হত। তবে বইটি বটতলার বলে বোধ হয় না। তা হলে বর্ণাশুদ্ধি যথেষ্টই থাকত এবং রবীন্দ্রনাথের তা অবশ্যই লক্ষ্যগোচর হত। কলকাতার কোনো পণ্ডিত-সম্পাদিত সংস্করণ হতেও পারে।)

আর-কিছু পড়বার না পেয়ে তিনি গীতগোবিন্দ পড়তে শুরু করলেন এবং পড়ে পড়ে গীতগোবিন্দের গানগুলির ছন্দ ঠিক করে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন যে এমনি করে গীতগোবিন্দের গানগুলি ছন্দোবিভাগ করতে করতে তিনি যখন

অহহ কলয়ামি বলয়াদিমণিভূষণম্।
হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণম্ ॥—

এই গানটিতেও উৎরে গেলেন তখন তাঁর মনে যে আনন্দ হয়েছিল সে আনন্দ তিনি কখনো ভোলেন নি। হয়তো তখন তাঁর বয়স ছিল দশ থেকে বারোর মধ্যে। জয়দেবের পদাবলীর ধ্বনি-মাধুর্য তাঁকে এতটাই মুগ্ধ করেছিল যে তিনি সমস্ত বইটা একটা খাতায় কপি করে নিয়েছিলেন।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের বাণীদীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথম কবিতা লিখতে থাকেন তখন সমসাময়িক বড়ো কবিদের ভাষার প্রতি-বিম্বন সে-সব রচনায় দেখা দিয়েছিল। এবং সে প্রতিবিম্বন প্রভাবে পরিণত হবার আগেই লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সবার আগে তিনি যে-কবির কাব্য পড়েছিলেন, এবং যা না বুঝতে পেরেও তাঁর ভালো লেগেছিল, তার প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ভাষা-শিল্পের গোড়াপত্তন করেছিল। রবীন্দ্রকাব্য-ভাষা আলোচনা করতে গিয়ে দেখতে পাই যাকে রবীন্দ্রনাথের মৌলিক শব্দভাণ্ডার (basic vocabulary) বলতে পারি তার মধ্যে আছে এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ যা তিনি প্রথমে জয়দেবের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। অনতিবিলম্বে বৈষ্ণব-পদাবলী থেকেও অনেক মালমসলা পেয়েছিলেন।

জয়দেবের কাছে পাওয়া শব্দের কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

অলস

জয়দেব। অলসনিমীলিতলোচনয়া (গান)।

রবীন্দ্র। অলস মায়া (কড়ি ও কোমল); অলস সুখে, অলস মেঘের খেলা (মানসী); অলস বেলায় (উৎসর্গ); ইত্যাদি।

গহন

জয়দেব। যদনুগমনায় নিশি গহনমপি শীলিতম্ (গান)।

রবীন্দ্র। গহনে হয়েছে হারা (গীতালি); অন্তরের গহনবাসী (পূরবী); ইত্যাদি।

তরল

জয়দেব। করতলতালতরলবলয়াবলিকলিত- (গান)।

রবীন্দ্র। তরল নিশি, তরল হাসি-লহরী (মানসী); তাণ্ডবে ও তরল তানে (পুনশ্চ); ইত্যাদি।

তল

অধিকরণ-বাচক অনুসর্গের মত

জয়দেব। কুঞ্জতল-, কিশলয়শয়নতলে (গান)।

রবীন্দ্র। এই অরণ্যের তলে (মানসী); নেমেছে ধূলার তলে (গীতাঞ্জলি); এই জনমের রূপের তলে (পূরবী); ইত্যাদি।

তিমির

জয়দেব। সতিমিরপুঞ্জম্; তিমিরমনল্পম্; দরতিমিরম্; তিমিরোদিত- (গান); সভয়চকিতং বিন্যস্তন্তী দৃশৌ তিমিরে পথি (শ্লোক)।

রবীন্দ্র। ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণ তিমির; তিমির রজনী (মানসী); তিমির রাতি; তিমির নিশীথে (গীতাঞ্জলি); তিমির মন্দির (বীথিকা); তিমিরপ্রান্তে (সেঁজুতি); ইত্যাদি।

নিবিড়

জয়দেব। দোর্বল্লিবন্ধনিবিড়স্তনপীড়নানি (শ্লোক)।

রবীন্দ্র। মেঘের আলোক লভিছে বিরাম নিবিড় তিমির কেশে (মানসী), নিবিড় মেঘে; নিবিড় ব্যথায় (গীতাঞ্জলি); ইত্যাদি।

নিভৃত

জয়দেব। নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং গতয়া (গান)।

রবীন্দ্র। নিভৃত সংসারে, নিভৃত সুখে (মানসী); নিভৃত স্বপনে (উৎসর্গ); নিভৃতকুঞ্জে (গীতাঞ্জলি); নিভৃত মন্দিরের (পূরবী); ইত্যাদি।

নিঃসহ

জয়দেব। নিঃসহতনোঃ (শ্লোক)।

রবীন্দ্র। নিঃসহ নৈরাশ্যতাপ (নৈবেদ্য)।

পুট[1]

জয়দেব। শ্রুতিপুটযুগলে (গান)।

রবীন্দ্র। আঁখিপুট, পত্রপুট (মানসী); করতলপুটে (গীতাঞ্জলি); ইত্যাদি।

পুলক। বিপুল

জয়দেব। সপুলকং (গান); বিপুলপুলকভর- (গান)।

রবীন্দ্র।[2] পুলক নাচিছে গাছে গাছে (কড়ি ও কোমল); বিপুলতর নয় সে বাধা (মানসী); ইত্যাদি।

রভস

জয়দেব। মৃগমদসৌরভরভস-; রতিরভস-; প্রিয়পরিরম্ভণরভসবলিতমিব; রভসকৃততন্দ্রা (গান)।

রবীন্দ্র। ক্ষিতিসৌরভরভসে (কল্পনা)।

রীতিমত সংস্কৃত পড়বার আগে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি কাব্যের কিছু রস আস্বাদন করেছিলেন। সে কাব্য মেঘদূত। সংস্কৃত শিখে রবীন্দ্রনাথ মেঘদূত ভালো করে পড়েছিলেন এবং বারবার পড়েছিলেন।[3] মেঘদূতকে রবীন্দ্রকাব্যের গীতা বললে অন্যায় হয় না। ভাবের কথা ছেড়ে দিই। গীতগোবিন্দের পরেই মেঘদূতের শব্দচ্ছায়া রবীন্দ্রকাব্যের ভাষায় কিছু কিছু লক্ষ্য করা যায়। তবে এ ছায়া গীতগোবিন্দের তুলনায় ফিকা। তার অনেক কারণ আছে। প্রথমত একটু বেশি বয়সে মেঘদূত পড়া হয়েছিল, তখন বাল্যকালের শব্দমোহের ঘোর কেটে গিয়েছিল।[4] দ্বিতীয়ত কালিদাসের শব্দাবলী জয়দেবের মতো স্বল্প ও সংকীর্ণ নয়। তৃতীয়ত জয়দেবের কাব্যের সঙ্গে বাংলা কবিতার জন্মগত ও ধাতুগত যোগাযোগ আছে, কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে ঠিক তা নেই। তবুও কালিদাসের— বিশেষ করে মেঘদূতের— ভাষা-প্রভাব রবীন্দ্রভাষায় দুর্লক্ষ্য নয়।

মেঘদূতের সঙ্গে মিল রয়েছে এবং মেঘদূতের থেকে নেওয়া মনে করা যেতে পারে এমন কিছু শব্দের উদাহরণ দিচ্ছি।

স্নিগ্ধ

মেঘদূত। স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু; স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্; স্নিগ্ধবেণীসবর্ণে; স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে; স্নিগ্ধবৈদূর্যনালম্, মন্দ্রস্নিগ্ধ-ধ্বনিভিঃ; কনকনিকষস্নিগ্ধয়া।

রবীন্দ্রকাব্য। ঘনস্নিগ্ধ, হিমস্নিগ্ধ (মানসী); স্নিগ্ধ-হসিত বদন-ইন্দু (উৎসর্গ); ইত্যাদি।

১ মেঘদূতেও আছে : কিশলয়পুটান্।

২ পুলক শব্দের উদাহরণ প্রচুরলভ্য।

৩ জমিদারি দেখার পর্যটনের সময়ে অনেক সময় তিনি সঙ্গে রাখতেন।

৪ বাল্যকালের শব্দমোহের ভালো উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই জীবনস্মৃতিতে দিয়েছেন— "দ্বিরেফ" শব্দ উপলক্ষ্য করে। কালিদাস কুমারসম্ভবে শব্দটি প্রথম সর্গে একবার আর তৃতীয় সর্গে চারবার ব্যবহার করেছিলেন।

স্তিমিত

মেঘদূত। স্তিমিতনয়নম্, স্তিমিতনয়নাম্ ; স্তিমিতনয়ন-প্রেক্ষণীয়াম্।[৫]

রবীন্দ্রকাব্য। তীরে কুটীরের তলে স্তিমিত প্রদীপ জ্বলে (মানসী) ; নিদ্রাহীন যামিনীতে স্তিমিত আলোকে (সোনার তরী) ; তোমার জ্যোতির স্তিমিতকেন্দ্রে (পত্রপুট) ; ইত্যাদি।

চল[৬]

মেঘদূত। চলকিশলয়ঃ ; চলকুবলয়শ্রীতুলাম্।

রবীন্দ্রকাব্য। চলচপলচোখে (পলাতকা) ; চলচপলার চকিতচমকে (ক্ষণিকা) ; ইত্যাদি।

বিরহ

মেঘদূত। বিরহদিবস- ; বিরহদিবসে ; বিরহবিধুরাম্ ; বিরহশয়নে।

রবীন্দ্রকাব্য। ফেলিছে বিরহছায়া শ্রাবণতিমির ; বিরহবিধুর নয়নসলিলে ; বিরহশয়ানে (মানসী) ; ইত্যাদি।

পাণ্ডু

মেঘদূত। শেষবিস্তারপাণ্ডু ; পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ, পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ।

রবীন্দ্রকাব্য। পাণ্ডুকিশলয় (মানসী) ; পাণ্ডু আঁধার (আকাশপ্রদীপ) ; পাণ্ডু নীল মধ্যাহ্ন-আকাশ (আরোগ্য)।

বলাকা

মেঘদূত। সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ।

রবীন্দ্রকাব্য। আকাশে বলাকা বাঁধি (চিত্রা) ; আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে। বলাকাদল যাচ্ছে উড়ে (উৎসর্গ) ; ইত্যাদি।

কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই "চির" ও "নিত্য" প্রথম পদ দিয়ে সমাস পছন্দ করতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রয়োগ অনেক বিচিত্র।

মেঘদূত

চির। চিরবিরহজম্ ; চিরবিলসনাৎ ; ইত্যাদি।

নিত্য। নিত্যপুষ্পাঃ ; নিত্যপদ্মাঃ ; নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ, নিত্যজ্যোৎস্নাঃ।

রবীন্দ্রকাব্য

চির। চিরচঞ্চলতা, চিরক্রন্দিত (মানসী) ; চিরতৃষার্তের (চিত্রা) ; চিরচেনা (বীথিকা) ; চিরচিহ্ন (পত্রপুট) ; চিরজীবিতের (পুনশ্চ) ; ইত্যাদি।

নিত্য। নারায়ণীর সিঁথের পরে নিত্যসিঁদুর সম (পলাতকা) ; নিত্যধাবিত স্রোতে (জন্মদিনে) ; ইত্যাদি।

কালিদাসের কাব্য থেকে গোটাগুটি নেওয়া শব্দের উদাহরণ— অনিভৃত, ক্ষণভঙ্গ, ছায়াতরু, তড়িৎ-চকিত, দিনশ্রী, দেহলী, সদ্যঃপাতী, সন্ধ্যাভ্রশিখর, স্নানপুণ্য, ইত্যাদি।

৫ রঘুবংশ : অথার্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে শয্যাগৃহে। কুমারসম্ভব : স্তিমিতোগ্রতারৈঃ···নেত্রৈঃ

৬ গীতগোবিন্দেও আছে : চলমলয়পবনসুরভি- (শ্লোক)।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম শিক্ষা-পাঠ নিয়েছিলেন তার সম্পূর্ণতা হল বৈষ্ণব-পদাবলী পড়ে। তখন তাঁর বয়স চৌদ্দ-পনেরো। অক্ষয়চন্দ্র সরকার -সম্পাদিত প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহের খণ্ডগুলি কি করে তাঁর হাতে আসে সে কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে বলেছেন। বৈষ্ণব-কবিতাসংগ্রহে, ব্রজবুলি পদাবলীর ভাষা তাঁর মন বিশেষভাবে টেনেছিল এবং সেই বয়সেই তিনি বিদ্যাপতি-গোবিন্দদাসের অনুকরণে ব্রজবুলিতে কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাগুলিতে সুরও দেওয়া হয়েছিল— যেমন কীর্তন-পদাবলীতে— তাই অধিকাংশ নিতান্ত কাঁচা লেখা হলেও রবীন্দ্রনাথের ব্রজবুলি কবিতা (ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী) কালের ব্যবহারে টিকে গেছে। ভানুসিংহের ঝোঁক অল্প দু-চার বছরেই কমে গিয়েছিল কিন্তু বৈষ্ণব-পদাবলীর— বিশেষ করে ব্রজবুলির— সম্বন্ধে, রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল অনেকদিন পর্যন্ত সজাগ ছিল। কড়ি ও কোমলের কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির পদাবলীর ভাষা নিয়ে খুঁটিয়ে আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিদ্যাপতির ভাষা ব্যবচ্ছেদ ও বিশ্লেষণ করে এবং কঠিন সব শব্দের ও পদের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা যথা-সাধ্য দিয়ে তিনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রস্তুত করেছিলেন।[৭] বৈষ্ণব-পদাবলী-রসিক বন্ধু শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথ একটি ছোটো বৈষ্ণব-পদাবলীসংগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বিদ্যাপতি-পদাবলীর পাণ্ডুলিপি তখনকার একজন প্রভাবশালী সাহিত্যিক পড়তে নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেন নি।[৮] পদাবলীসংগ্রহের বেলা সে দুর্ঘটনা ঘটে নি। বইটি 'পদরত্নাবলী' নামে ছাপা হয়েছিল (১২৯২)। বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল আরও কিছুকাল বিদ্যমান ছিল। তাঁরই উৎসাহে সাধনায় বৈষ্ণব-পদাবলীর কোনো কোনো শব্দের (যেমন "পঁহু", "বঁধু") ব্যুৎপত্তি নিয়ে ছোটোখাটো আলোচনা চলেছিল।

গীতগোবিন্দের শব্দ ও পদ যা একদা অজ্ঞাতসারে ভবিষ্যৎ কবির মনে গেঁথে গিয়েছিল এখন তেমন শব্দ ও পদ বৈষ্ণব-পদাবলীর মধ্য দিয়ে জ্ঞাতসারে স্বাগত হল। বৈষ্ণব-পদাবলীর পরে বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রধান বইগুলি রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন— যেমন চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, নরোত্তমবিলাস, ভক্তমাল ইত্যাদি। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বাইরেও পুরানো বাংলার অপর ছাপা বই সবই পড়েছিলেন। তার মধ্যে প্রধান বই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, তিনি বেশ ভালো করেই পড়েছিলেন।[৯]

৭ বইটির বিজ্ঞাপন পর্যন্ত বেরিয়েছিল (১২৯৩)। '১৫০ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। অগ্রহায়ণ মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।' প্রকাশক গোবিন্দলাল দত্ত এই বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন—

'প্রায় দশ বৎসরকাল রবীন্দ্রবাবু বৈষ্ণব পদাবলী অধ্যয়ন করিয়া এই সম্পাদকীয় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। …ফলকথা সেই প্রাচীন, শ্রেষ্ঠ কবির কবিত্ব বুঝিতে হইলে— এবং যাবতীয় বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীর ভাষা বুঝিতে হইলে— রবীন্দ্রবাবু কর্তৃক সম্পাদিত এই সুন্দর, মনোহর পদাবলী সকলেরই ক্রয় করা উচিত।'

৮ পরে তিনি নিজে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন।

৯ স্বহস্তে মার্জিনে নোট করা তাঁর ব্যবহৃত 'চণ্ডীমঙ্গল' বই আমি দেখেছি।

এই পড়ার ফলে মধ্যকালের বাংলা ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের দখল সম্পূর্ণ হয়। সে সময়ে অর্থাৎ বিগত শতাব্দের শেষ দশকে এই বিষয়ে তাঁর মতো ব্যুৎপত্তি আর কারো ছিল না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর মতো সত্যকার বোদ্ধাও তখন আর কেউ ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাষার মূলধনের বিশিষ্ট অংশ বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষা (অর্থাৎ মধ্যকালের বাংলা) থেকে নেওয়া। শুধু গোড়ার দিকের কবিতায় নয়, ভানুসিংহের পদাবলীতে নয়, মাঝের দিকের কবিতায়ও নয়, শেষ পর্যন্ত মধ্য বাংলা কাব্যভাষার পদ ক্রমক্ষীণভাবে হলেও রয়ে গেছে। সমসাময়িক নবীন বাংলার কাব্যভাষাও মধ্য বাংলার কাব্যভাষার উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল সত্য। তবে তা কেবল স্বরভক্তিবিশ্লিষ্ট অর্ধতৎসম শব্দে এবং অর্ধতৎসম ও তৎসম নামধাতুতেই পর্যবসিত। এ ধরণের শব্দ ও পদ রবীন্দ্রনাথ প্রচুর ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রয়োগরীতি বাংলা ভাষার প্রকৃতিসম্মত এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যে পরিচিত। মধ্যকালের বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে প্রাণবান্ ধারা বৈষ্ণব-কবিতা। সে ধারার রীতিকে আধুনিক কাব্যধারার ভাষার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাব্যভাষার জোর ও বিস্তার বাড়িয়ে দিলেন। গোড়ার ও শেষের দিকের দুখানি কাব্যগ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিয়ে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করছি।

মানসী

শব্দ। অনিমিখ, অমিয়, অবহেলে, আঁচোর, উতরোল, উভরায়, উলস (= উল্লসিত), একদিঠি, কভু, কেলি, গরজন, তরজন, তিয়াষ, দরশ, দোঁহায়, নয়ান, নিতি, নিমগন, পরশ, পিয়াসে, পিরিতি, পূরব, বরন (= বর্ণ), বরষ, বরিষা, বরষণ, বয়ান, বায়, বারতা, মাঝার, মুখানি, মোদের, শবদ, হরষ, হরিষে, হিয়া, ইত্যাদি।

নামধাতু। অন্বেষিয়া, আকুলিছে, আক্রমিছে, আগলিছে, আবরি, আশিসিলা, উথলিয়া, উদিলে, উতরিলা, উত্তরিতে, উছাসি, উদাসিয়া, কুহরে, গ্রাসি (য়া), চুম্বি, চূর্ণি, তরঙ্গিয়া, তেয়াগি (য়া), দহিতেছে, ধ্বনিতেছে, নমিল, নিরখি, নিবেশিলা, নিশ্বসিছে, নিশাসি, নেহারি, পসারিয়া, পরকাশে, পশিতেছে, প্রকাশিতে, প্রবাহিয়া, বরষিয়া, বাহিরিতেছিল, ব্যথিছে, ব্যাকুলিয়া, বিবশে, ভ্রমিয়াছে, মুদিয়া, রচিতেছে, লভিতেছে, লাথিয়ে (কথ্যভাষা থেকে), সন্তারিয়া, সম্বরি, স্বনিছে, ইত্যাদি।

সানাই

শব্দ। দেয়া, ধেয়ান, নিঠুর, নিঃশব্দ, পরণাম, পরশন, বরণ, বরষ, বায়, মুরতি, হরষ, ইত্যাদি।

নামধাতু। আকুলি (য়া), আলোড়িয়া, আবরি, উজলিয়া, উচ্ছুসিয়া, উদ্বারিল, কুসুমি, গর্জিছে, ঘোষিল, চঞ্চলি, পরশি, প্রবেশিতে, প্রসারিল, বঞ্চিতে (= বঞ্চনা করিতে), বরষে, বর্ষে, বিচ্ছুরিছে, বিশ্বাসি, বিস্তারিছে, মুখরিয়া, যুঝিতে, রচিছে, লক্ষ্যি, সচকিয়া, সমুচ্ছ্বাসি, সংবরি, ইত্যাদি।

রবীন্দ্রকাব্যে শব্দশক্তির অপ্রতিহত প্রকাশ। শব্দসংগ্রহের বেলায় রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ও বিস্তার কোনো ভূমিকে বর্জন করেন নি। সংস্কৃত ভাষার বিপুল ভাণ্ডার তাঁর ব্যবহারের জন্যে সর্বদা উন্মুক্ত ছিল। কথ্যভাষা এবং আঞ্চলিক উপভাষাও উপেক্ষিত হয় নি। এমন কি লেখ্য গদ্য

ভাষাকেও তিনি কাব্যব্যবহারে অনাচরণীয় মনে করেন নি। অন্য আধুনিক ভাষার মধ্যে ইংরেজি আর হিন্দী থেকে তিনি কিছু কিছু শব্দ নিয়েছিলেন। কিন্তু যেখানে থেকেই নেওয়া হোক-না কেন সর্বদা প্রয়োজন অনুসারে এবং আবশ্যক মাত্রায়।

সংস্কৃতের ভাণ্ডার আমাদের কবিদের কাছে চিরদিনই খোলা। বিষয়ের প্রকাশ নিমিত্ত, ছন্দের প্রয়োজনে অথবা পাণ্ডিত্যমণ্ডনের দুরাশায় অপ্রচলিত এবং দুরূহ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার মধ্যকালে বাংলার সমর্থ কবিরা এবং আধুনিক বাংলার প্রায় সকল কবি করেছেন। তাঁদের কারো চেয়ে রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত জ্ঞান কম ছিল না। কিন্তু তিনি সংস্কৃত শব্দ কখনো নিষ্প্রয়োজনে ব্যবহার করেন নি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় স্বল্পপরিচিত সংস্কৃত শব্দের সংখ্যা খুব প্রচুর নয়। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে উদাহরণ দিচ্ছি।

কড়ি ও কোমল। অশনি, ঊর্মি, তুরঙ্গম, দুকূল, পিকগণ, বাপী, বিকচ, বিধু, বিভাবরী, বিহগ, বিহঙ্গ, স্তিমিত, ইত্যাদি।

মানসী। অটবী, অনলশ্বসনা, কুলায়, তামসী, পাদপ, পাণ্ডুকিশলয়, পিক, বিকচ, সৌরভসদনে, স্তিমিত, ইত্যাদি। (বিষয় অনুসারে কঠিন তৎসম শব্দের সংখ্যা কম বেশি হয়েছে। মানসীর মেঘদূত কবিতায় এই শব্দগুলি লক্ষিতব্য— অন্তর্গূঢ়, অম্বর, আর্দ্র, উপল, ইন্দ্রনীল, কর্ণোৎপল, কপোল, কন্দর, কেতকী, ধূর্জটি, পারাবত, বিপিন, বিহঙ্গ, ভ্রূবিলাস, মণিহর্ম্য, মন্দ্র, সরসী, সোপান, স্বমহিমচ্ছায়া, ইত্যাদি।)

বলাকা। অপ্সররমণী, অম্বর, অলক, ইষ্টক, কিঙ্কিণী, কুন্দরাজি, গর্জমান, গিরিরাজি, গেহ, চক্রবাক, চিকুর, তূর্ণ, নীহারিকা, পত্রলিখা, পর্যঙ্ক, পল্লবপুঞ্জ, বিপিন, বিষাণ, বিহঙ্গ, বীথিকা, রণশৃঙ্গ, শুক্তি, হর্ম্যচূড়, ইত্যাদি।

মহুয়া। অলক্ত, অলিন্দ, অশনি, আগ্নেয়, উষসী, কঞ্চুলিকা, কার্মুক, কীর্ণ, কুবলয়, চন্দ্রমা, তত্ত্ববিদ্. ত্রিদিব, তূর্ণ, দয়িতা, দুকূল, দেহলি, বল্গা, বহমান, বিহঙ্গম, বীথিকা, বৃ্যহ, ভ্রূকুটিল, ললাটিকা, শর্বরী, স্পর্শন, হ্রেষা, ইত্যাদি।

সানাই। চেলাঞ্চল, তটপ্লাবী, তামসী, দূতিকা, ধূম্র, নিগড়, ফেনায়িত, বক্ষোদীর্ণ, বাতায়ন, বিকচ, বিভাবরী, বিদ্যুৎঘাত, রহঃসখী, হৃৎকম্পন, সদ্যঃপাতী, ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদের ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে একই পদের বিভিন্ন রূপের (সাধু কথ্য এবং আঞ্চলিক) একই রচনায় ব্যবহার। যেখানে ছন্দের ও মিলের প্রয়োজন আছে অথবা শ্রুতি-সুভগতার কিংবা ধ্বনিপ্রতীকতার আবশ্যক আছে, সেখানেই এমন অনির্বিচার প্রয়োগ দেখি। যেমন, মিলের প্রয়োজনে

"আমি পথের ধারে ব্যাকুল বেণু
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু।"

ছন্দের প্রয়োজনে

"ঐ যে কারা আসতেছে ডাক ছেড়ে"
"পড়িতেছিল সে কাব্যকাহিনী"

"ভাগ্যে কেহ একটি যদি নষ্টে যায়"
"মাফ করিতেই হবে"
"টুপ করিয়া ডুবে যেয়ো"
"উড়িতেছিল আবাধা চুল"

শ্রুতি-সুভগতার জন্য

"ভাগ্যে আমি কাজ হারালেম কাজের পথে।"
"এলেম নূতন দেশে।"

ইত্যাদি।

ইংরেজি শব্দের ব্যবহার বেশি নয়। যা হয়েছে তাও অধিকাংশ গোড়ার দিকের (কড়ি ও কোমল এবং মানসী) ব্যঙ্গ ও সরস কবিতায় ব্যবহৃত। প্রথমে এমন শব্দ সাধারণত ইংরেজি অক্ষরেই ছাপা হত। পরে (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় সংস্করণ থেকে) বাংলা অক্ষরে লিপ্যন্তরিত হয়েছে। ইংরেজি শব্দে দেশি প্রত্যয় যোগ করে রবীন্দ্রনাথ নতুন শব্দও করেছেন। যেমন

"শামলা আঁটিয়া নিত্য
কর তুমি ডেপুটিত্ব"
"শ্রাবণে ডেপুটিপনা
এত কভু নয় সনা-
তন প্রথা এ যে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।"
"খালি রেখে খালি পেট
মিছে কর এজিটেট"

ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যে কিছু হিন্দী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা কলকাতার কথ্য বাংলায় অপরিচিত নয়। কোনো কোনো শব্দ তো এখন বেমালুম বাংলা হয়ে গেছে। যেমন, "মাপ করিতেই হবে", "ধাই তুরন্ত", "তোমাতে আমাকে ভাই ভেদ অতি থোড়া", দানো, সিধা, কুর্তি, বীণকার, বিজ্‌লিপাখা, ইত্যাদি। কয়েকটি হিন্দী ধাতু ও শব্দ ক্রিয়াপদ রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, "জীবন-রাত্রি ভাগে", "ছুটিল তিমিররাত্রি", "রঘুনাথ হেথা আসি উতরিলা", "ফুকারে হৈ হৈ", "পিছু হটি", "সম্‌জে নেব", পাকড়ি, ইত্যাদি। "চরাচরে উঠাইয়া গান"— এখানে ইডিয়ম হিন্দীর।

এই সঙ্গে ফারসী-উর্দু শব্দেরও উল্লেখ করতে হয়। যেমন, দিল ("খিল"-এর সঙ্গে মিল রেখে), বিলকুল, হামেশা, বাগিচা, নকিব, মজলিস, সমজদার, জবানি, জামিন, দরিয়া, সাকী, ইত্যাদি। ফারসী উপসর্গের সঙ্গে হিন্দী শব্দের সমাসের উদাহরণও আছে। যেমন, গর্‌-ঠিকানা। এবং তাতে বাংলা প্রত্যয় যোগ করে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে— "গর্‌ঠিকানিয়া বন্ধু"।

সংস্কৃতে একটা প্রবচন আছে— নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ। অর্থাৎ, কবিদের কিছুতে আটক নেই, ভাষাচালনায় তাঁদের "কোনো বাধা নাই ভুবনে"। এর আসল মানে হচ্ছে যে শব্দশাস্ত্রের অনুশাসন প্রতি পদে মানতে কবিরা বাধ্য নন। তাঁরা যা লিখবেন তাই উত্তরকালের শব্দশাস্ত্রের সম্মতি পাবে। তবে কোনো কবিই— ভালো কবি হলে তো কথাই নেই— পারতপক্ষে শব্দের বা পদের কলেবরে ছুরি চালান না। অথবা শুধু শুধু শব্দ সৃষ্টি করেন না। কালিদাস দৈবাৎ কোনো কোনো শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ করেছেন, যেমন, "প্রিয়াল" স্থানে "পিয়াল" এবং "ত্র্যম্বক" স্থানে "ত্রিয়ম্বক"।[১০] রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের তুলনায় অনেক বেশি লেখা লিখেছেন তাই তাঁর রচনায় ছুরি চালানো শব্দের সংখ্যা বেশি। দু-একটি উদাহরণ দিলেই চলবে।

কাঁচল। "আঁচল"-এর ধ্বনিসাম্যের জন্য "কাঁচলি" স্থানে : "কাঁচল পরি আঁচল টানি", "কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি"।

ডানে। "বাম"-এর সাদৃশ্যে, ছন্দের খাতিরে : "বাম হতে ডানে"।

ডঙ্ক। "শঙ্খ"-এর মিলনের জন্য : "বিজয়ডঙ্ক"।

রবীন্দ্রনাথ বিস্তর নতুন শব্দ সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি আমাদের নজরে পড়ে না এই জন্য যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার আধারে ও সেই প্রকৃতি অনুযায়ী গড়া। নতুন-তৈরি শব্দ বলে মনেই হয় না। রবীন্দ্রনাথ যেন মুদ্রিত ভাণ্ডারের চাবি খুলে পুরানো শব্দকে নতুন করে চালিয়েছেন। দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সংস্কৃতে ব্যাপ্তি অর্থে ময় প্রত্যয় আছে, তা কয়েকটিমাত্র শব্দে দেখা যায়। যেমন চিন্ময়, তন্ময়, মৃন্ময়, হিরণ্ময়, ইত্যাদি। বাংলায় এই প্রত্যয়টি ব্যাপ্তি অর্থে সাধুভাষায় নিতান্ত অল্প কয়েকটি শব্দে সচল। তবে একটু অপছন্দের ভাব নিয়ে প্রত্যয়টি চলিত কথ্যভাষায় বেশ চলে। কিন্তু তখন প্রত্যয়টির উপর ঝোঁক পড়ে, আর তার ফলে অকারান্ত শব্দের পরে মকারের দ্বিত্ব হয়। যেমন, জায়গাটা জলে জলম্ময়। বাংলায় প্রত্যয়টি সপ্তমীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তখন মকারের দ্বিত্ব হয় না। যেমন, ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ময় প্রত্যয় দিয়ে বহু শব্দ (ও পদ) তৈরি করেছেন। যেমন,

সাধারণ বিশেষণ। "গ্রহতারাময়ী নিশি", "রৌদ্রময়ী রাত্তি", "মণিময় তাজ", "সন্ধ্যা কান্তিময়ী", "আকাশ আলোময়", "ঘাটের পথরেখা তারি চরণরেখাময়", "বহ্নিময় বেদনার", "মৈত্রীসুধাময় চোখে", "জীবনের আস্তরণময়", ইত্যাদি।

ব্যাপ্ত্যর্থে, বিধেয় বিশেষণ অথবা ক্রিয়া-বিশেষণ। "আকাশে চারিদিকময়", "বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে", "রাখব পরানময়", "শুনি আকাশময়", "দুলে অম্বরময়", "কাঁপে বক্ষোময়", "বিছাইছে আস্তরণ বনবীথিময়", "বাইরে রাত্রি তারায় তারাময়", ইত্যাদি।

আর-একটি উদাহরণ দিচ্ছি। সংস্কৃতে ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ভাববাচক এবং পুংলিঙ্গ। যেমন,

১০ দুটি উদাহরণই তাঁর প্রথমকালের রচনা কুমারসম্ভবে আছে

পূর্ণিমা (পূর্ণিমন্), মহিমা, গরিমা ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়কে দুটি প্রত্যয়ে পরিণত করেছেন। একটি 'ইমা' (পুংলিঙ্গ কর্তায় একবচনের রূপ) বিশেষ্য, অপরটি 'ইম' (ক্লীবলিঙ্গ কর্তা-কর্ম একবচনের রূপ) বিশেষণ। যেমন,

-ইমা, বিশেষ্য। অরুণিমা, কালিমা, নীলিমা, মধুরিমা, মহামধুরিমা, তনিমা, শোণিমা, গরিমা, মহিমা, তরঙ্গিমা, ঘনিমা, জড়িমা, রঙ্গিমা, জবড়জঙ্গিমা, ধূসরিমা, দীপ্তিমা, ইত্যাদি।

-ইম, বিশেষণ। 'রক্তিম মরীচিকা', 'বঙ্কিম গ্রীবা', 'নীলিম রেখাতে', 'মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে', 'ম্লানিম রঙে রাঙানো', ইত্যাদি।

'-ইমা' ও -'ইম' প্রত্যয়ের ঠিক এইরকম প্রয়োগ বৈষ্ণব-পদাবলীতেও পাওয়া যায়।

দুটি শব্দ সমাসের দ্বিতীয় পদরূপে ব্যবহৃত হয়ে কারক অনুসর্গের কাজ করেছে।

তলে, সপ্তমীর অর্থে। আসনতলে, কাননতলে, গগনতলে, চরণতলে, ছায়াতলে, তিমিরতলে, মহাবিশ্বতলে, নয়নতলে, সভাতলে, ইত্যাদি। বিচ্ছিন্নভাবেও 'তলে' ব্যবহৃত হয়েছে। 'অরণ্যের তলে', 'দূর নিঃশব্দের তলে', ইত্যাদি।

ভরে, তৃতীয়ার অর্থে। আনন্দভরে, উচ্ছ্বাসভরে, 'পরিপূর্ণ বাণীভরে', 'বিকাশভরে', বিশ্বাসভরে, বিষাদভরে, স্বপনভরে, ইত্যাদি।

কথ্য বাংলা ভাষায় যত বিচিত্র অনুকার, ধ্বন্যাত্মক ও ধ্বনিগর্ভ শব্দ আছে এত আর কোনো সম্পর্কিত ভাষায় নেই। ধ্বন্যাত্মক শব্দের বৈচিত্র্যের দিকে আমাদের নজর এনে রবীন্দ্রনাথই প্রথম এ বিষয়ে যুক্তিযুক্ত (এখনকার সমালোচনার পরিভাষায় 'বিজ্ঞানসম্মত') আলোচনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এমন অনেক শব্দ নাম ও ক্রিয়াপদ -রূপে যথেচ্ছ ব্যবহার করে এবং তার থেকে নতুন পদ তৈরি করে বাংলা ভাষার শক্তিপ্রকাশের একটা নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছেন। যেমন,

বিশেষ্য। 'খেলাত আলোর কিলিবিলি', 'পাতার ঝলক ঝিকিমিকে', 'ঝিলিমিলি করে পাতা ঝিকিমিকি আলো', 'শিশিরে যে ঝিলিমিলি ঘাসে ঘাসে', 'পৃথিবীর থর-থর', 'মনের সুখে বনের যেন বুকের দুরুদুরু', 'অবিশ্রাম মর্মরের মত', 'যে তারাটি নিশীথতিমিরে তারায় তারায় কাঁপে অধীর ঝির্ঝিরে', 'ভাবের রিনিঝিন', 'মোর ছন্দে দাও টেনে তারি রিনিঝিনি', ইত্যাদি।

বিশেষণ। 'ছলছল জল', 'নয়ন ছলোছলো', 'সূর্যাস্তের রশ্মি জ্বলোজ্বলো', 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা', 'টলমল মেঘের মাঝারে', 'থরথর লাজে', 'আলোকের থরথর শিহরণ', 'দুরুদুরু বুকে', ইত্যাদি।

ক্রিয়াবিশেষণ। 'জল বহে যায় কলকলে', 'আকুলিতে থাকে কিলিবিলি', 'গুনগুন্ কেঁদে', 'ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে', 'এই যে হিয়া থরথর কাঁপে', ইত্যাদি।

ক্রিয়া। 'কিঙ্কিণী কনকনিয়া', 'ঝরনা কলকলিয়ে', 'তোমার খুকি খিলখিলিয়ে হাসে', 'মৌমাছি সে গুনগুনিয়ে খুঁজে বেড়ায় কাকে', 'চিকুর চিকমিকে চকিয়া দিকে দিকে', 'ঝরঝরিয়া ঝরে', 'ওঠে

ঝনঝনি', '**ঝুপঝুপিয়ে** বৃষ্টি যখন বাঁশের বনে পড়ে', 'ঘোড়ায় চড়ে **টগ্‌বগিয়ে**', 'কাঠঠোকরা **ঠকঠকিয়ে** কেবল প্রশ্ন করে', '**থরথরিয়ে** কেঁপে', 'দুষ্ট ফেন উঠে **বুদ্‌বুদিয়া**', '**মর্মরিয়া** কাঁপে পাতা', 'গ্যাসের আলো **মিটমিটিয়ে** জ্বলে', 'হাওয়া উঠছে শিশিরে **শিরশিরিয়ে**', ইত্যাদি।

প্রত্যয়যুক্ত। '**ছলছলে** দৃষ্টিতে', '**ছলছলানি** চোখে', '**ঝরঝরানি** হঠাৎ হাওয়ায়', '**ঝিমঝিমিন্নি** সুরে', ইত্যাদি।

বাংলা ভাষার শক্তি নামধাতুর ব্যবহারেও নিহিত আছে। মধ্যকালের বাংলার সমর্থ কবিরা নামধাতুর যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন। আধুনিক কালের প্রথম বিশিষ্ট কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামধাতুর ব্যবহারে অকুণ্ঠ ছিলেন বলে সমালোচকদের তিরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি ভুল করেন নি। রবীন্দ্রনাথও সুবিধা ও প্রয়োজন মতো নামধাতুর ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন নি। তবে সে সম্বন্ধে সমসাময়িক সমালোচনা নীরব। কেননা রবীন্দ্রনাথের ভাষা পর্যবেক্ষণের জন্য যতটা শক্তি ও যোগ্যতা আবশ্যক তা সমসাময়িক সমালোচকদের ছিল না। পুরানো কাব্যভাষার শব্দের এবং অনুকার শব্দের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত নামধাতুর কিছু কিছু উদাহরণ আগের কোনো কোনো উদ্ধৃতিতে মিলবে। এখন আরো কিছু দিচ্ছি।

অপহরি (<অপহরণ), "অট্টহাস্য আঘাতিয়া (<আঘাত) এ পাশে ও পাশে", আন্দোলিছে (<আন্দোল, আন্দোলন), আবরিয়া (<আবরণ), আবর্তিয়া (<আবর্ত, আবর্তন), আস্ফালিছে (<আস্ফাল, আস্ফালন), আহ্বানি (<আহ্বান), উদিয়াছিল (<উদয়), "কলোল্লাসে উদ্‌ঘোষিল" (<উদ্‌ঘোষ, উদ্‌ঘোষণ), "যুদ্ধে উদ্ধারিয়া সীতা", কটাক্ষিয়া, কণ্টকিয়া, কুসুমি, ক্রন্দিয়া (<ক্রন্দ, ক্রন্দন), গ্রন্থিবারে (<গ্রন্থ, গ্রন্থন), "চঞ্চলিতে (<চঞ্চল) চাহে", "আঁধার আলোর বেশে রয়েছে জাগরি (<জাগর, জাগরণ)", তরঙ্গিছে, "দাহিয়া (<দাহ, দাহন) হইবে শান্ত", "দীক্ষিছে ধরণীরে", দীপিছে, ধ্বনিল, নিঃশেষিয়া, "পীড়িয়াছি (< পীড়ন, পীড়া) ফিরিয়া ফিরিয়া দিনে রাতে", প্রবাহিয়া, "প্রবেশিনু ঘরে", "বর্ণিতেছে (<বর্ণন) আখ্যায়িকা", "ব্যথিয়ে (<ব্যথা) উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে", ব্যাকুলিয়াছে, "সে হাস্যে মন্দ্রিল (<মন্দ্র) বাঁশি সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে", রোধিয়া, "লাথিয়ে (<লাথি) তুলি", "লেহিয়া (<লেহ, লেহন) লইল", সঞ্চিয়া (<সঞ্চয়), স্পন্দিয়া (<স্পন্দ, স্পন্দন), স্পর্শিয়া, হুংকারিয়া, ইত্যাদি।

পুরানো উপাদান নিয়ে নতুন সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ যে যে ভাবে করেছেন তা উপরের আলোচনা থেকে অনেকটা বোঝা যাবে। তা ছাড়া আরো একটা ক্ষেত্র আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ পুরানো উপাদানে কোনো পরিবর্তন না এনে সরাসরি শব্দশক্তির অভিনব প্রকাশ দেখিয়েছেন। সে হল সমাস ব্যাপারে। সংস্কৃত ভাষার শক্তিমত্তার একটা বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় সমাস-প্রকরণে। নানা কারণে আধুনিক আর্য ভাষায় সমাসের বৈচিত্র্য ও ব্যাপক ব্যবহার বেশ কমে এসেছে। সংস্কৃত ভাষার অনুসরণে সাধুভাষার গদ্যে লম্বা বহরের সমাস প্রয়োগ একদা রীতিসিদ্ধ ছিল। সে কথা এখানে ধরছি না। সংস্কৃত রীতির লম্বা লম্বা সমাসে বাংলা ভাষার শক্তি বৃদ্ধি হয় নি, জড়তা বৃদ্ধি হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত ব্যাকরণের পথ না ধরে বাংলা ভাষার প্রকৃতি অনুসরণ— অর্থাৎ অনাবশ্যক বিভক্তির বর্জন— করে বিচিত্র উপায়ে নানারকমের সমাসবন্ধন করেছেন এবং তৎসম অর্ধতৎসম ও তদ্‌ভব শব্দ অনির্বিচারে জুড়েছেন। এর দ্বারা যেমন নতুন ভাবের প্রকাশ সহজ ও নতুন ব্যঞ্জনার দীপ্তি স্পষ্ট হয়েছে তেমনি পদের বাহুল্য বর্জিত হওয়ায় বাক্যবন্ধ গাঢ় ও জোরালো হয়েছে। অল্প কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

তৎপুরুষ। "গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ", "রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়", "রাত-প্রভাতের কুসুম-ফোটা", "কৃষ্ণচূড়ার পুষ্প-পাগল শাখে", ইত্যাদি।

কর্মধারয়। "হৃদয়-পাখির গগন তোমার হৃদয় দেশে", "আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গড়িব না ধরণীতে (পৃথিবীতে)", "অস্তরবির তোরণ", "মেঘকজ্জল দিবসে", ইত্যাদি।

উপপদ। "নিত্য রবে প্রাণ-পোড়ানো গানের আগুন জ্বালা", "জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে", "নিদ্রাহারা রাতের এ গান", "মিলন-ছোঁওয়া[১১] বিচ্ছেদেরই", ইত্যাদি।

বহুব্রীহি। "করবী ফুল রক্তরুচি", "স্তিমিতশিখা…দীপ", "হলুদবর্ণ চাঁদ", "চিত্ত-উদাস গানে", "নিবিড়ছায়া বটের সাথে", "খ্যাতির ক্ষতিপূরণ প্রতি দৃষ্টি রাখি হরিণ-আঁখি", "বাতাস-বওয়া সকালে", ইত্যাদি।

সুপ্‌সুপা। অর্থাৎ বাক্যাংশ-সমাস। "ভুলে-যাওয়ার বোঝাই তরী", "বাতাসটি বয় মনের-কথা-জাগানে", "জামের শাখা ফলে-আঁধার-করা", "বীণা বাজে আপন-সুরে-আপনি-নিমগন", ইত্যাদি।

জয়দেবের ও কালিদাসের আলোচনা ছাড়া এই প্রবন্ধের সমস্ত উপাদান শ্রীমতী সুনন্দা দত্তের অপ্রকাশিত গবেষণাগ্রন্থ 'রবীন্দ্র-কাব্যভাষা' থেকে গৃহীত হয়েছে।

১১ তৎপুরুষও বলা যায়। তবে মানে একটু আলাদা হবে।

বাংলা গদ্য ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমযুগের পূর্বে

> গদ্য লেখাও যে একটা রচনা সেটা আমরা এখনো স্বীকার করতে শিখিনি। যখন আমাদের পণ্ডিত-মশায়রা কাদম্বরীর রীতিতে বাংলা গদ্য লিখতেন তখন তাঁরা আর যাই হোক এটা জানতেন যে লেখাটা একটা চাষের ফসল, ওটা আগাছা নয়। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের গদ্য লেখা নিতান্তই খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে।
>
> —চিঠিপত্র, পঞ্চম খণ্ড, ১৭ সংখ্যক পত্র

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি নানা দিক থেকেই বিবেচনা করে দেখবার যোগ্য। আমাদের গদ্য যে খবরের কাগজি ছাঁদের হয়েছে তার একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব হয়েছে সাময়িক পত্রেরই আনুকূল্যে। প্রথম যুগে যদিও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং রামমোহন প্রভৃতির রচনায় গদ্য দেখা গিয়েছিল, তবু অনতিবিলম্বেই সাময়িক পত্রের সুপ্রচুর প্রচারে বাংলা গদ্য ভাবের আদানপ্রদানের সর্বজনব্যবহার্য বাহন হয়ে উঠল। যে দেশে কয়েক বৎসর আগেও গদ্যরচনার আদর্শ বিশেষ কিছু ছিল না, সে দেশে গদ্য এত শীঘ্রই যে সাহিত্যে এতখানি ব্যাপক স্থান অধিকার করে নিল তার নৈসর্গিক কারণও নিশ্চয় ছিল। বিদ্যালয়পাঠ্য বইয়ের কথা বাদ দিলেও এ কথা মনে রাখতেই হবে যে সংবাদপত্র বস্তুটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন হলেও গদ্য অবলম্বনেই সে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং আমাদের প্রাত্যহিক চিন্তাভাবনা কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা এবং তার নিবৃত্তি এই সংবাদপত্রের সৌকর্যহীন প্রয়োজনসাধনের গদ্য দিয়েই রূপ নিয়েছিল। আমাদের প্রথম যুগের উপন্যাসের উপকরণ যেমন ছিল নাগরিক জীবনের সংবাদের খণ্ড চিত্রে, আমাদের প্রবন্ধের উপকরণ তেমনি ছিল সামাজিক ও নৈতিক আন্দোলনের অসংখ্য বর্ণনায় ও সংবাদে। তার পরে যাঁরা গভীরতর আলোচনা করলেন, তাঁরাও সাময়িক পত্রকে সহায় করেই এবং তৎকালীন বিষয় অবলম্বনেই তাকে পাঠকগ্রাহ্য করেছেন। ধর্ম নিয়ে সমাজ নিয়ে বাদপ্রতিবাদের সূত্রেই জীবননীতির আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রায় সমস্ত উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা গদ্য এমনি ঋজু স্পষ্ট তথ্যপ্রাধান্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠল।

গদ্যের সঙ্গে আধুনিক চিন্তাপদ্ধতির সম্পর্ক নিবিড়। গদ্য হচ্ছে বিচারের বিতর্কের এবং জিজ্ঞাসার ভাষা। কোনো বিষয়কে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখবার প্রয়োজন যখন হয় তখন গদ্য না হলে চলে না। এবং বিশ্লেষণ করে দেখবার বাসনাই আধুনিক। এককালে মানুষ যখন প্রকৃতির দিকে বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কিংবা কোনো অলৌকিক উপস্থিতি অনুভব করেছে, তখন সে গান

গেয়েছে। প্রকৃতিকে যখন বিশ্লেষণ করে দেখতে চেয়েছে, তখন আবেগহীন স্থির ভাষায় বস্তু সংগ্রহ করে লক্ষণ নির্ণয় করেছে। বাঙালী সমাজে যখন আধুনিক যুগের সূত্রপাত হল, তারই সঙ্গে তখন গদ্য রচনার আয়োজনও স্বাভাবিক ভাবেই হয়েছে। এর কারণ শুধুই বাংলা সাহিত্যে শিক্ষার্থীদের অভাব-পূরণের চেষ্টা নয়, কারণ বাঙালী মানস যে প্রকৃতির জগতে জেগে উঠেছে। প্রকৃতির ও সমাজের উপাদান পরীক্ষা, আমাদের জীবনের সঙ্গে তার সহযোগিতার মূল্যমান নির্ণয় প্রভৃতি তখন অত্যন্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' সে যুগের একটি স্পষ্ট নির্ণায়ক। অক্ষয়কুমারের মত রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সেকালের সুপরিচিত গদ্যলেখকদের সকলেরই চিন্তা ও ভাবনার ভঙ্গিটা একই ধরণের ছিল। অন্যান্য লেখকরা মোটামুটি এদেরই অনুসরণ করে গিয়েছেন। ইতিহাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক নীতিনিয়ম ও সেই নীতিনিয়মের অনুকূল নতুন যুগের সমাজগঠনের কল্পনা উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার মূলে প্রধানত নিহিত ছিল। ব্যক্তির চিন্তাকে বিশ্বনীতির সঙ্গে যুক্ত করে নেওয়াতেই আসলে সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব হয়। রবীন্দ্রপূর্ব বাংলা প্রবন্ধের গদ্যভাষার আভিধানিক স্পষ্টতা ইংরেজি অষ্টাদশ শতাব্দীর (ম্যাথু আর্নল্ড-কথিত indispensable age of prose and reason) প্রবন্ধ-ভাষারই আদর্শে গঠিত। চিন্তার স্পষ্টতা হব্‌সের জ্যামিতির নিরলংকার মিতভাষণে প্রতিফলিত হল। অক্ষয়কুমারের শিরোনাম-বিভক্ত বিষয়বিন্যাস এবং অনুচ্ছেদরচনার পদ্ধতি চিন্তার সুশৃঙ্খল বিস্তারেরই দ্যোতক। আদর্শ প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রে এবং রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত এই রীতিতেই লিখিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তার গদ্যে বিশেষণের বিরলতা, উপমা ইত্যাদি অলংকরণের দুষ্প্রাপ্যতার কারণ সহজেই নির্ণয় করা যায়। বিষয় যেখানে ভাবময়, সেখানে সাদৃশ্যার্থক উপমা উৎপ্রেক্ষা বা চিত্রগুণসম্পন্ন বিশেষণপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। বিষয় যেখানে গণিতের মত যুক্তিবদ্ধ, সেখানে ভাষা দ্ব্যর্থহীন, আতিশয্যবর্জিত। সংবাদপত্রের সংবাদ-পরিবেশনের নির্বিকার ভঙ্গির সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য এই দিক দিয়েই আছে। পার্থক্য এই যে, সংবাদপত্র তথ্য মাত্র, আর প্রবন্ধ শুধু সাময়িক বিষয় নয়, বিশ্বনীতি ও প্রাকৃতিক সত্যের নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা।

এটা তো গেল শুধু তত্ত্ব বা চিন্তার নূতনত্বের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি গদ্যের বাংলা গদ্যের উপর প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গদ্যের ব্যাকরণগত নিয়মগুলি[১] ক্রমে স্থিরীকৃত হলে

১ বাংলা গদ্যের ধর্ম ও নির্মাণপ্রণালীর আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

আমি বোধ করি, কবিতায় হ্রস্ব পদ, ভাবের নিয়মিত ছেদ ও ছন্দ এবং মিলের ঝংকারবশত কথাগুলি অতি শীঘ্র মনে অঙ্কিত হইয়া যায় এবং শ্রোতাগণ তাহা সত্বর ধারণা করিতে পারে। কিন্তু ছন্দোবন্ধহীন বৃহৎকায় গদ্যের প্রত্যেক পদটি এবং প্রত্যেক অংশটি পরস্পরের সহিত যোজনা করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া যাইতে বিশেষ একটা মানসিক চেষ্টার আবশ্যক করে। সেইজন্য রামমোহন রায় যখন বেদান্তসূত্র বাংলায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন গদ্য বুঝিবার কী প্রণালী, তৎসম্বন্ধে ভূমিকা রচনা করা আবশ্যক বোধ করিয়া-ছিলেন।—সাহিত্য, 'বাংলা জাতীয় সাহিত্য', ১৩০১

অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাতে প্রবন্ধ-গদ্যের রূপ প্রস্তুত হল। এই সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে প্রায় একই সময়ে কথাসাহিত্যের গদ্যও তৈরি হয়ে উঠতে থাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচনায়। বিদ্যাসাগরের প্রচলিত সাহিত্যিক রচনাগুলি সংস্কৃত সাহিত্য থেকে অনুবাদ। এজন্য কেউ কেউ তাঁকে শিল্পী বলে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। কাহিনীর মৌলিকতা যদি তাঁর নাও থাকে, তবু কল্পনামূলক গদ্যের ভাষাসৃষ্টির গৌরব তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য। যে জীবনমূল্য আবিষ্কার করবার চেষ্টায় সেকালের যুক্তি তর্ক বিচার এবং প্রবন্ধরচনা, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই বস্তুকেই আয়ত্ত করে গিয়েছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বাণী যাতে সমাহৃত, বিদ্যাসাগর মহাশয় তারই আভাস দিলেন তাঁর অনুবাদ-সাহিত্যে। সেকালের অবাস্তব রূপকথা এবং অসম্ভব কাহিনীর যুগে বিদ্যাসাগর আমাদের মনোযোগ ফেরালেন ক্লাসিকাল সাহিত্যে। রাজসিক ঐশ্বর্য ও মানবহৃদয়ের সুখদুঃখবেদনাকে তিনি আনলেন সেকালের বাংলা গদ্যভাষায়। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে তিনি কাহিনী এনেছেন, কিন্তু বর্ণনাভঙ্গী তাঁর নিজস্ব। সেকালের দিনে আর যাঁরা সংস্কৃত সাহিত্য থেকে যথার্থ অনুবাদ করেছেন তাঁদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য এখানেই যে বিদ্যাসাগর প্রাচীন কাহিনীকে নিজের কল্পনা দিয়েই প্রকাশ করেছেন; অন্যান্য অনুবাদকেরা ভাষা নিয়ে চিন্তাই করেছেন, তার সঙ্গে কল্পনা যুক্ত হয় নি। কথা-গদ্যের কাজ হচ্ছে চলিষ্ণু ঘটনা ও দৃশ্যের গতিশীলতাকে পাঠকমনে পৌঁছে দেওয়া। এর জন্য গদ্যের দুটি গুণের প্রয়োজন, অলংকরণ এবং ছন্দঃস্পন্দ। চিন্তার গদ্য যেমন অলংকারবিরল হয়ে ওঠে, কথা-গদ্যের তেমনি কল্পনাপ্রসারণের জন্য দরকার বিশেষণ ইত্যাদি স্বাভাবিক আতিশয্যের। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের গদ্য সম্পর্কে বহু পূর্বে বলেছিলেন—

> গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটি অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্বাচন করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন।
>
> —বিদ্যাসাগরচরিত, ১৩০২

ইংরেজ সমালোচক[২] বলেছেন শ্রেষ্ঠ কথা-গদ্যের সৃষ্টি হয় মহাকাব্যিক যুগে (in ages when the epic spirit has prevailed)। কারণ যে যুগে লেখক আত্মভাবপ্রধান হয়ে ওঠেন সে যুগে সততা রক্ষা করে বর্ণনা সম্ভব হয় না। কথা-গদ্য আত্মমুখরতাও নয় আত্মপ্রাধান্যও নয়। এই গদ্যের উৎকর্ষ ভাবের সাবয়বতায় এবং নৈর্ব্যক্তিকতায়। কথা-গদ্যের এই লক্ষণগুলি যদি সত্য হয়, তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস এই গুণে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে সন্দেহ নেই, এবং বিদ্যাসাগরই তার সূচনা করেছিলেন। সেকালের কথাসাহিত্যের অনুপ্রেরণায় ছিল সানুরাগ অতীতচারিতা। সংস্কৃত সাহিত্যের কাহিনীকে বাংলায় পরিবেশন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর ভাষায় সেই অনুরাগকে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর ভাষা সর্বত্র সমান নয়। 'শকুন্তলা' এবং 'সীতার বনবাসে'র

২ Herbert Read, *The English Prose Style*

ভাষার মধ্যে ভেদ আছে। তবু শকুন্তলার ভাষাই যে একটা সত্যিকার সাহিত্যিক গদ্য স্টাইলের পরিচয় দিচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। মহাভারতের অনুবাদেই তিনি কল্পনাশক্তির চেয়ে সততা রক্ষায় বেশি মনোযোগী হয়েছিলেন।

নতুন করে বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর এই গদ্য স্টাইল নির্মাণ করেছিলেন সংস্কৃতের উপকরণ দিয়ে এবং নিজের স্বাভাবিক প্রতিভা দিয়ে। প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পূর্বোক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতপণ্ডিতদের রচনাশিল্পের অনুকূল মন্তব্য করেছিলেন, এই প্রসঙ্গে সেটাও স্মরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যে দু রকমের গদ্যের সাক্ষাৎ পাই, সূত্রধর্মী এবং দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী। রবীন্দ্রনাথ 'বাংলা-ভাষা-পরিচয়ে' বাংলা গদ্যের মধ্যযুগীয় নিদর্শন বলে রূপগোস্বামীর কারিকা থেকে যে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, সেটা সংস্কৃতের সূত্ররীতির অনুসরণে গঠিত। সূত্ররীতির গদ্য স্বল্পাক্ষর, ক্রিয়াপদবিরল, হ্রস্বকায় ও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যের ত্রুটি সম্পর্কে বলেছেন—

> বাংলা ভাষার কাঁচা অবস্থায় যেটা সবচেয়ে আমাদের চোখে পড়ে সে হচ্ছে ক্রিয়াব্যবহার সম্বন্ধে ভাষার সংকোচ। সদ্যডিমভাঙা পাখির বাচ্ছার দেখা যায় ডানার ক্ষীণতা। ক্রিয়াপদের মধ্যেই থাকে ভাষার চলবার শক্তি।...ক্রিয়াপদ-ব্যবহার যদি পাকা হত, তা হলে উড়ে চলার বদলে ভাষার এরকম লাফ দিয়ে চলা সম্ভব হত না। সেই সময়কেই বাংলা ভাষার পরিণতির যুগ বলব যখন থেকে তার ক্রিয়াপদের যথোচিত প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য ঘটেছে।
>
> —বাংলাভাষা-পরিচয়, ১০

সূত্রধর্মী গদ্যের মধ্যেই থাকে ক্রিয়াপদের সংকোচন। এইজন্যেই আসে আড়ষ্টতা। অবশ্য এই ক্রিয়াপদ-ব্যবহারের ভিন্নতর নৈপুণ্য দিয়েই বাংলা গদ্যভাষার নতুন রীতি গড়ে উঠেছে, এই নিয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। কিন্তু যাকে সাহিত্যিক গদ্য বলে, আধুনিক বাংলায় তার পূর্বসূচনা এই সূত্রধর্মী রচনায় ছিল না, এটাও ঠিক। সংস্কৃত সাহিত্যে যে আর-এক রকমের গদ্যরীতির ব্যবহার ছিল, সেই দূরান্বয়ী বিস্তারধর্মী গদ্যই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রভাবিত করে থাকবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর সংস্কৃত গদ্যকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। দীর্ঘ সমাসবাহুল্যকে ক্ষুদ্রতর বাক্যে বিভক্ত করলেন, ছেদচিহ্ন দিয়ে অর্থসম্পন্ন বাক্যাংশের ইঙ্গিত দিলেন, অনুচ্ছেদ রচনা করে অর্থমণ্ডল সৃষ্টি করলেন। তারাশংকরের কাদম্বরীর অনুবাদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের রচনার তুলনা করলে এই পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। এই আধুনিক আদর্শ বিদ্যাসাগর কোথায় পেলেন? ইংরেজি গদ্য থেকে আমাদের গদ্য যে ভাবে তৈরি হয়ে উঠছিল, বিদ্যাসাগর সেখান থেকেই এই আদর্শ লাভ করে থাকবেন। কারণ তিনি সত্যই তো আর কাদম্বরী রীতিতে পল্লবিত সমাসাকীর্ণ ছেদপ্রয়োজনহীন তরঙ্গসংকুল গদ্য লেখেন নি। এখানে উল্লেখযোগ্য, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিতমশায়দের কাদম্বরী রীতিতে লেখা বাংলা গদ্য সম্পর্কে যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন, তার একটা অর্থ আছে, যদিও অন্তত: প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের সঙ্গে তার কোনো তুলনা মনে আসবার কথা নয়। সংস্কৃত রীতির গদ্য বাংলা মৌখিক ভঙ্গির একেবারে বিপরীতমুখী।

সেদিক থেকে সে গদ্য কৃত্রিমতার দ্বারা পরাহত। আরও পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথই সে গদ্যকে নিন্দা করেছিলেন এই বলে—

একবার যেমনি একে আত্মপ্রমাণের অবকাশ দেওয়া গেছে, অমনি আপন সহজ প্রাণশক্তির জোরেই সমস্ত বাঁধা আল ডিঙিয়ে আজ বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে আপন দখল কেবলি এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তার কারণ এটা জবরদখল নয়, এই দখলের দলিল ছিল তার নিজের স্বভাবের মধ্যেই, ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিতেরা সংস্কৃত বেড়া তুলে দখল ঠেকিয়ে রেখেছিলেন।

—পরিচয়, ১৩৩৮

তবু রবীন্দ্রনাথ একদিন এই সংস্কৃত পদ্ধতির গদ্যকে সম্মান করেছিলেন এবং নিজেও অনুসরণ করেছিলেন। সংস্কৃত রীতির গদ্যে আর-কিছুর অভাব থাকলেও শব্দ সম্বন্ধে সতর্ক চিন্তা ও আয়াসের লক্ষণ আছে। ভাষাও যে একটা সাধনার বস্তু, তাঁদের গদ্য এ বিষয়ে আমাদের কৌতূহল জাগায়। সে-গদ্য দৈনন্দিন জীবনের নয় বলেই তার মধ্যে এক ধরণের স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য আছে। বিদ্যাসাগর এই রাজলক্ষণসমন্বিত ভাষাকে দরিদ্র গ্রাম্য পাণ্ডিত্যের ঘর থেকে নিয়ে এসে রানীর আসনে বসালেন। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের এই প্রতিভা সম্পর্কে আর একটি চমৎকার কথা বলেছিলেন—

ভাষার অন্তরে একটা প্রকৃতিগত অভিরুচি আছে, সে সম্বন্ধে যাঁদের আছে সহজ বোধশক্তি, ভাষাসৃষ্টিকার্যে তাঁরা স্বতই এই রুচিকে বাঁচিয়ে চলেন, একে ক্ষুন্ন করেন না। সংস্কৃতশাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এইজন্য বাংলা ভাষার নির্মাণকার্যে সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকে তিনি যথোচিত উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন। কিন্তু উপকরণের ব্যবহারে তাঁর শিল্পীজনোচিত বেদনাবোধ ছিল। তাই তাঁর আহরিত সংস্কৃত শব্দের সবগুলিই বাংলা ভাষা সহজে গ্রহণ করেছে, আজ পর্যন্ত তার কোনোটিই অপ্রচলিত হয়ে যায় নি।

—বিদ্যাসাগরস্মৃতি, ১৩৪৬

বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত শব্দ-চয়ন বাংলা ভাষাপ্রকৃতির সম্মতি লাভ করে বেঁচে আছে, এতে তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয়। কিন্তু বাংলার গদ্যভাষায় তিনি যেটা আনেন নি, সেটা হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতাগুণ। এই গুণই বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত জীবন্ত সচল এবং সব রকম মানসিকতার উপযোগী করে তোলে। বিদ্যাসাগরের ভাষা রাজরানীর মত। হাটে বাজারে, মধ্যবিত্ত সংসারে, সভায় উৎসবে, বৈজ্ঞানিক পৃথিবীতে সে ভাষা সর্বত্রগামিনী নয়। যে ভাষা নিজেকে সব অবস্থার উপযোগী করে তুলতে পারে, সেই ভাষাই স্থিতিস্থাপক। ভাষার দ্বার যদি মুক্ত করে রাখা যায়, তবে সেই পথেই বাইরের হাওয়া তাতে প্রবেশ করে। বিচিত্র মনের বিচিত্র ভঙ্গি এবং তার প্রকাশদায়িত্বকে স্বীকার করে নেয়। নিজের সীমাবদ্ধ জগৎ থেকে বেরিয়ে না এলে তা চলে না।

বাংলা ভাষা সংস্কৃত ভাষা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল সত্য। কিন্তু বাংলার শব্দভাণ্ডারের একটি বৃহৎ অংশ সংস্কৃতের দানে এখন পুষ্ট হলেও বাক্যগঠনরীতি, বিশেষণ-প্রয়োগপ্রণালী, বিভক্তিপ্রত্যয়, সর্বোপরি উচ্চারণবৈশিষ্ট্য এবং ইডিয়ম ইত্যাদিতে অনন্যতুল্য ভঙ্গি— এসব দিক দিয়ে বাংলা

গদ্যে স্পষ্টতা আসা সহজ হয়েছিল। অবশ্য শুধু এটাই কারণ নয়। চিন্তা ও যুক্তি প্রবন্ধ-গদ্যে বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপনের সুস্পষ্টতা নিয়ে এসেছিল, তেমনি কল্পনার সাবয়বতা কথা-গদ্যকেও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, বাহুল্য-বর্জিত এবং পরিমিত করে তুলেছিল। বঙ্কিমযুগের গদ্য বলতে এই গুণগুলিকেই বোঝায়। অবশ্য সাহিত্যিক গদ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান লেখকদেরই গণনীয় করতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে একাধিকবার বাংলা গদ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্যারীচাঁদের গ্রন্থাবলীর সমালোচনায়, 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর সমসাময়িক কালের গদ্যের আদর্শ স্থির করে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। মোটামুটি তাঁর বক্তব্যটা এই : ভাষা যেন বক্তব্যকে অতিক্রম করে না যায়, তার জন্য ভাষার যথাযথতা রক্ষা করা দরকার। এর জন্য অনাবশ্যক সংস্কৃতবাহুল্য ত্যাগ করে মুখপ্রচলিত ভাষার অনুগামী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষার অন্যবিধ ত্রুটি থাকলেও এই ভাষার মৌখিক ভঙ্গিকে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কাম্য মনে করেছিলেন। অবশ্য 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'র চলতি রীতি তাঁর কাছে অযোগ্য মনে হয়েছিল। হুতোমী ভাষাকে তিনি বলেছেন শব্দধনে দরিদ্র। অবশ্য তিনি এ ভাষাকে 'নিস্তেজও' বলেছিলেন। কিন্তু হুতোমের ব্যঙ্গ (satire) নিস্তেজ নয় বরং অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। স্থানীয় ভঙ্গি ব্যবহৃত হওয়ায় ছবিগুলি খুব বাস্তব এবং ভঙ্গি খুব জীবন্ত হয়েছে। কিন্তু আলালের সঙ্গে হুতোমের তুলনায় একটা বিষয় অন্তত ভাষাশিল্পী বঙ্কিমের বুঝতে বাকি ছিল না যে আলালের ভাষায় যে সম্ভাবনা আছে হুতোমের ভাষায় তা নেই। অর্থাৎ আলালের ভাষার কাঠামো দিয়ে নানা মূর্তি গড়া যেতে পারে কিন্তু হুতোমের ভাষা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করলেও এই ভাষাকে বিষয় অনুযায়ী স্থিতিস্থাপক করে তোলা শক্ত। আলালী ভাষা ক্রিয়াপদ এবং শব্দসম্পদে সাধুরীতি অক্ষুণ্ণ রেখেছে, যদিও তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চলতি ইডিয়মের ব্যবহার এবং বাক্যরচনার মৌখিক ভঙ্গি মিশেছে। কিন্তু প্রয়োজন অনুসারে আলালী ভাষার মধ্যে কঠিনতর সংস্কৃত শব্দ বা লঘুতর চলতি শব্দ, শুদ্ধতর সংস্কৃত বাক্যরীতি অথবা ইংরেজি বাক্-ভঙ্গিমা— এসব ব্যবহার করলেও আলালী ভাষার বৈশিষ্ট্য কিছুই ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু হুতোমী ভাষা এমনই আঞ্চলিকতায় বদ্ধ যে এতে আর কোনো নমনীয়তা আনা সম্ভব নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যের আলোচনা করতে গিয়ে বিশেষ একটি সাহিত্যরূপের আদর্শকে সামনে রাখেন নি। উপন্যাস প্রবন্ধ বা ব্যঙ্গরচনা বলে বিশেষ শ্রেণীর আলোচনা তিনি করেন নি। তিনি একটি সাধারণ (standard) গদ্যরূপের কথাই ভাবছিলেন। এটা স্বীকার করতে হবে, প্রবন্ধ বা উপন্যাসের সাধারণ গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সেকালে অসাধারণ উদারতাও দেখিয়েছিলেন ; সংস্কৃত-অন্ধতা বর্জন করে তিনি ভাষাকে মুখের ভঙ্গির অনুগামী করতে চেয়েছিলেন। প্রধানতঃ শব্দ নিয়ে আলোচনা করলেও মৌখিক ভঙ্গি বলতে আরও অনেক কিছু বোঝায়, বঙ্কিম সে-সব বিষয় উত্থাপন করেন নি। আলোচনায় সে-সব না আনলেও বঙ্কিম সাহিত্য রচনা করবার সময় মৌখিক ভঙ্গির প্রয়োগ করে চলেছিলেন। বঙ্গদর্শনে উপন্যাস এবং প্রবন্ধ একই সঙ্গে রচনা করছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যে-গদ্য তিনি উপন্যাসে ব্যবহার করছিলেন এবং যে-গদ্য তিনি প্রবন্ধে ব্যবহার করছিলেন, মূলতঃ তারা একই। হ্রস্বকায় সরল এবং ক্ষুদ্র বাক্য, মাঝে মাঝে প্রশ্নাত্মক বাক্যের ব্যবহার দ্বারা পাঠকের ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে রাখা, শব্দচয়ন সম্পর্কে উদারতা, কখনও কখনও ইংরেজি বাক্যরীতি, নিছক শ্রুতিমাধুর্যের অলংকরণ বর্জন, শব্দের পরিমিতি রক্ষা এবং শব্দের অর্থাভাসের (shade of meaning) উপর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা না করা— এ সবই বঙ্কিমী গদ্যের নিজস্ব গুণ। অবশ্য সবচেয়ে বড়ো নতুন বৈশিষ্ট্য, নিখুঁত অনুচ্ছেদ রচনা। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের শ্রেষ্ঠত্বের একটা বড়ো কারণ নিশ্চয়ই এই নিটোল অনুচ্ছেদনির্মাণ। অনুচ্ছেদই বক্তব্যকে সুবিন্যস্ত করে, অর্থকে সংহতিবদ্ধ করে। অনুচ্ছেদ রচনার কৌশলেই বক্তব্য পাঠকমনে কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে এবং স্থায়িভাবে মুদ্রিত হয়। সমস্ত বিষয়টাকে সুসজ্জিত রূপায়ত করে তোলে অনুচ্ছেদ। বঙ্কিমের প্রবন্ধের নিটোল রূপ অনেকটাই যে অনুচ্ছেদ নির্মাণের গুণে, একটু পরীক্ষা করলেই সেটা বোঝা যাবে।

বঙ্কিমকে কেন্দ্র করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের গদ্যসাহিত্যের যে বিস্তার, রবীন্দ্রনাথ তার একটা বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে—

নতুন যুগের জোয়ার আসে কোনো একজন বিশেষ মনীষীর মনে। নতুন বাণীর পণ্য বহন করে আনে। সমস্ত দেশের মন জেগে ওঠে চিরাভ্যস্ত জড়তা থেকে, দেখতে দেখতে তার বাণীর বদল হয়ে যায়। বাংলাদেশে তার মস্ত দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে ভাষার মধ্যে অসাড়তা ছিল; তিনি জাগিয়ে দেওয়াতে তার যেন স্পর্শবোধ গেল বেড়ে। নতুন কালের নানা আহ্বানে সে সাড়া দিতে শুরু করলে। অল্পকালের মধ্যেই আপন শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন হয়ে উঠল। বঙ্গদর্শনের পূর্বকার ভাষা আর পরের ভাষা তুলনা করে দেখলে বোঝা যাবে, এক প্রান্তে একটা বড়ো মনের নাড়া খেলে দেশের সমস্ত মনে ঢেউ খেলিয়ে যায় কত দ্রুতবেগে, আর তখনি তার ভাষা কেমন করে নূতন নূতন প্রণালীর মধ্যে আপন পথ ছুটিয়ে নিয়ে চলে।

—বাংলাভাষা-পরিচয়, ৬

বাংলা গদ্যের এই বিচিত্র বিস্তারের মূলে একই ধরণের মনোভঙ্গি ছিল। প্রবন্ধের গদ্যের মূলে ছিল আত্মনিরপেক্ষ সমাজবোধ। এইজন্য বক্তব্যকে যথাসম্ভব স্পষ্ট এবং যুক্তিধর্মী করবার দিকেই ঝোঁক ছিল। বিশেষতঃ যে মূল্যমানকে দেশ সমাজ এবং জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা চলেছে, সেটা কাল্পনিকও নয়, নির্বস্তুকও নয়, বরং যুক্তিসিদ্ধ ও ব্যবহারিক। পাশ্চাত্য মননধারা থেকে প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে, ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে চিন্তামূলক গদ্যসাহিত্যের প্রসার ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি প্রবন্ধের বক্তব্যসর্বস্বতার অনুসরণে আমাদের সাহিত্যেও এই বৈশিষ্ট্য প্রাধান্য পেয়েছিল। প্রবন্ধের গদ্যের এই নৈর্ব্যক্তিকতার সঙ্গে সাদৃশ্য ছিল কথা-গদ্যের বিবরণাত্মক বস্তুনিষ্ঠতার। সেকালের উপন্যাস এবং মহাকাব্যের যুগে সৃষ্টিমানসও ছিল জীবনের রূপময় বিশালতায় মুগ্ধ। সেকসপীয়রের নাটক স্কটের উপন্যাস ছিল আত্মবিরহিত কাহিনী-লীলায় লীলায়িত, শরীরী কল্পনার বর্ণাঢ্যতায় সমৃদ্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেও ছিল তারই সগোত্রতা।

এই কল্পনা থেকে যে narrative style-এর জন্ম হল, তারও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় বর্ণনার পরিমিতি-সচেতনতায় এবং সাবয়বতায়। বঙ্কিমের উপন্যাসের ক্ষুদ্রায়তন ছাড়াও যুদ্ধ প্রকৃতি এবং পরিবেশ বর্ণনার সংক্ষিপ্ততাও লক্ষণীয়। নিছক বর্ণনার আনন্দেই রং ফলানো বা ভাষাবিস্তার বঙ্কিমের বৈশিষ্ট্য নয়। নায়িকার দীর্ঘ রূপবর্ণনাকে ব্যতিক্রম বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেখানেও নায়িকা-রূপ তার চরিত্রেরই বহির্বিকাশ বলেই বঙ্কিমকে দীর্ঘ বর্ণনা দিতে হয়েছে। কারণ চরিত্রবিশ্লেষণ সেকালের পদ্ধতি ছিল না। নাটকীয় সংকেত এনে এবং কখনও কখনও সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়েই কৌতূহল জাগিয়ে রাখা এবং গতিবেগ আনা বঙ্কিমের বর্ণন-রীতির বৈশিষ্ট্য। ক্ষুদ্র বাক্যের পারম্পর্যও দ্রুতগতি নিয়ে আসতে সাহায্য করে। বঙ্কিমের কথা-গদ্যের আর-একটি বৈশিষ্ট্য কৌতুকময় বর্ণনাভঙ্গি। মাঝে মাঝে কৌতুক করে বলবার জন্য বর্ণনায় অন্তরঙ্গতা এবং লঘুতা এসেছে। বাক্যরীতিও হয়েছে ক্ষিপ্র এবং যথাসম্ভব হালকা।

বঙ্কিমের এই প্রবন্ধ-গদ্য এবং কথা-গদ্য উনবিংশ শতাব্দীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বক্তব্যপ্রাধান্য, স্পষ্টতা, অলংকারবিরলতা, এবং সমাজকল্যাণমূলক আদর্শের গুরুগম্ভীর বিশ্লেষণ মোটামুটি সকলের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। ভূদেব, বঙ্কিম, রাজেন্দ্রলাল, রমেশ দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, অপেক্ষাকৃত অল্পখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়— প্রায় সকলের সম্বন্ধেই এই মন্তব্য অল্পাধিক প্রযোজ্য। এঁদের লেখা প্রবন্ধের আর-একটি আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য এই যে, আলোচ্য বিষয়ও প্রায় একই ধরণের অর্থাৎ তত্ত্বমূলক— দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি। বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরে বিষয়ানুগমনের কঠোরতা কিছুটা শিথিল হলেও বক্তব্যের প্রাধান্য এবং সেই হিসাবে আত্মনিরপেক্ষ সমস্যাচিন্তা তেমন হ্রাস পায় নি। আসলে, কথা এবং প্রবন্ধের গদ্য স্টাইল মিশে কমলাকান্তের দপ্তরের সৃষ্টি, তাই এর পশ্চাৎপটে সেই উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতাই অক্ষুণ্ণ।

রবীন্দ্রনাথ এই গদ্যরীতির আবহাওয়াতে বর্ধিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনাগুলি পড়লে বিস্মিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে এর মধ্যে বঙ্কিমী গদ্যের অন্ধ অনুসরণ নেই। সন্ধ্যাসংগীত প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮২। রবীন্দ্রনাথ নিজে এ যুগের কবিতা সম্পর্ক বলে-ছিলেন কিশোর মন তখন হৃদয়-অরণ্যে পথভ্রান্ত। নিজের মনের অস্পষ্ট অস্ফুট ভাবগুলি নিয়েই তখন তাঁর জগৎ। বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর তখনও সাক্ষাৎ হয় নি। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ যেসব গদ্য রচনা লিখছিলেন, তার মধ্যেও কিন্তু এই বিশেষত্ব আছে। এ সময় তাঁর আলোচ্য বিষয়কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, সাহিত্য ও আত্মভাব। প্রথমেই দ্বিতীয় বিষয়টিকে লক্ষ্য করতে বলি। বিষয় হিসাবে 'আত্মচিন্তা' বাংলা গদ্যে নতুন রীতির সূত্রপাত করল। সেকালের গদ্যরচনার বিষয়প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করলেন না। তাঁর সেই রচনাগুলিতে আত্মচিন্তন বা আত্মকথনই বড়ো। নিজের মনের ভাব বিশ্লেষণ করেই তিনি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিলেন। অথবা কোনো একটা উপলক্ষ্য নিয়ে আত্মগত আলোচনা করতেই তাঁর কিশোর মনের আনন্দ। স্বভাবতঃই এসব প্রবন্ধে কোনো বহির্গত সমস্যা, দেশ সমাজ জাতি সম্পর্কে কোনো

গুরু ভাবনার বিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে সাহিত্যবিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এই রচনাগুলিতেও আত্মগত ভঙ্গি প্রবল। সাহিত্যবিচারে পাঠক হিসাবে ব্যক্তিগত আস্বাদন-বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই এগুলি রচিত। তাঁর নিজের বিশ্বাসের সুরটিও খুবই স্পষ্ট। সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাবহারিক মানদণ্ড নিলে বক্তব্য নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। নিছক ব্যাবহারিক যুক্তির বিচার যেমন সর্বজনবোধ্য তেমনি ব্যক্তিগত অনুভূতিবর্জিত। অবশ্য 'মেঘনাদবধ' বা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রভৃতি সমালোচনাতে তিনি শুধু মনের আবেগেই লেখেন নি; তাদের মধ্যে সাহিত্যশাস্ত্রের লক্ষণ-বিচার ও প্রয়োগচেষ্টা ছিল, তবু আসলে সমালোচকের আস্বাদন-ভঙ্গিকে মাত্র তারা পুষ্ট করেছে। এইজন্য এসব রচনায় সমালোচকের নিজের প্রত্যয় ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা নিঃসন্দিগ্ধ।

বালকবয়সেই রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা, চিন্তা ও বিচারশক্তির পরিচয় অনেককেই বিস্মিত করেছে। সমালোচক মোহিতলাল অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবেই বলেছেন—

সেকালে যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ ও আলোচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রৌঢ়ত্বের ছাপ ছিল, এমনকি সেকালের কোন প্রবীণ লেখকের পক্ষেও তেমন রচনা সহজ ছিল না। কিন্তু তখন তাঁহার কবিতা অতিশয় অপরিপুষ্ট ছিল, তাহাতে form বা প্রকাশসৌষ্ঠবের একান্ত অভাব ছিল। ষোল বৎসর বয়স হইতে পঁচিশ বৎসর— এই দশ বৎসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত কবিতা ও লিখিত প্রবন্ধ তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এই প্রতিভার আদি উন্মেষ কোন্ পথে হইয়াছে। বাস্তবিক এত অল্পবয়সে মানস-শক্তির (intellect) এমন জাগরণ কবিজীবনে অতিশয় বিরল। ইংরেজ কবি কীটস-এর পত্রাবলীতে যে অসাধারণ মানসতীক্ষ্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও তাঁহার কবিশক্তির পূর্ণবিকাশকালেই ঘটিয়াছিল— রবীন্দ্রনাথের হইয়াছিল আরও অল্পবয়সে এবং কবিশক্তি বিকাশের পূর্বে।[৩]

এই বিচারশক্তি এবং সচেতনতা গদ্যের অনুপ্রেরক। এই বিচারশক্তিকে রবীন্দ্রনাথ প্রযুক্ত করেছিলেন আত্মভাববিশ্লেষণে, এটাই লক্ষ্য করবার বিষয়। মননশক্তিকে যদি তিনি বস্তুবিশ্লেষণে প্রয়োগ করতেন তবে নিঃসন্দেহে তাঁর প্রবন্ধ বঙ্কিম বা ভূদেবের প্রবন্ধের অনুরূপ হয়ে উঠত। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতার একটা প্রাথমিক কারণ হচ্ছে তাঁর অধ্যয়ন-রীতি। রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নস্পৃহা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাঁর গ্রন্থপাঠ বিশ্ব-বিদ্যালয়-নির্দিষ্ট (academic) প্রণালীতে চলে নি বলেই তার বিশ্লেষণরীতিও ঠিক গবেষণাধর্মী নয়। আরোহ (Inductive method) ও ঐতিহাসিক (Historical method) রীতি আয়ত্ত হয় সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে এই রীতির ব্যবহার নেই, যদিও বিশ্লেষণমূলক আলোচনা রবীন্দ্রনাথের আছে। সে সম্পর্কে যথাসময়ে আলোচনা করব।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যখন বঙ্গদর্শন প্রচার ভারতী -গোষ্ঠীর গুরু প্রবন্ধ রচনা পূর্ণোদ্যমে চলেছে, তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ একটা নতুন গদ্যরীতির উদ্ভাবন ও অনুসরণ করছেন। আত্মভাবকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ মননশক্তির উন্মেষ হয়েছে। তাঁর বিশ্লেষণ-প্রতিভা

৩ কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, প্রথম খণ্ড, ১৩৫৯, পৃ ৩৬

ভাববিশ্লেষণেরই প্রতিভা, বস্তুবিশ্লেষণের প্রতিভা নয়। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনিই যে মনোবিশ্লেষণ-রীতির উদ্ভাবক হবেন আমাদের সাহিত্যে সেটা কিছুই আকস্মিক বিস্ময়ের বিষয় নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে সেকালের কবিতার ক্ষেত্রে বিহারীলালের যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, আমাদের মতে গদ্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নিজেরই সেই স্বাতন্ত্র্য ছিল। তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই আত্মভাবমূলক রচনার সঙ্গে কতকটা মিল বঙ্কিমের কমলাকান্তের দপ্তরের 'একা' রচনাটির সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে বটে। মিল অনেকটাই আছে সত্য। বঙ্কিমের রচনায় বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ, যুক্তিপারম্পর্যও খুব স্পষ্ট। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনায় বিশ্লেষণ তীক্ষ্ণ হলেও বহির্গত যুক্তির চেয়ে অনুভূতির পারম্পর্যকেই যেন সাজানো হয় বেশি। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র 'সমাপন' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—

ইহা একটি মনের কিছুদিনকার ইতিহাস মাত্র। ইহাতে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সকলগুলি কি আমি জানি, না বিশ্বাস করি? সেগুলি আমার চিরগঠনশীল মনে উদিত হইয়াছিল, এই মাত্র। তাহার সকলগুলিই সত্য, অর্থাৎ ইতিহাসের হিসাবে সত্য, যুক্তিতে মেলে কি না মেলে সে কথা আমি জানি না। যুক্তির সহিত না মিলিলে যে একেবারে কোন কথাই বলিব না এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে কি জানি পাছে এমন অনেক কথা না বলা হয় যেগুলি আসলে সত্য!

—অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৯০-৯১

আমাদের বিশ্বাস রবীন্দ্রমানসের এই স্বাধীন বিচারণার পথ বাঁধা হয়েছিল পিতা দেবেন্দ্রনাথের রচনাতে। সেকালের দিনে দেবেন্দ্রনাথের একটি নিজস্ব গদ্যরচনাপদ্ধতি ছিল। তাঁর ধর্ম্মবিষয়ক রচনা বিশেষতঃ আত্মচরিতের রচনারীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথেরও আত্মভাবাশ্রয়ী চিন্তাধারার পূর্ব সূচনা পাওয়া যায়। এই রচনাপদ্ধতির একটি সূত্র সংক্ষেপে নির্দেশ করছি। এই সূত্রটি দেবেন্দ্রনাথই তাঁর ধর্মজীবনের আদর্শ রূপে জানিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত, ধর্ম। আত্মচেতনা এবং জ্ঞান এই দুই উপাদানে তাঁর ধর্মচেতনা গঠিত। তাঁর রচনার মধ্যেও কোমল বিশ্বাসের সঙ্গে সহজ যুক্তির মিশ্রণ গদ্যরচনার মধ্যে বলিষ্ঠ লাবণ্যের সঞ্চার করেছে। তিনি রাজনীতি বা অনুরূপ বহিরঙ্গ বিষয় নিয়ে লেখেন নি। তাঁর আত্মকথনভঙ্গি গদ্যকে এক দিকে সচেতন সাহিত্যিক আড়ম্বরবর্জিত করেছে। সরল শব্দ ও সরল বাক্যে নিজের মনের ভাবগুলিকে সহজ প্রত্যয় দিয়ে বলে গিয়েছেন। স্বাভাবিক ভাবে এই ভঙ্গিতে পত্রসাহিত্যের আভাস ছিল। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের ডায়ারি বা পত্রসাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্যের ক্ষীণ আভাস এখানেই ছিল। দেবেন্দ্রনাথের জীবনোপলব্ধি এক দিকে আত্মপ্রত্যয়ের উপরেই মূলতঃ নির্ভরশীল। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে তাই দেখি সামান্য বস্তুকে অবলম্বন করেও ভাবমগ্ন হওয়ার অসামান্য ক্ষমতা। অথচ এই ভাবমগ্নতার ফলে অসংযত উচ্ছ্বাসেও তিনি যে আত্মহারা হয়েছেন তা নয়। সেকালের দিনের বিখ্যাত গদ্যলেখক কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনার সঙ্গে তাঁর পার্থক্য শুধু যে ভাষার তা নয়, মননের আদর্শেও।

রবীন্দ্রনাথ নিজের এই ধরণের রচনার মধ্যে ১২৯২তে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধকে স্বীকার করেছেন। এই রচনার ধারা তিনি সবুজপত্রের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন। তবু প্রথম দিকের লেখার সঙ্গে পরের দিকের লেখার পার্থক্য ছিল। সে পার্থক্য গদ্যরীতি নিয়ে। প্রথম দিকের গদ্য স্পন্দিত। এর আগাগোড়াই একটা ভঙ্গিগত ঐক্য আছে এবং সে ভঙ্গি হচ্ছে কাব্যের। সে দিক থেকে এই গদ্য ঠিক মৌখিক ভঙ্গির অনুকূল নয়, এবং সেই অর্থে কৃত্রিম। বিদ্যাসাগরের গদ্যের ছন্দঃস্পন্দের সঙ্গে এর মিল আছে সত্য তবু রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অধিক। তিনি সামান্য বিষয়ের বর্ণনাতেই স্পন্দন আনতে পেরেছেন অর্থাৎ বিষয়কে ভাবময় করে আবৃত্তিযোগ্য করে তুলেছেন। বিশেষ করে দুটি প্রবন্ধ, 'পথপ্রান্তে' (১২৯২ অগ্রহায়ণ) এবং 'লাইব্রেরি' (১২৯২ পৌষ) এই উক্তির দৃষ্টান্তস্থল। গদ্যরীতিতে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি দুঃসাহসিক অভিনবত্ব এনেছেন, সেটা সহজেই বুঝতে পারি যখন দেখি তিনি আর বঙ্কিম-রীতিতে শব্দের আভিধানিক নির্দিষ্টতায় বদ্ধ থাকতে অনিচ্ছুক। শব্দের বিভিন্ন অর্থাভাসকে পুরোপুরি ব্যবহার করে মূল চিন্তার সৌধকেই তার উপর গড়ে তুলেছেন। 'পথপ্রান্তে'র পথ তো আর পায়ে হাঁটা মাটির পথ নয়। সে-পথ জীবনমৃত্যু-জন্মজন্মান্তরের সংসারের পথ। এইভাবে অনেক সময় বিষয়টাই রূপকধর্মী হয়ে ওঠে। এজন্য আসে কাব্যগুণ। কবির ভাবাবেগেই, অনুভূতির উচ্চাবচতাতেই বাক্যগুলি নিছক ছেদচিহ্নিত হওয়া ছাড়াও বিচিত্র আয়তনের ধ্বনিখণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যস্পন্দ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানতঃ দুটি কারণে, অর্থযুক্ত ছেদচিহ্নের জন্য এবং ধ্বনিবহুল সংস্কৃত শব্দব্যবহারের দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ অতখানি সংস্কৃত শব্দের প্রতি ঝোঁকেন নি কিংবা ছেদচিহ্নের উপরেই একান্ত নির্ভর করেন নি। বরং লক্ষ্য করা যাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা কথ্যভঙ্গির দিকেই। ঠিক মুখের ভাষা নয়, তবে বিদ্যাসাগরের মত রাজকীয় ঐশ্বর্যের অসাধারণ ভাষাও নয়। ছন্দঃস্পন্দের সঙ্গে কথ্যভঙ্গির বিরোধ আছে। কথ্যভঙ্গি সুরবর্জিত বলেই স্পন্দনসৃষ্টির প্রতিকূল। রবীন্দ্রনাথ যখন পুরোপুবি কথ্যভঙ্গিকে স্বীকার করেছেন, তাঁর তখনকার গদ্যের কিংবা প্রমথ চৌধুরীর গদ্যের এই বৈশিষ্ট্য পূর্ববর্তী গদ্যের সঙ্গে তুলনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র প্রথম দিকের গদ্য যেমন সুরময় তেমনি স্পন্দিত। তথাকথিত সাধুভাষায় লেখা 'বিচিত্র প্রবন্ধে' কথ্যভঙ্গির আমেজ কিছু কিছু আছে, বাক্যগঠনে, যুগল ক্রিয়াপদ ব্যবহারে, বাক্যকে আকস্মিক ভাবে ভেঙে ফেলায়। ভারতী ও বালকে প্রকাশিত প্রথম যুগের রচনায় এই ভঙ্গির প্রয়োগ অপেক্ষাকৃত অল্প হলেও পরবর্তী বঙ্গদর্শনের যুগের রচনায় এই রীতি খুবই স্পষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যকে শুধু যে সংস্কৃতের সন্ধি-সমাস থেকে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, কথ্য-ভঙ্গির দিকেও অনেকখানি অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমী গদ্যের পূর্ণ ঐশ্বর্যের দিনে রবীন্দ্রনাথ সেই গদ্য নিয়েই আবার নতুন সম্ভাবনার পরীক্ষায় ব্যাপৃত হলেন। তাঁর শিল্পীমনের আত্মপ্রকাশের বিশেষ ভাষাটি আয়ত্ত করার জন্যই এই পরীক্ষার প্রয়োজন হয়েছিল। গদ্যে যে তিনি সুর এবং স্পন্দন নিয়ে এলেন, তার কৌশল ছিল প্রধানত দুটি। ছন্দঃস্পন্দের সঙ্গে যে

কাব্যময়তার যোগ, সে কাব্যময়তা তিনি সৃষ্টি করেছিলেন নির্বস্তুক ভাবকে বস্তুর মত ব্যবহারে[৪]। এ যুগে এই পরীক্ষা চলেছে বটে, কিন্তু এর ব্যবহারে নানারকম কৌশল আছে। কখনও বস্তুরূপকে ভাবের সঙ্গে উপমিত করা, কখনও ভাবকে বস্তুর সঙ্গে উপমিত করা, কখনও এক ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিকে ভাবসাদৃশ্যে অন্য অনুভূতির ভাষায় প্রকাশ করা, কখনও পল্লবিত বর্ণনাকে মাত্র একটি ভাববিশেষ্যে সংহত করে নিয়ে আসা এবং নির্দেশবাচক অব্যয় ব্যবহার করে পরিমিত করে তোলা। ছিন্নপত্রের গদ্য রচনায় এই কৌশলগুলি কিছু কিছু প্রযুক্ত হয়েছে সত্য কিন্তু প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ এদের নিরঙ্কুশ অধিকার করতে পারেন নি। এর কারণ তখনও তিনি পুরোপুরি সংহতি আনতে পারেন নি; বাগ্‌বাহুল্যে এবং ক্রিয়াপদের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে গাঢ়বদ্ধতার অভাব ঘটেছে। অর্থকে বস্তুর থেকে ভাবের রাজ্যে অথবা ভাব থেকে বস্তুর রাজ্যে চালাচালি করে কাব্যের মত গদ্যের সীমানাকেও প্রসারিত করতে চেয়েছেন। এই সময়েই লেখা একটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে সচেতন-ভাবেই বলেছেন—

> মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে
> ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
> মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
> পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে;
> ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
> উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
> মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।
>
> —ভাষা ও ছন্দ

বলা অপ্রয়োজন, এই রীতি বিশেষভাবে কাব্যভাষার রীতি। এ কথাও বলা অনাবশ্যক, বিচিত্র প্রবন্ধের রবীন্দ্রীয় গদ্য কাব্যধর্মী সুরেলা এবং স্পন্দনশীল।

গদ্যে সুর এবং স্পন্দনসৃষ্টির দ্বিতীয় আর-একটি কারণ রবীন্দ্রীয় গদ্যের প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাস। আমরা হয়তো অবহিত থাকি না, কিন্তু প্রচুর অথচ যথাস্থাপিত অনুপ্রাস গদ্যের এক রমণীয় ধ্বনিমাধুর্যের সৃষ্টি করে। যুগ্মধ্বনির অনুপ্রাস অপেক্ষাকৃত কম। কারণ ঈশ্বর গুপ্তের আমলে তার সার্থকতার পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ করলেন অযুগ্ম কোমল ব্যঞ্জনধ্বনির বিশেষতঃ স্বরধ্বনির অনুপ্রাস সৃষ্টি। স্বরধ্বনির অনুপ্রাসের পরীক্ষা বোধহয় আমাদের সাহিত্যে আর কেউ

---

৪ দৃষ্টান্ত : ১ অরুণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারি দিকে লতাইয়া উঠে। —'পথপ্রান্তে'
২ জননীর স্নেহের ন্যায় জগতের শোভা সমস্ত পথ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। —'পথপ্রান্তে'
৩ কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে। —'লাইব্রেরি'

করেন নি। সম্ভবত বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একমাত্র ব্যতিক্রম ধরা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সেকালের গদ্য কবিতার মতই আবৃত্তিগুণসম্পন্ন। খাঁটি কথ্যরীতি এবং ভঙ্গিতে লেখা গদ্যের এই বৈশিষ্ট্য নেই। এই গুণের সর্বাধিক বিকাশ ঘটেছে 'প্রাচীন সাহিত্যে'।

'বিচিত্র প্রবন্ধে'র গদ্য রবীন্দ্রীয় গদ্যের বিচিত্রমুখিনতার যাত্রারম্ভস্থল। বিশেষ করে দুটি মহৎ গদ্যাদর্শের উৎস ছিল বিচিত্র প্রবন্ধ, একটি গল্পগুচ্ছের কথাগদ্য, আর-একটি প্রাচীন সাহিত্যের গদ্য। প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ভাষার যে মর্মরসৌধ গড়েছেন, বাংলা সাহিত্যে তা নিঃসঙ্গ। আজ লোক-জীবনের মুখরতায় এবং নাগরিক সমাজের বিদগ্ধ আধুনিকতার মাঝখানে প্রাচীন সাহিত্যের ক্ল্যাসিকাল ভাষা বিগত রাজকীয় বৈভবের স্বপ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গণসভ্যতার যুগে এই শিল্পীরাও জনতায় হারিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করেছেন, তেমনি একালের পাঠকদের কানে সে-সাহিত্যের উদাত্ত মহিমা ফুটিয়ে তুলবার জন্য ভাষায় এনেছেন ধ্বনিগাম্ভীর্য এবং দীর্ঘায়িত ছন্দঃস্পন্দ। বিদ্যাসাগর বা তারাশংকরের পর বাংলা ভাষা মৌখিক ভঙ্গির দিকেই অগ্রসর হচ্ছিল, রবীন্দ্রনাথও প্রথম রচনায় সেই গদ্যরীতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু আবার কেন জানি না তাঁর হঠাৎ মনে হল বিদ্যাসাগরী সাধুভাষার সম্ভাবনা নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বিদ্যাসাগরের ভাষার মতই তিনি দীর্ঘ বাক্যের ব্যবহার করলেন, বিদ্যাসাগরের মতই বেছে বেছে ব্যবহার করলেন তৎসম পরিচ্ছন্ন শব্দ। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ভাষাকে রবীন্দ্রনাথ করলেন আরও সম্পন্ন এবং সমর্থ।

বিদ্যাসাগরের গদ্য কথাকাব্যের এবং সেজন্য বর্ণনামূলক। রবীন্দ্রনাথের গদ্য ব্যাখ্যামূলক। বিদ্যাসাগরের রচনায় শিল্পীর ব্যক্তিত্ব জড়িত হয়েও সে গদ্য নৈর্ব্যক্তিক। রবীন্দ্রনাথের গদ্যে কবি এবং রসিক ব্যক্তিটি নিজেকে প্রকাশ করতেই আনন্দ পায়। প্রাচীন সাহিত্যের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ যেন নিজের ধর্ম এবং বিশ্বাসকেই ব্যাখ্যা করলেন। তাই এর সঙ্গে কবির জীবনবোধও ধ্বনিত। এইজন্য শব্দনির্বাচনে কবি শুধু যে বর্ণনীয় বিষয়ের যথাযথতা রক্ষাতেই সতর্ক হয়েছেন তা নয়, তার চেয়েও বেশি সতর্ক তাঁর কল্পিত ভাবটিকে অনুভবগম্য করানো গেল কি না সেদিকে। এমন-সব শব্দ তাঁকে যোজনা করতে হয়েছে যেগুলিকে বলা যায় 'সাবজেকটিভ'। বিদ্যাসাগরের শব্দপ্রয়োগকে 'সাবজেকটিভ' বলা চলে না। এজন্য রবীন্দ্রনাথের শব্দ শুধু যে ধ্বনিরই শোভাযাত্রা সাজায় তা নয়, তারা নানা রং এবং নানা রেখা ফুটিয়ে তোলে। এ দিক দিয়ে বাণভট্টের সঙ্গেই তাঁর মিল। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রীয় গদ্যে প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাসের উল্লেখ করেছি, তার চরম উৎকর্ষ ঘটেছে প্রাচীন সাহিত্যে। আর অর্থালংকারও বিস্ময়জনক। উপমা প্রভৃতি অলংকারের অপ্রত্যাশিত প্রয়োগ সমস্ত ভাবটিকে গানের মত বাজিয়ে তোলে। উপমানগুলি ক্ল্যাসিকাল জীবন থেকে সংগৃহীত বলে কল্পনার শুচিতা ও আভিজাত্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রীতিও আছে, বস্তুগত উপমেয়ের জন্য নির্বস্তুক উপমান। এবং এই ভাবেই চিত্রের সঙ্গে আসে সুর। গদ্যের এই ভঙ্গিকে বলা যেতে পারে রোমান্টিক।

এক দিক দিয়ে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে সংস্কৃত রচনারীতিকে আরও গভীরভাবে স্বীকার করেছিলেন। নিছক আর্ট হিসাবে গদ্যের চর্চা বিচিত্র প্রবন্ধের প্রাচীনতর রচনাগুলিতে আরম্ভ হয়েছে সত্য, কিন্তু এর চরম সিদ্ধি প্রাচীন সাহিত্যে। সংস্কৃত কাদম্বরীর রচনাকেও তিনি আর্ট হিসাবে গদ্যচর্চার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলেই মনে করেছেন। যে নিষ্ঠা ও উদ্দেশ্যবিরহিত আনন্দ নিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যিকরা শব্দের মালা গাঁথতেন, সেই নিষ্ঠা এবং আনন্দকে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে এনেছেন প্রাচীন সাহিত্যে। সংস্কৃত গদ্যে এক-একটি বাক্য প্রায় এক-একটি কাব্য। অলংকারে ও রসের পরিপূর্ণতায় একটি বাক্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে দাঁড়াত। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা বা অগ্রসরণের দিকে লেখকের মনোযোগ থাকত না, মনোযোগ থাকত একটি পংক্তিকে অলংকার, স্পন্দন, ধ্বনিলালিত্য, চিত্ররস,—সম্ভাব্য সব কয়টি কাব্যকৌশল দিয়ে পূর্ণ করে তোলার দিকে। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের রচনারীতি সম্পর্কে বলেছেন—

কালিদাসের কাব্য ঠিক স্রোতের মতো সর্বাঙ্গ দিয়া চলে না; তাহার প্রত্যেক শ্লোক আপনাতে আপনি সমাপ্ত, একবার থামিয়া দাঁড়াইয়া সেই শ্লোকটিকে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে পরের শ্লোকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। প্রত্যেক শ্লোকটি স্বতন্ত্র হীরকখণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল এবং সমস্ত কাব্যটি হীরকহারের ন্যায় সুন্দর, কিন্তু নদীর ন্যায় তাহার অখণ্ড কলধ্বনি এবং অবিচ্ছিন্ন ধারা নাই।

—প্রাচীন সাহিত্য, 'কাদম্বরীচিত্র'

সংস্কৃত গদ্য সম্পর্কে তিনি বলছেন—

সংস্কৃত ভাষার এমন স্বরবৈচিত্র্য, ধ্বনিগাম্ভীর্য, এমন স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাকে নিপুণরূপে চালনা করিতে পারিলে তাহাতে নানাযন্ত্রের এমন কন্সার্ট বাজিয়া উঠে, তাহার অন্তর্নিহিত রাগিণীর এমন-একটি অনির্বচনীয়তা আছে যে কবি-পণ্ডিতেরা বাঙ্‌নৈপুণ্যে পণ্ডিত শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিতেন না। সেইজন্য যেখানে বাক্যকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বিষয়কে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দেওয়া আবশ্যক সেখানেও ভাষার প্রলোভন সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয় এবং বাক্য বিষয়কে প্রকাশিত না করিয়া পদে পদে আচ্ছন্ন করিয়া দাঁড়ায়: বিষয়ের অপেক্ষা বাক্যই অধিক বাহাদুরি লইবার চেষ্টা করে, এবং তাহাতে সফলও হয়।

—প্রাচীন সাহিত্য, 'কাদম্বরীচিত্র'

এই রচনারীতির দোষ যাই থাক আর্ট হিসাবে রচনাচর্চার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তরূপে সংস্কৃত সাহিত্য গণ্য হতে পারে। প্রতি বাক্যকেই সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার জন্য এই নিষ্ঠা যে অনুকরণযোগ্য, তাতে সংশয় নেই। প্রাচীন সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ এমনি নিষ্ঠাবান। প্রতি বাক্যের ধ্বনিবিস্তার ঘটানো, খণ্ড বাক্যাংশে উপমার অপ্রত্যাশিত প্রদীপ জ্বালিয়ে তোলা, শান্ত গাম্ভীর্যে দীর্ঘ বাক্যটিকে শমে নিয়ে আসার যে নৈপুণ্য রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, তার তুলনা আর নেই। প্রাচীন সাহিত্যে মৌখিক ভঙ্গি একেবারেই নেই, এতে কৌতুকরসেরও অভাব আছে, কিন্তু তার পরিবর্তে আছে এক স্নিগ্ধগম্ভীর শান্ত কণ্ঠ। সংস্কৃত ভাষার দীর্ঘ ধ্বনি এবং যুক্তধ্বনি যে গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে বাংলা ভাষায় তা সম্ভব

নয়। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী হসন্তধ্বনিও ভাষাকে লঘু করে ফেলে। শব্দের স্বরান্ত উচ্চারণ এবং হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বরের যথাযোগ্য মর্যাদা সংস্কৃত ভাষায় উচ্ছলতাকে নিবারণ করে প্রতি শব্দকেই পূর্ণ পরিমিত এবং পরিচ্ছন্ন করে দেয়। প্রাচীন সাহিত্যের স্টাইলে সাধু তৎসম শব্দের ব্যবহার দ্বারা কবি সেই গাম্ভীর্য কিছুটা এনেছেন, কিন্তু বাংলা ভাষা-প্রকৃতির জন্য সেটা পুরোপুরি হবার উপায় নেই। বিশেষতঃ সংস্কৃত পংক্তিরচনার ক্ল্যাসিকাল নিষ্ঠা রবীন্দ্রনাথের থাকলেও পরিব্যাপ্ত বক্তব্য পংক্তিতে সম্পূর্ণ হতে পারে না। বস্তুতঃ সংস্কৃত ভাষার ধ্বনিকল্লোল এবং প্রাচীন সাহিত্যের ধ্বনিকল্লোল ঠিক এক নয়।

আমাদের মনে হয় প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যধ্বনির ঐশ্বর্যের মূলে সংস্কৃত ধ্বনির দান থাকলেও, ধ্বনিসজ্জা, যার থেকে ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি হয়, তার প্রেরণা এসেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যের স্পন্দিত গদ্যের আদর্শ থেকে।[৫] সন্ধি ও সমাসে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত বাক্যে ধ্বনিখণ্ড সৃষ্টি হয়, বাংলায় তার উপায় নেই। বাংলায় বাক্যাংশ, বিশেষ অর্থবাচক বিশেষণ, তুলনাত্মক কয়েকটি শব্দ, এবং অর্থের জোর দিয়ে ধ্বনিখণ্ড সৃষ্টি হয়। সুতরাং স্পন্দন সৃষ্টি ঘটে শুধু উচ্চাবচ ধ্বনির দ্বারা নয়, ঘটে সমতল ধ্বনির অর্থযতিবিভাজনে। ধ্বনির চেয়েও তাই অর্থের প্রয়োজনীয়তা এখানে বেশি। অবশ্য ধ্বনির সহায়তা সব সময়েই আছে, বিশেষতঃ প্রচ্ছন্ন অনুপ্রাসের মাধুর্য এমন করে আর কেউ সৃষ্টি করতে পারেন নি।

তাহার পরে/শকুন্তলার চতুর্দিকে কী গভীর স্তব্ধতা কী বিরলতা।/ যে শকুন্তলা কোমল হৃদয়ের প্রভাবে/ তাহার চারিদিকের বিশ্ব জুড়িয়া/সকলকে/আপনার করিয়া থাকিত/সে আজ/কী একাকিনী।/ তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতাকে/শকুন্তলা/আপনার একমাত্র মহৎ দুঃখের দ্বারা/পূর্ণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।/

—প্রাচীন সাহিত্য, 'শকুন্তলা'

অর্থের জোর বিশেষ করে লক্ষ্য করবার 'কী গভীর স্তব্ধতা', 'কী বিরলতা', 'তাহার সেই বৃহৎ শূন্যতা' প্রভৃতি বাক্যখণ্ডে। 'বৃহৎ শূন্যতা' 'মহৎ দুঃখ'— এই বিশেষিত ভাববিশেষ্যের প্রয়োগেও অর্থের বৈচিত্র্য এসেছে। অন্যত্র অন্য কৌশলও আছে। প্রাচীন সাহিত্যে দীর্ঘ বাক্যের অতিব্যবহার লক্ষণীয়। 'যে' এবং 'সে', 'যখন' এবং 'তখন', 'যেখানে' এবং 'সেখানে' প্রভৃতি পরস্পরনির্ভর সর্বনামের প্রয়োগ দ্বারা মিশ্রবাক্য রচনা প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যের একটি প্রধান লক্ষণ। এর প্রয়োজন হয় অর্থের জোর বোঝাবার জন্য, অর্থাৎ বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বিশ্লেষিত করে বোঝানোর জন্য। পরবর্তী আদর্শ বাংলা গদ্যে এই ধরণের মিশ্র বাক্যের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কমে এসেছে। বাক্যকে অন্যোন্যনির্ভর না করে ক্ষুদ্রতর বাক্যেই ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কারণ এ রকম দীর্ঘ মিশ্র এবং যৌগিক

৫ রাস্‌কিনের স্পন্দিত গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য Saintsbury, *History of English Prose Rhythm*, 1912, Pp 392-400

বাক্যে আসলে বাক্যবন্ধন এলায়িত ও শিথিল হয়ে পড়ে। প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যে এই ত্রুটি যে চোখে পড়ে না, তার কারণ ভাষার অন্যবিধ ঐশ্বর্য এর একটা রাজকীয় মহিমা রচনা করেছে।

যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই,'কোনো নিয়ম নাই,/যাহা'অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া/সংযমদুর্গের ভগ্নপ্রাকারের উপর'আপনার জয়ধ্বজা নিখাত করে,/কালিদাস'তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন,/কিন্তু তাহার কাছে'আত্মসমর্পণ করেন নাই।/ তিনি দেখাইয়াছেন,'যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ'আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে'তাহা'ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত,'ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত'ও দেবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। শকুন্তলার কাছে যখন আতিথ্যধর্ম কিছুই নহে,/দুষ্মন্তই সমস্ত,/তখন'শকুন্তলার সে প্রেমে'আর কল্যাণ রহিল না।/ যে উন্মত্ত প্রেম'প্রিয়জনকে ছাড়া'আর সমস্তই বিস্মৃত হয়'তাহা সমস্ত বিশ্বনীতিকে'আপনার প্রতিকূল করিয়া তোলে,'সেইজন্যই'সে প্রেম অল্পদিনের মধ্যে'দুর্ভর হইয়া উঠে। সকলের বিরুদ্ধে'আপনাকে আপনি'সে আর বহন করিয়া উঠিতে পারে না।

—প্রাচীন সাহিত্য, 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'

একটার পর একটা জটিল বাক্য দীর্ঘ হলেও বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করে নি। বরং অর্থযতিবিভক্ত বাক্‌পর্বগুলি গদ্যের মধ্যে স্পন্দন এনেছে। প্রতি অংশেই মূল বক্তব্যের নানা দিক গুচ্ছ গুচ্ছ রূপে দেখা দিচ্ছে। যে বক্তব্যকে আসলে তিনি ব্যর্থ প্রমাণ করতে চান, তাকেই বিস্তৃত করে তুলছেন বটে, কিন্তু শেষ বাক্যাংশটি দিয়ে সেই বিস্তারকে সংকুচিত করে ফেললেন। যেন তানকে বিস্তার করতে-করতে শেষে শমে এসে পৌঁছলেন। ছোটো ছোটো বাক্যাংশগুলির মধ্যে পুনরুক্তি না করে অর্থের বৈচিত্র্য সম্পাদন, সবশেষের বাক্যাংশটি দিয়ে দীর্ঘ বক্তব্যের শেষে যেন সমাপ্তিসূচক দাগ টেনে সিমফনি সৃষ্টি করা— এ সবই প্রাচীন সাহিত্যের গদ্যের বিশেষত্ব। এই গদ্যে নাটকীয় আকস্মিক কর্কশ যতিপাত নেই। কারণ সমগ্র প্রবন্ধেরই বক্তব্যটি পূর্বেই উপলব্ধ ও আত্মস্থ। ধীরলয়ে তাকে একে একে উপস্থাপিত করে যাচ্ছেন। যুক্তিমূলক রচনা নয়, তাই সিদ্ধান্ত অপ্রত্যাশিত নয়। শান্ত সমাহিত চিত্তে লব্ধ সাহিত্যরসটিকে শুধু বিস্তৃত করছেন, নির্ণয় করছেন না। তাই প্রবন্ধ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই সুরে বাঁধা।

প্রাচীন সাহিত্যের স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনিময় ভাষা আর অনুসৃত হল না। রবীন্দ্রনাথ যে সময়ে মনোযোগী শিল্পীর মত ভাষার কারুকর্ম করছিলেন, সেই সময়েই তিনি অন্য রচনায় এক অন্য স্টাইল অনুসরণ করছিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের গদ্য তিনি সচেতন আর্ট হিসাবেই চর্চা করছিলেন। তখনও তিনি জানতেন এ ভাষা আসলে সর্ববিধব্যবহার্য ভাষা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই 'কাদম্বরীচিত্রে' বলছেন—

সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই।··

বিশিষ্টরূপে বাংলা মৌখিক ভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত যে গদ্য রচনার আদর্শ তৈরি হয়ে আসছিল, রবীন্দ্রনাথও যার প্রতি ঔৎসুক্য দেখিয়েছিলেন, বিচিত্র প্রবন্ধেই সেই স্টাইলের আদর্শ আছে। গল্পগুচ্ছে লোকসাহিত্যে রাজা প্রজা সমাজ সমূহ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ এই ভাষা-

কাঠামো ব্যবহার করে এসেছেন। আমাদের বক্তব্য, এই ভাষারীতিই পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ অব্যাহত আছে। এই ভাষারীতির স্থিতিস্থাপকতার প্রমাণ এই যে গল্প প্রবন্ধ চিঠিপত্র ভ্রমণ-কাহিনী প্রায় সব রকমের রচনাই এতে সম্ভব হয়েছে। গল্পগুচ্ছের জীবনযাত্রা পল্লীবাংলার মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের। তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ-বিষয়ও তেমনি সমসাময়িক। এমন-কি লোকসাহিত্য যেমন বাংলাদেশের মৃদু নিস্তরঙ্গ জীবনের কোমল স্নিগ্ধতায় পূর্ণ, আধুনিক সাহিত্যের বিষয়ও তেমনি সমসাময়িক উচ্চতর সাহিত্যের রসাস্বাদনের আনন্দে পূর্ণ।

এক কথায়, প্রাচীন সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে পরিবেশগত ঐক্য আছে। সেইজন্য আলোচনার ভাষাতেও একটা মিল পাওয়া স্বাভাবিক। এই ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের উত্তরভাগের ভাষা। শুধু ক্রিয়াপদের সাধুরূপের দিক দিয়েই নয়, বঙ্কিম নিজে সাধুরূপকে অক্ষুন্ন রেখেও গদ্যভঙ্গিতে মৌখিক আলাপের গতিবেগ আনছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যে বাধা ছিল, রবীন্দ্রনাথের সে বাধা ছিল না। কারণ প্রধানতঃ বিষয়গত, দ্বিতীয়তঃ পদ্ধতিগত। রবীন্দ্রনাথের গল্প সমসাময়িক জীবনকে অবলম্বন করায় কণ্ঠস্বরে উদাত্ততা আনবার প্রয়োজন স্বাভাবিক ভাবেই ছিল না। প্রবন্ধেও আলোচনাপদ্ধতি বঙ্কিমের থেকে আলাদা হওয়ায় অর্থাৎ গ্রন্থ বা তত্ত্বাশ্রয়ী না হওয়ায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সহজ যুক্তিতে সহজগম্য করায় ভাষাও যথাসম্ভব মৌখিক ভঙ্গির অনুযায়ী হয়েছে। বলতেই হবে, বিষয়-বৈশিষ্ট্যও রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও কথাগদ্যকে সরল করতে সাহায্য করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর গ্রন্থন-চাকচিক্যে যে রোমান্সের উঁচু সুর ও নাটকীয় চমক ছিল, রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না। বঙ্কিম-গদ্যের প্রধান লক্ষণ বাক্যের ক্ষুদ্রতা। বাক্যের ক্ষুদ্র পরিসরে বক্তব্যকে যথাসাধ্য ভরে দিলে অর্থ গলে পড়বার সম্ভাবনা থাকে না, এবং এইজন্য গদ্য যেমন হয় দ্রুতসঞ্চারী, তেমনি হয় সপ্রতিভ। সপ্রতিভতাকে আমরা বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সঙ্গে এক বলেই ভেবে থাকি। সেটা হয়তো অযথার্থ নয়, তার প্রমাণ সবুজ পত্রের যুগেই পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যের সপ্রতিভতা নির্ভর করছে অন্য গুণের উপর, তাকে বলা যেতে পারে স্পষ্ট অর্থবহনক্ষমতার গুণ। বাক্য এবং শব্দের ব্যবহারে ফাঁকি নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছেও দেখা দিয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় বঙ্কিমের ছোটো ছোটো বাক্য ঘটনার যে দ্রুততা ফুটিয়ে তোলে রবীন্দ্রনাথের কথা-গদ্য কিন্তু ঠিক সেই দ্রুততাকে ফোটায় না। বঙ্কিমের কাহিনী নাটকীয়তায় পূর্ণ বলে যেটা ঘটে, রবীন্দ্রনাথের কাহিনীতে তার অভাব আছে বলেই সেটা হয় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যের একটা নতুন বৈশিষ্ট্য বক্তব্যকে খুব জোরালো করেছে। বাক্য এক সুর দিয়ে আরম্ভ করে অন্য সুর দিয়ে শেষ করা— অনেকটা অ্যান্টিথিসীসের মত প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে সচল করে তোলে। এটা ঠিক নাটকীয়তা নয়— বক্তব্যের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা মাত্র। যেমন 'সে দক্ষিনে হাওয়াকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া হন্‌হন্ করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে।' অথবা, 'কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনার নাটকীয় দ্রুততা নেই, এমন-কি যেখানে সত্যিই আছে সেখানেও বর্ণনাভঙ্গিতে কোনো ব্যস্ততা চমক বা আকস্মিকতাসৃষ্টি নেই। এবং রবীন্দ্রনাথের narrative style-এ একটা নিরুত্তাপ নিম্নকণ্ঠ শুনতে পাই। এ যেন নিজেদের মধ্যে বসে কোনো-একটা পূর্বদৃষ্ট ঘটনার পর্যালোচনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথের সমাজবিষয়ক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পড়লেও একটি কথাই মনে পড়ে, নানা রীতির গদ্যের মধ্যে 'পরামর্শ রীতি' বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তবে এই প্রবন্ধই হচ্ছে তার চমৎকার উদাহরণ। মৌখিক ভঙ্গির দিকেই এই গদ্যের প্রবণতা স্বাভাবিক। ছোটো ছোটো বাক্যের প্রয়োগের কারণ তাই। কিন্তু এ বিষয়ে সাবধানে মন্তব্য করাই ভালো। ক্ষুদ্র বাক্যের দিকে যেমন ঝোঁক আছে, তেমনি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বাক্যও অবিরল। সেটা প্রয়োজনের জন্যই। এ ভাষা স্বাভাবিক ভাবেই সাহিত্যিক সাজসজ্জাবর্জিত। সাধু ক্রিয়ায় লেখা হলেও বাগ্‌ভঙ্গিতে এমন সরল মৌখিক বাঁধুনি রক্ষা করা হয়েছে, মনে হয়, লেখক যেন সবাইকে নিয়ে অন্তরঙ্গভাবে পরামর্শ করতে বসেছেন। 'স্বচ্ছ' শব্দটা আমরা আজকাল গদ্যলেখা সম্পর্কে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি। রবীন্দ্রনাথের এ যুগের গদ্য সম্বন্ধে 'স্বচ্ছ' প্রায় স্ফটিক-গুণ অর্থেই প্রয়োগ করা যায়। লেখকের মন এবং পাঠকের মনের মধ্যে ভাষার যে 'মধ্যবর্তিতা' আছে তার আলাদা অস্তিত্বই যেন মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়। ভাষার যদি আলাদা প্রয়োজনাতীত কারুকার্য থাকত, তবেই আমরা ভাষা সম্বন্ধে সচেতন হতাম। এই ভাষা ও এই রীতির বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বভাবতঃই প্রবন্ধ একটু বেশিই দীর্ঘ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধকে গাঢ়বন্ধ বলা যায় না।

গল্পগুচ্ছের ভাষাতেও এই আশ্চর্য স্বচ্ছতাগুণ এবং মৌখিক ভঙ্গি আছে, যদিও বিশিষ্ট কারণেই তাতে বিশেষণ ও উপমার ব্যবহারও আরো বেশি। গল্পগুচ্ছের ভাষা আসলে মিশ্ররীতি নিয়ে রচিত। এখানে প্রয়োজনে যেমন স্পন্দিত গদ্য আছে, প্রয়োজনে তেমনি খুঁটিনাটি বাস্তব বর্ণনামূলক গদ্যও আছে। গল্পগুচ্ছের ভাষার মহৎ কীর্তি এই যে, ভাবের এবং ভাষার বিচিত্র উত্থান-পতনকে কবি এমন-একটা ভাষার কাঠামোর মধ্যে ধরে দিয়েছেন যার কোনো অংশকে কৃত্রিম বা ভঙ্গিবহুল বলে মনে হয় না। অলংকারগুলিও আর 'অলংকার' নয়। গল্পগুচ্ছের ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর আলোচনা যথার্থ বলে মনে করি।[৬] আমাদের বক্তব্য, রবীন্দ্রনাথের মূল ভাষার কাঠামোটি একই এবং এই কাঠামোই পরে চলে এসেছে।

সম্ভবতঃ এরই আনুষঙ্গিক কারণে রবীন্দ্রনাথের সেকালের প্রবন্ধের আর একটা বিশেষত্ব চোখে পড়ে— প্রবন্ধের অনুচ্ছেদের অসমগঠন। অবশ্য অনুচ্ছেদের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাপ নেই বলাই বাহুল্য। তবু এক লাইন থেকে আধ পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন মাপের অনুচ্ছেদের পরিকল্পনা ঠিক বোঝা যায় না। বঙ্কিমের প্রবন্ধের অনুচ্ছেদের নিটোল রূপের কথা আগেই বলেছি। দুজনের অনুচ্ছেদ-রচনার অভিরুচির তুলনা করলে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর মূল বিষয়টিকে পরম্পরাক্রমে বিন্যস্ত

৬ দ্রষ্টব্য, 'রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য', 'গল্পগুচ্ছের রচনারীতি'

করেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর ভাবনাটিকে মাত্র জোরালো করে তুলবার জন্য আলাদা অনুচ্ছেদে স্থাপিত করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়টি কবির নিজের মধ্যে অন্যের সাহায্য ছাড়াই উদ্‌ভূত হয় বলেই সেটা ভাবনামূলক। এইজন্য যুক্তিও সহজবুদ্ধির। বক্তব্যকেও অনুভূতি দিয়েই শক্তিশালী করে তোলেন। তাই উপমা, সাদৃশ্যমূলক দৃষ্টান্ত, কথিকা (parable) ইত্যাদিই যুক্তির স্থান নেয়। কখনও কখনও একটি উপমা দিয়েই একটি অনুচ্ছেদ তৈরি হয়ে ওঠে।

কিন্তু এর ফলে প্রবন্ধ যে কবিতা হয়ে উঠেছে তা নয়। রবীন্দ্রনাথ এসব সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে এমন বাস্তবজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, এবং ভাষাতেও এমন আটপৌরে সাধাসিধে ভঙ্গিটিকে রক্ষা করেছেন যে আগাগোড়া একটা ভাবগত ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকে, বক্তব্য কোথায়ও কবিত্বে পরিণত হয়ে ফানুসে রূপান্তরিত হয় না। উপমা বা সাদৃশ্য -মূলক দৃষ্টান্ত কবিত্বের কৌশল হলেও বাস্তব প্রত্যক্ষদৃষ্ট জীবন থেকে সংগৃহীত হওয়ায় আমাদের মনে আবেগ জাগানোর পরিবর্তে সহজ যুক্তিবুদ্ধি (common sense) -কেই শাণিত করে দেয় মাত্র। প্রবন্ধের মধ্যে মাঝে মাঝেই তিনি চারিত্রনীতি এবং মানবনীতি সম্পর্কে যেসব সাধারণ সত্য উচ্চারণ করে থাকেন, সেগুলির মধ্যে এমন-এক অকুণ্ঠ অসংশয়িত সরলতা থাকে, যা অবিলম্বেই প্রশ্নাতীত রূপে প্রতিভাত হয়। লক্ষ্য করা দরকার, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিছক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ছাড়া কোথায়ও উদ্দেশ্যহীনভাবে তত্ত্বগত আলোচনা করেন নি। একটা কিছু গড়বার আদর্শ নিয়েই প্রবন্ধ লিখেছেন। বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধের সঙ্গে এদিক দিয়ে তাঁর মিল আছে। কিন্তু সেকালের চিন্তায় বস্তুবিশ্লেষণের গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনায় কিন্তু মূল আদর্শ সর্বদাই মানবচারিত্রনীতি। এই বৃহৎ আদর্শকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে তিনি সাময়িক সমস্যার আলোচনা করেছেন। আমাদের উপস্থিত কর্তব্য কোন্ নীতিদ্বারা চালিত হওয়া উচিত, এই সূত্র থেকেই তার দিক নির্দেশ করেছেন। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধকে 'অবরোহ রীতির' (deductive) প্রবন্ধ বলা চলে এবং এই অর্থে সাময়িক উপলক্ষ্য নিয়ে লেখা হলেও নৈতিক আদর্শে এদের বক্তব্য সমসাময়িকভাবে অতিক্রম করেই গিয়েছে। নৈতিক মান রক্ষা করেই আমাদের কর্মোদ্যমকে পরিচালিত এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানের চিন্তা করতে, শুধু সেকালে নয়, পরবর্তী কালের প্রবন্ধেও বলে গিয়েছেন। বক্তব্যবিস্তারের দিক দিয়েও রবীন্দ্রনাথের বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ সমস্যাকে চারি দিক দিয়ে পরীক্ষা করে শেষাংশে তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা সমাধানই প্রবন্ধরচনার নিয়ম। বঙ্কিমচন্দ্র ও রামেন্দ্রসুন্দর— এই দুজন শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকার এই প্রণালীতেই লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বক্তব্যকে এভাবে না সাজিয়ে তাঁর পূর্বচিন্তার সিদ্ধান্ত— সে সিদ্ধান্ত সাময়িক সমাধান মাত্র নয়, একটা উঁচু নৈতিক মান— তাকেই সাময়িক উপলক্ষ্যের পটভূমিতে স্থাপন করতে করতে উপসংহারে এসে পৌঁছান।

গদ্য রচনার আর-একটি রীতি একই সময়ে রবীন্দ্রনাথ চর্চা করছিলেন তাঁর ধর্মবিষয়ক রচনাগুলিতে। এই রচনার ভাষা ও ভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের অন্য রচনার মত নয়, এমন-কি মূল কাঠামোটিই এক কি না সন্দেহ। এতে রবীন্দ্রনাথ মৌখিক ভঙ্গির থেকে সরেই এসেছিলেন, তাই এর ভাষা

বরং প্রাচীন সাহিত্যের সাহিত্যিক ভাষার সঙ্গেই কিছু মিলবে। প্রাচীন সাহিত্যের যেসব জায়গায় ধর্ম বা নীতির আদর্শ সম্বন্ধে প্রসঙ্গমুক্ত আলোচনা আছে তার সঙ্গে ধর্ম বইটির ভাষার তুলনা করলেই গভীর সাদৃশ্য চোখে পড়বে। ভাষার উদাত্ততা, সাধু তৎসম শব্দের অবিরল প্রয়োগ, বাক্যের পল্লবিত বিস্তার, বিশেষণ ও অন্যান্য অলংকরণের প্রাচুর্য— এসব দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কথাগদ্য বা অন্যান্য প্রবন্ধের ভাষার থেকে আলাদা রীতিকে অনুসরণ করেছেন। আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ ও রাজা প্রজা সমূহ প্রভৃতির মধ্যে পরিবেশগত এক ঐক্য আছে। ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার বিষয় এবং প্রসঙ্গ ভিন্ন বলেই এর ভাষার পিছনের কণ্ঠস্বরও অন্যরকম এবং তা প্রাচীন সাহিত্যের ভাবমগ্ন গভীরতার সঙ্গেই মিলবে। ধর্মের এই প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই লিখেছিলেন, যে সময় তিনি রাজনৈতিক ভাবনা নিয়েও ব্যস্ত ছিলেন। অথচ এতে সাময়িক প্রসঙ্গ বিশেষ নেই। মানসিক পরিবেশ এবং ভাষাতে তিনি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছেন। এই রচনার আত্মভাব-প্রাধান্যের জন্যও একে দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যানের গদ্যপদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। রবীন্দ্রনাথে এসে সেই গদ্য অধিকতর অলংকৃত হয়েছে মাত্র। প্রাচীন সাহিত্যের মত রবীন্দ্রনাথের এই গদ্যও তার নিজস্ব পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বাইরে তেমন প্রভাব সৃষ্টি করে নি।

সবুজ পত্রের পর

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তা যদি সবটাই ভুল না হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতে হবে রবীন্দ্রীয় গদ্য সবুজ পত্রের বহু পূর্ব থেকেই মৌখিক ভঙ্গিকে স্বীকার করে নিচ্ছিল। ছিন্নপত্র বা য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রের চলতি ভাষার কথা বলছি না। বাঙালীর যে বাগ্‌ভঙ্গি সংস্কৃত বা অপরাপর ভাষার থেকে আলাদা এক ভাষাপ্রকৃতিকে গড়ে তুলেছে, সেই বাগ্‌ভঙ্গিকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেকটাই সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের আমলে সাহিত্যরূপের এত বৈচিত্র্য ছিল না বলেই এই বাগ্‌ভঙ্গির পরীক্ষাও তেমন হয় নি। রবীন্দ্রনাথ তার প্রয়োগ করলেন পত্রে প্রবন্ধে গল্পে ভ্রমণকাহিনীতে। তিনি এবার স্বভাবতঃই চাইলেন ক্রিয়াপদের মৌখিক রূপকেও গ্রহণ করা যায় কি না, তার পরীক্ষা করতে।

ক্রিয়াপদ বাংলা গদ্যরীতির প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে, এটা একটু আশ্চর্যের বিষয়। মৌখিক বাগ্‌ভঙ্গি যদি বাংলা গদ্যে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়ে থাকে, তবে শুধু ক্রিয়াপদের পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যে এত বড় একটা স্মরণীয় আন্দোলন ঘটাবে কেন? বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ তো আগেও চলতি রীতিতে গদ্য লিখেছেন। আসলে ওই ক্রিয়াপদের মধ্যে বাংলা উচ্চারণভঙ্গির এমন-একটা চলিত রূপ নিহিত আছে যা সমস্ত সাহিত্যিক গদ্যদেহকেই স্পর্শ ও প্রভাবিত করে। এজন্য সমস্ত ধ্বনিরূপটাই যেন বদলে যেতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ লৌকিক ছন্দের আলোচনাপ্রসঙ্গে এবং অন্যত্র বাংলা উচ্চারণরীতির যে বৈশিষ্ট্যের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন, তা হচ্ছে এর হসন্তপ্রবণতা। বাংলা ভাষারীতিতে শব্দের আদ্যস্বরের

উপর ঝোঁক পড়ায় শেষের ধ্বনির জোর কমে যায়, ফলে মুক্তধ্বনি রুদ্ধধ্বনিতে পরিণত হয়। শব্দান্তের স্বর লুপ্ত হয়ে হসন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টি করে। সংস্কৃত রীতিতে 'আকাশ' শব্দটি যেভাবে উচ্চারিত হবে, বাংলায় সেভাবে হবে না। শেষের 'শ' ধ্বনির 'অ'-স্বর লুপ্ত হয়ে যায়। ভাষাতাত্ত্বিকেরা এর কারণ নির্দেশ করেন, সংস্কৃতেতর লোকভাষায় শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে বলেই এমন হয়। আমরা যখন বিদ্যাসাগর বা তারাশংকরের গদ্যরচনা পড়ি তখনও নিশ্চয়ই বাংলা উচ্চারণেই পড়ি, কিন্তু শব্দের শেষ ধ্বনিটি ছাড়া অন্যত্র সংস্কৃতমতেই যথাসম্ভব উচ্চারণ করে থাকি। এইজন্যই স্বরধ্বনির স্পষ্ট উচ্চারণে মন্থর ধ্বনিপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। কিন্তু খাঁটি বাংলা উচ্চারণে স্বরধ্বনির চেয়ে ব্যঞ্জনধ্বনি-গুলিই সংঘাত সৃষ্টি করে। নেহাৎ উচ্চারণ করা যায় না বলেই যেন ব্যঞ্জনের অবলম্বনরূপে স্বরধ্বনি কোনোরকমে অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। অবশ্য একটি স্বরকে আশ্রয় করে দুটি পর্যন্ত ব্যঞ্জন মিশ্র সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। অল্প কয়েকটি স্থলে তিনটি ব্যঞ্জনও থাকে বটে। এই ব্যঞ্জনসংঘাতের প্রখর রূপ ফোটে চলতি ক্রিয়াপদে। 'করিতেছি' যখন 'কর্‌ছি' হয় তখন তিনটি ব্যঞ্জন দুটি স্বরকে আশ্রয় করে যেন কলরব করতে থাকে। আর-একটি লক্ষণ আদ্যস্বরের উপর প্রদত্ত প্রস্বর। প্রস্বরের বেগে বাক্য চলতে থাকে এবং নতুন নতুন প্রস্বর নতুন নতুন বাক্যখণ্ড তৈরি করে। ঘন ঘন প্রস্বরে বাক্যে আর প্রবাহগুণ থাকে না, তাই এতে সুরের অবকাশ নেই। আমাদের দেশে সুরবর্জিত গদ্য সবুজ পত্রের সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে, বলা চলে।

বাংলা ক্রিয়াপদের যখন রূপান্তরণ ঘটিয়ে সাহিত্যে স্থান দেওয়া হল, তখন সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি প্রয়োজন অনুভব করা গেল। ধাতুর সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়, তার মূল রূপটা একই রকম বলেও একঘেয়েমি আসে। 'যাইতেছি' 'যাইতেছ' 'যাইতেছে'— গদ্যের মধ্যে এই বৈচিত্র্যহীনতাকে ঘোচানো যায় কি না, সে চেষ্টা হল। কিন্তু সেটা সম্ভব কিভাবে। ভাষার নিজস্বতাকে তো বদলানো যায় না। তা ছাড়া বাক্যে ক্রিয়াপদের স্থান নির্দিষ্ট থাকলেও একঘেয়েমি বাড়ে। বাক্যের মধ্যে যদি একে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তবে প্রত্যাশার বিরোধিতা করে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। আরও একটা সমস্যা, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষায় নামধাতুর ব্যবহার বেশি থাকায় যে সুবিধা আছে, বাংলা ভাষায় সে সুবিধা নেই। নামধাতুতে দুটি শব্দের কাজ একটাতেই মেটানো যায়। কবিতার ভাষায় মধুসূদন এককালে এই অভাব বোধ করে নামধাতুর অতিরিক্ত ব্যবহার করেছিলেন।

ক্রিয়াপদগত এই সমস্যা তিনটির আসলে চলতি বাংলায় কোনো সমাধান নেই। এ সমস্যা সাধু-চলতি নির্বিশেষে বাংলা ভাষাপ্রকৃতির। এর সমাধান করার অর্থ বাংলা ভাষাকে কিছুটা নতুন করে গড়ে সাহিত্যিক শিল্পবিন্যাসে সাজিয়ে তোলা। ভেবে দেখলে সবুজ পত্র যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক দ্বন্দ্বটা সাধু চলতি রীতির দ্বন্দ্ব নয়। কারণ চলতি রীতি, ক্রিয়াপদ ছাড়া, আগেই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছে ও প্রবন্ধে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতির প্রবন্ধে অনেকটাই এসে গিয়েছিল। সবুজ পত্রের বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাংলা ভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন

শব্দতত্ত্ব বইতে—এ কথা মনে রাখার প্রয়োজন আছে। দ্বন্দ্বটা হচ্ছে নতুন গদ্যভঙ্গির সাহিত্যিক রূপ নিয়ে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ একটি অর্থপূর্ণ উক্তি করেছিলেন—

কথার ভাষার বদল চলছে লেখার ভাষার মাপে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে-সব কথা ব্যবহার করলে হাসির রোল উঠত, আজ মুখের বাক্যে তাদের চলাফেরা চলছে অনায়াসেই।...মনে করো সাধারণ আলাপে আজ যদি এমন কথা কেউ বলে যে 'সভ্যজগতে অর্থনীতির সঙ্গে গ্রন্থি পাকিয়ে রাষ্ট্রনীতির জটিলতা যতই বেড়ে উঠছে শান্তির সম্ভাবনা যাচ্ছে দূরে', তা হলে এই মাত্র সন্দেহ করব, লোকটা বাংলার সঙ্গে ইংরেজি মেশাবার বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বাক্যকে প্রহসনে উদ্ধৃত করবার যোগ্য বলে কেউ মনে করবে না। নিঃসন্দেহ এর শব্দগুলো হয়ে উঠেছে সাহিত্যিক, কেননা বিষয়টাই তাই। পঞ্চাশ বছর আগে এ রকম বিষয় নিয়ে ঘরোয়া আলোচনা হত না, এখন তা হয়ে থাকে, কাজেই কথা ও লেখার সীমানার ভেদ থাকছে না। সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।

—বাংলাভাষা-পরিচয়, ১০

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে, নতুন গদ্যলেখকদের সম্বন্ধে যা এতকাল ভাবা হয়েছে, আসল তর্কটা ঠিক উলটো বিষয় নিয়ে। চলতি ভাষাকে গদ্যভাষারূপে নেওয়াটাই মূল কথা নয়। গদ্যভাষা স্বাভাবিক নিয়মেই সাহিত্যরূপ লাভ করে চলবে, এবং মুখের ভাষায় সেই সাহিত্যিক ভঙ্গিকেই আয়ত্ত করে চলতে হবে। অতএব সাহিত্যিক গদ্য বস্তুটা মৌখিক ভঙ্গিকে যতই আয়ত্ত করুক না কেন, ওটা ঠিক চলতি ভাষা নয়। এ ভাষা শিক্ষিতসমাজের ভাষা এবং শিক্ষিতসমাজ ভাব-প্রকাশের জন্য হয়তো বৈঠকী আলাপেও সাহিত্যিক গদ্যকেই ব্যবহার করে থাকে। ভারতচন্দ্রের দৃষ্টান্তই আমরা নিতে পারি। ভারতচন্দ্র ভাষায় যে গাঢ়বন্ধতা ও শুচিতা এনেছিলেন, তাতে মৌখিক ভঙ্গি তো ছিলই, তিনি নিজেও তার আবশ্যকতা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু মৌখিক ভঙ্গি এবং শব্দের অকুণ্ঠ ব্যবহার সত্ত্বেও সে ভাষা যে কবিওয়ালা এমন-কি রামপ্রসাদের ভাষা থেকেও আলাদা, তার কারণ সুস্পষ্ট। সেই ভাষাই সেকালের শিক্ষিত বিদগ্ধ সমাজের ভাষা হয়ে উঠছিল। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের ভারতচন্দ্রকে তাঁর নিজের ভাষাসৃষ্টির প্রসঙ্গে টেনে আনার এবং সমর্থন খোঁজার কারণ এটাই ছিল বলে মনে হয়। ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই সাধারণ অর্থে 'চলতি রীতি' প্রয়োগের আদর্শ বলে ধরা যাবে না।

প্রমথ চৌধুরী এই সাহিত্যিক বৈদগ্ধ্য ও আভিজাত্যকে চলতি রীতির মধ্যে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য অ-সাধারণ কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিরোধাভাস প্রভৃতি নানারকমের তির্যক ভঙ্গি চিন্তা ও বাক্যের মারপ্যাঁচ এনেছিলেন, যা অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে প্রমথ চৌধুরীর বিশেষত্ব হলেও নিশ্চয়ই সাধারণ ভাবে চলতি রীতির বিশেষত্ব নয়। এগুলি যদি ভাষাপ্রকৃতিরই লক্ষণ হত, তবে পরবর্তী এই রীতির গদ্যেও এই লক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকত। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সাময়িক ভাবে, বিশেষতঃ 'শেষের কবিতা'য়, প্রমথ চৌধুরীর অলংকার-কৌতুকের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সত্য, কিন্তু চলতি রীতি প্রয়োগে আসলে তিনি সম্পূর্ণ নিজের আদর্শেই চলেছিলেন। চলতি রীতির সাহিত্যিক রূপ

তিনি নিজেই গড়ে নিয়েছিলেন। যেগুলি নিছক শব্দক্রীড়া বা কথার কৌশল, রবীন্দ্রনাথ তাই দিয়ে তাঁর রচনাকে সাজান নি, কিন্তু বাক্যের মধ্যে অর্থের নমনীয়তা এনে কৌতুকরস সঞ্চার করা, অপ্রত্যা-শিত অর্থ বা বাক্য যোজনা করে পাঠককে চকিত করা এসব রীতি রবীন্দ্রনাথের সবুজ পত্রের পূর্বে গল্পগুচ্ছ ও অন্যান্য রচনাতেই ছিল। তবে তাঁর প্রবন্ধের সামগ্রিক বক্তব্যের অনুকূলেই তারা প্রযুক্ত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যভঙ্গিতে এই রীতি সমগ্র বক্তব্যের থেকে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন থেকে বুদ্ধিগত শব্দক্রীড়া বা অর্থক্রীড়ায় পরিণত হয় মাত্র।

চলতি রীতিতে সাহিত্যিক মার্জনা কিভাবে দেওয়া যায়, সে সমস্যা রবীন্দ্রনাথের কাছে নতুন মনে হয়েছে, তা নয়। ভাবনাটা শুধু এই যে ক্রিয়াপদের পরিবর্তনের সঙ্গে যে হসন্তপ্রাধান্য ঘটবে, সমস্ত বাক্যে তার সংগতি (balance) আনা যাবে কি করে। সেই সঙ্গে একটি বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। চলতি ক্রিয়াপদ গ্রহণ করার অর্থ তৎসম শব্দ বর্জন করা নয়, বরং আধুনিক কালের বিচিত্র শব্দধ্বনি এবং বাক্যভঙ্গিকে উদারভাবে গ্রহণ করতে সংস্কৃত শব্দকে গ্রহণ করার প্রয়োজন ফুরায় না। সংস্কৃত ভাষায় নতুন শব্দ তৈরি করবার যে উপায় আছে সেটা বাংলায় চাই-ই। এ কথা রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েই জীবনের শেষের দিকে রচিত 'বাংলাভাষা-পরিচয়ে' বলে গিয়েছেন। চলতি বাংলার (রবীন্দ্রনাথ বলতেন প্রাকৃত বাংলা) প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধু বাংলার এলায়িত শব্দকে 'পিণ্ড পাকিয়ে' তোলা। এর বহু দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। এই পিণ্ড পাকানোর ফলে ক্রিয়াপদে এবং দেশী শব্দে সংকোচন ঘটে থাকে। হসন্তপ্রাধান্য ও প্রস্বরবাহুল্য এর ফল। তা ছাড়া খাঁটি বাংলা পদ্ধতির আরও অনেক রকম ব্যবহারও আছে। এই সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে মিলিয়ে বাক্যধ্বনিকে নতুন করে কি করে পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে, সবুজ পত্রের যুগে রবীন্দ্রনাথ সেটা ভাবছিলেন। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করে গদ্যরচনা তিনি অনেক আগে থেকেই করে আসছিলেন। য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে, ছিন্নপত্রে, গদ্য নাটকে তিনি এর ব্যবহার করছিলেন। কিন্তু এদের ব্যবহারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ বলে সর্বজনব্যবহার্য সাহিত্যিক রূপের ভাবনাটা তখনও বড় হয়ে ওঠে নি। 'ক্ষণিকা'তে তিনি চলতি বাংলায় স্বরবৃত্ত ছন্দধ্বনি বাজিয়েছিলেন। কিন্তু আসলে প্রাকৃত বাংলার পরীক্ষা প্রবন্ধে ও কথা-গদ্যে (narrative prose)।

সাধু রীতি থেকে প্রাকৃত রীতিতে উত্তরণের ইতিহাসে চতুরঙ্গ ও ঘরে-বাইরে বই দুটি অনেকেরই মনঃসংযোগের স্থল হয়েছে। দুটি বই একই বছরে (১৯১৬) প্রকাশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণে, একালের চতুরঙ্গের সঙ্গে সেকালের আলালের ঘরের দুলালের তুলনা করা চলে। দুইই সাধুভাষার পোশাক পরেছে যদিও অন্তরপ্রকৃতি মৌখিক ভাষার। এই অন্তরপ্রকৃতিটাই শেষকালে আর নিরুদ্ধ থাকে নি। কিন্তু চতুরঙ্গ আপাত-সাধু ভাষায় লেখা হলেও তাতে চলিত রীতির প্রতি আগ্রহ এতই বেশি যে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার থেকেও মাঝে মাঝেই 'পিণ্ড-পাকানো' ক্রিয়া এবং শব্দের ব্যবহার রয়েছে। শুধু তাই নয়, বলবার কায়দাতেও চলতি রীতি এসেছে ; অবশ্য এই রীতি পূর্বাগত— সে কথা বলেছি। ঘরে-বাইরে উপন্যাসে ক্রিয়াপদও চলতি হল যদিও রীতি পুরোপুরি

চলতি হল না। দীর্ঘ পল্লবিত বাক্য, অলংকারবাহুল্য এর কথা-গদ্যকে কিছুটা ভারগ্রস্ত করেছে, বিশেষ করে উত্তমপুরুষে কাহিনীকে বর্ণনা করায়। গল্পগুচ্ছে সাধুভাষায় উত্তমপুরুষের কাহিনীবর্ণনার প্রণালী আছে, কিন্তু তুলনা করলেই দেখা যাবে বরং গল্পগুচ্ছের ওই গল্পের ভাষাই মৌখিক ভঙ্গির অনুগামী। 'ঘরে বাইরে'র চেয়ে সে ভাষা অনেক হালকা। ইতিপূর্বে ক্রিয়াপদের তিনটি সমস্যার উল্লেখ করেছি। কেউ কেউ মনে করেছেন ক্রিয়াপদকে বাদ দেওয়াই 'বাংলা গদ্যে বেগ আনবার একটি নিশ্চিত উপায়'। কিন্তু তাতে সমস্যা সম্পূর্ণ মেটে না। ক্রিয়াপদ বাদ দেওয়ার দিকে লক্ষ্যবদ্ধ থাকলে বাংলা গদ্যের আবার 'রূপগোস্বামীর কারিকা'র রবীন্দ্রনাথের দেওয়া দৃষ্টান্তেই ফিরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বরং বাক্যে ক্রিয়ার স্থানান্তরণ করা যেতে পারে। ক্রিয়ায় মূল অর্থের বিপর্যয় না ঘটিয়েই বাচ্য ও বিভক্তির রকমফের করা যায়, যেমন 'মনে পড়ছে' না বলে বলা যায় 'মনে পড়ে'। ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ দিয়ে বিধেয় রচনা করা যেতে পারে। চলতি রীতির নতুন বাক্যগঠন দিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন লিপিকা (১৯২২)। এসব নানা রকমের কৌশল মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঘরে বাইরে লিখতে গেলেন কিন্তু এর গদ্যধ্বনিতে ঠিক যেন সংগতি (balance) আসে নি। চলতি রীতির কথা-গদ্যের চরম সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ দেখিয়ে দিয়ে গেলেন তাঁর ছেলেবেলা বইটিতে। শেষের কবিতাতেও রবীন্দ্রনাথ ভাষার কারুশিল্পে বর্ণনীয়কে অতিক্রম করে গিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য ভাষা ছেলেবেলার। ছোট ছোট বাক্য, হসন্তের কলধ্বনি, উপমার পরিমিত প্রয়োগ, সর্বোপরি কথা-গদ্যের যা প্রধান সার্থকতা— বক্তামনের আচ্ছন্নতার চেয়ে বর্ণনীয়ের স্পষ্টতা। তাঁর দুটি আত্মজীবনী তাঁর দুই রীতির চরম সিদ্ধি— সাধুরীতিতে জীবনস্মৃতি (১৯১২), চলতি রীতিতে ছেলেবেলা (১৯৪০)। দুটিই ছবি-আঁকা। চলতি রীতির গদ্যে ছবি আঁকার কাজে অবনীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে ছেলেবেলার একমাত্র তুলনা চলে বোধ হয়।

ধর্ম সম্বন্ধীয় ভাষণের বাইরে রবীন্দ্রনাথ নতুন রীতিতে প্রবন্ধ-গদ্য সম্ভবত 'বাতায়নিকের পত্রে' (১৯১৯) ব্যবহার করলেন। রীতির দিক দিয়ে এই প্রবন্ধের চেয়ে পরবর্তী প্রবন্ধ আরও নিরঙ্কুশ সন্দেহ নেই। প্রবন্ধরীতিও ক্রমে বদলাতে আরম্ভ করেছে। ব্যক্তিগত প্রত্যয়ের সুরটি স্পষ্টতর। নিম্নকণ্ঠে পরামর্শ করার ভঙ্গির বদলে একক কণ্ঠস্বরটি উচ্চতর হয়েছে। শ্লেষ ব্যঙ্গ এবং উদ্যত কঠিন প্রশ্ন সমন্বিত স্টাইলে চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথের প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত মানসিকতা সূর্যের মতই অপাবৃত। এই শ্লেষ বা ব্যঙ্গ অলংকার হয়ে আসে নি ; তাঁর অসন্দিগ্ধ জীবন-মূল্যমানের আহত বেদনা থেকে বজ্রাগ্নিশিখার মত উচ্ছ্রিত হয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ 'এসেয়িস্ট' নন। তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধ একই বিশ্বাস ও মূল্য -বোধের বিভিন্ন উপলক্ষ্যে প্রকাশ মাত্র। রচনাকে নেহাৎ শিল্প হিসাবে সাজান নি। বিশ্ব-সমাজের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মানববুদ্ধির অখণ্ড অস্তিত্বে আস্থা রেখে প্রফেটের মতই রবীন্দ্রনাথ ভবিষ্যতের দিগন্তে দৃষ্টির আলো ফেলে 'সত্যের আহ্বান' ও 'সভ্যতার সংকট' উচ্চারণ করেছেন। হয়তো বক্তব্যের অনুপাতে প্রবন্ধ কখনও কখনও দীর্ঘ। কিন্তু তাঁর ভাষার ঋজুতা ও তীক্ষ্ণতা কাউকে অনাহত রাখবে, এ অসম্ভব ; এবং এটাই প্রমাণ করে, নিকৃষ্ট অর্থে রচনাশিল্পীর চেয়ে মহৎ অর্থে তিনি জীবনশিল্পী।

বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ
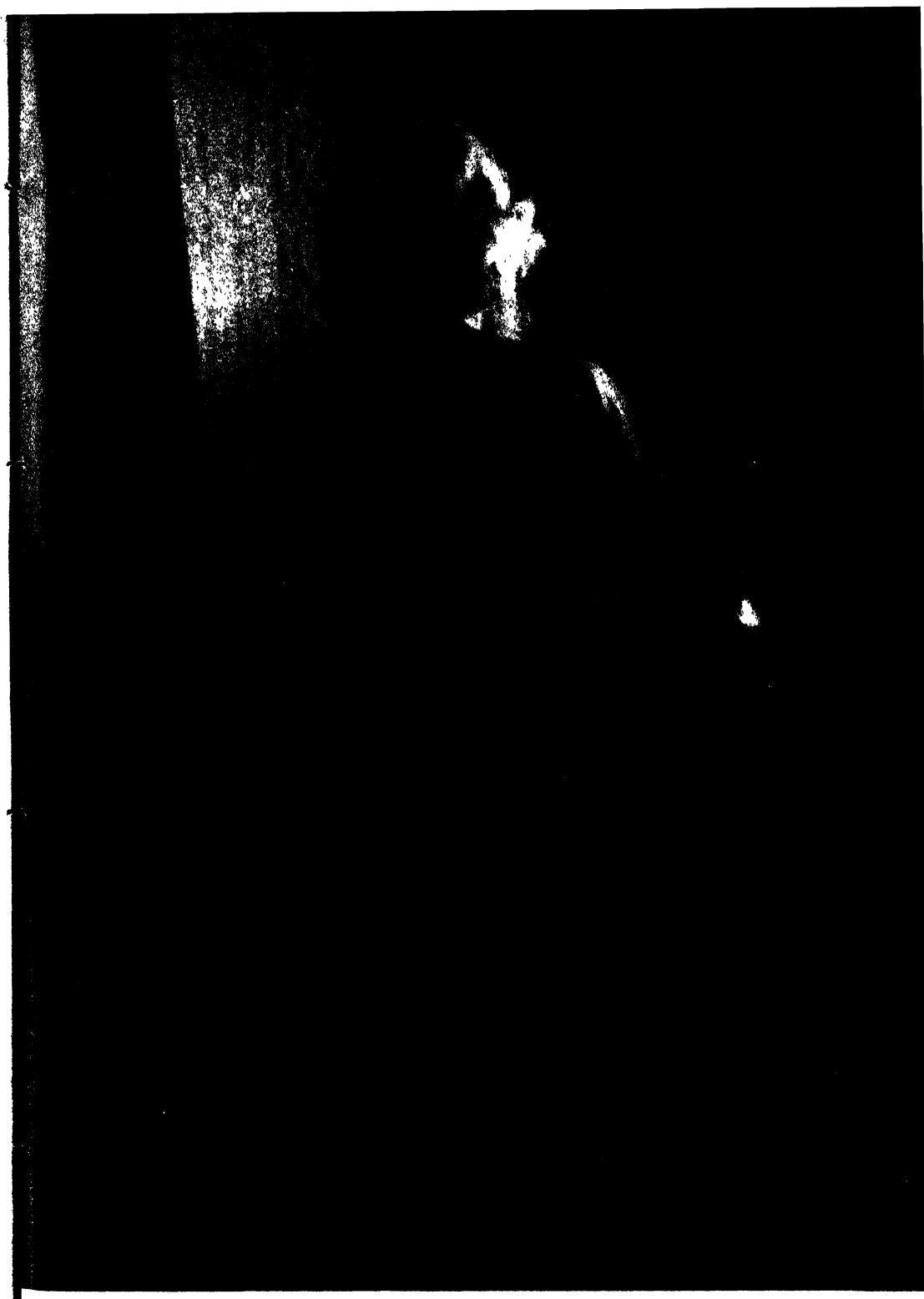
'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র' : রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা

শ্রীঅমলেন্দু বসু

এক কথায় সমুদ্রের বর্ণনা দেওয়া যায় না, সেজন্য গ্রীকদের কল্পনায় অর্ধদেবতা প্রটিউস ক্ষণ-পরিবর্তনশীল, বহুরূপী, বহুবর্ণসম্পন্ন। সমুদ্রের কোথাও পুনরাবৃত্তি নেই। কোটি কোটি তরঙ্গের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র— উচ্ছ্বাসে উচ্চতায় জলভারে বর্ণে। অথচ ব্যষ্টির স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও কোটি তরঙ্গের সমষ্টিতে আবার সমুদ্রের একটা মহান সমগ্র রূপও বিদ্যমান। রবীন্দ্রনাথের কাব্য তাঁর বহুস্তরী বহুপ্রসারী গভীরতল সমগ্র জীবনশিল্পের একটিমাত্র অভিব্যক্তি, আবার তাঁর কাব্যেও সে অগণিত বৈচিত্র্য আর অনন্ত সমৃদ্ধি যার তুলনা একমাত্র সমুদ্রেই সম্ভব। তাঁর কাব্যের সম্যক ব্যাখ্যা করবে কে? সমালোচক যত সাবধানী যত কুশলী হোন-না কেন, এই সাগরোপম বিশাল কবিপ্রতিভার কোনো-না-কোনো অংশ তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যেতে পারে। তবুও সমুদ্রের অংশ থেকেও সমুদ্রের ধারণা অসাধ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের কবিতার কোনো কোনো বিশেষ দিক্ চিন্তনের ফলে তাঁর সম্পূর্ণ কাব্যপ্রতিভার, তথা জীবনশিল্পের, ধারণা সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। সাগরতীরবাসী হয়েও বাঙালী সমুদ্র নিয়ে বেশি কবিতা লেখে নি, রবীন্দ্রনাথও অল্পই লিখেছেন, কিন্তু তাঁরই 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় এমন ছত্র পাই—

> শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন
> কিছু কিছু মর্ম তার।

সে সমুদ্রপ্রতিভার ধ্বনিমর্ম, যাকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অন্য প্রসঙ্গে 'জন্মদিনে' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র', সে-ধ্বনিমর্মের কিছু আভাস হয়তো পাওয়া যায় তাঁর বাক্‌প্রতিমায়, বাচনিক 'ইমেজ'গুলিতে।

ছন্দ ও বাগৈশ্বর্য— এই দুইয়ে কাব্যকলার বৈশিষ্ট্য। চিত্রকলা বা নৃত্যকলা অথবা উপন্যাস বা নাটক প্রমুখ অন্যান্য সাহিত্যিক কলা থেকে যে কারণে কাব্যকলা স্বতন্ত্র, শিল্পের যে করণকৌশল অনুপম রূপে কাব্যেই নিহিত, যে করণকৌশলে বিধৃত হলে অন্য শিল্পকেও আমরা বলি কাব্যধর্মী, সেই শৈল্পিক কারুকৃতি উদ্ভাসিত হয় বাক্‌প্রয়োগের প্রায় অনির্বচনীয় প্রায় অবিশ্লেষ্য রীতিতে। সত্য বটে যে বাক্যমাত্রেই ধ্বনি, কিন্তু কাব্যের বাক্‌রীতিতে যে ধ্বনি যে লীলায়িত সুর যে ছন্দ তা একান্তরূপে কাব্যেরই যদিচ কখনো-সখনো অন্য শিল্পের শিল্পী (যেমন চিত্রকর অথবা ঔপন্যাসিক) নিজ শিল্পে কাব্যছন্দ প্রয়োগের চেষ্টা করতে পারেন। ধ্বনি ছাড়া— বস্তুতঃ ধ্বনির সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে সম্পৃক্ত হয়েই— বাক্যের আবেগসঞ্চারী শক্তিতে কাব্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, অথবা বলা যেতে

পারে এক অখণ্ড বৈশিষ্ট্যেরই প্রসারিত রূপ। যে-ভাষা কাব্যে ব্যবহৃত সে-ভাষা অন্য সবারই বটে কিন্তু সাধারণ প্রয়োগে যে-ভাষায় কেবল মুখ্য অর্থই প্রকট, কবির প্রয়োগে সে ভাষা মুখ্যার্থ ছাপিয়ে প্রদীপ্ত ব্যঞ্জনা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ থেকে দুটি উদ্‌ধৃতি বিবেচনা করুন—

১ লাজুক ছায়া বনের তলে
আলোরে ভালোবাসে।
২ ফুরাইলে দিবসের পালা
আকাশ সূর্যেরে জপে
লয়ে তারকার জপমালা।

'লাজুক', 'পালা', 'জপমালা'— সুপরিচিত বহুব্যবহৃত শব্দ এগুলি, কিন্তু এই ছত্র কয়েকটিতে অন্য বাক্যের সংযোজনায় অচেতন বস্তুতে মনুষ্যোচিত সচেতন অনুভূতির যে-ইশারা দিচ্ছে তাতে মুখ্যার্থ ছাপিয়ে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে তাদের ব্যঞ্জনা। এই ব্যঞ্জনাতেই কাব্যের ভাষাবৈশিষ্ট্য আর এই ব্যঞ্জনাতেই সৃজনীশক্তির অফুরন্ত প্রাচুর্যের লক্ষণ। উচ্ছ্বাস নয়, প্রাচুর্য, প্রাচুর্যের দান, অকৃপণ অকুণ্ঠ দান। যদি বলা যায় উপরিউক্ত শব্দ কয়টি কিছুটা কাব্যঘেঁষা, অন্য শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

১ তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।
২ তখন ঝিকিমিকি বেলা,
করুণ ক্লান্তি লেগেছে মূলতানে।
ক্রমে ধূসর আলোর উপরে কালো মরচে পড়ে এল।

পত্রপুট থেকে নেওয়া ছত্র কয়টি। 'চালাচ্ছে ছুরি' অথবা 'মরচে' কোনো কথাতেই মামুলি কাব্যের ভাবানুষঙ্গ নেই, বাংলা কাব্যে বিশেষ বা আদৌ ব্যবহৃত হয়েছে বলে মনে পড়ে না, কিন্তু শান-দেওয়া ছুরি চালানোর উল্লেখে ঝড়ের আওয়াজ শুনতে পাই আর পাই যেন অন্ধকারের মেদকঠিন দেহের ধারণা। পাঠকের শ্রবণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শেন্দ্রিয়, দুদিকেই যুগপৎ আবেদন। 'কালো মরচে' কথাটিতে চিত্ররূপ। অ-কাব্যিক কথাও মহৎ কবির প্রয়োগে অপ্রত্যাশিত ঔজ্জ্বল্য লাভ করতে পারে।

ছন্দোলীলায় ও বাক্-ব্যঞ্জনায় যদি কাব্যের প্রধান দুটি করণ-কৌশল বিধৃত ব'লে মানি, তা হলে এও দেখা যাবে যে সে-ব্যঞ্জনা কোনো-না-কোনো ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার রূপ নেয়। কবির মনোজগৎ মূলে ধ্বনি-স্পর্শ-ঘ্রাণ-দৃশ্য-সম্পৃক্ত অনুভূতিতে উদ্‌বুদ্ধ, কবিচিত্ত sensuous, ইন্দ্রিয়বেদী। শক্তিমান কবির আত্মবিকাশের পরিণত পর্যায়ে বাক্-ব্যঞ্জনা ইন্দ্রিয়জ থেকে ইন্দ্রিয়াতীত অভিজ্ঞতার অভিসারী কিন্তু কখনোই মূল বিস্মৃত হয় না। বাক্যের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়জ এবং কোনো কোনো সময় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির ইঙ্গিত দিতে পারা কবির প্রধান শৈল্পিক লক্ষণ তো বটেই, অনেক ক্ষেত্রেই বাক্যের ও শিল্পের চেয়েও বড়ো যে-অন্তর্গূঢ় সত্তা তারও স্বাক্ষর। কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন—

ক ১ হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।

২ গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—

৩ ওরে আমার হৃদয় আমার, কখন তোরে প্রভাতকালে
দীপের মতো গানের স্রোতে কে ভাসালে।

খ ১ এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে,
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে॥
ও তার শিখার জটা ছড়িয়ে পড়ে দিক হ'তে ঐ দিগন্তরে,
তার কালো হাওয়ার কাঁপন দেখো তালবনের এই গাছে গাছে॥

২ কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, পাগল ওগো, ধরায় আস॥

৩ বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা॥

গ ১ কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে।
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে, নিত্যনূতন সংঘাতে॥
বাজে ফুলে বাজে কাঁটায়, আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায়,
প্রাণের মাঝে ঐ যে বাজে দুঃখে সুখে শঙ্কাতে॥

২ দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না—
সেই-যে আমার নানারঙের দিনগুলি।
কান্নাহাসির বাঁধন তারা সইল না—
সেই-যে আমার নানারঙের দিনগুলি॥

৩ আকাশ হতে আকাশপথে হাজার স্রোতে
ঝরছে জগৎ ঝরনাধারার মতো।
আমার শরীর মনের অধীর ধারা সাথে সাথে বইছে অবিরত॥

তিন শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমায় তিন ধরণের অভিজ্ঞতা। প্রথম শ্রেণীর প্রতিমায় কেবল দৃশ্যকল্প। বিশেষ পরিবেশে, বিশেষ অনুভূতির আবেগে, কবির কল্পনা দৃশ্যরূপ গ্রহণ করেছে— হৃদয় যেন নর্তনশীল ময়ূর, গানগুলি যেন স্থিতিহীন শৈবাল, কবির হৃদয় যেন প্রদীপ আর গান যেন নদীস্রোত আর সেই স্রোতে ভেসে চলেছে প্রদীপ। প্রতিটি দৃষ্টান্তে একটি সুঠাম বাক্‌চিত্র, সে-চিত্রে বর্ণায়িত হয়েছে কবির আবেগ। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাক্‌প্রতিমা কয়টিতেও চিত্ররূপ— বিদ্যুৎচমকিত কালো শ্রাবণ-মেঘ, প্রদীপ-হাতে অগ্রসর সাধক, আষাঢ়ের শ্যামল বুকে বজ্রবিদ্যুতের মালা। কিন্তু এই চিত্ররূপগুলি আগেকার চিত্ররূপের চেয়ে জটিলতর। এখানে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি যেন কোনো ইন্দ্রিয়োত্তর রূপের দিকে হাত বাড়িয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীর প্রতিমা কয়টিতেও চিত্ররূপ—নৃত্য ও বাদ্য -রত মহাকাল, কবির দিনগুলি যেন খাঁচাপালানো রঙিন পাখি, আকাশ যেন ঝরনা আর সে-ঝরনাধারার সংগতে বয়ে

চলেছে কবির দেহমনের ধারা। পাঠকের হৃদয়মোহন বটে চিত্ররূপগুলি কিন্তু স্পষ্টতই এখানে কবির প্রকাশকলা প্রথম দুই শ্রেণীর চিত্ররূপের তুল্য নয়। সেখানে চিত্ররূপ প্রত্যক্ষদৃশ্যনির্ভর, প্রত্যক্ষ থেকে সঞ্জাত, প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে গড়া। অর্থাৎ কবি প্রথমে দেখেছেন কিছু— ময়ূর, শ্যাওলা, শ্রাবণের মেঘ, আষাঢ়ের বজ্রবিদ্যুৎ— সে দৃশ্যগুলির ছবি রঙে তুলিতে না এঁকে (যেমন করতেন হয়তো চিত্রী) এঁকেছেন ভাষার মাধ্যমে। প্রথম দুই শ্রেণীর বাক্‌চিত্রগুলির আবেদন হয় পুরোপুরি দর্শনেন্দ্রিয়ে সীমিত অথবা কোনো ইন্দ্রিয়াতীত আবেগের সন্ধানী। কিন্তু গ-শ্রেণীর চিত্ররূপগুলির উদ্‌ভব অন্য পন্থায়, ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় নয় বরং অশরীরী চিন্তায়, কোনো অ্যাব্‌স্‌ট্র্যাক্ট উপলব্ধিতে। মহাকাল, বিগত দিনগুলি, জগৎপ্রবাহ— এসব বিষয়ে কবির চিত্তে জন্মেছে একটা বিশেষ ভাব, বিমূর্ত দার্শনিক ভাব, কিন্তু যেহেতু কবিচিত্তে বিদেহী জ্ঞানও শরীরী রূপ ধারণ করে নিয়ত সেজন্য এই দার্শনিক ভাবগুলি অচিরেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিমায় রূপান্তরিত ও প্রতীকিত হয়েছে। মহাকাল হলেন নৃত্যপরায়ণ, দিনগুলি হল রঙিন পাখি, জগৎ হল ঝরনা। অতীন্দ্রিয় থেকে আমরা পৌঁছেছি ইন্দ্রিয়গম্যে।

কাব্যব্যঞ্জনা প্রধানত ইন্দ্রিয়বেদী, তার প্রকাশরূপ বাক্‌প্রতিমায়।

২

কাব্যকারুতে বাক্‌প্রতিমা যে কত মূল্যবান সে কথা আধুনিক কাব্যরসিকই বুঝেছেন এমন নয়, বস্তুতঃ যখন থেকেই কাব্যের আলোচনা শুরু হয়েছে তখন থেকেই বাক্‌প্রতিমায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে সমালোচকের চিন্তা। আমাদের দেশে প্রাচীন কাব্যরসিক উপমা ও রূপকের আলোচনা করেছেন, সংস্কৃত কবিদের শিল্পমাহাত্ম্যবিচারে উপমা ও রূপকের প্রয়োগনৈপুণ্য ছিল মূল্যবান মানদণ্ড। গ্রীক ও রোমান কাব্যপাঠক উপমা ও রূপকের সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ করতেন। আধুনিক সমালোচক যে বাক্‌প্রতিমায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হয়েও প্রাচীন আলোচনাপদ্ধতিতে সন্তুষ্ট থাকেন নি তার কারণ সংস্কৃত ও গ্রীকো-রোমান পণ্ডিতেরা মনে করতেন বাক্‌প্রতিমা অলংকার মাত্র। কিন্তু অলংকার নয় বাক্‌প্রতিমা যেমন নয় ছন্দোলীলা, বস্তুতঃ ছন্দে ও প্রতিমায়ই কাব্যের অন্তরতম সত্তা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
> ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
> ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

সুর বা ভাব কাব্য নয়, ছন্দ বা রূপও কাব্য নয়, সুরে ও ছন্দে যে-মিলন, ভাবে ও রূপে যে-একাবয়ব, তাতেই কাব্য। 'এক কহে, আর-একটি একা কই, শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়'— কুহু ও কেকার পরিণয়ে সুর ও ভাবের সংগত্, কাব্যের শিল্পত্ব। যে বস্তু অলংকার মাত্র তা কাব্যের বাইরে, মহৎ কাব্য কোনো কোনো সময় নিরলংকার, অনাবৃত 'ইমেজ' সম্পর্কে এই যে ভিন্ন দৃষ্টি, এখানেই

প্রাচীন অলংকারশাস্ত্রে ও আধুনিক সমালোচনাপ্রণালীতে মৌল প্রভেদ আর এ প্রভেদ প্রকট হতে থাকে উনিশ শতকে ফরাসী দেশে। পোল্ ভালেরি লিখেছেন যে একদা চিত্রকর দেগা কবিতা রচনার চেষ্টায় কিছু মুশকিল বোধ করে মালার্মের উপদেশ চাওয়াতে কবিবর বলেছিলেন, 'You don't write poems with ideas, my dear Degas, but with words'—বন্ধু, কবিতা লিখবে ভাব দিয়ে নয়, কথা দিয়ে। ভাষা তো জড়পদার্থ নয়। একদা শব্দকে ব্রহ্ম ব'লে মানা হয়েছিল, আজ যদি সেই 'লোগোস্'-তত্ত্বে কেউ কেউ সংশয়ী হনও তা হলেও শব্দের প্রাণবত্তায় অন্ততঃ বিশ্বাস করা হয়তো কষ্টসাধ্য হবে না। শব্দের ধ্বনি ও রূপ জড়বস্তু নয়, বরং সপ্রাণ সত্তা, সে সত্তা কাব্যে এমন বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও মনোহরতা লাভ করে যা শব্দের সচরাচরিক প্রয়োগে পাওয়া যায় না। এ প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে 'লাজুক', 'পালা,' 'মরচে' ইত্যাদি কয়েকটি শব্দের কাব্যিক প্রয়োগে আমার এ কথা প্রমাণ হয়। দৈনন্দিন ব্যবহারে শব্দের অর্থ সীমায়িত। কাব্যের জগতে সার্থকপ্রযুক্ত সেই সীমায়িত অর্থেরই অসীম দ্যোতনা আর উপরে যে আলোচনা করেছি তারই রেশ টেনে আবার বলতে পারি যে এই দ্যোতনা ইন্দ্রিয়বেদী।

আধুনিক সমালোচনার মতে বস্তুতঃ কাব্যের প্রাণ ইমেজ-প্রয়োগে। বাক্‌প্রতিমার আলোচনায় প্রণিহিত হয় কবির শিল্পকারু, সংকেত পাওয়া যায় কবির ভাবজগতের। এই নূতন সমালোচনা-পদ্ধতিতে অনেক চোরাবালি লুকিয়ে থাকে যার ফলে সমালোচকের বিচার ও মূল্যায়ন বিভ্রান্ত হতে পারে। ইংরেজি সমালোচনায় ক্যারোলিন স্পার্জন ও উইলসন নাইট্‌স্ এহেন বিভ্রমের দৃষ্টান্ত। চোরাবালি এড়াতে পারলে বাক্‌প্রতিমার আলোচনায় কবির সৃজনীশক্তির নিকটে পৌঁছনো যায়। অন্তিম বিচারে কবির সৃজনীশক্তি পরম রহস্য। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু সন্তানের মধ্যে, ঠাকুরবাড়ির বহু মনীষীর মধ্যে, তৎকালীন অনেক কৃতী বাঙালীর মধ্যে, কেন রবীন্দ্রনাথই এমন মহৎ কবি ও অসাধারণ ব্যক্তি হলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংবেষ্টনী, তাঁর নিজ কার্যকলাপ ও অভিজ্ঞতা, তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক সামাজিক ধর্মীয় ইত্যাদি পরিবেশের বিশ্লেষণে। সে-বিশ্লেষণে বড়ো জোর জানা যেতে পারে কোন্ বহির্জাগতিক ঘটনাসংস্থানে কোন্ কবিতার উৎপত্তি। জানা যাবে না কিভাবে, সৃজনীপ্রতিভার কোন্ অজ্ঞাততল মন্থনে, কবিতাটি মহৎ শিল্পত্ব লাভ করল। বস্তুতঃ অনেক কবিতা তাৎক্ষণিক ঘটনাপরিবেশ থেকে উদ্ভূত নয়ও। 'সোনার তরী' লেখা হয়েছিল ফাল্গুন মাসে,[১] 'সমুদ্রের প্রতি' রামপুর বোয়ালিয়ায়, অথচ 'বলাকা' লেখা হয়েছিল ঝিলম-তীরে প্রত্যাশিত পরিবেশেই। রবীন্দ্রজীবনকথা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকা বাঙালী কাব্যপ্রেমীর একান্ত কর্তব্য, কিন্তু শুধু জীবনকথার নির্ভরে কবির কবিত্ব কতটুকু বোঝা যাবে? বরং মনুষ্যসাধ্য যতটা নিকটে পৌঁছনো সম্ভব কবির সৃষ্টিপরায়ণ চিত্তের ততটা নিকটে পৌঁছনো যেতে পারে যদি তাঁর বাক্‌প্রতিমা অধ্যয়ন করি। ইংরেজিতে ইম্যাজিনেশন ও

[১] সেঁজুতির 'নিঃশেষ' কবিতাটি ৮ এপ্রিল দিনে লেখা হয়ে শরতের মেঘ ও পাকা ফসলের উল্লেখ করছে

ইমেজ, বাংলায় কল্পনা-বাক্‌কল্প-চিত্রকল্প, এসব একমূল শব্দ থেকে শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিমার মর্যাদা বোঝা যায়। প্রতিটি সার্থক প্রতিমায় সৃষ্টিমুহূর্তের সংহত উল্লাস। প্রতিটি ইমেজ যেন ইম্যাজি-নেশনে পৌঁছবার রাস্তা। এ প্রবন্ধের শুরুতে তরঙ্গোদ্বেল সমুদ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রপ্রতিভার তুলনা করেছি। সে মহৎ প্রতিভা শতকর্মে বিচ্ছুরিত, যেমন কবিকর্মে তেমনই শিক্ষায়তন গড়ার কর্মে তেমনই আরো কত কর্মে। আবার একই কবিকর্মে পাই হাজার হাজার গান ও কবিতার সমাবেশ। কিন্তু এত বিভিন্ন কর্মে, একই কর্মের শতধা রূপে, সকল কাজে, একই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর। হয়তো কোনো কোনো আধুনিক শিল্পী পরস্পরদ্বন্দ্বজীর্ণ সত্তাসমূহে বিচ্ছিন্ন ও বিকলচিত্ত, তাঁদের ইমেজগুলিতে (ধরুন রিল্‌কে বা হার্ট ক্রেন-এর লেখায়) সে-বিচ্ছিন্নতার সাক্ষ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মহৎ কবিত্ব তাঁর মহৎ ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল প্রতিভাস আর সে মহৎ ব্যক্তিত্বের পরম লক্ষণ তাঁর সর্বকর্মের সমগ্র কাব্যের সুষম সাযুজ্যে। সুতরাং শত তরঙ্গসত্ত্বেও যেমন জলরাশির উপরিতলে একই সমুদ্ররূপ, শত শত ইমেজের ইঙ্গিতে তেমনি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের খানিকটা আভাস পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু এই অতীব দুরূহ ও দায়িত্বসংকুল কাজের জন্য পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী গবেষণার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রয়োগের Concordance তৈরি হওয়া দরকার যেমন কোনো কোনো মহৎ ইউরোপীয় লেখকের আছে। আবার যেমন শেক্‌স্‌পীয়র ও কোনো কোনো ইংরেজ কবির সমগ্র রচনা বিশ্লেষণ করে বাক্‌প্রতিমার শ্রেণীবিভাগ ও বিচার হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনার তেমন সশ্রদ্ধ ও সপ্রেম অধ্যয়ন হওয়া আবশ্যক। এমন বললে চলবে না যে এসব কাজ ব্যবচ্ছেদী মাত্র, নিতান্তই ডিগ্রীলোভীর স্বেদাক্ত পরিশ্রম, কাব্যরস এতে ক্ষুণ্ণ হয়। মেধাবর্জিত রসসম্ভোগ কর্পূরধর্মী। পল্লবগ্রাহিতায় প্রেম নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠেই যদি মেধাবিহীন হই তা হলে আমাদের কাব্যপাঠই বিকল, রসের নামে অগভীর উচ্ছ্বাসের প্রশ্রয়। তবুও আমি কবুল করব যে এ প্রবন্ধে সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণবিস্তৃত গবেষণার দাবি আমি রাখি নে আদৌ, এ প্রবন্ধে শুধু কয়েকটি প্রশস্ত দিঙ্‌নির্ণয়ের চেষ্টা, শুধুই খসড়া।

৩

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইমেজ অগুন্‌তি। হেন কবিতা নেই, হেন গান নেই যাতে ইমেজ মিলবে না। এ যেন পরম ঐশ্বর্যবান কোনো মহাপুরুষ শুধু দানের প্রেরণায় দু হাতে বিলিয়েছেন বাক্‌-বৈভব। কিন্তু এই অকুণ্ঠ অনবরত দানে এমন প্রতিমারও অভাব নেই যা নেহাতই অনুজ্জ্বল সচরাচরিক বাক্‌প্রয়োগ মাত্র। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

১ হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার।
হৃদয়চকোর চাবে হাসির কিরণ। —'হৃদয় আকাশ', কড়ি ও কোমল

২ নিবাও বাসনাবহ্নি নয়নের নীরে। —'নিষ্ফল কামনা', মানসী

৩ এই সংকটময় কর্মজীবন
মনে হয় মরু সাহারা। —'ভৈরবী গান', মানসী

৪ দুটি হাত, ত্রস্ত কপোতের মতো দুটি
বক্ষ দুরুদুরু। —'মানসসুন্দরী', সোনার তরী

৫ সন্ধ্যাসখী ভালোবেসে
স্নেহকরস্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা করিয়ে চুপে চুপে
চলে যায় তিমিরমন্দিরে। —'সমুদ্রের প্রতি', সোনার তরী

৬ দুঃখের যজ্ঞ-অনল-জ্বলনে জন্মে যে প্রেম
দীপ্ত সে হেম। —গীতবিতান পৃ ৩৫৫

৭ হৃদয়শতদল করিছে টলমল
অরুণ প্রভাতে করুণ তপনে। —গীতবিতান পৃ ৩৫৬

৮ যেয়ো না, যেয়ো না ফিরে ;
দাঁড়াও বারেক, দাঁড়াও হৃদয়-আসনে। —গীতবিতান পৃ ৪১২

৯ বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে। —গীতবিতান পৃ ৪৪৩

কোনো উজ্জ্বল বাক্‌প্রতিমা নেই এসব ছত্রে। চকোরচাতকরূপ হৃদয়, হৃদয়-আসন, কপোতের মতো ভীরু হৃদয়, হৃদয়শতদল, বাসনাবহ্নি, জীবনের সাহারা, সন্ধ্যাসখী, তিমিরমন্দির, দুঃখের আগুনে শুদ্ধীকৃত সোনা, বাদলের মাদল, এ হেন উপমা ও রূপক উপর-ছোঁওয়া মামুলি ভাষাপ্রয়োগ মাত্র ; অনন্য ও তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বেদিতার পরিচায়ক নয়। অথবা একটি পুরো কবিতা নেওয়া যাক, মানসীর 'ভুল-ভাঙা'। কতকগুলি প্রতিমা পাচ্ছি এখানে : নিশার স্বপন, বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ, চরণে কঠিন শিকলের ফাঁসি, মধুনিশা, পাষাণহৃদয়— এসব প্রতিমাকে বলা যেতে পারে dead imagery, কোনো কালে হয়তো কেউ যখন প্রথম ব্যবহার করেছিলেন তখন তাতে ছিল নবত্বের আকর্ষণ যদিও চিন্তনের গভীরতা নয়, কিন্তু কালক্রমে বহুপ্রয়োগের ফলে এগুলো বাঁধিগৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কবিকল্পনা উদ্‌বুদ্ধ না হয়েও অভ্যস্ত প্রয়োগে সন্তুষ্ট থাকতে পারে। হৃতদীপ্তি অভ্যস্ত প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের পরিণত কাব্যেও দুর্লভ নয়। ধরা যাক সেঁজুতির 'পরিচয়' কবিতাটি। কবির জীবন-তরী একদা থেমেছিল এক ঘাটে লেগে, তিনি জানতেন না তাঁর পরিচয় কি, গন্তব্যস্থল কোথায় ; তিনি গাইলেন যৌবনের বেদনার গান ; তার পরে জোয়ার সাঙ্গ হয়ে শুরু হল ভাঁটা ; ফাল্গুনের উৎসবরাত্রি শেষ হল ; ভাঁটার টানে নৌকা ভেসে চলল সমুদ্রের পানে। যাঁরাই রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা প্রায় শ'খানেকের সঙ্গেও পরিচিত তাঁরাই জানেন এসব প্রতিমা তাঁর কাব্যে এবারই নূতন নয়, আগেকার কবিতার পুনরাবৃত্তি, এদের চেয়ে মহত্তর প্রকাশের প্রমাণ আছে অন্য কবিতায়, এখানে যেন অভ্যাসের 'মোমেন্টাম্‌', বেগভার।

অভ্যস্ত প্রতিমা প্রয়োগের দরুন যে কবিতাটি কাব্য হিসেবে মন্দ হল এমন কথা অনুচিত হবে। বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতাটি ধরা যাক। গরজে মেঘ, নদী ক্ষুরধারা, তরুছায়ামসী-মাখা,

সোনার ধান— কোনো প্রতিমাতেই নবত্বের আশ্চর্যতা নেই কিন্তু এ কবিতার কারুকৃতি আলাদা আলাদা আঙ্গিকে নিহিত নয়, এখানে সমগ্র কবিতাটি একটি সুঠাম চিত্রকল্প, সেই সর্বাঙ্গীণ প্রতিমা-দীপ্তিতে এর মহত্ত্ব, অভ্যস্ত বা পুরাতন প্রতিমা যে কিভাবে এক সার্বিক নূতন রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে তার অসাধারণ দৃষ্টান্ত এই কবিতায়। চৈতালির 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটিতেও লক্ষ করি একক প্রতিমার বিস্ময়করতা নয়, সব জড়িয়ে এক অনুপম বুনট।

নিষ্প্রাণ ইমেজ এমন-কি রবীন্দ্রনাথেও পাওয়া যায় খোঁজ করলে, কিন্তু পাওয়া যায় বেশির ভাগ তাঁর প্রথমদিককার রচনায়। সেটা অপ্রত্যাশিত নয় কেননা কবিচিত্ত ও কবিকৃতি তখনো সৃজন-বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে নি, ভাষায় ছন্দে ভাবে একটা নূতন যুগ গড়ে তোলার প্রয়াসে তখনো সন্ধানশীল। কিন্তু অনন্য আবেগময় প্রতিমায় পৌঁছতে রবীন্দ্রনাথের বেশিদিন লাগে নি। বিদ্যুৎচকিত কয়েকটি প্রতিমার দৃষ্টান্ত ধরা যাক—

১ দুরন্ত পবন অতি— আক্রমণে তার
অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার। —'মেঘদূত', মানসী

২ তরুশ্রেণী উদাসীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে সারাদিন
আপন ছায়ার পানে। —'যেতে নাহি দিব', সোনার তরী

৩ সম্মুখ-ঊর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ —'যেতে নাহি দিব', সোনার তরী

৪ রৌদ্রালোকে
জ্বলন্ত বালুকারাশি সূচি বিঁধে চোখে। —'বসুন্ধরা', সোনার তরী

৫ দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশয্যা-'পরে
জ্বরাতুরা বসুন্ধরা লুটাইছে পড়ে। —'বসুন্ধরা'

৬ খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি। —'বসুন্ধরা'

৭ যেখানে লয়েছে ধরা
অনন্তকুমারীব্রত, হিমবস্ত্র-পরা,
নিঃসঙ্গ, নিস্পৃহ, সর্বআভরণহীন। —'বসুন্ধরা'

৮ অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো। —'বসুন্ধরা'

৯ ঊর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি —'দুঃসময়', কল্পনা

১০ বাতায়নে তব দ্রুত কৌতুকে মারিছে উঁকি।
বাতাস করিছে দুরন্তপনা ঘরেতে ঢুকি। —'অবিনয়', ক্ষণিকা

১১ আমার ছুটি চার দিকে ধূ ধূ করছে
ধান-কেটে-নেওয়া খেতের মতো। —পত্রপুট, ২

১২ দেখলেম বর্ষা গেল চলে
কালো ফরাশটা নিল গুটিয়ে। —পত্রপুট, ২

১৩ কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড়। —পত্রপুট, ৩

১৪ হাওয়ার মুখে ছুটল ভাঙা কুঁড়ের চাল
শিকলছেঁড়া কয়েদী-ডাকাতের মতো। —পত্রপুট, ৩

১৫ কালবৈশাখী হঠাৎ মারে পাখার ঝাপট। —পত্রপুট, ১২

১৬ গিরিশিখরের পাগলাঝোরা পোষ মেনেছে
গিরিপদতলের বোবা জলরাশিতে। —পত্রপুট, ১২

১৭ কত সূত্র ছিন্ন হল জীবনের আস্তরণময়
জোড়া লাগাবারে আর রবে না সময়। —আরোগ্য, ১৬

১৮ যেখানে মানুষগুলো সব ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো
ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। —'শিশুতীর্থ', পুনশ্চ

১৯ যেখানে কঙ্কালসার দেহ বসে আছে প্রাণের কাঙাল —'শিশুতীর্থ'

২০ যেখানে বোবা অতীত তার ভাঙা কীর্তি কোলে নিয়ে নিস্তব্ধ —'শিশুতীর্থ'

এসব প্রতিমার যথাযথতা, সুষ্ঠুতা, সংযম এবং পাঠকচিত্তে রসোদ্রেকক্ষমতা অসামান্য। বর্ষা যে কালো ফরাশ গুটিয়ে নিয়ে যায়, বাতাস যে ঘরে ঢুকে দুরন্তপনা করে, কালবৈশাখী যেন বিশাল পাখার ঝাপট মারে, খণ্ড মেঘগুলি যেন শিশুর মতো শিখর-মায়ের বুক আঁকড়ে পড়ে আছে, গাছগুলি যে সারাদিন উদাসীন দৃষ্টিতে আপন ছায়ার পানে তাকিয়ে থাকে— এসব চিত্রানুভূতি সাধারণ জীবনের অন্তর্গত, কবির প্রতিমা-প্রয়োগে সেগুলি মণ্ডিত হয় বিস্ময়ময় ব্যঞ্জনায়। 'অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার'— মনে পড়ে বহু বৎসর পূর্বে এক চৈত্রের বিকেলে ঢাকা শহরের রমনার রাস্তায় চলতে চলতে যখন প্রায় আচম্বিতে কালবৈশাখীর দুর্বার ঝড়ে পড়েছিলাম তখন একটি মস্ত শিরীষ গাছের তলায় আশ্রয় নিয়ে দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম সত্যিই অরণ্য উদ্যতবাহু করে হাহাকার, আর তখন বারংবার আপন মনে বলেছিলাম, হে কবি, জীবনের এমন কোনো অংশ আছে কি যা তোমার সর্ব-স্পর্শী বাক্‌প্রতিমায় রূপায়িত হয় নি? 'রৌদ্রালোকে জ্বলন্ত বালুকারাশি', 'জ্বরাতুরা বসুন্ধরা'— সুয়েজখালে পৌঁছবার পথে ইস্‌মাইলিয়া নামে যে আরব শহরটি, সেখানে মরুপ্রান্তরের প্রান্তে দেখেছি সুচ-বেঁধা বালুকারাশি, বসুন্ধরা সেখানে সত্যিই জ্বরাতুরা। নিজ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দৃঢ়তর হল কবির প্রতিমা। আর যে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখি নি, কম লোকেই দেখেছে, কবিও দেখেন নি, সে দৃশ্যও কবির সর্বত্রগামী কল্পনায় সমূর্ত হয়েছে— অনন্তকুমারীব্রতধারিণী মহামেরুদেশের দৃশ্য। লক্ষ্য করি যে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রতিমা রূপকের সে পর্যায়ে পড়ে যাকে রস্‌কিন বলেছিলেন, 'প্যাথেটিক ফ্যালাসি', অর্থাৎ জড় নিসর্গে মানবিক অনুভূতির আরোপ। যখন বলা হয় 'অরণ্য

উদ্যতবাহু করে হাহাকার', 'খণ্ড মেঘগণ মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন', 'লয়েছে ধরা অনন্তকুমারী-ব্রত', তখন কল্পনা করা হয়েছে যে নিসর্গ নিশ্চেতন বস্তুপিণ্ড নয় বরং মনুষ্যোচিত চেতনাধর্মী আর এই চেতনাধর্মিতার জন্য নিসর্গের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সমবেদনা জমে ওঠে, রসবোধ জাগ্রত হয় পাঠকচিত্তে। এহেন মনুষ্যতা-আরোপ আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সহজ কাজ, কিন্তু সহজ যে নয় তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথেরই ছত্র 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে/সব গাছ ছাড়িয়ে/উঁকি মারে আকাশে'। কল্পনা এখানেও সক্রিয় কিন্তু এ-কল্পনা ('শিশু ভোলানাথে' অন্তর্ভুক্ত এ কবিতাটি অবশ্য হালকা চালেই লেখা) কল্পনাশক্তির সে পর্যায়ে পড়ে যাকে ইংরেজি সমালোচনায় বলা হয় 'ফ্যান্‌সি', ইম্যাজিনেশন থেকে নিচু শক্তি। দুর্বল ও গৌণ কবির প্রতিমায় মনুষ্যতা-আরোপ এমনকি হাস্যকরও হতে পারে। দৃষ্টান্ত না-ই বা দিলাম।

এক দিকে যেমন প্রত্যক্ষ-দেখা নিসর্গে মানবিক চেতনা আরোপ করা হয়েছে, অন্য দিকে উপরে উদ্ধৃত কয়েকটি প্রতিমায় প্রতিমার উৎস প্রত্যক্ষে নয়, ভাব ও চিন্তায়। জীবনের কত সূত্র ছিঁড়ে গেল, আর জোড়া লাগল না, ইতিহাসের ছেঁড়াপাতার মতো এলোমেলো মানুষ, কীর্তিনিস্তব্ধ অতীত—এসব প্রতিমায় চিন্তা ও চিত্র বিদ্যুৎ-উদ্ভাসে সমীকৃত। যা ছিল চিন্তা তা নিয়েছে চিত্ররূপ।

রবীন্দ্রনাথের প্রতিমাপ্রয়োগে কোনো কোনো সময় আরেক ধরণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

১ শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সংগীতভরে; নক্ষত্রের প্রায়
শিহরি জ্বলিব শুধু কম্পিত শিখায়;
শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব
তোমার তরঙ্গপানে। —'মানসসুন্দরী', সোনার তরী

২ এ নিয়ে আজ নালিশ নেই আমার।
বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা খেলেছে তার নাচের উড়নিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথরাত্রের জপমন্ত্র পেয়েছে
তার তিমিরপুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়। —পত্রপুট, ১২

দুটি উদ্ধৃতিতেই পুঞ্জীকৃত প্রতিমা, যেন কবিকল্পনা উপমান ও উপমেয় এ দুয়ের সাযুজ্যসাধন করেই আপন অন্তঃশীল আবেগে তৎক্ষণাৎ ধাবিত হয়েছে অন্য সাযুজ্যে। ইতিপূর্বে যে-কুড়িটি প্রতিমা উদ্ধৃত করেছি সেগুলির কোনো কোনোটিতে পরম সংহতি ও সংযম। এবারকার উদ্ধৃতি দুটিতে যেন সংযমের বদলে উদ্দাম অস্থির আবেগ। 'কাঁপিব সংগীতভরে', সে কেমন কাঁপা? না, নক্ষত্রের

প্রায়। কিন্তু নক্ষত্র আবার উপমিত হয়েছে অগ্নিশিখার সঙ্গে। পরক্ষণেই কবিকল্পনা অন্য আধার খুঁজেছে তরঙ্গপ্রতিমায়। যে আগুন ও ঢেউ জড়নৈসর্গিক বিচারে বিপরীত-ধর্মী, তারা কবিকল্পনায় গ্রথিত হয়েছে সমসূত্রে। দ্বিতীয় স্তবকটিতে একই ধরণের কল্পনাকৃতি। বিরহবেদনা উপমিত হয়েছে ক্ষুধার সঙ্গে, অভাববোধে দুয়ের তুল্যতা আর সে তুল্যতা চিত্রায়িত হয়েছে 'কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর' এই কথা কয়টিতে। গহ্বর থেকে ভাবানুষঙ্গে বেরল ঝরনা। ঝরনা কিসের? বিরহবেদনার গানের ঝরনা। এর পরেই কবিকল্পনা সপ্রেমে ঝরনার আরো খুঁটিনাটির প্রতিমা তৈরি করল : ঝরনার উপরে সূর্যালোক পড়ে লাগিয়েছে সাতরঙের ছটা। সেই সদাসচকিত রামধনু-রঙা ঝরনার চিত্র সমৃদ্ধতর হল যখন কবি কল্পনা করলেন যে ঝরনা যেন নর্তকী, রামধনু-রঙ যেন তার নাচের উড়নি। দুটি স্তবকেই এক উপমা গড়িয়ে পড়েছে আর-এক উপমার গায়ে, যেন এক বাজির আগুনে জ্বলে উঠল আর-এক বাজি, যেন একটা chain actionএ সংযোজিত হয়েছে প্রতিমাপুঞ্জ। কিন্তু বস্তুতঃ এ পুঞ্জীকরণে অসংযত কল্পনার পরিচয় নয়, পারচয় কল্পনার অন্য এক শক্তিতে যাকে ইয়োরোপীয় সমালোচনা-শাস্ত্রে বলা হয়েছে synaesthesia, সে-শক্তির আধুনিক সংজ্ঞার নির্ভরে বলতে পারি, এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা থেকে অন্য ইন্দ্রিয়জ ধারণায় গড়িয়ে পড়ার মনঃশক্তি। যে বস্তু সচরাচর ঘ্রাণেন্দ্রিয়সাধ্য, যদি তাকে শ্রবণেন্দ্রিয়ের ভাষায় বর্ণনা করি, যে বস্তু আমার নয়নগোচর যদি বলি সে বস্তু আমাকে দিচ্ছে স্পর্শানুভূতি, তা হলে আমি একটি বিশেষ রকমের ইন্দ্রিয়সমন্বয়ী শক্তির অধিকারী। ইংরেজ কবি শেলি ও স্যুইনবর্ন, ফরাসী কবি বোদলেয়র ও র‍্যাঁবো, এলিজাবেথ-যুগের ইংরেজ নাট্যকার-কবিগণ এই সিনেস্‌থিসিয়ার অধিকারী। কবিকল্পনায় যে দৃশ্য আমি দেখছি সে তো স্থূল দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্যে দেখছি না, অথবা যে ধ্বনি শুনছি তাও আমার স্থূল কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি, আমার দেখা ও শোনা দুইই কল্পনার দেখা ও শোনা। স্থূল অভিজ্ঞতায়ও সিনেস্‌থিসিয়া বিরল নয়। বলতে পারি, 'ভাই, তোমার বিদ্রূপবাক্য যেন আমার গায়ে চাবুক মারল' অথবা 'কিশোরী মেয়েটির চলন যেন হালকা গানের মতো'। যা শুনলাম তা যেন আমার স্পর্শে এল, যা দেখলাম তা যেন শুনলাম। এক ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা রূপান্তরিত হল অন্য ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায়। স্থূল ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় যদি এমনধারা রূপান্তর সম্ভব হয় তা হলে কল্পনার ইন্দ্রিয়বেদী অভিজ্ঞতায় রূপান্তর আরো বেশি সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের বহুস্তরী কল্পনাশক্তির সাক্ষ্য এই পুঞ্জীকৃত, গড়িয়ে-পড়া প্রতিমা-প্রয়োগে। আমার যতদূর জানা আছে, 'শিশুতীর্থ' কবিতাটিতে এবং বলাকার 'চঞ্চলা' কবিতাটিতে সিনেস্‌থিসিয়া বা গোত্রান্তরী প্রতিমার প্রকৃষ্ট প্রকাশ।

১ বিক্ষিপ্ত বস্তুগুলো যেন বিকারের প্রলাপ,
অসম্পূর্ণ জীবলীলার ধূলিবিলীন উচ্ছিষ্ট ;
তারা অমিতাচারী দৃপ্ত প্রতাপের ভগ্ন তোরণ,
লুপ্ত নদীর বিস্মৃতিবিলগ্ন জীর্ণ সেতু,

দেবতাহীন দেউলের সর্পবিবরছিদ্রিত বেদী,
অসমাপ্ত দীর্ণ সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত। —'শিশুতীর্থ'

২ অকস্মাৎ উচ্চণ্ড কলরব আকাশে আলোড়িত আবর্তিত হতে থাকে,
ও কি বন্দী বন্যা-বারির গুহা-বিদরণের রলরোল ?
ও কি ঘূর্ণ্যতাণ্ডবী উন্মাদ সাধকের রুদ্র মন্ত্র উচ্চারণ ?
ও কি দাবাগ্নিবেষ্টিত মহারণ্যের আত্মঘাতী প্রলয়-নিনাদ ? —'শিশুতীর্থ'

প্রথম দৃষ্টান্তে চিত্ররূপের প্রাধান্য— উচ্ছিষ্ট, ভগ্নতোরণ, জীর্ণ সেতু, ছিদ্রিত বেদী, অসমাপ্ত সোপান-পঙ্‌ক্তির ছবি। চিত্ররূপের সঙ্গে মিলেছে ধ্বনিরূপ— বিকারের প্রলাপ। আবার ইন্দ্রিয়গম্য রূপের সঙ্গে সংযোজিত অশরীরী ভাব— তোরণ অমিতাচারী ও দৃপ্ত, সেতু বিস্মৃতিবিলগ্ন, সোপানপঙ্‌ক্তি শূন্যতায় অবসিত। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে ধ্বনিরূপের প্রাধান্য— বন্যার গুহা-বিদারণ ধ্বনি, উন্মাদ সাধকের মন্ত্রোচ্চারণ, দাবাগ্নির মহানিনাদ। কিন্তু ধ্বনিরূপ চিত্ররূপের সঙ্গেও সংগত— সাধক তাণ্ডবনৃত্যপরায়ণ, দাবাগ্নি বেষ্টন করেছে মহারণ্য। একাধিক ইন্দ্রিয়বেদিতা পরস্পরে অনুষংগত, আর ইন্দ্রিয়বেদিতা সমন্বিত অশরীরী ভাবের সঙ্গে। প্রত্যেকটি প্রতিমা স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল কিন্তু স্তবক দুটির কবিকৃতি প্রধানতঃ একাধিকের ঐক্যে। অনেক মিলিয়ে হয়েছে এক ছাঁদ বাঁধা।

৪

অনেক মিলিয়ে যাঁর মহৎ প্রতিমায় এক ছাঁদ বাঁধা হয়েছে, একক ইন্দ্রিয়বেদিতায় তাঁর কবিকৃতির কোন্ রূপ ? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সচরাচর চক্ষু ও কর্ণ কবিদের উপলব্ধিতে সক্রিয়, অনেক কবিই দৃশ্যরূপময় ও ধ্বনিরূপময় প্রতিমা-প্রয়োগে পারদর্শী। রবীন্দ্রনাথে আমি লক্ষ্য করি প্রথম চারিটি ইন্দ্রিয়ের সংবেদনা, রসনেন্দ্রিয়সঞ্জাত অভিজ্ঞতার ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করি নি। তাঁর কাব্যে দৃশ্যরূপময় প্রতিমা অসংখ্য, ধ্বনিরূপও অগণিত, স্পর্শরূপ প্রচুর, ঘ্রাণরূপ বিরল নয়। কোন্ ইন্দ্রিয়ের আবেদন কোন্ প্রতিমায় প্রকাশ পেয়েছে এ বিষয়ে আমি কোনো পরিসংখ্যান-কর্মে লিপ্ত হই নি, শুধু স্মৃতির মোটামুটি হিসেবে বলতে পারি যে রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমা প্রধানতঃ চিত্রধর্মী। তাঁর কল্পনা যে চিত্রসৃষ্টিশীল সে কথা জানার জন্য তাঁর চিত্রকলায় যাবার প্রয়োজন নেই, কাব্যেই তার অজস্র সাক্ষ্য। কিন্তু এ থেকে এমন সিদ্ধান্ত সংগত হবে না যে রবীন্দ্রনাথে ধ্বনিসৃষ্টি, স্পর্শসৃষ্টি ও ঘ্রাণসৃষ্টি অনায়াসে উজ্জীবিত হয় না। সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে না কল্পনার প্রধান আকৃতি কোন্ ইন্দ্রিয়বেদিতায় বিধৃত ; আসল কথা, সংখ্যা কম হোক বেশি হোক, বাগৈশ্বর্য উদ্‌বুদ্ধ হল কোন্ প্রেরণায় ? আমার কাব্যপাঠে আমি দেখেছি যে ঘ্রাণরূপময় প্রতিমায় কবির সে ঐশ্বর্য বিরল যার প্রমাণ বারংবার পাই দৃশ্যরূপময় শ্রুতিরূপময় ও স্পর্শরূপময় প্রতিমায়। সৃজনসম্ভাবনা তুল্য-ভাবেই নয়নেন্দ্রিয়ে ও স্পর্শেন্দ্রিয়ে বিদ্যমান। কিছু দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা পরিষ্কার হোক। প্রথমে লক্ষ্য করব বাক্‌প্রতিমায় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের ইঙ্গিত—

১ তোমার মদির গন্ধ অন্ধ বায়ু বহে চারিভিতে। —'উর্বশী', চিত্রা

২ অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস। —'স্বপ্ন', কল্পনা

৩ পক্বশস্যগন্ধহরা মধ্যাহ্নের বায়ে। —'পরিশোধ', কথা

৪ পড়েছে অবাধে
উন্মুক্ত সুগন্ধ কেশরাশি, সুকোমল
তরঙ্গিত তমোজালে ছেয়ে বক্ষতল
বিদেশীর, সুনিবিড় তন্দ্রাজালসম। —'পরিশোধ', কথা

৫ গন্ধভারে আমন্থর বসন্তের উন্মাদনরসে। —'তপোভঙ্গ', পূরবী

৬ …শিরীষের ঊর্ধ্বশাখা, যেথা হতে ধীরে
ক্ষীণগন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে। —'শ্যামা', আকাশপ্রদীপ

৭ ডিনার টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে,…
চক্ষু-কানের স্বাদের ঘ্রাণের সম্মিলিত নেশা। —'যাত্রা', আকাশপ্রদীপ

৮ যেতে যেতে পথপাশে
পানাপুকুরের গন্ধ আসে,
সেই গন্ধে পায় মন
বহুদিনরজনীর সকরুণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গন। —'ঘরছাড়া', সেঁজুতি

৯ অধীর সমীর-ভরে উচ্ছ্বসি বকুল ঝরে,
গন্ধ-সনে হল মন সুদূরে বিলীন। —গীতবিতান পৃ ৫২৫

১০ চৈত্রদিনে তপ্ত বেলা তৃণ-আঁচল পেতে
শূন্যতলে গন্ধ-ভেলা ভাসায় বাতাসেতে —গীতবিতান পৃ ৫৮৫

কবির তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিতে বহুরকম গন্ধের আসা-যাওয়া— দেহের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ফসলের গন্ধ, পানা-পুকুরের গন্ধ, খাদ্য ও পানীয়ের গন্ধ ; তীব্র গন্ধ, মৃদু গন্ধ। এইসঙ্গে লক্ষ্য করি ঘ্রাণরূপময় প্রতিমা যেন স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ থাকতে পারে না, অন্য ইন্দ্রিয়বেদী প্রতিমায় আত্মলোপ করতে চায়। অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ যেন উতলা নিশ্বাস ফেলে, অর্থাৎ গন্ধ রূপায়িত হয় নিশ্বাসের স্পর্শে। সুগন্ধ কেশরাশি ধারণ করে তমোজালের চিত্ররূপ ; পানাপুকুরের গন্ধে মন পায় আলিঙ্গনের স্পর্শ ; চৈত্রদিনের গন্ধ আঁচল ও ভেলার দৃশ্যরূপময়। আমার জানা কোনো বাঙালী কবি নেই, ইয়োরোপীয় কবিও কম, যাঁর কাব্যে এমন সুন্দর গন্ধেন্দ্রিয়বেদী আকৃতি পাওয়া যায় কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য প্রতিমায় যে তুঙ্গ মানদণ্ড আমাদের সামনে ধরেছেন তার তুলনায় তাঁর ঘ্রাণরূপময় প্রতিমার স্থান নীচেই।

অন্য ইন্দ্রিয়বেদী প্রতিমা আলোচনার পূর্বে একটি কথা এখনই বলা দরকার। সাহিত্য-আলোচনায় যখন ইন্দ্রিয়নির্ভর অভিজ্ঞতার কথা বলি, যখন বলি কবির ঘ্রাণশক্তি অথবা শ্রবণশক্তি

এরকম বা ওরকম, তখন তাঁর শারীর ইন্দ্রিয়ের কথা বলি না। কাব্যসৃষ্টির কারবার শারীর ইন্দ্রিয় নিয়ে নয়, শরীরোত্তর কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বোধ নিয়ে। বাস্তবজীবনে দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ না হলেও কাব্যে দৃশ্যরূপময় প্রতিমার প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্য অসম্ভব নয়, মিল্টন ও টেনিসন তার প্রমাণ, শোনা যায় হোমর অন্ধ ছিলেন। বধির বেঠোফনের মতো ধ্বনিময় চিত্ত কজনার? রবীন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়বেদী প্রতিমা-আলোচনায় যখন ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রুতিশক্তির উল্লেখ করি তখন তাঁর কল্পনাগম্য ইন্দ্রিয়বোধের কথা বলি কেননা সেখানে তাঁর কাব্যকারু বিধৃত, তাঁর শারীর ইন্দ্রিয় আমাদের আলোচ্য নয়।

স্পর্শেন্দ্রিয়বেদী প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রচুর এবং কোনো কোনো দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল দ্যোতনাময়।

১ তপ্ত কপোলের তাপে ক্লান্ত কর্ণোৎপল —'মেঘদূত', মানসী

২ বেণীমুক্ত কেশজাল স্পর্শিবে তাপিত ভাল
কোমল বক্ষের তাল মৃদুমন্দ দোল। —'সান্ত্বনা', চিত্রা

৩ সিক্ত তনু মুছি নিল আতপ্ত অঞ্চলে —'বিজয়িনী', চিত্রা

৪ মধ্যাহ্নের জলন্ত তপন
হানিল সর্বাঙ্গে তার অগ্নিময়ী কশা —'পরিশোধ', কথা

৫ সে চুম্বনে উচ্ছলিল জ্বালার তরঙ্গ মোর প্রাণে—
অগ্নির প্রবাহ। —'সাবিত্রী', পূরবী

৬ ঝংকারি উঠিল মোর অঙ্গ আচম্বিতে
কাঁটার সংগীতে।
চমকিনু কী তীব্র হরষে
পরুষ পরশে। —'পরিচয়', মহুয়া

৭ আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,
পাঁজরের-উপরে-আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক। —'বাঁশিওয়ালা', শ্যামলী

৮ পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে,
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড —'আফ্রিকা', পত্রপুট

৯ পিঠ রাখি কুঞ্চিত বল্কলে
যে পরশ লভিতাম। —'স্কুল-পালানে', আকাশপ্রদীপ

১০ সুড়সুড়ি দেয় আরসুলারা পায়ের তলায় মোর। —'সময়হারা', আকাশপ্রদীপ

এসব স্পর্শরূপময় প্রতিমার কোনো-কোনোটিতে (৪, ৫, ৬, ৭, ৯) অনুভূতি তীক্ষ্ণ, শুধু শরীর-ছোঁওয়া নয়, শরীরের অন্তরতম প্রদেশে আবেগ ও শিহরণ-সৃষ্টি-করা। এসব প্রতিমায়ও অনুভূতি কেবল এক ইন্দ্রিয়সঞ্জাত নয়, কেবল ছোঁওয়াতেই সীমিত নয়, কবির কল্পনা স্পর্শের সঙ্গে মিলিয়েছে দৃশ্য অথবা ধ্বনি। 'ক্লান্ত কর্ণোৎপল', ক্লান্ত কথাটিতে অতি সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে তাপ-লাগার ধারণা, সেই সঙ্গে উৎপলে মনুষ্যচেতনার আরোপ, আরো ইশারা আছে এলিয়ে-পড়া উৎপলের দৃশ্যরূপ। এমনি ধারা দৃশ্যরূপ আরো প্রতিমায় যে কেশজাল তপ্ত ললাট স্পর্শ করবে তার বেণীমুক্তি; যে-তপন কশা হানল তার জ্বলন্ত মূর্তি; জুতোর তলায় চেপটে-যাওয়া পিণ্ড যুগপৎ স্পর্শবোধ ও দৃশ্যবোধের সঞ্চার করে। দৃশ্য ছাড়া ধ্বনিও রূপায়িত হয়েছে রক্তে-বওয়া ঝড়ের ডাকে বন্যার ডাকে।

ধ্বনিরূপপ্রবল বাক্‌প্রতিমা বলতে ছন্দের সুর বুঝব না, সে-সুরে অন্য ধরণের কাব্যকারু। শুধু ছন্দের দোলায় যে শিল্পসত্তার পূর্ণ বিকাশ পেতে পারে সে-প্রতিভার নিয়ত সাক্ষী রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা ও গান, দুই পরম দৃষ্টান্ত হিসেবে 'চঞ্চলা' কবিতাটি ও 'ভাঙো, বাঁধ ভেঙে দাও' গানটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। ছন্দ যদি না বুঝি, অনুপ্রাস ও স্বরধ্বনির লীলাও বুঝব না। কয়েকটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক—

১ তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবনশিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া

২ গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে, গরজে গগনে।

৩ চলচপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ।

শুধু ব্যঞ্জনবর্ণ-ধ্বনির সমাবেশে প্রতিভাত হয়েছে কঙ্কণ-সংগীত, মেঘগর্জন, বিদ্যুতের সর্পিল গতি কিন্তু এসব দৃষ্টান্তে কারুকার্য কিছুটা অতিপ্রকট। এর চেয়ে সৌম্যতর অনুপ্রাস রবীন্দ্রনাথে মিলবে বহু কিন্তু যে বাক্‌প্রতিমার বিষয় এখানে আলোচনা করছি তাতে ব্যঞ্জন বা স্বরবর্ণ -সঞ্জাত ধ্বনি আলোচ্য নয়, আলোচনার বস্তু কবিচিত্তে ধ্বনির প্রতিমায়ন, কাব্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা। কত বিচিত্র ধ্বনি অথবা ধ্বনি-ক্ষান্তি রূপ নিয়েছে কবির ভাষায়।

১ এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধূলায় ধূলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধরে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল। —'স্তব্ধতা', নৈবেদ্য

২ সেথা এসে তার স্রোত নাহি আর,
কলকল ভাষ নীরব তাহার—
তরঙ্গহীন ভীষণ মৌন, তুমি তারে কোথা লও?
হে অতীত, তুমি হৃদয়ে আমার কথা কও, কথা কও। —'অতীত', উৎসর্গ

৩ ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ংকর,
তুমি নিবিড় নিশীথ-রাত্রি বন্দী হয়ে আছ—
মাটির পিঞ্জর। —'দিঘি', খেয়া

৪ হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওংকার ধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি। —'ভারততীর্থ', গীতাঞ্জলি

৫ সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন কেশর-দোলা সিংহ;
বনের মর্মরধ্বনি বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্য হারিয়েছে
অকস্মাৎ কল্লোলোচ্ছ্বাসে। —'পৃথিবী', পত্রপুট

৬ আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক,
আগুনের ডাক,
পাঁজরের-উপরে-আছাড়-খাওয়া
মরণসাগরের ডাক,
ঘরের-শিকল-নাড়া উদাসি হাওয়ার ডাক।…
কালবৈশাখীর ঘূর্ণি-মার-খাওয়া
অরণ্যের বকুনি। —'বাঁশিওয়ালা', শ্যামলী

৭ শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি। —'জন্মদিন', সেঁজুতি

৮ ট্যাক্সি এল দ্বারে, দিল সাড়া
হুংকার পরুষরবে। —'ঘরছাড়া', সেঁজুতি

৯ ধরাতলে
চঞ্চলতা সব আগে নেমেছিল জলে।
সবার প্রথম ধ্বনি উঠেছিল জেগে
তারি স্রোতোবেগে।
তরঙ্গিত গতিমত্ত সেই জল
কলোল্লোলে উদ্বেল উচ্ছল
শৃঙ্খলিত ছিল স্তব্ধ পুকুরে আমার। —'জল', আকাশপ্রদীপ

১০ সেই নাম থেকে থেকে ফিরে ফিরে
তোমারে গুঞ্জন করি ঘিরে
চারিদিকে,
ধ্বনি-লিপি দিয়ে তার বিদায়-স্বাক্ষর দেয় লিখে। —'নামকরণ', আকাশপ্রদীপ

রুক্ষ পরুষ ধ্বনি থেকে উদাত্ত ওংকারধ্বনি অবধি, নিখাদ থেকে পঞ্চম অবধি, সব কয়টি সুর তন্ত্রিত

হয়েছে রবীন্দ্রনাথের শ্রুতিতে— পাখির গান, জন্তুর হুংকার, যন্ত্রের গর্জন, নিসর্গের শব্দবৈচিত্র্য, নিসর্গ-পেরিয়ে-যাওয়া অলৌকিক ধ্বনি, আর পরম স্তব্ধতার ধ্বনি।

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম-তারে-বাঁধা মন নিয়া,
চারি দিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা সুরে
নাড়ীর জটিল জালে ঘুরে ঘুরে।

আকাশপ্রদীপ গ্রন্থের 'ধ্বনি' কবিতাটিতে কবি নিজেই বলেছেন কত বিভিন্ন ধ্বনিতে তাঁর সহজাত সংবেদনা। চিলের সুতীক্ষ্ণ সুর, ও পাড়ায় কুকুরের সুদূর কলহ-কোলাহল, ফেরিওলাদের ডাক, সহিসের ডাক, এক ঝাঁক পাতিহাঁসের উচ্চ কলভাষ, ইস্কুলের ঘণ্টা, সমুদ্র-খেয়ার গম্ভীর মন্দ্রিত শিঙা এ-সমস্ত শব্দের অশ্বারোহী ছুটে যেত রৌদ্রের প্রান্তর বয়ে। এমন ধ্বনি আমরাই কি শুনি নি? ক্লান্ত দুপুরের শহরে কত-যে ডাক— মৃদু বা উচ্চকিত— সংবেদী চিত্তে দোলা দিয়ে যায়, সে-সব ধ্বনি-বৈচিত্র্য সংসারী মানুষকে অভিভূত করে বা করে না, সংসারী মানুষের কাছে অনির্বচনীয় তো বটেই। আমাদের ভাষা নেই সে-শব্দের রূপায়ণ করি অথচ বিভিন্ন ধ্বনির কী আশ্চর্য সূক্ষ্ম রূপায়ণ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়! আকাশটা ডেকে উঠল কেশর-ফোলা সিংহের মতো, বাতাসের স্পর্ধায় ধৈর্যহারা বনের মর্মরধ্বনি, অরণ্যের বকুনি, জন্তুর হুহুংকার, ট্যাক্সির পরুষ হুংকার, চিলের সুতীক্ষ্ণ সুর, জাহাজের গম্ভীর মন্দ্রিত ডাক— বিশেষণের প্রদীপ্ত যথাযথতায় কত-না ধ্বনিময় প্রতিমা পাঠকচিত্তে অসামান্য আবেগসঞ্চার করে। তবু এত বাগৈশ্বর্যের মধ্যেও কোনো প্রতিমা নেই যা 'বলাকা'-কবিতার ধ্বনিপ্রতিমার সঙ্গে তুলনীয়—

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।

আমার জানা কোনো কবিতা নেই যেখানে ধ্বনির সংবোধে কবিকল্পনা এমন উত্তুঙ্গতায় পৌঁছতে পেরেছে। ইংরেজিতে এই মহৎ গম্ভীর সু-উচ্চ ভাবনাকেই সাব্‌লাইম বলা হয়। সারি সারি দেওদার-তরুর অরণ্যে যে-অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে গুমরে উঠেছে, সহসা সে-স্তব্ধতার তপোভঙ্গ হল হংসবলাকার ঝঞ্ঝায়িত পক্ষ-বিধুননে সমূর্ত শব্দময়ী অপ্সররমণীর বেগবান গতিমত্ততায়। স্তব্ধতার আকস্মিক বিদারণ সূচিত হয়েছে 'বিদ্যুৎছটা' কথাটিতে এবং 'ছটা' ও 'ছুটিয়া' এ-অনুপ্রাসে, আর স্তব্ধতাহানি যে কত মৌল পরিবর্তন নিয়ে এল দেওদার-অরণ্যে সে কথা সূচিত হয়েছে তপোভঙ্গ-প্রতিমার ভাবানুষঙ্গে। তপোভঙ্গ যখন হলই, স্তব্ধতা যখন টুটে গেল, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ণ হল রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে; বিশ্বচরাচরের অকথিত বাণী, কত অলক্ষিত অথচ যুগযুগান্তরব্যাপী,

দ্বীপদ্বীপান্তর-অতিক্রমী, নিয়ত-স্পন্দমান আবেগ এক পরম উদাত্ত বাক্‌-ধ্বনিতে সংহত হল, 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!'

৫

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সবচেয়ে বেশি বাক্‌প্রতিমা দর্শনেন্দ্রিয়ের আবেগ-সঞ্জাত। এমন কবিতা নেই গান নেই, তাঁর কাব্যগ্রন্থাবলীর এমন পাতা নেই, যেখানে চিত্ররূপময় বাক্‌প্রতিমা বিধৃত হয় নি। এই প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে দৃষ্টান্ত দেওয়া সহজ নয়, সংবেদী সাবধানী পাঠক অনায়াসে আমার দেওয়া দৃষ্টান্তের চেয়ে সুষ্ঠুতর প্রতিমা খুঁজে পেতে পারেন। আমার কাজ দৃশ্যরূপময় কল্পনার গঠন-আলোচনা।

এ-প্রবন্ধের তৃতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছি মানবিক-চেতনা আরোপিত বাক্‌প্রতিমার। সে আরোপ চিত্রায়িত-প্রতিমায় সবচেয়ে বেশি।

১ নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল-খসা,
হাতে দীপশিখা
—'অশেষ', কল্পনা

২ কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙুলগুলো—
কাকে ধরতে চায় ওই জলের ঝিকিমিকির মধ্যে?
—'আমার ফুলবাগানের ফুলগুলিকে', শেষ সপ্তক

৩ সজনে ঝুলায় ফুলের বেণী —'শেষমধু', মহুয়া

৪ শ্রাবণের স্নেহ নামে আঘাতের ছল ক'রে,
সবুজ মঞ্জরী এগিয়ে চলে দিনে দিনে
শিষগুলি কাঁধে তুলে নিয়ে
অন্তহীন স্পর্ধিত জয়যাত্রায়। —পত্রপুট, ৪

চিত্রপ্রতিমায় কখনো রঙের ছটা কখনো তুলির লিখন, বর্ণাঢ্য সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ তৈলচিত্র অথবা কালিকলমের আঁচড়ে ছন্দায়িত অবয়ব-সীমানা। এই সর্বত্র-সার্থক চিত্রায়ণ যে কেবল নিসর্গবিষয়ক কাব্যে উপস্থিত এমন নয়, যদিচ নিসর্গকাব্যের সর্বাধিক ঐশ্বর্য রবীন্দ্রনাথের গানে ও কবিতায় অর্থাৎ নিসর্গপ্রীতিতে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত নিয়ত ভরপুর, তবুও যে-কোনো বিষয়ের কল্পনাতেই প্রকাশিত তাঁর চিত্ররূপময় ইন্দ্রিয়বেদিতা। আর নিসর্গের চিত্রে মানুষী-চেতনার আরোপ যেমন বিদ্যমান, এ হেন কোনো আরোপ-মণ্ডিত না হয়েও নিছক নিসর্গবর্ণনায় একই রকম সূক্ষ্ম, যথাযথ, বর্ণসমৃদ্ধ চিত্ররূপ। অসংখ্য কবিতায় এত অজস্র এই চিত্ররূপ যে আমি শুধু অল্প কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই আমার বক্তব্যের সমর্থন করব। নিছক নিসর্গবর্ণনার একটি দীর্ঘ স্তবক—

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূরপানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।

প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক ব'সে
পাশে রাখি' হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর,
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি,
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
শর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলেনৌকো এল ঘাটে,
ঝুড়ি কাঁধে জুটেছে মেছুনী;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।
আঁকড়ি' মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের ক্ষেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত-রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি'
দূরত্ব-জয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা। —আরোগ্য, ৪

এ দৃশ্য দেখেন নি কোন্ বাঙালী? মেছোবাজার থেকে নেবুতলা অবধি যে-'ককনি'র জীবনের প্রসার সীমাবদ্ধ, একবারটি কোনো রেলের ব্রাঞ্চ লাইনে দু ঘণ্টা বেড়িয়ে এলেও এ দৃশ্য তিনি দেখে থাকবেন। শহরের বাইরে যে-বাংলা দেশ সে তো এই বাংলা দেশ। (বস্তুতঃ কিছু অদলবদল ক'রে এমন

দেশই গুজরাত, অযোধ্যা, ত্রিহুত, এমন দেশই ভারতবর্ষ।) এই সুপরিচিত দৃশ্যের চিত্ররূপ কবি এঁকেছেন আশ্চর্য সরল, প্রায় নিরলংকার প্রণালীতে, প্রধানত এই দৃশ্যের একটির পরে একটি আলাদা আলাদা অঙ্গের সুমিত উল্লেখে। খেয়া-প্রত্যাশী লোক, হাটের পসরা, টিনের চালাঘর, গুড়ের কলস ইত্যাদি থেকে মোষের-গলা-ধরে-সাঁতার-দেওয়া চাষী অবধি এত বিভিন্ন ছোট ছোট দৃশ্যের পুঞ্জীকরণে পাঠকচিত্তে এক অদ্ভুত আবেশের সৃষ্টি হয়, পুরনো স্মৃতিকে ফিরে পাওয়ার আবেশ, সে-দৃশ্যগুলি গড়ে উঠেছে শুধু উল্লেখের সাহায্যে, কোনো বিশেষণের বর্ণচ্ছটায় বিচিত্রিত নয়। বিশেষণের মধ্যে প্রা চী ন অশথতলা, ভ্রা ণ লু ব্ধ কুকুর, রাস্তার স বু জ প্রান্তে— কিন্তু সাধারণতঃ বিশেষণ যেমন বক্তব্যের শাঁস নয়, শাঁসের অতিরিক্ত, এখানে বিশেষণ কয়টি মূল বক্তব্যের একান্ত অন্তর্গত। দুইটি মাত্র উজ্জ্বল রূপক এত বড়ো স্তবকে, মেঠো পথ গেছে গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে; রেলগাড়ির ধোঁয়া তার দূরত্ব-জয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা। দৃশ্যরূপের চিত্রায়ণে এই অতীব ঋজু, পুঞ্জীকরণী, উল্লেখী করণ-কৌশলে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে আমার বিশ্বাস। এই ঋজু করণ-কৌশল রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে অনেক আগে থেকেই বিদ্যমান তার প্রমাণস্বরূপ চৈতালি থেকে 'মধ্যাহ্ন' কবিতাটির কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করছি—

বেলা দ্বিপ্রহর।
ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবালে জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী-'পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্ত নেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা। শূন্য ঘাটতলে
রৌদ্রতপ্ত দাঁড়কাক স্নান করে জলে
পাখা ঝট্‌পটি।

অন্যত্র দৃশ্যরূপের চিত্রায়ণে কবি প্রয়োগ করেন বর্ণাঢ্য অলংকৃত করণ-কৌশল, তার একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
একদিকে আপক্ক ধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে।

এ দৃশ্যরূপ মানবিক চেতনাসমৃদ্ধ ; দ্যোতনা-গাঢ় বিশেষণে সালংকারা। রবীন্দ্রনাথের দৃশ্যরূপে কত-না বৈচিত্র্য!

১ তখন ছিল সর্ষেখেতে ফুলের আগুন লাগা —'বিলম্বিত', ক্ষণিকা

২ কাঁচা রোদখানি পড়েছে বনের ভিজে পাতায় —'মেঘমুক্ত', ক্ষণিকা

৩ সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার। —'বলাকা', বলাকা

৪ আমি তোমার চশমা-পরা বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়ষাটার বিষম জালে বাঁধা। —'ঠাকুরদাদার ছুটি', পলাতকা

৫ জলের উপর ঝলোমলো টুকরো আলোর রাশি —'ইচ্ছামতী', শিশু ভোলানাথ

৬ বিদ্যুৎবহ্নির স্বপ্ন হানে ফণা যুগান্তের মেঘে। —'তপোভঙ্গ', পূরবী

৭ সারি-দেওয়া সুপারির আন্দোলিত সঘন সবুজে
জোনাকি ফিরিতেছিল অবিশ্রান্ত কারে খুঁজে খুঁজে। —'পরিচয়', মহুয়া

৮ এই মাঠ, এই রাঙা ধুলি,
অঘ্রাণের-রৌদ্র-লাগা চিকণ কাঁঠাল-পাতাগুলি। —'পসারিণী', বিচিত্রিতা

৯ বাদলের কালো ছায়া
স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে
কলে-পড়া জন্তুর মতন
মূর্ছায় অসাড়। —'বাঁশি', পরিশেষ

১০ বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো তোমার ঝড় —'পৃথিবী', পত্রপুট

১১ জানা-অজানার মাঝে সরু এক চৈতন্যের সাঁকো। —'জানা-অজানা', আকাশপ্রদীপ

১২ আর ছিল কাক।
তার ডাক
সময় চলার বোধ
মনে এনে দিত। দশটা বেলার রোদ
সে ডাকের সঙ্গে মিশে নারিকেল-ডালে
দোলা খেত উদাস হাওয়ার তালে তালে।
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গী, চাতুরী সতর্ক আঁখিকোণে
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে। —'স্কুল-পালানে', আকাশপ্রদীপ

দৃশ্যরূপবেদী কল্পনা বিধৃত হয়েছে কত রকমের আধারে! ১, ২, ৫, ৮, ১০, ১২ -সংখ্যক চিত্র কয়টি খাঁটি প্রকৃতিবর্ণনা, সচরাচর যে-প্রকৃতি আমাদের দৃষ্টিসাধ্য। ৩, ৬ নিসর্গ-নির্ভর বটে কিন্তু ইন্দ্রিয়-বেদিতা এখানে সমৃদ্ধির জটিলতায় পৌঁছেছে চিন্তাশক্তির আবেগে, অর্থাৎ কবি শুধুই দেখছেন না,

শুধুই অনুভব করছেন না, তাঁর দেখা ও অনুভূতির সঙ্গে মিশেছে চিন্তা। এ হেন মনস্বী আবেগের সুন্দর দৃষ্টান্ত ১১ -সংখ্যক ছত্রটিতে, খাঁটি দেশজ দৃশ্য পরিণত হয়েছে রূপকে। আরো কয়েকটি ছত্র উদাহরণ হিসেবে উদ্‌ধৃত করা যাক—

১ মনে ভাবি
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল। —'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু', প্রান্তিক

২ একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল। —'শা-জাহান', বলাকা

৩ চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশপাথারে। —'ছবি', বলাকা

৪ তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
কখন সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা। —'শা-জাহান', বলাকা

৫ তব বক্ষোহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা, ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল,
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল। —'চঞ্চলা', বলাকা

৬ তখনি চমকি
উচ্ছ্রিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে। —'চঞ্চলা', বলাকা

চিন্তায়িত আবেগ, আবেগায়িত চিন্তা, ইন্‌টেলেক্‌ট্‌ ও ইমোশন্‌, এ-সব ছত্রে অভিন্নসীম, সৃজনীচিত্তের সে অভিজ্ঞান যা সুমহৎ ব্যক্তিত্বেই সম্ভব। আবেগ ও চিন্তার সম্মেলন অন্য কবিতেও দুর্লভ নয় কিন্তু রবীন্দ্রনাথে যেমন চিন্তার উত্তুঙ্গতা ও নিষ্ঠা, আবেগের বিশুদ্ধতা তেমনি, এ দুয়ের মিলিত মহত্ত্ব অতুলন। যে গভীর অন্তঃসন্ধানী দার্শনিক প্রত্যয় এসব ছত্রে চিত্ররূপে বাগৈশ্বর্যের সৃষ্টি করেছে, তাকে বলব পরম শক্তিমান কবিপ্রতিভার নিঃসংশয় নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথের বাক্‌প্রতিমায় ইন্দ্রিয়-বেদিতার নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ কিন্তু কখনো কখনো ইন্দ্রিয়গম্য অভিজ্ঞতা থেকেই প্রতিমার উদ্ভব ও সেখানেই পরিণতি, কখনো বা গোড়ায় যা ছিল বিমূর্ত ধারণা অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ চিন্তা, অচিরেই সে চিন্তার সে ধারণার রূপান্তর হল ইন্দ্রিয়বেদী প্রতিমায়। একদা নৈবেদ্য গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যে-কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

দীর্ঘকাল পরে পত্রপুট গ্রন্থে লিখেছেন—

হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট
গুচ্ছে গুচ্ছে অঙ্গুলি মেলে আছে
আমার চারদিকে চিরকাল ধরে,
বিশ্বভুবনের সমস্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে আমার যোগ হয়েছে
মনোবৃক্ষের এই ছড়িয়ে-পড়া
রসলোলুপ পাতাগুলির সংবেদনে।

দুই স্তবকের প্রতিমা দু ধরণের কিন্তু তারা একই কথা বলে— রবীন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তি ইন্দ্রিয়বেদী।

৬

বাক্‌প্রতিমার বিস্তৃত আলোচনায় আরো দুটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের একেবারে শেষের রচনায় আমরা এমন সম্পূর্ণ শুদ্ধ অনুভূতিতে ও প্রজ্ঞায় পৌঁছই যেখানে কোনোরকম বাক্যালংকার, কোনো করণ-কৌশল, কোনো বাগৈশ্বর্য মনে হয় বাহুল্যের রূঢ়তা-ক্লান্ত। ফরাসী চিত্রকর নিকলাস পুস্যাঁ তাঁর প্রথমদিককার ঘনবর্ণিল চিত্রাবলী থেকে ক্রমে পৌঁছেছিলেন নিরাভরণ চিত্রে ; মিল্‌টন প্যারাডাইস্ লস্‌টের ধ্বনি ও চিত্র-গম্ভীর কাব্য ছেড়ে স্যাম্‌সন্ অ্যাগনিস্টিসে এগিয়েছিলেন ঋজু অলংকাররিক্ত ভাষার দিকে ; রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রত্যন্তপ্রদেশে এসে জীবন ও মৃত্যুর (অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন জীবনেরই) রহস্য-উপলব্ধির পরে, নির্মোহ যোগীশ্বর দৃষ্টিতে দীর্ঘজীবনের পানে তাকিয়েছিলেন গভীর প্রজ্ঞায়। সে প্রজ্ঞার, সে পরম কাব্যের তুলনা যদি কোথাও পাই, পাব একমাত্র কোনো কোনো উপনিষদে। জীবনব্যাপী প্রতিমা-প্রিয়তা ছেড়ে শেষ কাব্যে তিনি যে চরম ঋজুতায় সন্নিহিত হয়েছিলেন কাব্যের চেয়েও তা মহত্তর, তাকে বলব প্রজ্ঞায়-অন্তর্লীন কাব্য।

এক দিকে যেমন প্রতিমার এই অপসরণ আলোচনার বিষয়, অন্য দিকে অধ্যয়নযোগ্য তাঁর কাব্যের কতকগুলি পুনরাবৃত্ত প্রতিমা। কবির কতকগুলি নিভৃত ও শাশ্বত চিন্তা কয়েকটি প্রতিমায় অথবা সমজাতিক প্রতিমায় বিধৃত। ধরা যাক, 'আলোক'-প্রতিমা। শব্দটি যে কতবার রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে, কতবার রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিমায়, তার পরিসংখ্যানের প্রয়োজন নেই, একনজর অধ্যয়নেই সে বিষয়ে অবহিত হওয়া যায়। আর শুধু যে অসংখ্যবার ব্যবহৃত তেমন নয়, বারংবার আলোর প্রতিমায় বিদ্যুৎ-চকিত হয়েছে প্রতীকিত ভাবজগতের ইশারা। বস্তুতঃ অনেক প্রতিমা প্রতীকে উন্নীত, সে প্রতীক-চিন্তনে রবীন্দ্রনাথের গূঢ় শিল্পসত্তার কিছু আভাস পাওয়া সম্ভব।

এ দুটি বিষয়ই স্বতন্ত্র সযত্ন আলোচনার যোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙ্‌লাভাষা

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯১৩ সালে ক'লকাতায় এম্‌-এ পাস করি। বিষয় ছিল ইংরিজী। এম্‌-এ পরীক্ষার জন্য ইংরিজী পড়ার যে ব্যবস্থা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, তা'তে বিষয়টি দু'টি পৃথক ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে— এক, শুদ্ধ আধুনিক ইংরিজী সাহিত্য, আর দুই, প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইংরিজী সাহিত্য আর ইংরিজী ভাষাতত্ত্ব। কলেজে প'ড়তে প'ড়তে সাহিত্যের চাইতে ভাষাতত্ত্বের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি। একটু গুণ্ডাপ্রকৃতির ছিলুম— ব্যায়াম করা, দৌড়ধাব, ধাক্কাধুক্কি, এইসবে প্রবৃত্তি ছিল। আমাদের সঙ্গে কতকগুলি সহপাঠী ছিলেন, তাঁরা অতি মোলায়েম প্রকৃতির, ব'সে ব'সে কবিতা লিখতেন আর কবিতা প'ড়তেন, আর তাঁদের কারও-কারও চাল-চলনে কথাবার্তার ধরণে যেন একটি অত্যন্ত সুকুমার ভাব তাঁরা প্রকট ক'রতেন। এটা আমার ভাল লাগ্‌ত না— যখন এইসব সহপাঠী চোখে একটু উদ্‌ভ্রান্ত কবি-কবি দৃষ্টি নিয়ে ঘাড় কা'ত ক'রে ইংরিজী আর বাঙ্‌লা নানারকম সাহিত্যিক বুক্‌নি প্রয়োগ ক'রতে ক'রতে, Shelley, Epipsychidion আর The Ideal আর 'মানসী মূর্তি' আর 'ভাবের সংঘাত' প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রতেন, সে-সব বুঝতুম না— তাঁদের আমি ঠাট্টা ক'রে ব'লতুম, 'তোমাদের শেলির দল আমাকে গথিক ভাষার ব্যাকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।' যাই হ'ক্‌, নিছক সাহিত্যের চেয়ে, জটিল আধুনিক সাহিত্যের চেয়ে সহজবোধ্য প্রাচীন সাহিত্য আর ভাষাতত্ত্বের কচ্‌চায়ন এই দু'টির দিকেই একটু ঝোঁক আসে, এবং কখন্‌ অজ্ঞাতসারে ভাষার আলোচনাতেই একটা রস পেতে থাকি। সেইজন্যে ইংরিজীতে এম্‌-এ পড়বার কালে আমি প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরিজী সাহিত্য আর ইংরিজী ভাষার নাড়ীনক্ষত্রের কথা খুব আগ্রহ ক'রে স্বীকার ক'রে নিই। দু' বচ্ছর এম্‌-এ পড়বার সময়ে, ইংরিজী ভাষাতত্ত্বের খুঁটিনাটি আমাকে ভাল ক'রেই আয়ত্ত ক'রতে হয়। এবং সেই সময়ে একটি জিনিস দেখে মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে— ইউরোপের লোকেরা নিজেদের ভাষা, যেমন ইংরিজী, জার্মান, ফরাসী, কী নিষ্ঠার সঙ্গে কেমন গভীরভাবে আলোচনা ক'রেছে আর তার নষ্টকোষ্ঠী কত কষ্ট ক'রে বা'র ক'রেছে, তাদের মধ্যে যা-কিছু অজানা ছিল তার সবই তারা যেন প্রকাশ ক'রে দিতে পেরেছে। আমার মনে এই দেখে একটা হিংসের ভাবও জাগ্‌ত, আর একটা প্রবল ইচ্ছাও হ'ত, এইভাবে আমার মাতৃভাষার ইতিহাসের উদ্ধার হয় না! আমাদের ভাষার প্রকৃতি আর বিকৃতি, আর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে তার গতিশীল ধারার ইতিহাস আমরা তো কিছুই জানি না! মনে একটা উৎকট আগ্রহ হ'ত, আমরা আমাদের ভাষার নানা ব্যাসকূটের সমাধান ক'রতে কবে পার্‌বো। তখন থেকেই মনে এই ইচ্ছা যেন পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠ্‌ছিল, ইংরিজীতে এম্‌-এ পরীক্ষায় পাস ক'রেই মাতৃভাষা বাঙ্‌লার ভিতরকার কথা খুঁজে বা'র ক'রতে হবে।

ভারতবর্ষে এখন থেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বে পাণিনির উদ্ভব হ'য়েছিল। সংস্কৃত ভাষার নিজস্ব রূপ যেটি আছে, সেটির অভূতপূর্ব বিশ্লেষণ পাণিনি ক'রে দিয়ে গিয়েছেন। সংস্কৃত ভাষায় এই এই নিয়ম কাজ ক'রছে, ভাষার ধ্বনি আর প্রত্যয়গুলির প্রয়োগ এইভাবে হ'চ্ছে, এই-সব নিয়ম সর্বত্রই কার্যকরী, আবার এই নিয়মগুলির প্রতিষেধও আছে, আবার এইসব নিয়মের বিরোধী অনেক বৈশিষ্ট্যও আছে— সংস্কৃত ভাষায় যা আছে, তার একখানি সর্বগ্রাহী নিখুঁত বর্ণনা পাণিনি ব্যাকরণে পাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষার গঠনে এমন অনেক জিনিস আছে, যা কোনও নিয়ম মানে না, আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণেরা তার উল্লেখ ক'রলেও তার কারণ নির্দেশ ক'রেন নি। 'এইরকমটি হয়, এইরকম আদেশ আছে'— এই ব'লেই তাঁরা ক্ষান্ত হ'য়েছেন। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বা বাক্‌তত্ত্ব বিদ্যার যে নবীন বিচার আর প্রয়োগ গত দেড়-শ' বছরের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছে, তার এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমে নির্ধারিত হ'য়েছে। আধুনিক বাক্‌তত্ত্বের বিচারের সাহায্যে, সংস্কৃত ব্যাকরণের বা অন্য ভাষার ব্যাকরণের তথাকথিত নিয়ম-বহির্ভূত নানা ব্যাপারের একটা কারণ-নির্দেশও সম্ভবপর হ'য়েছে। এইভাবে প্রাচীন বৈয়াকরণের বস্তুনিষ্ঠ পরিপূর্ণ আলোচনা এক দিকে, আর-এক দিকে আধুনিক তুলনাত্মক বাক্‌তত্ত্বের সাহায্যে আভ্যন্তর কারণনির্দেশ, তাতে অনিয়মেরও নিয়ম পাওয়া যায়, এই দুইয়ের সঙ্গেই একটু পরিচিত হবার সুযোগ আমার এই ছাত্রাবস্থায় হ'য়েছিল। এম্-এ পাস করবার পর এল' 'অন্নচিন্তা চমৎকারা'। সৌভাগ্যবশতঃ ভাল কাজও পেয়ে গেলাম— ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ ভবনের ইংরিজী বিভাগে প্রাচীন ইংরিজী সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্ব পড়ানো হ'ল আমার ব্যবসায়। পড়াতে গেলেই লোকে শিখতে আরম্ভ ক'রে, আমারও তাই হ'ল। ইংরিজীর সঙ্গে সঙ্গে নিবিষ্টচিত্তে প'ড়তে লাগলুম অন্যান্য ভাষা। ক্রমে ভারতের আধুনিক ভাষা আর অন্যান্য ভাষা, তা ছাড়া সংস্কৃত আর প্রাকৃতের ভাষাতত্ত্ব, আর ভারতের অনার্য ভাষা প্রভৃতির মোহে প'ড়ে গেলুম।

এই কাজে নেমেই প্রথমেই জানবার আগ্রহ হ'ল— আমাদের দেশের পূর্বাচার্য্যেরা ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধে কী কাজ ক'রেছেন। সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণিনি ও তাঁর পূর্বগামী ও অনুগামীরা যা ক'রেছেন তা তো আছেই। তা ছাড়া আধুনিক তুলনাত্মক গবেষণাও আমাদের সামনে আছে। কিন্তু আধুনিক ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে, যেটি আমার প্রধান উপজীব্য ক'রে নিতে চাই সে বিষয়ে, কী কাজ হ'য়েছে? পুরোনো বাঙ্‌লা ব্যাকরণ খুঁজতে লাগ্‌লুম। হ্যালহেডের বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, যেটি ১৭৭৮ সালে ছাপা, মানোএল্ দা-আস্‌সুম্পসামের পর্তুগীজ ভাষায় লেখা বাঙ্‌লা ব্যাকরণ ১৭৪৩ সালে লিসবনে ছাপা, রামমোহনের ব্যাকরণ ১৮৩৩ সালে ছাপা, কেরী সাহেবের বই, শ্যামাচরণ সরকারের লেখা বিরাট্ বাঙ্‌লা ব্যাকরণ, চিন্তামণি গাঙ্গুলি আর পরে নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ এঁদের লেখা বাঙ্‌লা ব্যাকরণ— এ-সব দেখলুম। কিন্তু মনে হ'ল রামমোহন আর নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ ছাড়া আর কেউ বাঙ্‌লা ভাষার ভিতরকার প্রকৃতি ধ'রতে পারেন নি, বা সেদিকে নজর দেন নি।

এমন সময় পেয়ে গেলুম রবীন্দ্রনাথের বাঙ্‌লা-ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ 'শব্দতত্ত্ব'। এগুলির মধ্যে একটি জিনিস দেখে মনে মনে কবির সমীক্ষাশক্তির শত-সহস্র সাধুবাদ দিতে লাগলুম।

এমন ক'রে তাঁর পূর্বে বাঙ্‌লা ভাষার বৈশিষ্ট্য আর কারও তো চোখে পড়ে নি। আর বৈশিষ্ট্যগুলি শুধু যে ধ'রেছেন তা নয়, বৈশিষ্ট্যগুলি কেমনভাবে কাজ ক'রছে সে বিষয়ে যেন তাঁর একটা দিব্যদৃষ্টি এসে গিয়েছে। ইউরোপের যে-সব ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত, সাধারণ মানুষের ভাষা নিয়ে কাজ ক'রেছেন, তার মধ্যেকার পদ্ধতি তো আমার জন্যে তৈরিই ছিল। তা ছাড়া, সহজ মোটা কথা যা আমরা সকলেই জানি, তার ভিতরে কী সূক্ষ্ম ধ্বনি-বিষয়ক বা ভাব-বিষয়ক রীতি কাজ ক'রছে, সেটা আমার কাছে এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাক্‌ছিল, তার কতকগুলি বিষয়ে ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া গেল। এই জন্যেই আমার মনে হ'ল যে, বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্বের বা বাঙ্‌লাভাষার ইতিহাসের আলোচকদের মধ্যে একজন পাইওনিয়র বা অগ্রণী পথিকৃৎ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বারো বৎসরের পরিশ্রমের পরে যখন আমার বড় বই *Origin and Development of the Bengali Language* ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় প্রকাশিত হ'ল, তার ভূমিকায় এই কথা লিখেছিলুম—

The first Bengali with a scientific insight to attack the problems of the language was the poet Rabindranath Tagore; and it is flattering for the votaries of Philology to find in one who is the greatest writer in the language, and a great poet and seer for all time, a keen philologist as well, distinguished alike by an assiduous enquiry into the facts of the language and by a scholary appreciation of the methods and findings of the modern Western philologist. The work of Rabindranath is in the shape of a few essays (now collected in one volume) on Bengali phonetics, Bengali onomatopoetics, and on the Bengali noun, and on other topics, the earliest of which appeared in the early nineties, and some fresh papers appeared only several years ago. The papers may be said to have shown to the Bengali enquiring into the problems of his language the proper lines of approaching them.

যাঁরা কেবল ব্যাকরণ নিয়ে চর্চা করেন, অনেক সময় তাঁরা 'সাহিত্য' বোঝেন না। 'সাহিত্য' শব্দের ব্যাখ্যা কেউ কেউ ক'রেছেন— 'যা কেবল ব্যাকরণের সহিত পড়া যায়'। নিছক ব্যাকরণ-কারকে সংস্কৃতে 'শাব্দিক' বলা হয়— শব্দ আর শব্দের বাহ্যরূপ নিয়েই যাঁদের কারবার। 'শাব্দিক' আর 'রসিক' এ দু'জনের মধ্যে চিরন্তন বিবাদ। খ্রীষ্টীয় ১৬৫০ সালের দিকে তামিল দেশের পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দীক্ষিত তাঁর 'শিবলীলার্ণব' নামে সংস্কৃত কাব্যের প্রথম সর্গে শাব্দিক আর তার্কিকদের বেশ একহাত নিয়েছেন। তাঁর সংস্কৃত শ্লোকগুলি বেশ উপভোগ্য। একটি শ্লোকে তিনি ব'লছেন—

স্তোতুং প্রবৃত্তা শ্রুতির্‌ ঈশ্বরং হি
ন শাব্দিকং প্রাহ, ন তার্কিকং বা।
ব্রূতে তু তাবৎ কবিরিত্যভীক্ষ্ণং,
কাষ্ঠা পরা সা কবিতা ততো নঃ॥

"শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরের স্তব ক'রতে প্রবৃত্ত হ'য়ে তাঁকে কখনও শাব্দিকও বলে নি, তার্কিকও বলে নি, সর্বদা তাঁকে 'কবি' বলেই বর্ণনা ক'রেছে। এইজন্য আমাদের পক্ষে কবিতাই হ'চ্ছে পরা কাষ্ঠা।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক অদ্ভুত সমন্বয় দেখতে পাই— তিনি শাব্দিকও বটেন, কবিও বটেন। শব্দ আর অর্থ, উচ্চারিত ধ্বনি আর তার ভিতরের ব্যঞ্জনা, এই দুইয়ের সম্বন্ধেই কবির মনে স্পর্শ-কাতরতা ছিল। ভাষার নাড়ীনক্ষত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু সে নাড়ীনক্ষত্রের জ্ঞানটাই চরম বস্তু নয়, সে-কথাটা তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার দ্বারা দেখিয়ে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের কবি আর সমালোচক রাজশেখর, যিনি খ্রীষ্টীয় নবম শতকের লোক ছিলেন, তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'য় ব'লে গিয়েছেন, সাহিত্য-রচয়িতার প্রতিভা দুই প্রকারের,— এক, 'কারয়িত্রী'— যা সাহিত্য সৃষ্টি করে ; আর দুই, 'ভাবয়িত্রী—' যা বিচার ক'রে সমালোচনা ক'রে উপভোগ করে। এই উভয়বিধ প্রতিভাই যে রবীন্দ্রনাথের ছিল, তা বলা বাহুল্য। তা ছাড়া, শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণিয়ার যোগ্য বৈজ্ঞানিক মনোভাবও তাঁর ছিল। যাঁরা কেবল ব্যাকরণের ছোব্‌ড়া নিয়েই কারবার করেন, তাঁরা ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আর প্রয়োগের আইন-কানুন নিয়েই মাতামাতি করেন, লেখকদের ধমকও দেন। আমাদের দেশে বহুকাল ধ'রে এই ধারণা চ'লে আস্‌ছিল যে বাঙ্‌লা ভাষা আর বাঙ্‌লা ব্যাকরণের নিকষ হ'চ্ছে সংস্কৃত ভাষা আর সংস্কৃত ব্যাকরণ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজকল্প দু'জন বিশিষ্ট পণ্ডিত বাঙ্‌লাদেশে দেখা দিয়েছিলেন, যাঁরা বাঙ্‌লাভাষার বিশিষ্ট প্রকৃতি ধরবার চেষ্টা ক'রেছিলেন আর জোর গলায় ব'লেছিলেন যে, সংস্কৃতের সব নিয়ম বাংলায় চ'লবে না, বাঙ্‌লার নিজস্ব স্বরূপটিকে ধ'রে দিতে হবে, যেটি বাঙ্‌লাকে চিরকাল ধ'রে সংস্কৃতের সঙ্গে এক দড়িতে বেঁধে রাখ্‌বে না। এই দুইজন মনীষী হ'চ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এঁদের পথেরই পথিক ছিলেন, আর মনে হয় এঁদের চেয়ে আগেই এদিকে তাঁর দৃষ্টি প'ড়েছিল। ভাষাতাত্ত্বিক, শাব্দিক বা ব্যাকরণিয়া ঢঙের বিচার বা মন্তব্য আর নিষ্কর্ষ বা সমাধান তাঁর প্রথমদিকের কতকগুলি বাঙ্‌লা প্রবন্ধে পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধগুলির পত্তন হয় ১৮৮৫ সালে। আর এই প্রবন্ধমালার শেষ প্রবন্ধ বার হয় ১৯৩৮ সালে, যখন বাঙ্‌লা ভাষা সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' নামে সংকলিত হ'য়ে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে কয়েক বছর ধ'রে মাঝে-মাঝে প্রবন্ধে বাঙ্‌লা ভাষার কয়েকটী সমস্যা সমাধানের চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ ক'রেছিলেন। সেই প্রবন্ধগুলির অধিকাংশ পরে 'শব্দতত্ত্ব' নামে বা'র হয় ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে। এর পরেও কতকগুলি প্রবন্ধ প্রবাসী ও অন্যত্র বেরোতে থাকে, আর তা ছাড়া বাঙ্‌লা ছন্দের উপর তিনি কতকগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় বা'র করেন। রবীন্দ্রনাথের অন্য সব রচনার তুলনায় এই প্রবন্ধগুলি সাকল্যে খুব একটা বড় ব্যাপার নয়। কিন্তু সেগুলির মধ্যে বাঙ্‌লা ভাষার প্রকৃতি, আর বাঙ্‌লা ভাষার রীতি আর পদ্ধতি, আর উচ্চারণ-গত, নাম আর ক্রিয়ার রূপ-গত, আর শব্দ-গত বৈশিষ্ট্য তিনি আবিষ্কার করেন আর ধ'রে দিয়ে যান। তাঁর আগে এগুলিকে এভাবে কেউ লক্ষ্য করেন নি। 'শব্দতত্ত্ব'-তে সংকলিত প্রবন্ধগুলিকে বাঙ্‌লা ভাষাতত্ত্ব আলোচনায় এক হিসাবে প্রথম বৈজ্ঞানিক রচনা বলা যায়। এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে যে-কোনো ভাষার চারটি মুখ্য বিভাগের সবগুলির সম্বন্ধেই কিছু না কিছু নূতন কথা আছে। এই চারটি বিভাগ হ'ল— (১) উচ্চারণ বানান-ছন্দ— ধ্বনিতত্ত্ব ; (২) সুপ্‌-তিঙ-কৃৎ-তদ্ধিত-- রূপতত্ত্ব আর শব্দসাধন ; (৩) বাক্যে শব্দের স্থান বা

ক্রম— বাক্যরীতি ; আর এ ছাড়া আছে (৪) শব্দের ইতিহাস আর শব্দের অর্থ নিয়ে বিচার। বাঙ্‌লা উচ্চারণ বিষয়ক প্রবন্ধে আলোচনা আছে, ক'লকাতার চল্‌তি বাঙ্‌লা -টা-টো-টে নিয়ে— যেমন সাধু-ভাষার -টা প্রত্যয়ের চলিত ভাষায় তিনটি রূপ— সাধুভাষায় 'একটা, দুইটা, তিনটা', কিন্তু চলিতভাষায় 'একটা, দুটো, তিনটে' ; বাঙ্‌লার কতকগুলি স্বরধ্বনির উচ্চারণ, আর তা ছাড়া বাঙ্‌লা আর আধুনিক ভারতীয় ভাষার ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রকৃতি নিয়ে বিচার,— এগুলি একেবারে নূতন ঢঙের আলোচনা। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্‌লা ধ্বন্যাত্মক শব্দের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করেন ১৩১৪ সালে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত 'ধ্বনিবিচার' নামে এক উপাদেয় বহু তথ্য ও বিচারে পূর্ণ প্রবন্ধে। 'বাংলা শব্দদ্বৈত', 'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত', 'সম্বন্ধে -কার' আর 'বাংলা বহুবচন'— এই কয়টি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা রূপতত্ত্ব আর শব্দসাধনের ঐতিহাসিক আলোচনা করবার চেষ্টা করেন। 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে আবার বাঙ্‌লা ভাষার শব্দের দ্যোতনা নিয়ে তিনি কতকগুলি মূল্যবান্ কথা ব'লেছেন।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরকালে ১৯৩৮ সালে রচিত আর প্রকাশিত তাঁর 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইয়ে বাঙ্‌লা ভাষার প্রকৃতি আর রীতি সম্বন্ধে আরও কতকগুলি ভাববার কথা ব'লে গিয়েছেন। এই বইয়ে তিনি প্রথমেই ভূমিকাতে তাঁর ভাষাতত্ত্ব আলোচনার প্রেরণা সম্বন্ধে আমাদের ব'ল্‌ছেন যে, 'মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে, তারি ব্যাখ্যা ক'রে এই বইটি আরম্ভ ক'রেছি।' দেখা যাচ্ছে, এইখানে রবীন্দ্রনাথের মনে আছে— ভাষা-সম্বন্ধে রহস্যবোধ, আর সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার ব্যাখ্যার চেষ্টা। এই দুইটি জিনিস মিলে, এক দিকে তাঁর রস-রচনা আর অন্য দিকে তাঁর ভাষাঘটিত-রচনা, এই দুই-ই আমাদের মনে একটা কৌতূহল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে আত্মতৃপ্তি এনে দেয়। সত্যকার যিনি জ্ঞানী, তাঁর মনের মধ্যে একটা নম্রতা একটা বিনয়বোধ থাকে। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা ভাষার বিরাট্ ইতিহাস লিখতে বসেন নি, যদি ব'সতেন তা-হ'লে হয়-তো সে ইতিহাস বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ হ'ত, আর মুষ্টিমেয় ভাষাবিজ্ঞানী তাঁদের সংকীর্ণ গোষ্ঠীতে ব'সে তা নিয়ে কচ্চায়ন ক'রে আনন্দ পেতেন ; কিন্তু বিশ্বমানব রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি থেকে তা-হ'লে হয়-তো বঞ্চিত হ'ত। সেটা মানুষের পক্ষে এক পরম দুর্ভাগ্য হ'ত। কিন্তু বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ ইতিহাস না লিখলেও, তিনি প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক অনুপ্রেরণা যুগিয়ে গিয়েছেন এই প্রবন্ধগুলিতে। রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর নিজের সম্বন্ধে আক্ষেপ ক'রেই ব'লেছেন, তিনি ভাষা-সম্পর্কে 'ভূগোল-বিজ্ঞানী' ন'ন, যেহেতু তিনি ভাষা-বিজ্ঞানীর মতো এ বিষয়ে তলিয়ে অনুশীলন করেন নি। তিনি নিজের সম্বন্ধে ব'লছেন, 'আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী।...বিজ্ঞানের রাজ্যে স্থায়ী বাসিন্দাদের মতো সঞ্চয় জমা হয় নি ভাণ্ডারে, রাস্তায় বাউলদের মতো খুশি হ'য়ে ফিরেছি, খবরের ঝুলিটাতে দিন-ভিক্ষে যা জুটেছে তার সঙ্গে দিয়েছি আমার খুশির ভাষা মিলিয়ে।...জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ ছিল ব'লেই বেঁচে গেছি, বিশেষ সাধনা না থাকলেও।' এই যে 'জ্ঞানের দেশে ভ্রমণের শখ', এটা তাঁর মনে ছিল— সেইটাই মস্ত কথা, এবং সে শখটা তিনি অনেকের মনে জাগিয়ে তুল্‌তে পেরেছিলেন। কাজেই, এক দিকে ভাষার

বাহ্যরূপ আর তার ইতিহাস, আর অন্য দিকে ভাষার আভ্যন্তর রূপ আর তার রসপরিপূর্ণ প্রয়োগ, এই দুইয়েরই অপূর্ব সমাবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথকে এক কথায় 'বাকৃপতি' ব'ল্‌তে হয়।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আর প্রবন্ধে নিহিত তাঁর কারয়িত্রী আর ভাবয়িত্রী প্রতিভার অনেক কিছু কথা চিরকালের জন্য স্থায়ী হ'য়ে রইল। কিন্তু দৈনন্দিন আলাপে তাঁর যে পরিহাসোজ্জ্বল নানা মন্তব্য আমরা শুনতে পেতুম, তা থেকে ভাষা আর ভাষাতত্ত্ব বাদ পড়ে নি, সেগুলির তো সংগ্রহ হ'ল না। মনে হয়, যদি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পাশে যেমন 'শ্রী-ম' ব'সে থেকে নিঃশব্দে তাঁর বচনামৃত লিপিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন, গান্ধীজীর নানা উপদেশ যেমন দিনের পর দিন সংগৃহীত হ'য়ে গিয়েছে— সেই রকমটা যদি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও হ'ত, আমরা তা-হ'লে তাঁর বিরাট্‌ ব্যক্তিত্বের একটা কত বড় দিক পেতে পারতুম। Rabindranath the Conversationalist 'সদালাপী রবীন্দ্রনাথ'কে চিরতরে তা-হ'লে ধ'রে রাখা যেত। তাঁর ভাষা আর ভাবকে একাধারে, দ্রাবিড়-দেশে প্রচলিত একটি সংস্কৃত সমস্তপদ দিয়ে বলা যায়, 'সুগুণ-বিলাস'। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্যে-মধ্যে বাঙ্‌লা ভাষার অনেক সমস্যা এবং অপূর্ণতা নিয়েও তাঁর স্বভাব-রসিক মন্তব্যের সঙ্গে, নিজের মত তিনি প্রকট ক'রে গিয়েছেন। আজকাল হচ্ছে সাম্যের যুগ। ইংরিজী আর ফরাসী ভাষায় এক you আর vous, মধ্যম-পুরুষে সকলের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যদিও সেকেলে মতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা জানাবার জন্য ঈশ্বরের প্রতি thou শব্দের প্রয়োগ ইংরিজীতে পাওয়া যায়, এবং ফরাসীতে যেখানে তুই-তোকারির সম্বন্ধ সেখানে tu, toi রূপের প্রয়োগ হয়। কিন্তু you আর vous-এর একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। অতি সম্মানিত ব্যক্তি সম্বন্ধেও you, অতি দীন দরিদ্রের সম্বন্ধেও you। বাঙ্‌লা 'তুই তুমি আপনি'— এ নিয়ে মাঝে-মাঝে বিপদ হয়। 'তুমি' ব'ল্‌বো কি 'আপনি' বল্‌বো এটা যখন ঠিক ক'রতে না পারি, তখন আমরা কর্মবাচ্য বা ভাববাচ্যের আশ্রয় নি— 'তুমি কোথায় থাকো' আর 'আপনি কোথায় থাকেন'— এ দুইয়ের টানাটানির মধ্যে প'ড়লে বলি, 'কোথায় থাকা হয়', 'কী করা হয়'। বাঙ্‌লায় যদি ইংরিজী ও ফরাসীর মতন মধ্যম-পুরুষের জন্য একটা সর্বনামই চলে, সেটা কোন্‌টা হওয়া উচিত? অনেক তর্কের পর ঠিক হ'ল, 'আপনি'-টাই গ্রহণযোগ্য, 'তুমি' নয়, 'তুই' তো নয়ই। যদিও ঘরের লোকেদের জন্য 'তুমি'টা 'তুই'টাও চ'ল্‌তে পারে। ইংরিজীতে Mrs. আর Miss, এ দুইয়ের পার্থক্য বাঙ্‌লায় মেয়েদের সম্বন্ধে কী ক'রে জানানো যায়? Miss অর্থে তো 'কুমারী' চলছে, আর Mrs. অর্থে 'শ্রীমতী' চ'লতে পারে। হিন্দী মারাঠী গুজরাটীতে 'সৌভাগ্যবতী' চলে, 'সৌভাগ্যবতী' কি বাঙ্‌লায় আমদানি করা যায়? কোনও মহিলাকে উদ্দেশ ক'রে ব'ল্‌তে গেলে, 'মিস্‌ অমুক, মিসেস্‌ অমুক'-এর জায়গায় বাঙ্‌লায় কী ব'লবো? ইংরিজীতে সম্মান দেখিয়ে Madam চলে। রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের মত চাইলেন। ম্যাডামের জায়গায় 'ভদ্রে' ব'লবো? কেউ ব'ললেন, 'মালক্ষ্মী' কথাটি আবার জীইয়ে তুল্‌লে চলে না? রবীন্দ্রনাথ ব'ললেন, 'ভদ্রারা এ বিষয়ে কী বলেন?' ইংরিজীতে এক-অক্ষর ধাতু ask, পুরোনো বাঙ্‌লায় 'পুছ্‌', হিন্দীতে 'পুছ্‌' সংস্কৃত 'পৃচ্ছ' বা 'প্রচ্ছ' থেকে এসেছে। কিন্তু বাঙ্‌লায় বলি 'জিজ্ঞাসা করা', আর তার নানা বিকার 'জিজ্ঞেস করা', 'জিগেস

করা', 'জিগানো', ইত্যাদি। তিনি ব'ললেন, 'পুছ্, বোধহয় আবার ফিরে আসতে চাইবে না— কিন্তু 'শুধানো' এখনও বোধহয় চলে, আর 'শুধানো'কে এখনও ফিরিয়ে আনা চলে। 'শুধানো' শব্দটী অনেকেরই মনে লাগে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরে 'প্রবাসী'-তে 'শুধানো' ব্যবহার ক'রতে আরম্ভ করেন। এখন দেখা যাচ্ছে, দুই-একজন নামকরা আধুনিক সাহিত্যিক, যেমন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, 'শুধানো' প্রয়োগ ক'রছেন। বাঙ্‌লায় 'মুখ' বললে ইংরিজী face আর mouth দুই-ই বুঝি। 'মুখ'-এর বিশুদ্ধ (বা তদ্ভব) বাঙ্‌লা রূপ 'মু' 'মুহ' অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়েছে ; mouth-এর জন্য 'মুখবিবর'— এ দাঁতভাঙা শব্দ লোকে নেবে না। আমি ব'ললুম, বীরভূমে 'বেঁত' বা 'ব্যাঁত' প্রচলিত আছে, শব্দটা এসেছে 'ব্যাত্ত' থেকে, প্রাকৃতে 'বত্ত' তারপর 'বন্ত', তা থেকে পুরোনো বাঙ্‌লায় 'বাঁত', সিন্ধী ভাষায় এ শব্দ পাওয়া যায়, 'ৱাত্তু'। এইরকম অনেক শব্দ আমাদের লোপ পেয়েছে। এরকম স্থানে কী করা যায় ? তাঁর দৈনন্দিন আলাপের মাঝে এইরকম অনেক সমস্যার আলোচনা হ'ত, অনেক সমস্যার সমাধানও তিনি দিতেন সুন্দরভাবে। বাঙ্‌লা পরিভাষা-শব্দ সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা ক'রেছেন, এবং কতকগুলি শব্দের সুন্দর পরিভাষা তিনি তৈরি ক'রে দিয়েছেন, যেমন, compulsory আর optional— এদের বাঙ্‌লা তিনি করেছেন 'আবশ্যিক' আর 'ঐচ্ছিক'। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' এইরকম তাঁর প্রস্তাবিত অনেক পরিভাষা-শব্দ বেরিয়েছিল। একবার বিশ্বভারতীর নিয়মাবলী তৈরির সময়ে প্রশ্ন উঠল— advisory council of senior members-এর জন্য কী বাঙ্‌লা বা সংস্কৃত পরিভাষা করা যায় ? রবীন্দ্রনাথ একটু ভেবে ব'ললেন, যদি বলি 'সুমন্ত্রসভা', তা-হ'লে কেমন হয় ? আমরা তো আনন্দে প্রায় আত্মহারা হ'লুম। কী সুন্দর শব্দটি তিনি আমাদের ব'ললেন ! আর এর পিছনে আছে রামায়ণের বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী সুমন্ত্রের অতন্দ্র সেবা আর সৎ-পরামর্শের কথা ! এইভাবে রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনার মধ্যেও তাঁর 'বাক্‌পতি'-রূপের অনেক বিকাশ আমরা লক্ষ্য ক'রেছি— তার সামান্যই স্থায়ী ভাবে ধ'রে রাখা হ'য়েছে।

কিন্তু যা তিনি দিয়ে গিয়েছেন তাতেই আমরা ধন্য। তাঁর জন্মের এই শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের সময় বিনম্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তিনি যে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন, সেই মহা গৌরবের অধিকারী হ'তে পেরেছি ব'লে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি ॥

আধুনিক বিশ্বকবির আবির্ভাব

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার

গ্রীক সমালোচকদের প্রভাবে আমরা মহাকবি বলতে epic poet বা মহাকাব্যরচয়িতা কবিকে বুঝি। কিন্তু এ কথা এখন মানতে হবে যে মহাকাব্যের নির্দিষ্ট গঠন ও লক্ষণকে অতিক্রম করেও মহৎ কাব্য রচনা করা সম্ভব, যা মহাকাব্যেরই মত মানুষের জীবনের কোনো-একটা যুগকে বা বিবর্তনস্তরকে আয়ত্ত ও প্রকাশিত করতে সক্ষম। এই ধরণের কবিকেই এখন আমরা বলি বিশ্বকবি। কোনো কবিকে এই আখ্যা দিতে হলে এই কথা প্রমাণ করতে হবে যে তিনি শুধু তাঁর নিজের ভাষা ও সাহিত্যের নয়, সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্যবিবর্তনের এমন একটি যুগসমস্যার সমাধান করেছেন যা আর-কোনো কবি করেন নি, এবং তার ফলে বিশ্বসাহিত্য-সম্ভাবনাকে তিনি স্থায়ীভাবে কিছুদূর অগ্রসর করে দিয়েছেন।

আমরা রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক যুগের বিশ্বকবির আসনে বসাতে চাইছি। তাহলে খুঁজে বার করতে হবে সাহিত্যের সংসারে তাঁর একেবারে নিজস্ব ও নূতন দানটি কি। বুঝে নিতে হবে তাঁর আগেকার বিশ্বকবিদের প্রত্যেকের দানকে কোনো-একটা বিবর্তনধারার মধ্যে এক-একটি সার্থক বিশ্রামভূমি হিসাবে চিনে নেওয়া যায় কি না। দেখতে হবে এই যাত্রাপথে ভারতীয় সাহিত্য-পথিকদের কোনো বিশিষ্ট গতিপথ ছিল কি না। এবং তার পরে দেখতে হবে এই ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় দু রকম ধারাতেই রবীন্দ্রনাথ কোনো নূতন প্রেরণা দিতে পেরেছেন কি না।

সমালোচনার প্রচলিত রীতি যাই হোক, অতিসরলীকরণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে দেখা যাবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক-একটি বিবর্তনস্তরকে চিহ্নিত করবার জন্যে একাধিক কবিকে একসঙ্গে যুগপ্রবর্তক বা বিশ্বকবির গৌরব দিতে হবে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যের যুগগুলিকে নীচে সাজিয়ে দেওয়া হল :

১ গ্রীক যুগ ॥ কবি : হোমর, এস্কিলাস্, সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস্। প্রথম দুই কবির কাজ ইন্দ্রিয়বোধের প্রত্যক্ষ জগতের ঐশ্বর্য উদ্‌ঘাটন ; যে-সব মানুষরা নিজেদের বীর্যবলে দেবতার মত এই ঐশ্বর্য ভোগ করতে পেরেছে তাদের মাহাত্ম্যগান। হোমর গেয়েছেন এই জগতের স্তুতিগান, আর এস্কিলাস করেছেন এর সংঘাত ও সমস্যার আবরণমোচন।

এস্কিলাসে বিদ্রোহের মধ্যেও যে আশাবাদ রয়েছে, সফোক্লিসে তা ভেঙে পড়েছে। ঐ একই জগতে তিনি দেখছেন নিয়তির তাড়নায় অপ্রতিরোধ্য বিভীষিকার সঞ্চার। মানসিক বীর্যের দ্বারা এই জগতের প্রতিমা ও প্রবেগগুলিকেও বশীভূত ও শিল্পসুষমায় মণ্ডিত ক'রে শান্ত contemplation বা ধ্যানের দ্বারা তার সৌন্দর্য-সম্ভোগই সফোক্লিসের শিল্পকৃতিত্ব।

হোমর-এস্কিলাসকে তাঁদের সম্ভোগপ্রবণতার জন্য বলা হয়ে থাকে ডায়োনিসীয়ান কবি। সফোক্লিসকে বলা যেতে পারে এপোলোনীয়ান। এই দু রকমের কাব্যিক সমাধানে গ্রীক যুগের শেষ।

২ রোমান যুগ॥ কবি: প্রধানতঃ ভার্জিল। তা ছাড়া ওভিড্, হোরেস। মহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষা-আদর্শ-রূপায়ণচেষ্টার মধ্য দিয়ে জীবনসম্ভোগের কবি ভার্জিল। তিনি দেখিয়েছেন ঈনিয়সের মধ্য দিয়ে অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ সত্ত্বেও মহৎ উদ্দেশ্যসিদ্ধির মাহাত্ম্য। জীবনে বীরত্ব উদারতা মহত্ত্ব ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিকশিত করে তোলার আনন্দ। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শান্ত সংযত জীবনযাপনের সুখ।

সুসভ্য রোম্যানদের সামাজিক জীবনে নানা বিচিত্র সাংস্কৃতিক সম্পদের রসাস্বাদন ও চতুর সম্ভোগ, ঐ জীবন সম্বন্ধে বিচক্ষণতা তাঁদের কাব্যে ফুটিয়ে তুলেছেন ওভিড্ হোরেস প্রভৃতি কবিরা। এই ধরণের সাংস্কৃতিক কাব্য পরে অনেক কবিকে প্রভাবিত করেছে।

৩ ইটালীয় রেনেসাঁস॥ কবি: দান্তে। দীর্ঘকালস্থায়ী মধ্যযুগের অন্ধকারে এক দিকে চলছিল ভোগতৃষ্ণার রাসলীলা, অন্য দিকে কঠোর ক্রীশ্চান কৃচ্ছ্রসাধন, প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা জীবনের সব-কিছু সাধারণ ঐশ্বর্য ও উদ্যমকে অস্বীকার করে তাকে সংশোধিত করবার চেষ্টা। এই দুই চরমপন্থার মাঝামাঝি একটা সমাধান খুঁজেছিল মধ্যযুগীয় রোমান্স্-সাহিত্য, কিন্তু তাকে বলা যায় রোমান আদর্শবাদেরই একটা অস্থায়ী বিচিত্রণ। এই জগৎ থেকে কেমন করে মুক্তি পাওয়া যায় হৃদয়ের গুহাদ্বার দিয়ে তাই দেখালেন দান্তে। ক্রীশ্চান প্রেমের শুদ্ধতম অনুভূতিই তাঁর হৃদয়দ্বার খোলার চাবি। সংসারকে তিনি দেখলেন নরকের হতাশাকবলিত। বিশ্ব তাকে ত্যাগ করলেও তার প্রতি উছলে উঠল তাঁর শিশুসরল (দান্তের বিখ্যাত innocence) হৃদয়ের করুণা। মানুষের সভ্যতার সমস্যাজটিল সংস্কৃতির ভালো-মন্দের অভিজ্ঞতা দান্তের হয়েছিল। শুধু আদর্শবাদে সেই জীবনের সুখসম্ভোগের আর উপায় নেই, এখন যেতে হবে ক্রীশ্চান সাধনার পথে জগৎ থেকে ঊর্ধ্বে, প্রেমের আগুনে হৃদয়কে গলিয়ে শোধিত করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে পেতে হবে চিরন্তন জীবনের ঐশ্বর্য, আর নিম্নতর এই জগৎকে দিতে হবে করুণা। এই হল দান্তের সমাধান। ইয়োরোপ হিউম্যানিজ্‌ম বা মানবতাবাদকে আশ্রয় করেই তার সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলছে। সেই তার সাধনা। মানবকে অতিক্রম করে অতিমানবিক বা জগৎকে পার হয়ে অতিজাগতিক কোনো সত্যের সম্ভাবনা কল্পনা করতেও তার স্বভাব আহত বোধ করে। ক্রীশ্চানিটিও আসলে তার স্বভাববিরুদ্ধ, তার করুণাটা ইয়োরোপ ভালোবাসে, কিন্তু প্রেম আস্পৃহার পথে নিষ্ক্রান্তিকে নয়। দান্তেই প্রথম ইয়োরোপীয় বিশ্বকবি যিনি জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে আঙুল দেখালেন অতিজাগতিকের দিকে। ইয়োরোপ তাঁর করুণাস্নাত ও সত্যদৃষ্টিধৌত *Inferno*র জগৎকে গ্রহণ করল, প্রশংসা করল, কিন্তু *Paradiso*কে নয়। কিন্তু তাঁর প্রেম ও আস্পৃহা অনেক যুগ পেরিয়ে গিয়ে কাজ করেছে শেলির মধ্যে।

৪ ইংলণ্ডের রেনেসাঁস॥ কবি: শেক্‌স্‌পীয়র; মিল্‌টন।

ভালোবাসার পথে দান্তে চেয়েছিলেন বেরিয়ে যেতে জগৎ থেকে। এই বর্জনপ্রয়াসের

প্রতিপ্রয়াস হিসাবেই যেন জীবনপ্রেমিক শেক্স্পীয়র দেখালেন অপক্ষপাত দেবতাসুলভ প্রেমের মধ্য দিয়ে জীবনের একেবারে গভীরতম কেন্দ্রে যাওয়ার কৌশল। সেখান থেকে জীবনের প্রতি শুধু করুণা নয়, অনুভব করা যায় একাত্মতা। এবং তখন দেখা যায় শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও, চরম ট্র্যাজিডি সত্ত্বেও জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নিপুণ রহস্যময় সৃষ্টির মাহাত্ম্য। এই সৃষ্টির বিভিন্ন রূপসৃষ্টির নমুনা দেখলেন শেক্স্পীয়র একেবারে সেই সৃষ্টির উৎসমুখ থেকে। জীবনের বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরার প্যাটার্ন ও জীবন্ত-চরিত্র-সমবায়ের গতিপথ তাঁর চেয়ে নিখুঁতভাবে আর কেউ লক্ষ্য করে নি। দান্তে যে সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন উপরে, শেক্স্পীয়র দেখালেন নিষ্কাম জীবনপ্রেমের দ্বারা তার অনেকটাই পাওয়া যায় এই জগতের মধ্য থেকেই। শেক্স্পীয়রের কৃতিত্বের তুলনা নেই এবং তাঁর সমাধান একটা চিরস্থায়ী নির্দেশ। কিন্তু তাঁর ট্র্যাজিডিগুলিই দেখাচ্ছে যে তাঁর আবিষ্কৃত জগতে জীবনের থেমে থাকা সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিকতার সৌন্দর্যবোধ করেও ঐ হ্যামলেট ম্যাকবেথ ওথেলো লীয়রের সমস্যার সত্যি কোনো সমাধান পেতেই হবে।

এলিজাবেথান যুগ শেষ হতেই এই একটা-কিছুর অভাববোধ আরো তীব্র হয়ে উঠল। রেনেসাঁসের সম্পদ্টুকু রক্ষা করেও জীবনকে তুলে ধরা যায় কিনা আরো এক ধাপ উঁচুতে। শুধু হৃদয় নয়, হৃদয়ের দ্বারা আলোকিত উচ্চতর মানসিকতার মধ্যে ঊর্ধ্বজগতের আলো, তুঙ্গতা (sublimity) ও ঐশ্বর্য লাভ করবার চেষ্টা করলেন মিল্টন। জগৎ থেকে প্রস্থান নয়, জগৎকে উন্নয়ন। ইংলণ্ডের রেনেসাঁসে মিল্টনের দান হল শেক্স্পীয়রের দানের পরিপূরক।

৫ রোম্যান্টিক যুগ॥ কবি : এক দিকে গ্যেটে ; অন্য দিকে ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ, শেলি, কীট্স্। ভিক্টর হিউগো যদিও বড় ও মৌলিক কবি, তবু তাঁকে আমরা বিশেষ কোনো স্থান এই তালিকায় দিলাম না।

মানবজীবনের আন্তর ইতিহাসই হচ্ছে এই যে বারবার মানুষ তার বিভিন্ন সহজাত চৈতন্যস্তর, কল্পনাবুদ্ধি অনুভূতিবোধ প্রভৃতি ক্ষমতা, আদর্শ সেন্টিমেন্ট কন্সিট্ (conceit) সৌন্দর্যরুচি শুভবোধ সত্যজ্ঞান প্রভৃতি আভ্যন্তর আত্মসৃষ্ট উপাদান ও শক্তির সঙ্গে প্রাণের আবেগ উদ্বেগ আশা আকাঙ্ক্ষা অভীপ্সা মিলিয়ে তৈরি করে তুলেছে তার এক-এক যুগের জগৎ। এক সুচতুর বিশেষ বিন্যাসে এই উপাদান ও শক্তিগুলির সমন্বয় করে এবং কোনো এক বা একাধিক প্রধান শক্তির অধীনে তাদের পরিচালনা সমর্পিত করে সে জীবন ভোগ করেছে যতদিন-না স্বাভাবিক নিয়মেই আবার এই শক্তিসাম্য বিচলিত হয়েছে। দেখা যায় কোনো-না-কোনো শক্তি বেড়ে উঠে অপর শক্তি বা উপাদানগুলিকে আহত করেছে এবং তার ফলে বেধেছে সংঘাত। জীবন ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে তার কেন্দ্র থেকে। তখন আবার দরকার হয়েছে এমন-কোনো সূত্র ও কৌশল যার দ্বারা জীবনের নূতন পরিধি টানা যায়, নূতন কেন্দ্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

রেনেসাঁসের সময় থেকেই বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানবিশ্লেষণের দ্রুত দিগ্বিজয়ের ফলে জীবনের অনেক উপাদান নষ্টশ্রী হৃতমূল্য হয়ে পড়তে লাগল। হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমল উদার অনুভূতিগুলি, মনের

উচ্চবিহার ও আদর্শসৃষ্টি ও দেবতার মত উন্নতভূমি থেকে জীবনধ্যান— এ সবই একে একে মুখ লুকোতে লাগল। বুদ্ধি সব সময়েই মূর্তিগুলিকে কেটে টুকরো করে। তা সে ধর্মতাত্ত্বিক (theological) বুদ্ধিই হোক, আর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিই হোক। দান্তের তত্ত্ববুদ্ধি তাঁকে মানুষের পূর্ণরূপ দেখতে দেয় নি, দেখতে দিয়েছিল তার মধ্যে প্রবৃত্তির লীলাকে। এই বিশ্লিষ্ট প্রবৃত্তিগুলোর জীবন্ত সঞ্চারেই তাঁর *Inferno* ভর্তি। তাঁর কল্পনা জীবনের স্পন্দন দিতে পেরেছে এই প্রবৃত্তিগুলোকে, কাজেই লোভ কাম ঈর্ষা দ্বেষ ইত্যাদির জগৎ শুধু মরা পুতুলের মিউজিয়ম, বা রূপকের ঠাণ্ডা বুদ্ধিগ্রাহ্যতায় শেষ হয়ে যায় নি। পূর্ণ মানুষটিকে দেখবার সুযোগ ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এক শেক্‌স্‌পীয়র। তিনি কোনো বুদ্ধিবাদের কবলে পড়েন নি। তিনি ছিলেন ডগ্‌মা-প্রুফ, তাঁর চিন্তা তাঁর মৌলিক অভিজ্ঞতার অধীনস্থ খতিয়ানের প্রজা। মিল্‌টন আত্মত্যাগের আত্মনিবেদনের দ্বারা নিজেকে যে স্তরে তুলেছিলেন সেখানে যুক্তিবাদকে আমল না দিলে বিশেষ অত্যাচার করতে পারে না। কিন্তু লোকজীবন ক্রমশই তাদের নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তাগিদে সরে দাঁড়াল শেক্‌স্‌পীয়র ও মিলটনের, এবং অবশ্য দান্তেরও, প্রদর্শিত পথ থেকে। বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে এই দ্বন্দ্ব। বারবার এই যুক্তিবাদের জয়ধ্বনি নীরব করে দিয়েছে কবিকণ্ঠকে। রোম্যান্টিক যুগের কাজ হল এমন কোনো নূতন সূত্র বা তত্ত্ব বা শক্তির, কিংবা তাদের নূতন কোনো সম্বন্ধবিন্যাসের আবিষ্কার যার দ্বারা আবার ঐ ভেঙে ছত্রাকার-হয়ে যাওয়া জীবনকে কোনো একটি মূল দ্যোতনা ও প্রবেগের মধ্যে গেঁথে নেওয়া যায়।

গ্যেটে যে সমাধান দিলেন তাকে বলা যায় বুদ্ধির (Reason) মুক্তি, বিশোধন, বিশ্বব্যাপী প্রসারণ।

গ্রীসে Reasonএর উর্ধ্বতম অর্থে নিশ্চয় একটা সাক্ষীচৈতন্যের মত তত্ত্ব বোঝাত, অন্ততঃ প্লেটোর রচনায়। গ্রীক সাহিত্যে যে চৈতন্য কাজ করেছে তারও ছিল কতকটা দেবোচিত অনাসক্ত দর্শনের ও ভোগের ক্ষমতা, কিন্তু তা সম্পূর্ণভাবে শান্ত অবলোকনের রাজ্যে উত্তীর্ণ নয়, এবং অপক্ষপাতিত্ব ও নির্বিকারত্বের গুণে পূর্ণ উন্মীলিতও নয়। যতই বলা হোক সফোক্লিস জীবনকে নিষ্পলক নেত্রে দেখেছিলেন ও তার সর্বাঙ্গীণ রূপই দেখেছিলেন, ('he saw life steadily and saw it whole') তবু স্বীকার করতেই হবে মানুষের জীবনের অনেক স্তর, অনেক দ্যোতনা ও সম্ভাবনাই তাঁর কাছে অজানা ছিল। মানুষের উন্নততর অভিজ্ঞতা ও আবেগগুলি তাঁর কাব্যে কোথায়? তাঁর সময়কার লোকগ্রাহ্য জগৎকে অদ্ভুত নৈপুণ্যে দেখবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। কালের পটেই নিয়তিতাড়িত মানুষের একটা রূপ তিনি দেখেছিলেন। কিন্তু এ কাল চিরকাল নয়। সর্বদেশকালের ধারণার কোনো চেষ্টাও সে যুগে সহজ ছিল না কবির পক্ষে; আর সব রকমের মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে বোঝবার মত বৃহৎ চৈতন্যও তখনকার পক্ষে অনেকটা ইতিহাসবিরুদ্ধ ঘটনা হত। এবং সেই চৈতন্য জীবনে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করবার সুযোগও দুর্লভ ছিল তখনকার সমাজগঠন ও জীবনব্যবস্থার সংকীর্ণতায়।

বিজ্ঞান নির্বিকার, যথাসম্ভব নিরবচ্ছিন্ন, ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ব্যাপক দৃষ্টিপাতের কৌশল এই প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের উপর প্রয়োগ করে যে চিন্তাবিপ্লব এনেছিল তাতে গ্রীকো-রোম্যান জগৎ-ধ্যানের কেন্দ্রে আর থাকা সম্ভব ছিল না। নিজের প্রতিভায়, এবং খানিকটা দার্শনিক স্পিনোজার প্রভাবে, গ্যেটে আয়ত্ত করলেন একটি বিস্তৃততর চৈতন্য যা শুধু বস্তুজগৎ নয়, প্রাণ ও মনেরও জীবন্ত তত্ত্বগুলিকে নিঃস্পৃহ দৃষ্টির পরিধির মধ্যে গ্রহণ করতে পারল। Universal mind বা বিশ্বচৈতন্যের একটা প্রথম সোপানে তিনি উত্তীর্ণ হলেন। সেখান থেকে দেবতার মত উদার অপক্ষপাত দৃষ্টিতেই তিনি দেখলেন ফরাসী বিদ্রোহের সময়কার সমস্যাসংকুল অসংখ্য নূতন তত্ত্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতে বিচিত্র ঐতিহাসিক মানুষের সামগ্রিক জীবনকে। মানুষের সভ্যতার সমস্ত প্রৈতিগুলিকে বুঝে নেবার চেষ্টা ও কতকগুলি ইউনিভার্স্যাল টাইপের মধ্যে এই প্রৈতি বা movementগুলির চরিত্ররূপ গঠন করে দেখানো— এই হল গ্যেটের কৃতিত্ব। প্রধান দুটি বিরুদ্ধ শক্তি রূপ নিয়েছে তাঁর ফাউস্ট্ ও মেফিস্টোফিলিসে। ফাউস্ট্ এক হিসাবে তখনকার ইয়োরোপের সমস্ত মানবিক অভীপ্সার প্রমূর্তন। মেফিস্টোফিলিস্ সেই মানুষেরই স্বার্থপর ভোগাকাঙ্ক্ষা, দানবিক আত্মপ্রসারণের চরিত্রণ। হ্বাগ্‌নার— সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানপিপাসা, হেলেন— সৌন্দর্যবাসনা, ইউফোরিয়ন—ঊর্ধ্বতর আদর্শের অভীপ্সা। বিভিন্ন বিকৃত ও রুগ্ন জীবনধারাগুলিও সীম্‌ফনিতে কর্ড ও ডিস্‌কর্ডের মত গ্রথিত হয়েছে তাঁর হ্বাল্‌পার্গিস্ নাইট্-এর দৃশ্যগুলিতে।

স্পিনোজা ছিলেন ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর দান প্রধানতঃ জ্ঞানযোগের সাধনা, মননকে আসক্তি থেকে মুক্ত করে তাকে অনন্ত দেশকালে উন্নীত করা, সেই জ্ঞানের আলোয় জগতের সত্যকার আস্বাদনীয় আনন্দবস্তুগুলিকে আবিষ্কার করা।

Love towards a thing eternal and infinite alone feeds the mind with a pleasure secure from all pain...The greatest good is the knowledge of the union which the mind has with the whole of nature.

স্পিনোজার মতে এই জানার দ্বারাই মন পায় তার মুক্তি এবং তখন জগতের সব কিছুকে, এমনকি passions বা প্রবৃত্তি ও বাসনাবেগগুলিকেও, দেখতে পায় অনন্ত দেশকালের পটে— *sub specie eternitatis*। এবং তখন সেই সামগ্রিক জ্ঞানের সাহায্যে সেগুলিকেও গ্রহণ ও আস্বাদন করতে পারে।

গীতার জ্ঞানতত্ত্ব সমস্ত অজ্ঞান বাসনা অভিলাষ আসক্তি মোহকে নিঃশেষে পরিহার করে আদিত্যবৎ জ্যোতিশ্চেতনালাভের তত্ত্ব। এই সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মানন্দলাভ সম্ভব। স্পিনোজা এই উচ্চতম জ্ঞান বা ব্রহ্মানন্দের কথা বলেছেন কি না বুঝতে পারি নি। কিন্তু গ্যেটে এক উচ্চবিস্তৃত চেতনার অধিকার লাভ করে বৈজ্ঞানিকদের তাঁদের নিজের খেলাতেই পরাস্ত করে যে জগৎকে পেয়েছিলেন ও প্রকাশিত করেছিলেন তা ব্রহ্মোপলব্ধির জগৎ নয়। তাঁর চেতনায় দেখি বৈজ্ঞানিক অনাসক্তির একটা প্রাথমিক ব্যাপক সিদ্ধি, উদারচৈতন্যের একটা ঐশ্বর্য যার মধ্যে বুদ্ধির সূক্ষ্ম তত্ত্ব-

বিশ্লেষণকে সম্পূর্ণ বশীভূত ক'রে, বিজ্ঞান ও কাব্যের দ্বন্দ্বকে পরাস্ত ক'রে, প্রেম ও জগতের সত্যতত্ত্ব-রসের আস্বাদন সম্ভব হয়েছে। তাই তাঁকে সংসারকে পরিত্যাগ ক'রে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতে হয় নি। কতকটা আত্মশোধনের দ্বারাই তিনি পেয়েছেন আপাততঃ ভোগের অধিকার।

গ্যেটে এই প্রকাশিত জগতেরই বস্তু-প্রাণ-মনকে তাঁর চেতনার দ্বারা আয়ত্ত ও উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলেন। এর অতীত কিছুকে নামিয়ে আনবার বা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেন নি। একটা অধ্যাত্মতত্ত্বের বুদ্ধিগত প্রতিফলন ছিল তাঁর চেতনায়। কিন্তু সেটা কার্যকর নয় তাঁর উপলব্ধিতে, বা জগতে। কিন্তু এই নূতন তত্ত্বকে পাবার ও প্রকাশিত করবার চেষ্টাই করেছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলি, কীট্‌স্‌। গ্যেটের মত চৈতন্য-সম্প্রসারণের পথ না ধরে তাঁরা মিস্টিক উপলব্ধিকে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলেন। এবং এঁরাও ঐ স্পিনোজার দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর সেই যে *natura naturans* বা জন্মদাত্রী প্রকৃতিশক্তির ধারণা, যাকেই তিনি মনে করেন immanent God বা অন্তর্লীন ঈশ্বরশক্তি, তারই প্রভাব দেখি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এই উক্তিতে—

Something
Whose dwelling is the light of setting suns,
And the round ocean, and the living air,
And the blue sky, and in the mind of man ;—
A motion and a spirit, which impels
All thinking things, all objects of all thought,
And rolls through all things.

এরই সমর্থন দেখি শেলির 'The one remains, the many change and pass'-এ। এই অন্তর্লীন বিশ্বাতীত রহস্যকে তার নানা বিভিন্ন বিভূতি বা ঐশ্বর্যের দ্বারাও উপলব্ধি করা যায়, যথা, জ্যোতি, আনন্দ, শান্তি, সৌন্দর্য, শুভ, প্রেম ইত্যাদি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই আনন্দের সমাচার তাঁর কোনো কোনো কবিতায় দিয়েছেন, কোথাও শান্তির ইঙ্গিত, কোথাও বা শুভ বা শিবের। কিন্তু ইঙ্গিতমাত্র। এইগুলির প্রত্যেকটি নিয়ে এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অনন্তলোক আবিষ্কার করার কোনো ধারণা বা চেষ্টা তাঁর নেই। সেটা বরং অনেক স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে শেলির কাব্যে। শেলির আলোর বিচিত্র ঝলমলানি, অনন্তের বিভাব, intellectual beautyর লীলা, spirit of delight-এর আবাহন, প্রেমের পূজা— এই সব থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক রসের বিচিত্র ও উচ্চতম অধিকার অস্বীকার করবার উপায় নেই, নানা কারণে তাঁর সৃষ্টি যতই অসম্পূর্ণ থাকুক। কীট্‌স্‌ শিক্ষার অসম্পূর্ণতার ও বয়সের পরিণতির অভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মীলিত করতে পারেন নি— কিন্তু তিনি ছিলেন জন্মগতভাবে সৌন্দর্য ও প্রেমের মন্দিরের পূজারী। আধ্যাত্মিকতায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে যে অসীম ও চিরন্তন ভূমিকার দরকার তার প্রথম আভাস দেখা গিয়েছিল তাঁর Ode ও শেষ-লেখা সনেটগুলিতে। এক ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ছাড়া আর দুজনই সাধারণ জাগতিক জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা

করতে পারেন নি। শেলির কেবলই প্রস্থান স্বর্গ বা আকাশের দিকে, কীট্‌সের স্বপ্ন বা রূপলোকে; heaven ও home, স্বর্গ ও নীড়, দুয়ের সঙ্গেই সম্বন্ধরক্ষার কৃতিত্ব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের। কিন্তু পরবর্তী যুগে রোম্যান্টিক কবিমাত্রেই 'পলায়নে'র অভিযোগে অভিযুক্ত, 'escapist' নামে অভিহিত।

৬ রোম্যান্টিক-পরবর্তী যুগ : এই সময়ের মধ্যে এমন কোনো কবির আবির্ভাব হয় নি যাঁকে বিশ্বকবি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যিনি কোনো এক নতুন স্তরে জীবনবিন্যাস উপলব্ধি ও রূপায়িত করেছেন। রোম্যান্টিক সম্ভাবনাগুলিকেই আরো সূক্ষ্ম সুকুমার করে তোলা, বা সাধারণ জগতে বৈজ্ঞানিক ও ইউটিলিটেরিয়ান মতামত ও বুদ্ধিবিচারের ঘাতসহ ক'রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন টেনিসন, ব্রাউনিং। সন্দেহ দ্বন্দ্ব ও 'আয়রনি'র বেদনাহত ছায়ালোকে জগৎকে দেখিয়েছেন কোনো কোনো কবি রোম্যান্টিক আর রিয়্যালিস্টিক সুতোর একত্র বয়নে— যেমন হাইনে, আর্নল্ড, হার্ডি। কিন্তু সত্যকার নতুন আবিষ্কার করেছেন, নতুন সুর এনেছেন তিনজন কবি। এঁরা তিনজনেই ফরাসী। তিনজনেই কবির ভূমিকা ও কর্তব্য সম্বন্ধে পুরোনো ধারণা বর্জন করলেন। অখণ্ড অভিজ্ঞতা, জগৎ ও জীবনের সত্য উদ্‌ঘাটন ইত্যাদির দায়িত্ব যে কবির সে কথা তাঁরা আর স্বীকার করলেন না। মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির ও অন্তর্জীবনের মধ্যে যে সম্বন্ধসাম্য সভ্য শিক্ষিত মানুষ রক্ষা করতে চায়, যে সব বিধিনিষেধ ও নীতির দ্বারা সে নিজের মানস ক্রিয়া ও অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে তার মধ্যে তাঁরা এনে ফেললেন একটা আকস্মিক শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের বিপ্লব, একটা *coup d'etat*। তখন এই নতুনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সীমিত চেতনা দিয়ে তাঁরা জগৎ-ব্যাপারের— তাও সবটাতে নয়— কোনো ঈপ্সিত বস্তুতে যুক্ত হয়ে দেখতে চাইলেন কি পাওয়া যায়। এই কবিদের নাম বোদ্‌লেয়র, ম্যালার্মে, ভার্লেন। এঁদের তিনজনের প্রাথমিক দীক্ষা কয়েক বছরের জ্যেষ্ঠ ফরাসী কবি গোতিয়ের (Gautier)-এর কাছে, যিনিই art for art's sake মতবাদের প্রবর্তক। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এই সব কবিই আসলে গ্যেটের বিরাট্‌ সিদ্ধি ও সম্ভাবনার এক-একটি ধারার উত্তরসাধক। বোদ্‌লেয়র ত্যাগ করলেন নীতিবোধ এবং তার পর অবাধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগ ও তীক্ষ্ণ অশৃঙ্খলিত জীবন-অনুভূতির মধ্য দিয়ে পেতে চাইলেন জীবনের সেই সত্য ও সুন্দরকে, যা সমস্ত বিধিনিষেধ-বঞ্চনাকে পেরিয়েও অক্ষত ও নিত্যস্বরূপে টিকে থাকতে পারে। ম্যালার্মে বাদ দিলেন বুদ্ধিবিবেচনার অত্যাচার, প্রচলিত ধারণার ও আইডিয়ার দাসজনোচিত ব্যবহার। ভিক্ষায় পাওয়া চলতি চিন্তাধারণা প্রত্যয়সংস্কার সরিয়ে তিনি জগতের ইন্দ্রিয়বোধ প্রতিফলন বা প্রতিচিত্রণ থেকেই সরাসরি পেতে চাইলেন তার বিভিন্ন ব্যাপারের ভাবস্বরূপ। ঐতিহ্যের নকল করা পেরিয়ে স্বাধীন আবিষ্কারের দ্বারা পেতে চাইলেন প্রতি অভিজ্ঞতার চৈতন্যলিপি, তার idea structure, যে অর্থে প্লেটো ঐ আইডিয়া কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। তাই তাঁর কবিতায় কিছু আপাত-অসম্বদ্ধ 'ইমেজ' বা চিত্রাংশের যোজনা ও তার মধ্য দিয়ে নগ্ন 'তৎ'-এর বিদ্যুদ্দীপ্তি। অন্ততঃ তাঁর শ্রেষ্ঠ অল্পসংখ্যক কবিতায় এই সাধনাই করা হয়েছে অদ্ভুত সাফল্যের সঙ্গে। ভার্লেন দিলেন অভিজ্ঞতার পূর্বাপরতাকে বাদ। কাজেই ভাবনাচিন্তার, ভালোমন্দ বিচারের আর দায় রইল না। *Sub specie eternitatis* বা অনন্ত দেশকাল গেল দূরে—

একমাত্র কাম্য হল সর্বসম্বন্ধবিরহিত একটি অভিজ্ঞতা-মুহূর্তের চকিতদীপ্তি। একেই ইংরেজ সমালোচক পেটর বলেছিলেন gem-like flame. কবিতা এর ফলে তীক্ষ্ণ ঘন হয়ে তার essenceএ পৌঁছোবার সম্ভাবনা হল। অর্থের দরকার নেই, বিষয়ের দরকার নেই, শুধু চাঁপাফুলের গন্ধের মত একটু কবিতার তীব্র উদ্‌গমন— এই হল pure poetryর অভিলাষ।

গ্যেটের প্রধান দিক তিনটি: ১ ভোগচর্যা ও তার ভিতরের মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন— উদাহরণ ফাউস্ট্-চরিত্র ও ছোট ছোট কবিতায় কথোপকথনের ভঙ্গীতে তৈরী নাটিকাগুলি। এইখানে বোদলেয়র তাঁর অনুবর্তী। ২ জীবনের তত্ত্বগুলিকে অপলক অনাসক্ত বিজ্ঞানদৃষ্টির সম্মুখে এনে তার মর্মোদ্‌ঘাটন ও রসভোগ। এখানে ম্যালার্মে তাঁর উত্তরসাধক। ৩ Music বা গানের মধ্য দিয়ে নিম্নজগতের সংঘাত উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। যেমন তাঁর এই কবিতায়—

What I err'd in, what corrected,
What I suffered, what effected,
To this wreath as flowers belong;
For the aged, and the youthful,
And the vicious, and the truthful,
All are fair when viewed in song.

ভার্লেন এই 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি'র অনুসারী।

রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর ১৮৬১ সাল। টেনিসনের *In Memoriam* প্রকাশিত হয় ১৮৫০ সালে, বোদ্‌লেয়রের *Fleurs du Mal* ১৮৫৭ সালে, ব্রাউনিং-এর *Ring and the Book* ১৮৬৮-৬৯ সালে, ভার্লেনের *Romances sans Paroles* ১৮৭৪ সালে এবং ম্যালার্মের *L' Apre-midi d'un faune* ১৮৭৬ সালে। আর ১৮৭৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে পৌঁছে সেখানকার ইউনিভার্সিটিতে সাহিত্যের পাঠ নিতে শুরু করেন।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ও সাহিত্যজীবনবিবর্তনের ইঙ্গিত বুঝতে হলে যে এমনি সুদূরব্যাপী একটি প্রসঙ্গরেখা টানা দরকার আশা করি পাঠকের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিশ্ব-কাব্যের আলোচনায় আমরা থেকে গেছি ইয়োরোপে, ভারতে এসে পৌঁছোই নি। সেখানকার ইতিহাসটুকু যথাসম্ভব দ্রুতরেখায় অনুসরণ করা দরকার।

এক হিসাবে ভারত সমস্ত পৃথিবী-ইতিহাসের ব্যতিক্রম। গ্যেটের মধ্যে যে চেতনা-প্রসারের কথা আমরা লক্ষ্য করেছি, শেলি-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অবতরণ দেখেছি তার সমান ও তার চেয়ে অনেক মহত্তর সিদ্ধি আমাদের দেশে অনেক আগেই দেখা গেছে— সাহিত্যে না হলেও অসংখ্য সাধক ও মনীষীর ব্যক্তিগত জীবনে। কিন্তু এ দেশে বহুসহস্র বৎসর ধরে এই চেতনার উন্নয়নের সঙ্গে জাগতিক জীবনের একটা শুধু বিচ্ছেদ নয় বিরোধ থেকে গেছে। যে ব্রহ্মকে সত্য

বলে চিনেছে, সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শংকরের পদানুসরণ করে জগৎকে বলেছে মিথ্যা। প্রেম-মৈত্রীর মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ জগৎকে পরিহার করে নির্বাণ লাভ করতে চেয়েছে বৌদ্ধ সাধক। তাই এ দেশে থেকে গেছে তুঙ্গ অভিজ্ঞতার আকাশস্পর্শী চূড়াগুলি, আর একেবারে সমতলে ভূমিতে লুটিয়ে-থাকা জনজীবন। এ দুয়ের মধ্যে ছিল না যাতায়াতের পথ, ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার নাট্যরসায়ন। তাই আমাদের জীবনের মাঝামাঝি অনেকগুলি সৃষ্টির অবস্থানভূমি প্রায় শূন্য বললেই হয়। অথচ আমাদের সাহিত্যিক সূচনা যেমন মহিমান্বিত এমন আর কোনো দেশের নয়। আমাদের বেদে উপনিষদে বেজেছিল ঊর্ধ্বতম উপলব্ধির সুর। আর সেই উচ্চ অবস্থানভূমি থেকে দুই মহাকবি সহানুভূতির দৃষ্টিপাত করেছিলেন জীবনের বিস্তৃত রঙ্গমঞ্চের দিকে। রামায়ণে জীবনের নানা সংঘাত ও অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মধ্য থেকে জীবনরূপগুলির আদর্শায়ন যেমনভাবে হয়েছে রোম্যান কবিদের সৃষ্টি তার তুলনায় অনেক দুর্বল। আর নিরাসক্ত চৈতন্যের সামনে বুদ্ধিতর্ক ও বিভিন্ন বিরোধী ইচ্ছা ও চরিত্রের সংঘাতে বিক্ষুব্ধ বৃহৎ জীবনের একটা সামগ্রিক রূপকে এনে দাঁড় করিয়ে তার নিষ্করুণ সত্যতাকে বিন্দুমাত্র কোমল বা রঙিন করবার চেষ্টা না করেই চিরকালের জন্য তাকে মানুষের চিত্তাকর্ষক করে রাখতে পারার দৃষ্টান্ত দেখি মহাভারতে। এতে গ্যেটের মত সৌন্দর্যচর্যার কোনো বিশেষ ব্যবহার, কোনো aesthetic cultএর দরকার হয় নি। দুর্যোধন-শকুনির চরিত্ররূপের আস্বাদনটা যে সুন্দর এ কথা অনুভব করবার দরকার হয় নি। সত্য, এতেই কবি ও তাঁর অসংখ্য পাঠকের মন সন্তুষ্ট। এবং এই অবিচল সত্য সংগঠিত রাজ্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছে গীতার ব্রহ্ম-চৈতন্যের রাজ্যে। ঊর্ধ্বতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত এমন মিলনের চেষ্টামাত্র আর কোনো সাহিত্যে সম্ভব হয় নি।

কিন্তু পরে দু হাজারেরও বেশি বছরে ভারতে এই সিদ্ধির আংশিক অনুকরণের চেষ্টাও কেউ করল না, এক কালিদাস ছাড়া। ইনিই তৃতীয় ভারতীয় কবি যাঁকে বলব বিশ্বকবি, যিনি দেখিয়েছেন জীবনকে কেমন করে উন্নীত করা যায় সৌন্দর্যলোকে। পাশ্চাত্য কবির কাছে জীবনের বিরোধ ও সংঘাতগুলিই বেশি সত্য, বেশি তীব্র। ভারতীয় কবির দেশের সাধারণ সাধনার ঐতিহ্য এবং ব্যক্তিগত সাধনার ফলে অবস্থানভূমি প্রায়ই হয় এমন জায়গায় যেখান থেকে ঐ বিবাদী তত্ত্বগুলো হয়ে যায় তুচ্ছ, ফুটে ওঠে বৃহত্তর দেশকালের পট, মহৎ আদর্শ রূপায়ণের অবসর। ভারতীয় আকাশ-বাতাস-মাটিরও এই বহিঃপ্রকৃতিও সাহায্য করে এই বৃহত্ত্ব-মহত্ত্বের সম্ভাবনাময় অনতিবিক্ষুব্ধ পট-ভূমিকারচনায়। সৌন্দর্যস্রষ্টা এই কবিকে অভিনন্দিত করেছেন গ্যেটে। তাঁর মধ্যে গ্যেটে দেখেছেন স্বর্গমর্ত্যের মিলন, সত্য ও সুন্দরের সমন্বয়— যা খুঁজেছিলেন কীট্‌স্।

এই কালিদাসকে বহু বৎসরের ব্যবধানে অনুসরণ করে এলেন এক কবিগোষ্ঠী— তাঁরাই রক্ষা করে এসেছেন এ দেশের একটি কাব্যধারাকে। জয়দেব ও বৈষ্ণব কবিরাই এই ঐতিহ্যের সাধক। আমাদের মহাকাব্য দুটির প্রভাব কাজ করল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে— যেখানে দেখি সামান্য সংসার-জীবন ঊর্ধ্বচেতনার স্বর্গ থেকে সম্পূর্ণ ভ্রষ্ট হয়ে সামান্য হাসিখুশি-বেদনাবিড়ম্বনার তুচ্ছলোকে

প্রবাহিত। দেশের পরাধীনতার জন্যে এই জীবনও যেমন সংকীর্ণ ও মাহাত্ম্যহীন, এই সাহিত্যও তেমনি। অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া। চতুর বুদ্ধিপ্রয়োগে জীবন-অভিজ্ঞতার রসায়ন, যাকে বলি urbanity, রোম্যান স্যাটায়ারিস্টদের মত তির্যক ব্যঞ্জনা— এর কতকটা দেখি ভারতচন্দ্রে। বাস, এখানেই শেষ। তার পরেই আমরা এসে পড়ি সেই যুগের দরজায়— যাকে নাম দিতে পারি বাংলায় ভারতীয় রেনেসাঁস। এর প্রথম দিকেই হয়ে গেল ধর্মসংস্কার, চিন্তাসংস্কার— ইংলণ্ডের রেফর্মেশনের চেয়ে অনেক গভীর ও নিপুণভাবে। এমন সব মহাত্মা এই রেফর্মেশন সংঘটিত করলেন যাঁদের ব্যক্তিত্বরূপ ও দান শুধু ভারতীয় নয়, সমস্ত পৃথিবীর: রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীরামকৃষ্ণ। সমসাময়িক সামাজিক সাধনা ও চেতনার মধ্যে এসে পড়ল নতুন করে আবিষ্কার-করা সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্য, এল ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্য দিয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অভিজ্ঞতা ও অনুবাদ, তাছাড়া অন্য ইয়োরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানেরও প্রথম ইঙ্গিত। ১৮৫৭ সালের আগে থাকতেই এসেছিল স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ঐ বছরের পর থেকে আরো স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল স্বাদেশিকতা— এই অনুমান করি। তাছাড়া দেখি ব্রিটিশ ব্যক্তিতন্ত্রবাদ এনেছিল একটা স্বাধীন ব্যক্তিগত বিচরণ ও উদ্‌ভাবনের তাগিদ আমাদের ইংরেজিনবিশদের মধ্যে। কোঁৎ ও হার্বার্ট স্পেন্সরের পজিটিভিজ্‌ম্— বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নতুন বৈজ্ঞানিক জগৎ-দৃষ্টি এসে পৌঁছেছিল আমাদের নব্যযুবকদের মধ্যে। স্পেন্সরের *Principles of Psychology* প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে, *First Principles* ১৮৬২ সালে। আর বাংলার রেনেসাঁসের প্রথম মুখপাত্রদের রচনা ঐ সময়েই প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ আরম্ভ হয়েছিল রবীন্দ্রজন্মের কিছু বছর আগে। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশ হতে আরম্ভ হয়েছিল ১৮৫৮ সালে। মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা ও একেই কি বলে সভ্যতার প্রকাশকাল ১৮৫৯-৬০। বিদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের ও দীনবন্ধুর নীলদর্পণের ১৮৬০। আর রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয় মেঘনাদবধ কাব্য, কৃষ্ণকুমারী ও বাংলার প্রথম সার্থক লিরিক কবিতা আত্মবিলাপ। এইভাবে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সংস্কৃতিধারার যখন সংগমমুহূর্ত তখন জন্মগ্রহণ করেন রবীন্দ্রনাথ। এবং তখন থেকেই তখনকার সেই পরাধীন দেশের একটি ক্ষুদ্র গৃহকোণে এক শিশুচিত্ত স্থানলাভ করল যেন বিস্তৃত পৃথিবীর মানচিত্রে, তার ক্ষণে ক্ষণে বেড়ে ওঠার রহস্যকে ঘিরে এসে তার ধাত্রীত্ব গ্রহণ করল স্বদেশের বিদেশের অতীত ও বর্তমান সংস্কৃতিলোকের সমস্ত জীবন্ত প্রেতিগুলি।

বিশ্ব-ইতিহাসের যে বিবৃতি দেওয়া হল তা যদি সত্য হয় তাহলে দেখা যাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই যে-কোনো নূতন কবির সামনে থেকেছে এই সমস্যাগুলি—

১ কেমন করে জ্ঞান-কল্পনার পরিধি, কবিচৈতন্যের দিগন্ত এমনভাবে বাড়িয়ে নেওয়া যায় যাতে আধুনিক জগতের সব স্তরের সব রকমের অভিজ্ঞতা, প্রবণতা ও প্রয়াসকে ধরা যায়, শুধু জানা নয়, অপক্ষপাত রসবেদিত্বের দ্বারা তাকে সাহিত্যের সামগ্রী করে তোলা যায়। তাকে দূরপ্রসারী ভাব ও দর্শনের বাহন করা যায়, আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শনেরও যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ

ইউনিভার্সাল আর ইন্‌ডিভিডুয়াল, সার্বিক আর ব্যক্তিক— সব রকম তত্ত্বকেই গ্রহণ করা যায়। গ্যেটে এই পথে যাত্রানায়ক, তাঁর অনুবর্তী হলেন দূরায়ত আদর্শ ও ভাব -রূপায়ণে হুগো ও টেনিসন, সূক্ষ্ম ভাব ও ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ব্রাউনিং। অবশ্য এঁদের সকলেরই মূল কবিপ্রয়াস বিজ্ঞানের নীরস বুদ্ধিপ্রয়োগের অস্ত্রাঘাতকে পরাস্ত ক'রে ব্যাপকতর, বিশুদ্ধতর জ্ঞানের রস ও আনন্দ আবিষ্কার করা, তাকে দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের সহায়ক করে তোলা। এক কথায় একে বলা যায় আনন্দের ক্ষেত্রে জ্ঞানের মুক্তি।

২ শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ ই একমাত্র পথ না হতেও পারে। প্রেমসৌন্দর্যশ্রদ্ধারও একটা অসীমপ্রসারী পথ আছে হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যার রাজপথ। সেই পথ দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেলে এমন জায়গায় পৌঁছোনো যেতে পারে যেখান থেকে চাইলে জগতের সমস্ত আপাতবিরোধ নিরস্ত হয়ে তার অন্তর্লীন রূপলোক ফুটে উঠতে পারে। আর এই জগৎকে তার আশীর্বাদ ও ইন্দ্রজালে অপরাজেয় মহিমার অধিকারী করতে পারে অতিজাগতিক সৌন্দর্যতত্ত্ব, রূপলোকের ঊর্ধ্বতম আকাশের প্রেরণা, যা অধ্যাত্মলোকেরই একটি বিশিষ্ট ক্রিয়া। এই সৌন্দর্যপ্রেমলোক, এই ভূস্বর্গসৃষ্টির সহায়তা করা হল কবির সামনে দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ।

৩ আগের প্রচেষ্টাটিতে পৃথিবীকে রক্ষা করেই স্বর্গলাভের আয়োজন, হিউম্যানিজ্‌ম্‌কে মারাত্মক-ভাবে অতিক্রম না করেই মানবাতীত কিছু রহস্যকে স্বাঙ্গীকরণের কৌশল। এই কাজে নেতা কীট্‌স, অনুবর্তী অনেক পরে প্রি-র‍্যাফেলাইট্ কবিরা, ইয়েট্‌স্। কিন্তু পৃথিবীজীবনকে অধ্যাত্ম-আলোয় পরিবর্তিত করবার দুঃসাহসিক চেষ্টা হচ্ছে কবির তৃতীয় এক্‌স্‌পেরিমেন্ট। এর অগ্রণী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও শেলি; পরবর্তী এই পথচারী কবি কেল্টিক ম্যুভ্‌মেন্টের এ. ই., ইয়েট্‌স প্রভৃতি, তাছাড়া ফ্রান্সিস টমসন। কিন্তু এই সব এক্‌স্‌পেরিমেন্ট রবীন্দ্রজন্মের পরবর্তী।

৪ কবিচৈতন্যের অখণ্ডত্বের আকাঙ্ক্ষা না রেখে তার বিভিন্ন শক্তির যে-কোনো একটিকে গ্রহণ করে তার পরিমার্জন ও তীক্ষ্ণীকরণ ও তার পূর্ণ ভোগ ও চরম প্রয়োগের সাধন। এখানে নেতা বুদ্ধিচৈতন্যে ম্যালার্মে, রসচৈতন্যে বোদ্‌লেয়র এবং ভার্লেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সমস্যা ও প্রবণতা (tendency)গুলিই পথ খুঁজছিল জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ইয়োরোপের অঙ্গনে। কলকাতার সংস্কৃতি-জীবনে এই আধুনিকতার জীবন্ত পরিবেশ, বিশ্বসমস্যাগুলির প্রত্যক্ষ স্পর্শলাভে যাঁরা সাহায্য করলেন সেই সব মনীষী ও সাধকের নাম আগেই করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রজীবনের উপর যাঁদের প্রভাব সব চেয়ে অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষগোচর, তাঁরা হচ্ছেন যথাক্রমে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। বুদ্ধি, বিশ্বাস ও প্রত্যয়, হৃদয়ভাব, চরিত্র ও ব্যক্তিত্বরূপায়ণের কৌশল ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটা বিস্তৃত নূতন সংশ্লেষণ সমন্বয় ও বিন্যাসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তবে নূতন বিশ্বকবি নিজের বাণীকে সমস্ত বিশ্বের নাটমন্দিরে উপস্থাপিত করতে পারেন। কাজেই একটা বহুপ্রসারী ও কঠিন

মানসিক প্রস্তুতি এই ধরণের সব কবির পক্ষেই অবশ্যপ্রয়োজনীয়। এর অনেকটাই হয়তো তাঁরা পান সেই সেই যুগের পূর্বমনীষীদের দাক্ষিণ্যে। আবার অনেকটা তাঁদের নিজেদেরই করে নিতে হয়। ভাব ও আইডিয়া জগতের সমন্বয়ের কাজ রবীন্দ্রনাথ ক'রে গিয়েছেন তাঁর দীর্ঘ জীবন ধরে। শুধু চিন্তাশীল মনীষী হিসাবেই তাঁর দান পৃথিবীর যে-কোনো প্রসিদ্ধ মনীষী ও জ্ঞানতপস্বীর সঙ্গে তুলনায় প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাবার যোগ্য। কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর জীবনদেবতা বা হয়তো ভারত-ভাগ্যবিধাতার, কৃপাও ছিল অসীম। তাঁর প্রতিভার পথ সুগম করে দিয়েছেন এমন কয়েকজন লোক যাঁরা নিজেরাই অদ্ভুত প্রতিভা ও শক্তির অধিকারী। এবং এঁরা প্রত্যেকেই বিশ্বজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য।

মহর্ষি॥ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে এঁর দানের বিশেষত্ব এই যে তা জগৎ-বিমুখ নয়। একটি সর্বগ চৈতন্যের মধ্যে ঊর্ধ্বতম থেকে নিম্নতম সংসারভূমি পর্যন্ত ধারণ করবার বাণী তাঁর। তাঁর দেবতা তাঁকে হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়া থেকে নির্ঝরের মত সমতলভূমিতে নেমে আসতে আদেশ দিয়েছে। এবং তাঁর অধিগত এই চেতনার প্রধান বিশেষত্বই হল আনন্দের থেকে উদ্‌ভূত ও আনন্দের মধ্যে লীন হওয়ার যে সৃষ্টিতত্ত্ব তাই আবিষ্কার। 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' ইত্যাদি। আধুনিক কবির নীরসজ্ঞানকে আনন্দে পরিণত করার যে সমস্যা তার পূর্ণ সমাধান দেবেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতায়। কেমন করে এই জ্ঞানানন্দের সাধনা করতে হয় এবং তার দ্বারা পরব্রহ্মের দিকে অসহিষ্ণু প্রস্থান না করে এই জগৎ-ব্যাপারকেই ভোগ করা যায় সেই কৌশলও তিনি নূতন করে আবিষ্কার করেছেন, নিজের জীবনে কর্মে প্রতিফলিত করেছেন— 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', ত্যাগের দ্বারাই ভোগ করো। কাজেই তাঁর বাড়ি সব রকমের শিক্ষাসংস্কৃতিশিল্পসাধনার, আত্মচরিত্র ও সামাজিক জীবন রচনার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের সাহিত্যবিবর্তনের যে প্রধান বাধা ছিল তাও তাঁর এই আবিষ্কারের দ্বারা নিরস্ত হয়েছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্যেরও যে বাধা তাও দূর হয়েছে। রসাস্বাদকে বজায় রেখে heaven ও home, স্বর্গ ও ভূমির এই মিলনসাধনে তাঁর যে অপূর্ব কালোচিত দান সে সম্বন্ধে আধুনিক জগৎ এখনো সচেতন নয়।

বিদ্যাসাগর॥ হিউম্যানিজ্‌মের আশ্রয়ে থেকে তার সমস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানকে স্বীকার করে কেমন করে উচ্চতম আদর্শ নিজের চরিত্রে রূপায়িত করা যায়, কেমন করে বিশ্বসংস্কৃতি গ্রহণ করেও স্বভূমিতে স্বমহিমায় অবস্থান করা যায়, এবং নিজের চরিত্রের ঐশ্বর্য নিয়ে কেমন করে সাধারণ সংসারের মানুষের কল্যাণে তা নিয়োজিত করা যায় তার দুরূহ উদাহরণ দেখালেন বিদ্যাসাগর। বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের মধ্যে চরিত্রের আদর্শমহিমা ও ক্রিয়াশীলতা রক্ষার যে-সমস্যা ইয়োরোপীয়, তারই সমাধান দেখি বিদ্যাসাগরে। যেমন ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখি জন্‌সন্, উনবিংশে দেখি কার্লাইল, রাস্কিন, বিদ্যাসাগর সেই পর্যায়ের। যদিও তাঁর চারিত্রিক সমাধান আমাদের কাছে মনে হয় আরো গভীর ও সফল। এ ছাড়া বাংলা ভাষাকে বোধোদয়ের রাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্ব তো তাঁর আছেই।

মধুসূদন॥ পরাধীনতা ও এক ধরণের ধর্মচর্যার ফলে আমাদের দেশের সমাজজীবনের যে লাঞ্ছনা ও দৈন্যের কথা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে তা অস্বীকার করে আমাদের সাহিত্যে বৃহৎ জীবনভোগের পিপাসা প্রথম প্রতিফলিত করলেন মধুসূদন। নৈতিক শাসন ও অকারণ inhibition দূর করে তিনি হোমরের জগতের বীরের মত চাইলেন বিশাল প্রাণ 'অপরিমাণ মত্তসম করিতে পান'। এর জন্যে নিজের জীবনে একটা Byronic ভূমিকা নিতে তিনি দ্বিধা করলেন না, Satanismএর অভিযোগের ভয় তিনি রাখলেন না, মেঘনাদবধে রাবণের ঐশ্বর্যলোককে, তার বাসনা-কামনার জগৎকে গৌরব দিতে তাঁর লেখনী কুণ্ঠিত হল না। এর ফলে বাংলা কাব্য এই প্রথম তার উপাদানচয়নের বিস্তৃত ক্ষেত্র পেল। মধুসূদনের প্রতিভায় তাঁর কাব্যে এসেছে হোমরের জীবনরসের পুনরুজ্জীবন, নতুন হেলেনিজ্‌ম্— যা আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও বার বার প্রেরণাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে বিভিন্ন কবিতে— গ্যেটের কাব্যে, এমনকি অনেক পরে ইয়েট্‌সের মধ্যেও। কাজেই মধুসূদনের সমাধান শুধু ভারতীয় পরিধিরই নয়, তা বিশ্বের। হোমেরিক জগতের মধ্যেও কেমন করে পাওয়া যাবে সেই অন্তরলক্ষ্মীকে যা আধুনিক চিত্তকে দেবে শান্তি তৃপ্তি— এই হল সন্ধান। মেঘনাদবধেরও প্রাণ হলেন সীতা— যিনি 'একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে' স্বপ্নমূর্তির মত কবিচিত্তকে মুগ্ধ আকৃষ্ট করে রেখেছেন। পাশ্চাত্ত্য দেশের হেলেন-সন্ধানের সঙ্গে পূর্বদেশের কবির এই সীতা-মুক্তির প্রয়াস আদর্শের দিক থেকে তুলনীয়। এইখানেই মধুসূদন ইয়োরোপ-প্রভাবান্বিত হয়েও ভারতীয়, এবং ভারতীয় হয়েও বিশ্বের।

বঙ্কিমচন্দ্র॥ বঙ্কিমকে স্কটের সঙ্গে যে তুলনা করা হত তাতে যে তাঁকে খুব সম্মানিত করা হত তা নয়। তাঁর মনীষার মধ্যে এমন বিচিত্র দিকে প্রয়াণ ও সাফল্য ছিল যার জন্য বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা অতি উচ্চ আসন তাঁর প্রাপ্য। তখনকার পাশ্চাত্ত্য চিন্তাজগতের আধুনিকতম দানগুলি আয়ত্ত করে তার সঙ্গে ভারতীয় চিন্তা সংশ্লেষিত করবার প্রথম বিরাট্ সাফল্য তাঁর। কোঁৎ, স্পেন্সারের প্রভাব পশ্চিমে শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে— কলকাতায়। বঙ্কিমই কলকাতার সাংস্কৃতিক জীবনকে পশ্চিমের সঙ্গে সমকালীনতায়, একই date-line-এ উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। মধুসূদন নীতিবোধের হাত এড়াতে চেয়েও ভারতীয় আদর্শবোধের প্রভাব এড়াতে পারেন নি— তাই তাঁর আত্মবিলাপ। কিন্তু ভারতের উচ্চতম চিন্তা ও আদর্শকে তিনি সাহিত্যে স্থান দেবার চেষ্টা করেন নি। বঙ্কিম মিলিয়েছেন সরস রোম্যান্টিক এবং কখনো বা গভীর ও ট্র্যাজিক জীবন অনুধাবনের সঙ্গে কৃষ্ণচরিত্রের রহস্য-অনুধ্যান, গীতার সাধনা। ভারতীয় জীবনের অতীত অনাবিষ্কৃত বিশালতা সরলতা ও সম্পদ্, বর্তমান দিনেও সেই জীবনের বৈচিত্র্য ও আকর্ষণ প্রথম পেলাম বঙ্কিমে। আর এই সৃষ্টি আমাদের জীবনভূমিতেই অতিসত্যভাবে প্রতিষ্ঠিত, বিদেশ থেকে এনে সাময়িক অলংকরণ নয়। এর মধ্যে রয়েছে জীবনের এমন সব আদর্শের প্রেরণা ও অভিঘাত যা স্কটের সাহিত্যে কোথাও নেই। জ্ঞানের বিষ পান করেও কেমনভাবে শিবত্বে পৌঁছোনো যায়, নিষ্কাম সাধনার মধ্য দিয়ে কেমন করে মার্জিত জীবনবোধ ও ভোগে পৌঁছোনো যায় তাই বঙ্কিম

অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর সাহিত্যে। আমাদের সাহিত্যবিবর্তনের অনেকগুলি অস্তিত্বহীন অবস্থানভূমিই তিনি এনে দিয়েছেন প্রত্যক্ষ করে। রোম্যান সাহিত্যের আদর্শ ও সংস্কৃতির জীবনরূপায়ণ, আর এলিজাবেথান রেনেসাঁসের সরসতা, অপরূপ চরিত্রস্ফুরণ ও অপ্রতিরোধ্য ট্র্যাজিডি। বরং ভিক্টোরীয়-যুগের শৌখিন রোমান্স ও সাংস্কৃতিক রূপগুলির সূক্ষ্ম পরিমার্জন-প্রসাধনের প্রভাবই তাঁর মধ্যে কম। এ ছাড়া বঙ্কিমসাহিত্য আমাদের সচেতন করে তুলল আমাদের আত্ম-চরিত্র সম্বন্ধে, জাতীয় অভীপ্সা সম্বন্ধে। আমাদের রেনেসাঁসের এই নেতার, রবীন্দ্রনাথের এই অগ্রজের দানের একটা বিশ্বগত মর্যাদা আছে যা এখনো স্বীকৃত হয় নি।

যে সব উপাদান আহরণ ও সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিবেশরচনার বিবরণ দেওয়া হল তার সাহায্যে এবার আমরা নতুন করে রচনা করতে চাই কবিকাহিনী, যে চেষ্টা কিশোর রবীন্দ্রনাথ শুরু করেছিলেন তাঁর প্রাথমিক অপরিণত কাব্যরচনায়, বনফুল ও কবিকাহিনীতে। রবীন্দ্রনাথের প্রথমকার রচনাগুলি লুপ্ত হয়ে গেলে তাঁর কবিখ্যাতির ক্ষতিবৃদ্ধি হত না, কিন্তু তাঁর অন্তর্জীবনের ক্রমপরিণতি বোঝবার মূল্যবান উপাদান নষ্ট হত।

১৮৬১ সাল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে শুরু হয়েছে বদলের পালা। উচ্চারিত হয়েছে একটি যুগান্তকারী নতুন আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বাণী, শুরু হয়েছে এক উন্নততর সমাজজীবন গঠনের প্রয়াস। যে ধরণের চিন্তাবিপ্লবে অন্য দেশে দীর্ঘস্থায়ী মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী হত, তাই মহর্ষির ব্যক্তিত্বের আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করল বিদ্বজ্জনসমাগমে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে। বাধা বিরোধ তর্ক যা উঠল তা শ্রদ্ধা ও সৌজন্যের পরিবেশটিকে অযথা বিক্ষুব্ধ না করেই নিরস্ত হল বা অপেক্ষা করতে লাগল ভবিষ্যৎ সুযোগের। জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে প্রতিমাপূজা অন্তর্হিত হল, ধ্বনিত হতে আরম্ভ হল বিশুদ্ধ উচ্চারণে বেদ-উপনিষদের মন্ত্র। ভারতের দূরতম অতীতের মর্মবাণীর একটা ঢেউ উঠে এসে যেন ঐ মহর্ষির বাসস্থানটিকে ভাসিয়ে তুলল কালসমুদ্রের প্রবহমানতায়। রবীন্দ্রনাথ পরে গতির অনেক বন্দনা করেছেন, সমুদ্রে নৌকা ভাসানোর অনেক চিত্র ছড়ানো আছে তাঁর কবিতায়। তাঁর জন্ম হল ঠাকুরপরিবার ও বাঙালীসমাজের এক পরম গতিময়তার ক্ষণে।

ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার Taineএর race (জাতি বা জাতিগত ঐতিহ্য), moment (যুগমুহূর্ত), milieu (পরিবেশ)এর থিয়োরির অসম্পূর্ণতা এইখানে যে ঐ তিনটি তত্ত্বের উপরই যদি সাহিত্যিকের বিকাশ নির্ভর করত তাহলে একই সময় ও পরিবেশে একই সাংস্কৃতিক সম্প্রদায়ের একাধিক ব্যক্তি একই রকমের সাহিত্যিক পরিণতি লাভ করত। তাহলে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশের গুণে বাড়ির অনেকেই রবীন্দ্রনাথের মত আন্তর ঐশ্বর্য ও সৌষম্য, ও বিচিত্রপথে উন্মেষ-প্রবণতা লাভ করত। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যতগুলি প্রতিভাবান্ ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল তা যে-কোনো পারিবারিক ইতিহাসে প্রায় একটা অভূতপূর্ব ব্যাপার। এঁরা এই পরিবেশের দ্বারা আত্ম-গঠনের সুবিধা পেয়েছিলেন ও তার ব্যবহার করেছিলেন এবং এই পরিবেশকেই তাঁরা নিজের নিজের

দানে আরো ঐশ্বর্যময় করে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের কারোই মানসিক ও চারিত্রিক স্ফুরণ রবীন্দ্রনাথের মত এত সর্বাঙ্গীণ, এত দূরপ্রসারী, গ্রীক নিয়তির মত এত অপ্রতিরোধ্যভাবে গতিশীল হয় নি। মহর্ষির সিদ্ধির ফল আত্মায় বহন করেই যেন তাঁর জন্ম, মহর্ষিরই রচিত বাইরের পরিবেশটি শুধু যেন সেই মুক্ত আত্মার বীজটিকে সস্নেহ আহ্বানে ও আদরে ফুটিয়ে দিতে সাহায্য করল। তাঁর প্রথম বারো বছরের যে জীবনের চিত্র তাঁর জীবনস্মৃতি, ছেলেবেলা ও পরবর্তী কিছু কবিতায় পাই তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে একটি ছেলের রূপ যে নিরভিমান, ভোরের আলোর রেখাটির মত সরল স্বচ্ছ উজ্জ্বল ; যে নির্লোভ, প্রসন্ন ; সূক্ষ্ম সলজ্জ সুকুমার যার স্বভাব কিন্তু সেই স্বভাবে কৌতুকময়তা ও বলিষ্ঠতার অভাব নেই ; যে কল্পনাপ্রবণ ও সরল বিশ্বাসপরায়ণ কিন্তু সবল বাস্তবমুখী চিন্তাশক্তির অতি নিপুণ ব্যবহারে যার সহজ অধিকার। আর দেখি শিশু ও কিশোর রবীন্দ্রনাথের অতি শুদ্ধ, অতি বিচিত্র স্নেহসম্বন্ধরচনার অদ্ভুত প্রতিভা। মহর্ষির মত যাঁর পিতা, তাঁর পক্ষে শ্রদ্ধাপাত্রকে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করতে পারা শক্ত নয়। দ্বিজেন্দ্র-জ্যোতিরিন্দ্রের মত যাঁর দাদা, তাঁর পক্ষে শ্রদ্ধা ও সখ্যের অপূর্ব মিশ্রণে তৈরি একধরণের স্থায়ী কনিষ্ঠভ্রাতাসুলভ স্নিগ্ধ মনোভঙ্গী অপ্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এইসব ভালোবাসাই তাঁর স্বভাবের নির্মলতার জন্যে, তাঁর হৃদয়ের অখণ্ডতার জন্যে এমন একটি উজ্জ্বল আনন্দরূপ পেয়েছে যা লক্ষণীয়। তাছাড়া তাঁর হৃদয়ের একটি বিশেষ রণন পাওয়া যায় তাঁর সখ্যে। ডাকঘরের অমলের হৃদয়মাধুর্যের সবটুকুই দেখি কিশোর রবীন্দ্রনাথের সখ্যবন্ধনরচনায়। অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলালের সঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথের বন্ধুত্বে তাঁদের যেমন গুণপ্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথেরও কম নয়। কিশোরী চাটুজ্যের ছিল দুঃখ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে পাঁচালীর দল খোলা গেল না ব'লে। আর শ্রীকণ্ঠ তাঁকে নিয়ে ঘুরতেন তাঁর গানের দোসর করে।

সত্যর সঙ্গে যে কৌতুকময় সখ্য তা স্মরণ করে তার পর মনে করতে হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের একটি অতি গভীর প্রভাবময় স্নেহসম্বন্ধের কথা। তাঁর প্রায় সমবয়সী বৌদি— জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে এই সম্বন্ধ। ইনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র দু বছরের বড় এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র সাত তখন বধূরূপে এঁর ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ। সেই সময় থেকেই ইনি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য- পাঠ ও চর্চার সঙ্গিনী।

আর দেখি প্রকৃতির প্রতি অবিচল আগ্রহ ও অনুরাগে এই বালকের স্বাভাবিক কৃতিত্ব। কি এমন আকর্ষণের জিনিস পেয়েছিলেন তিনি প্রকৃতির মধ্যে, তার সকাল-দুপুর-সন্ধ্যার যাওয়া-আসায়, তার চিরদিনকার দিনযাত্রায় ? বাধানিষেধের জন্যই তাঁর মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি আগ্রহ বেড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের এই কথা মেনে নিয়েও বলতে হয়, শুধু তাই নয়। এইরকমের স্বাভাবিক নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহ ও আনন্দানুভূতি লাভ— যার জন্যে কৃত্রিম কোনো আয়োজন বা উত্তেজনার প্রয়োজন নেই— সেই তো আধুনিক কবির সমস্যা। ভারতীয় মতে ঐ তো সিদ্ধ মুক্ত মনের লক্ষণ, ওকেই বলে সাক্ষীচৈতন্যের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের বটগাছের কবিতাটি মনে করলে, তাঁর বাড়ির

বাগানটি সম্বন্ধে অনুভূতি, দুপুরবেলায় তেতালার ছাদে মনকে বিস্ফারিত করে দেওয়ার অভিজ্ঞতা, পেনেটির বাগানে তাঁর সামনে বিশাল উন্মোচনে মুক্তির স্বাদ— এই সমস্ত ভেবে দেখলে দেখা যাবে ঐ সাক্ষীচৈতন্যেরই হয়তো একটা শিশু-সংস্করণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর আয়ত্ত ছিল। এই অনাসক্ত কিন্তু আনন্দময় চৈতন্যই তাঁকে মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধে নির্ভুল পথ দেখিয়েছে, বিচিত্র যোগ ও সম্বন্ধরচনায় সাহায্য করেছে। এবং এই ভিতরের পরিণতি এতখানি তাঁর এগারো বৎসরের মধ্যে হয়েছে যে উপনয়নের সময়ে 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' মন্ত্রের আত্মপ্রসারণ-ধ্যান তাঁর পক্ষে হয়েছে সহজ, এবং শান্তিনিকেতনে ও হিমালয়ে প্রথম পিতৃসান্নিধ্যলাভে অতি স্বাভাবিক ও অন্তরঙ্গভাবে একটা মহৎ আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ সঞ্চারিত হয়েছে তাঁর মনে ও চরিত্রে।

কিন্তু এই বারো বছরের বালকের আত্মসমস্যা সমাধানে এই এক আশ্চর্য সমন্বয়কৃতিত্ব দেখি যে আধ্যাত্মিক আস্বাদন ও জাগতিক জীবনের বিরোধ সেখানে নেই। মহর্ষির সাহচর্যে তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর স্বকর্তৃত্বের জীবনের অনুভূতিতে মাত্রাভেদ থাকতে পারে কিন্তু স্বভাববিরোধ কিছু ছিল না। তাঁর গায়ত্রীজপ, ব্রহ্মসংগীতগান তাঁর 'জীবনানন্দ'-ভোগের ব্যাঘাত ঘটায় নি, শৈশবে যে জীবনানন্দের উল্লেখ তিনি অনেক পরে এক চিঠিতে করেছেন। নির্জন ছাদ থেকে তিনি অনুভব করতেন যে শহরের সমস্ত রূপ-রস-গন্ধ-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে 'একটা বৃহৎ অপরিচিত প্রাণী নানা মূর্তিতে আমাকে সঙ্গদান করত'।

হিমালয় থেকে ফিরে এলেন যখন বারো বছর বয়সের কিশোর, তখনই তাঁর ভিতরে তৈরি হয়ে উঠেছে এমন একটি চিন্তার স্বচ্ছতা, পরিমার্জিত ভাব ও অনুভবের ঐশ্বর্য ও সৌষম্য, আন্তর ভঙ্গীর ঐকান্তিকতা, ইচ্ছাপ্রয়োগের কুশলতা যে তাঁর সেই তারুণ্য সত্ত্বেও আপনা থেকেই তাঁর চেয়ে অনেক জ্যেষ্ঠরাও তাঁকে মেনে নিয়েছেন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বশক্তি হিসাবে। তাঁর মনের স্বয়ংক্রিয়তা ও মৌলিকতা, তার সৃষ্টিশীলতাকে তখন আর স্বীকার না করে উপায় ছিল না। জীবনের আসল অভিজ্ঞতার উপর তাঁর অধিকার ছিল এত নিঃসংশয় যে যা মেকি তাকে সাময়িক-ভাবে সহ্য করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। ১৮৭৩ থেকে ৭৮ সাল (ঐ ৭৮ সালে তিনি যান বিলাতে)— এই পাঁচ বছর তাঁর অধ্যয়ন ও মানসিক পরিণতিলাভের একটা সুতীব্র সাধনার কাল। এই সময়েই তিনি স্কুলের পড়া একেবারে ছেড়ে দিলেন। এর মধ্যেও তাঁর ভিতরের সত্যবিচার ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দেখা যায়— যদিও তা ছিল তাঁর বাইরের সলজ্জ কুণ্ঠায় ঢাকা।

প্রথম বারো বছরেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন বঙ্কিমসাহিত্যের সঙ্গে। দুর্গেশনন্দিনী বার হয় তাঁর চার বছর বয়সে, বঙ্গদর্শন তাঁর এগারো বছরে। সারদামঙ্গলের প্রকাশ ১৮৭০ সালে। কিন্তু তিনি ও তাঁর বৌঠান এই কাব্য হয়তো পড়েছিলেন আরো এক-আধ বছর আগে। মেঘনাদবধও অবশ্যই পড়েছিলেন গুরুমশায়ের কাছে। এ ছাড়া নিজে খুঁজে পড়তেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থসংগ্রহ। মনের আহার্য সংগ্রহে তাঁর ছিল এক বিপুল উদারতা। তার থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান রামায়ণ কঙ্কালতত্ত্ব ম্যাজিক কিছুই বাদ যেত না।

পরের পাঁচ বছরে (১৮৭৩-৭৮) পরিচয় হল কালিদাস-শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে। মহর্ষির নৌকোয় উঠে তাঁর বইয়ের মধ্য থেকে বার করে নিয়ে পড়লেন গীতগোবিন্দ। অক্ষয় সরকারের প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহের সংখ্যাগুলি যাঁদের কাছে আসত পড়তেন না তাঁরা, পড়তেন ঐ মানসিক ক্ষুধাচঞ্চল বালক। এবং রচনাপাঠ ও প্রকাশও আরম্ভ হয়ে যায় তাঁর তেরো-চোদ্দো বছর থেকে। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে সত্যকার কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ হয়তো তখনো তাঁর হয় নি, এবং রচনা ছিল প্রায় সবটাই প্রতিধ্বনিতে পূর্ণ, কিন্তু তাই বলে নিজস্ব বলবার কথা তাঁর ছিল না এমন নয়। অন্তর্জীবনে যিনি ছিলেন শৈশব থেকেই স্বাধীনবিচরণশীল নিজস্ব আনন্দ ও প্রত্যয়লাভের অধিকারী তাঁর আত্মকথা চোদ্দো বছর বয়সে অনেকখানি সঞ্চিত হয়ে উঠবে না এ হতেই পারে না। বরং তাঁর সৃষ্টিশীল মনের ভাব-নির্মাণ ও বিকিরণ-ক্ষমতা দেখেই মহর্ষি হিমালয় থেকে তাঁকে ফেরত পাঠাবার সময় রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্রস্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি'।

কাজেই তাঁর এই কয় বছরের রচনায় সাহিত্যিক সাফল্য সামান্য হলেও এর মধ্যে তাঁর অন্তর্জীবনের সাক্ষ্য পাওয়া যায়। হিন্দুমেলায় যে কবিতাপাঠের সময় নবীন সেন তাঁকে দেখেছিলেন যেন একটি তরুণ দেবতা, সে কবিতাটি হেমচন্দ্রের অনুকরণ হলেও তার থেকে বালকের প্রথম স্বদেশানুরাগের একটা প্রমাণ পাওয়া যায়। 'অভিলাষ' কবিতা— যা এই সময়ে ছাপা হয়— তা অতি কাঁচা লেখা। কিন্তু তা প্রকাশ করে একটি আত্মপ্রত্যয়শীল হৃদয়ের মহৎ আদর্শানুরাগ। জীবনকে একটা উঁচু আদর্শের সুরে বাঁধতে হবে এই ঐ 'অভিলাষ' কবিতার অভিলাষ। তারপর ১৮৭৫ থেকে ৭৬ সালে জ্ঞানাঙ্কুরে বনফুল কাব্যের প্রকাশ। কাহিনী ও রচনা অপরিণত। কিন্তু এর মধ্যে ঐ প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ ও মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথাগুলি কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিবৃতি। সেখানে কোনো ফাঁকি নেই, অনুকরণ নেই। কমলা বিলাপ করছে প্রকৃতিজীবনে ফিরে যাবার জন্যে। সে জেনেছে '"মানুষ", "হৃদয়", "ভালোবাসা" কারে বলে।' তার ভিতরে এক ব্যাকুলতা— 'কি জানি কেন হৃদয় কাঁদে ঘুমন্ত প্রাণ জাগে'।

প্রলাপ (১৮৭৫) কবিতায় ঐ রকম একটি থীম (theme) দেখি যা বারবার তাঁর কাব্যে এসেছে। 'কল্পনা'র সঙ্গে সময়যাপন। 'আয় কল্পনা, মিলিয়া দুজনা' ইত্যাদি।

১৮৭৭-৭৮ সালে কবিকাহিনী বেরোল ভারতীতে। এর মধ্যে কবি ও প্রকৃতির কিছু সম্বন্ধবর্ণনা আছে আর আছে মানব-সম্বন্ধে প্রার্থনা। 'মানব'-সম্বন্ধে এই পরিণত মনোভাব রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ঐ বয়সে অস্বাভাবিক হয় নি। এই সময়কার এক প্রবন্ধেই তিনি বলছেন 'গীতিকাব্য নিজের জন্য রচনা করি', এবং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করছেন তাঁর প্রেম, করুণা ও ভক্তির অনুভূতির।

কিন্তু এই সময়ে তিনি আংশিকভাবে সাহিত্যিক সফলতা লাভ করেছেন একমাত্র ভানুসিংহের কবিতাগুলির কয়েকটিতে। ১৮৭৭ থেকে ৮১ পর্যন্ত এগুলি ভারতীতে ছাপা হয়। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, আর শব্দলালিত্য ও সংগীতের প্রতি আকর্ষণ— এই দুটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাভাবিক প্রবণতাকে

কাজে লাগাতে পেরেছেন কবি এই কবিতাতে। লিরিক কবিতার পথ কেমন করে তাঁকে তৈরি করে নিতে হবে তার প্রথম সন্ধান তিনি পেলেন এইখানে।

বিলাতযাত্রার প্রস্তুতির জন্য শাহিবাগে মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে যে পাঠসূচি তিনি নিজের জন্য তৈরি করলেন তা তাঁকে সমস্ত ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রথম দেউড়ি পার হবার অধিকার দিল। ভাষাজ্ঞানে তিনি যথেষ্ট কুশলী ছিলেন না, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিব্যবহারে ও কল্পনার সাহায্যে মূলতত্ত্বগুলি বুঝে নেওয়ায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। এইখানেই তিনি পড়েন পূর্বে উল্লিখিত Taineএর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস, টেনিসন ব্রাউনিং প্রভৃতি ইংরেজ কবি, গ্যেটে দান্তে প্রভৃতি ইয়োরোপীয় কবি। এবং সংস্কৃত কাব্য ও নাটক। অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকেই তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অনেক অভিজ্ঞতা ও ভাবসম্পদ্ পেয়েছিলেন, কিন্তু অক্ষয়বাবুর উচ্ছ্বাসপরায়ণতার জন্যে তার সমস্তটা হয়তো তিনি প্রসন্নভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর নিজের মধ্যে ভাব ও অনুভূতির যে স্বাভাবিক শক্তি ছিল তার আলোয় যে-কোনো কৃত্রিম উত্তেজনা, উগ্র অনুভূতি বা অনর্থক ভাববিস্ফারণকে তিনি বরাবর জীবনে ও সাহিত্যে পরিহার করে এসেছেন। এক সন্ধ্যাসংগীতেই বোধ হয় এর ব্যতিক্রম।

বিলাত-যাত্রার আগে ষোলো-সতেরো বছরের এই কিশোর মেঘনাদবধের রূঢ় সমালোচনা প্রকাশ করেছেন, গ্যেটে পেত্রার্ক দান্তে বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেছেন, বঙ্কিমের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম ও ব্যাপক মননক্ষমতা, তাঁর রসবোধের বৈচিত্র্য। ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিধারার শ্রেষ্ঠদান নিজের মধ্যে বহন করেই তিনি গেলেন বিলাতে ইয়োরোপীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে। সেখানে তাঁর কিছু পাস করার সুবিধা হল না, কিন্তু জ্ঞানবিস্তৃতির ও চেতনাবিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ হল। তাঁর সূক্ষ্মভাবগ্রাহী মনে তিনি নিয়ে এলেন তখনকার ইয়োরোপীয় সাহিত্যচেষ্টার ইঙ্গিতগুলি।

দেশে ফিরে এসে সেই উনিশ বছর বয়স থেকেই বলা যায় শুরু হল রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবন।

কিন্তু এই সময়ে গানরচনায় কবি একটা নিশ্চিত সাফল্যলাভ করেছেন। ১৮৮০ সালে তাঁর রচিত গানগুলির মধ্যে আছে 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' আর 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'।

এরই সঙ্গে চলেছে বাল্মীকিপ্রতিভার গান রচনার উত্তেজনা।

রুদ্রচণ্ড নাটিকা সম্পূর্ণ বিস্মরণযোগ্য হলেও তার মধ্যে আঁকা হয়েছে একটি সংঘাতের কাহিনী যা কবিজীবনের একটি নিজস্ব অভিজ্ঞতারই বিবরণ। কোমলতা সৌকুমার্য সৌজন্যের সঙ্গে রূঢ়তা, নির্বোধ উগ্রতা ও আত্মম্ভরিতার বিরোধ। এই বিরোধের চিত্র দেখি তাঁর প্রথম উপন্যাস বৌঠাকুরানীর হাটে— উদয় ও প্রতাপের মধ্যে— যা রচিত প্রায় ঐ একই সময়ে (১৮৮১-৮২)।

বাল্মীকিপ্রতিভা ১৮৮১ সালে অভিনীত হয়ে পেল বঙ্কিমের প্রশংসা। ১৮৮২ সালে প্রকাশিত

সন্ধ্যাসংগীতের জন্যও তিনি পেলেন তাঁর হাতের মালা। এই দুটি রচনার মূল্য যাই হোক, এরাই তাঁকে প্রথম এনে দিল বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী স্বীকৃতি।

সন্ধ্যাসংগীত ১৮৮১-৮২ সালে রচিত, রচনাস্থান জোড়াসাঁকোর ছাদ ও চন্দননগরের গঙ্গাতীর। প্রথম কবিতাগুলি রচনার সময় কবি হয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী কর্তৃক 'পরিত্যক্ত', তাঁরা কোথাও বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাসংগীতের 'পরিত্যক্ত' কবিতায় সেই একাকিত্বের বেদনা। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতাতেই প্রথম তিনি করলেন তাঁর আত্মকণ্ঠ আবিষ্কার। কবির জীবনে বারবার ঘটেছে পরিচিত সাথীর সান্নিধ্য ও তার পর বিচ্ছেদ ও একাকিত্ব। এই দুই শক্তি— প্রিয়সঙ্গ ও নিঃসঙ্গতাই তাঁর কাব্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে থেকে থেকে।

সন্ধ্যাসংগীতের মূল্য অনেক দিক থেকেই বিচার করা যায়। এই প্রথম কবির নিজস্ব কণ্ঠের প্রকাশ।

এ ছাড়া অপর একটি বিশেষ মূল্য এই যে সন্ধ্যাসংগীতেই কবি প্রথম তখনকার দিনের সাম্প্রতিকতম ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রকাশ-টেকনিক ও কাব্যভঙ্গী কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন যা তখনকার দিনের পাঠকরা লক্ষ্য করেন নি। এবং আজকেও বোধ হয় তা অনাবিষ্কৃত।

প্রথমেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা ধরা যাক। এর কাব্যবিবৃতিতে দেখি কবি কিছু কিছু আত্মনাট্যীকরণ (self-dramatization) করলেও তা গৌণ। কিন্তু অনেক আলগা ও অল্পশ্বাস উচ্চারণের মধ্যে থেকে থেকে বেরিয়ে এসেছে একেবারে তীব্র আন্তরিকতার সুর। নিজের সাইকলজি বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতাও এই বয়সের পক্ষে অসাধারণ। হৃদয়ের একই সুরের fixation— অপরিবর্তন একঘেয়েমির চমৎকার বর্ণনা হৃদয়ের গীতিধ্বনিতে। তারপর আছে ইচ্ছা করে আরো দুঃখভোগের বিপরীত বিলাস। 'দুঃখ-আবাহন' কবিতায় দেখি নারীসুলভ কোমলতা ও পেলবতা নয়— উগ্র সবল অনুভব ও উচ্চারণের ক্ষমতা। দুঃখ এসে তাঁর হৃদয়ের প্রতি শিরা ছিঁড়ে রক্তপান করুক, এই তাঁর আহ্বান—

প্রাণের মর্মের কাছে
একটি যে ভাঙা বাদ্য আছে,
দুই হাতে তুলে নে রে সবলে বাজায়ে দে রে,
নিতান্ত উন্মাদ সম ঝন্ ঝন্ ঝন্ ঝন্…

'অসহ্য ভালোবাসা'তে বর্ণনা আছে এই ভালোবাসার—

কী ভাব তোমার মনে জাগে,
বুকফাটা প্রাণফাটা মোর ভালোবাসা
এত বুঝি ভালো নাহি লাগে।

তার পরে আছে যুদ্ধ করে এই ভালোবাসা থেকে মুক্তি পাবার কথা 'সংগ্রামসংগীত' কবিতায়—

আজ তবে হৃদয়ের সাথে
একবার করিব সংগ্রাম।

ফিরে নেব, কেড়ে নেব আমি
জগতের এক-একটি গ্রাম।
ফিরে নেব রবিশশিতারা,
ফিরে নেব সন্ধ্যা আর উষা
পৃথিবীর শ্যামল যৌবন
কাননের ফুলময় ভূষা।

'জগৎফুলের কীট' না হয়ে কেমন করে জগতের মধ্যে বেরিয়ে এসে বাঁচতে হয় তার ইতিহাস আছে প্রভাতসংগীতের প্রথম কবিতায়। এবং এই মুক্তির ইতিহাস তার চরম মুহূর্ত লাভ করেছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'। কিন্তু সে আলোচনা এ প্রবন্ধে নয়। এ প্রবন্ধে শুধু দেখা গেল যে সন্ধ্যা-সংগীতের সময়েই কবি নিজের জীবনের একটি তীব্র দ্বন্দ্ব নিরস্ত করেছেন তাঁর অনাসক্ত জীবনানন্দ-ভোগের ক্ষমতায়। সব কামনা, স্বার্থপর প্রবণতা মহত্তর জ্ঞান ও আনন্দের দ্বারা জয় করার এই ইতিহাসের জীবন ও সাহিত্য -গত মূল্য অনেক। গ্যেটে তাঁর প্রেমগুলিকে বিশোধন করেও কামনাময় প্রেম হিসাবেই ভোগ করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' এগিয়েছে আরো শুদ্ধ বৈরাগ্যের দিকে, আরো ব্যাপক, আরো অপরাজেয় আত্মশূন্য বিরহমিলন-অভিজ্ঞতার সার্বিকতার দিকে।

কবিত্বের দিক থেকে, লিরিক আত্মপ্রকাশের প্রথম চেষ্টা হিসাবে উল্লেখ করা যায় তিনটি বা চারটি কবিতা: 'সন্ধ্যা', 'গান আরম্ভ', 'তারকার আত্মহত্যা' ও 'দু দিন'। শেষ কবিতাটি প্রবাস-বাসের স্মৃতিচঞ্চল— সময় চলার যে উদাস সুর কবির পরের কাব্যে একটি স্থায়ী সম্পদ্ তার প্রথম নিঃশ্বাস পাই এই কবিতার ছন্দে গতিতে। তারকার আত্মহত্যার নাট্যিকতা থেকে থেকে পরের যুগের কাব্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে যেমন 'নিষ্ফল কামনা', 'রাহুর প্রেম' প্রভৃতি কবিতায়। এর মধ্যে কিছুটা ব্রাউনিঙের প্রেরণা আছে অনুমান করা বোধ হয় অসংগত হবে না। গান আরম্ভে 'শিশির যেমন করে ঝরে, তারাটি যেমন করে যায়'— শেলি নয়, কীট্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'To one who has long been in city pent' সনেটে ঐ শিশিরঝরার বিখ্যাত ইমেজ মনে আসে। কিন্তু এ সব গৌণ, প্রচলিত কাব্যরীতি ও প্রকাশভঙ্গীর কিছু ব্যবহার শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেও প্রথমজীবনে অপরিহার্য। পরে এমন সময় আসে যখন সমাজের কাছ থেকে পাওয়া ভাষা ভঙ্গী ভাবের উপাদান একটা যেন রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কবির নিজস্ব সামগ্রী হয়ে ওঠে। দেখা মাত্র চেনা যায় সেটা সেই কবির ব'লে। আসলে এই কথাই ঠিক, সন্ধ্যাসংগীতে কবি নিজের কথা নিজের সুরেই বলেছেন। কিন্তু সব চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঐ প্রথম 'সন্ধ্যা' কবিতাটি। এর প্রথম লাইনটি 'অয়ি সন্ধ্যা, অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী কেশ এলাইয়া'র মধ্যে বেশ একটু ব্যাপ্ত দৃষ্টি পরিণত কল্পনার সুর লেগেছে এবং শেলির Ode to Nightএর সুরের সঙ্গে মিল থাকা সত্ত্বেও কবির স্বকীয় কণ্ঠও এতে অনাবিষ্কৃত নয়। তার পরে কিন্তু এমন একটা গহন সাই-

কোলজির অস্পষ্ট লোকের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ও বিবরণ যা শেলিয়ান নয়। ব্রাউনিঙের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও এর চেয়ে অনেক স্পষ্ট লোকজীবন-জগতের। এইভাবে নিজের গহন ও গোপন মনস্তত্ত্বকে কবিতায় উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো— অনেকটা মনে হয় গ্যেটের 'হ্বার্থারে'র প্রভাবে— ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বোদ্‌লেয়রের দান। আগেই বলা হয়েছে যে তাঁর *Fleur Du Mal* প্রকাশিত হয় ১৮৫৭ সালে। বিলাতবাসের সময় রবীন্দ্রনাথ যে এই কবির প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না। বোদ্‌লেয়রের Evening Twilight, Evening Harmony, I adore you as much as the Vault of Night প্রভৃতি কবিতায় সন্ধ্যার অস্পষ্টলোকের যেমন একটা ছবি, কবিহৃদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন একটা দুর্লক্ষ্য বিষাদের সুর এবং এই বিষাদকেই উগ্রমধুর কোনো বিষফলের মত আস্বাদন করবার যেমন আগ্রহ তারই আভাস পাই এই কবিতায়, এবং সন্ধ্যাসংগীতের আরো অনেক কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক, হৃদয়ের শিরাছেঁড়া রক্ত, হলাহলপানের উগ্র উত্তেজনা ইত্যাদি যা সন্ধ্যাসংগীতে ছড়িয়ে আছে তা বোদ্‌লেয়রের মূল মনোভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত এ কথা স্বীকার করলেই তবে সন্ধ্যাসংগীতের জন্মরহস্য ধরা পড়ে। যেমন ভানুসিংহের দুএকটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় মোটামুটি একটা প্রভাবের পরিমণ্ডলে কবির নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও সুরের প্রকাশ, তেমনি সন্ধ্যাসংগীতে বোদ্‌লেয়রের আদর্শে কবির আত্মকথা ও অতিসত্য অন্তর্দ্বন্দ্বের অভিব্যক্তি। এই সন্ধ্যাসংগীতের পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছিলেন বাংলার শেলি হিসাবে। সন্ধ্যা কবিতায় উপমার দ্রুত পরিবর্তন ও এক ধরণের সূক্ষ্ম sensitivenessএর প্রকাশ এই তুলনার কারণ। কিন্তু সমস্ত সন্ধ্যাসংগীত কাব্যটি পড়লে সন্দেহ থাকে না যে কবি বাংলা সাহিত্যকে সমসাময়িক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের বিচিত্র প্রতিক্রিয়ামণ্ডলের মধ্যে স্থাপন করেছেন এবং তাঁর কাব্যেই প্রথম পাওয়া যাচ্ছে বোদ্‌লেয়রের সূত্রের কতকটা সার্থক প্রয়োগ।

সন্ধ্যাসংগীতের শেষেই কবি পৌঁছলেন তাঁর সাহিত্যিক যৌবনে। এর মধ্যেই তাঁর কবিচরিত্র নিজেকে গঠিত করে নিয়ে পথ বেছে নিয়েছে দেখা যায়। সে পথ নিরাসক্ত জীবনানন্দের, মানুষের সঙ্গে নিঃস্বার্থ কনিষ্ঠভ্রাতাসুলভ সাগ্রহ শ্রদ্ধাপ্রীতির, বা কৌতুকময় সখ্যের, প্রকৃতির প্রতি নিরবচ্ছিন্ন সহজ আগ্রহের, এবং এই সব তত্ত্বেরও উপরের কোনো তত্ত্বে সহজ শ্রদ্ধা ও আত্মনিবেদনের। তাঁর প্রবণতা আত্মবিস্তৃতির দিকে, আনন্ত্যধারণার দিকে, দিনযাত্রার গতিময়তার দিকে। সেই ঊর্ধ্বতম উদারতম সত্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে জীবনের সহজতম স্নিগ্ধতমকে মিলিয়ে নিতে পারা— ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গনটিতেই সম্পূর্ণ নির্ভরে বাস করে তার স্নেহকরুণার কোমলতার মধ্যেই বৃহৎকে প্রিয় অতিথির মত আহ্বান করে নিতে পারাই এই কবির সাধনা। প্রসন্ন-সুন্দর চেতনায় বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে এঁর পক্ষে কোনো আস্ফালনের প্রয়োজন নেই— অতি সহজ নিশ্চিত ভালোলাগার সামর্থ্যে তিনি তা করতে পারেন, এবং নিজের জীবনের যা-কিছু এই আত্মবিবর্তনের বিরোধী তাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা ছাড়া তাঁর উপায় নেই। তাঁর জয় অবশ্য এক অঙ্কেই সমাপ্ত হয়ে যায় নি, সেটা যে-কোনো জীবনে স্বাভাবিকও নয়। পরেও তাঁকে বারবার বিরোধী শক্তির সম্মুখীন হয়ে তাকে জয়

করতে হয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যাসংগীতেই প্রথম তাঁর ব্যক্তিহিসাবে ও কবিহিসাবে একটা নির্দিষ্ট সংগ্রামে অবতরণ ও জয়লাভ।

এখন ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় পূর্বনেতাদের প্রভাবমণ্ডল থেকে কিছু নিয়ে কিছু-বা না নিয়ে কেমন করে কবি স্বকীয়তার প্রাথমিক একটা সোপানে উঠলেন দেখা যেতে পারে। মধুসূদনের তৃষ্ণা যে জীবনের, আকাঙ্ক্ষা যে ঐশ্বর্যের, রবীন্দ্রনাথের কাছে তার আকর্ষণ নেই। বাসনা কামনা ঐশ্বর্য-গৌরব নিয়ে যে প্রসারিত অহম্ (magnified ego)-এর রাজ্য তা তিনি অতি সহজেই প্রত্যাখ্যান করেছেন তাঁর বালককাল থেকেই। মধুসূদনের লিরিকে যে আন্তরিক ব্যক্তিগত হৃদয়বেদনার সুর বেজেছে, যার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখি মিলটনের সনেটে, কুপারের কবিতায়, সেই ধরণের ধ্বনিময় আকূতিও রবীন্দ্রনাথ নেন নি। 'আশার ছলনে ভুলি', 'হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব'-র সঙ্গে মিলটনের When I consider how my light is spentএর সুরের কিছুটা মিল আছে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আকূতি বরং মুক্তি পেয়েছে ব্রহ্মসংগীতে— যার মধ্যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ হয়ে গেছে গৌণ। মধুসূদনের ভাষার ঝংকার ও ছন্দও রবীন্দ্রনাথ নেন নি। বরং তুলনায় তিনি বুঝেছেন তাঁর জীবনের ও কবিতার প্রসার হবে বিস্তৃততর, স্বাভাবিক ও অনুগ্র এবং একটা উর্ধ্বতর অনুভূতির কাছে সমর্পিত।

বঙ্কিমের দানকে অত্যন্ত আদরের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু প্রকৃতি, জীবন ও মানবসত্তার একটা বিস্তৃততর চেতনার দিকে তাঁর নিষ্ক্রমণপথ এখনই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমের বাসনাকামনার জগতেরও যে একটা মহত্ত্ব আছে, তার চেয়েও উর্ধ্বতর জীবনের সমস্যাই কবির সমস্যা। শুধু গীতার নিঃস্পৃহতা নয়— যা দেবী চৌধুরানীকে গড়লেও সংসারের মধ্যে একটি আনন্দময় চেতনার শক্তি হিসাবে কতটা উত্তীর্ণ করে তা তর্কের বিষয়। বঙ্কিমের পজিটিভ্ সমাধান আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র, নিষ্কাম কর্মযোগ শুধু নয়, ভক্তি- প্রেমের প্রেরণা। আনন্দমঠ রচিত হয় সন্ধ্যাসংগীতের রচনার সময়ে। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথের 'এবার ফিরাও মোরে'র কর্মপ্রেরণার বিশেষত্ব এই যে, তা আরো সোজাসুজি অধ্যাত্মপ্রভাবচিহ্নিত।

ইয়োরোপীয় প্রভাবের মধ্যে তখনকার যুগের সুবিখ্যাত টেনিসনের পরিমার্জিত ভাষা ভাব ও শিল্পচেষ্টার প্রভাব রবীন্দ্রনাথে অতি অল্পই। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ শেলি কীট্‌সের প্রভাবের ফল তাঁর জীবনে ফুটেছে আরো পরে। বরং তিনি বোদ্‌লেয়রের মধ্যে পেয়েছেন তীক্ষ্ণতা, একটা একাগ্র সন্ধানের তন্ময়তা। আধুনিক কবির গ্রহণযোগ্য চারটি প্রস্থানপথের কথা এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা : ১. অনাসক্ত জ্ঞানানন্দ ও জীবনানন্দ, ২. রূপ ও প্রেমের জগতের অনুবর্তী আদর্শায়ন, ৩. আধ্যাত্মিক রূপায়ণ ও ৪. আংশিক কবিমানসের খণ্ডিত ক্ষমতা বা প্রস্থানপথের ব্যবহারে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় তীক্ষ্ণ ও অনাবিষ্কৃত উপলব্ধিলাভ। এর মধ্যে যে পথটি স্বভাবতই রবীন্দ্র-চরিত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ সেই চতুর্থ পথটিই তিনি ঘটনাচক্রে ও বোদ্‌লেয়রের প্রভাবে ব্যবহার করেছেন সন্ধ্যা-সংগীতে। এর দ্বারা জেনেছেন এ পথ তাঁর নয়, এবং একটা খোলা-আকাশ মুক্তজীবনের মধ্যে নিষ্ক্রান্ত হয়েছেন স্থায়ীভাবে। তৃতীয় পন্থা, রূপলোকসৃষ্টির প্রয়াস, এখনো অনাগত। কিন্তু প্রথম

দুটি পথে তাঁর স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এই সন্ধ্যাসংগীত থেকেই আর সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর অন্তর্জীবনের একটি কঠিন দ্বন্দ্ব এসে এই প্রমাণ করে দিয়ে গেল যে তাঁর পথ ঐ বিরাট্ বিশ্ব, ঐ বিশ্ব-প্রকৃতি ও বিশ্বমানবের পথ (অবশ্য বিশ্বমানবের আইডিয়াটা, এবং বিশ্বপ্রকৃতিরও, তাঁর সারাজীবন ধরেই বিবর্তিত হয়েছে)। আর এ ছাড়া এও প্রমাণিত হল যে দ্বিতীয় সূত্রেও তাঁর নিঃসন্দেহ অধিকার। জীবনরস ক্ষুণ্ণ না করেও আধ্যাত্মিকরসের কাব্যিক ব্যবহারে তাঁর সাধনালব্ধ দক্ষতা যা বাংলায় বা সমসাময়িক ইয়োরোপেরও কোনো কবির মধ্যে ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের শব্দ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস

রবীন্দ্রনাথের শব্দ বলতে রবীন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত সমস্ত শব্দ আমার উদ্দিষ্ট নয়। ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, ইতিহাস, অর্থ ও গঠনের দিক থেকে ঔৎসুক্যজনক শব্দই প্রধানত রবীন্দ্রশব্দ বলে অভিহিত করতে চাই। এই সব শব্দেও রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় মুদ্রিত দেখি। পৌনঃপুনিক ব্যবহৃত শব্দকেও আমি রবীন্দ্রশব্দই বলব। কেননা সেই সব বিশেষ শব্দের প্রতি আসক্তি কবির একধরণের মানসতন্ত্রের ইঙ্গিত বহন করে।

আমার বক্তব্য স্পষ্টতর হবে মনে করে কয়েকটি উপবিভাগের সাহায্যে আলোচনার অবতারণা করছি। গোড়াতেই বলে রাখি অনেক শব্দই একাধিক উপবিভাগের লক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং পুনরুক্তি-দোষ এড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিভাগে একই শব্দের আলোচনা করা হয় নি।

প্রাচীন বা archaic শব্দ ॥ এই শ্রেণীর শব্দগুলো প্রাচীন সাহিত্যে পাই। রবীন্দ্রনাথের আগে থেকেই এগুলোর প্রচলন নেই। গোঙানো (কাটানো)— 'ভেবেছিনু দিন মিছে গোঙালেম' ; চিহ্নিনু (চিনিনু)— 'ভালে ভালে হম অলপে চিহ্নিনু/না পতিয়াব রে তোয়/' ; 'চাহে নারী রথসঙ্গিনী হবে,/তোমার ধনুর তূণ চিহ্নিয়া লবে।'/ ; চেহো (চেয়ো)— 'খোকা বলে, 'আপনার/পানে তুমি চেহো' ; ঝাট (ঝটিতি)— 'যে যার ঘরে চলে আয় ঝাট্' ; ঝুরা (কাঁদা)— 'শুধু আমারি জীবন মরিল ঝুরিয়া/চিরজীবনের তিয়াষে' ; তুহারে (তোকে)— 'আঁধার লাগে চোখে, দেখি না তুহারে ॥' ; দিলক (দিল)— 'পুলক দিলক গায়ে' ; নিছা— 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে/আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে' ; 'দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারম্বার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম', 'নুমাইয়া (নুইয়ে)— 'ধীরে নুমাইয়া আঁখি' ; বণ্টক (বণ্টন)— 'ডালকুত্তাদের মাঝে করহ বণ্টক' ; বহিবেক (বইবে)— ; বুলা (বেড়ান)— 'কাঁদিয়া পরান বুলে বিরহব্যথায়', 'যে গান বায়ু বেড়ায় বুলে' ; বাস্ (পর বাসা ; ভয় বাসা)— 'আমারে বাসিস কেন পর', ছবি ও গান ১৷১১৩ ; 'মনে বাসি ভয়', নৈবেদ্য ৮৷৩৬ ; রাতিয়া (রাত্রি)— 'বিজন দিবস-রাতিয়া/কাটে', গীতবিতান ২৷৩০২ ; লিখক (লেখক)— 'কিন্তু যমের পত্রলিখককে…'। এই শব্দগুলোর মধ্যে গোঙানো, ঝাট্, ঝুরা, নিছা, রাতিয়া বৈষ্ণবপদাবলীতে পাওয়া যায়। 'অবিলম্বে ঝাট চল ব্রজে যাই'— চণ্ডীদাস ; 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'— জ্ঞানদাস ; 'কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিনরাতিয়া'— বিদ্যাপতি। নিছনি শব্দ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে 'শব্দতত্ত্বে'। উল্লিখিত শব্দগুলো ছাড়াও খেল্ ধাতুর প্রাচীন রূপ 'খেলা'ও উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কবিতায় এই রূপ পাওয়া যায়। সোনার তরী, চিত্রা, ক্ষণিকা পর্যন্ত এর জের আছে। সোনার তরীর 'এক বালকের সাথে কী খেলা

খেলাতে সখী' ; চিত্রার 'কোন্ মা আমারে দিলি শুধু এই খেলাবার বাঁশি' ; ক্ষণিকার 'ধানের খেতে খেলিয়ে গেল ঢেউ।' এই সব প্রাচীন বা অপ্রচলিত রূপ ঐতিহ্যসূত্রে রবীন্দ্রনাথে এসে গেছে। এদের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই পর্যায়ের শব্দ কবিতাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। বস্তুত কবিতাই এই ধরণের আভিধানিক, অপ্রচলিত ও নতুন শব্দ ব্যবহারের উপযুক্ত স্থান। কিন্তু একটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখি। গল্পগুচ্ছের 'অধ্যাপক' গল্পে রবীন্দ্রনাথ 'নিছিয়া' ব্যবহার করেছেন। কবি এক সময় 'নিছনি' শব্দটির অর্থনির্ণয়ে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। এই শব্দটি তার অর্থসহ কীভাবে কবির মনের গভীরে বাসা বেঁধেছিল, তার কতকটা ধারণা করতে কষ্ট হয় না যখন বহু পরে ১৩৩২ সালে প্রকাশিত 'শোধবোধ' নাটকে হিমির কণ্ঠে শুনি, 'নীরব নিশি তব চরণ নিছায়ে/আঁধার কেশভার দিয়েছে বিছায়ে।'

এই পর্যায়ে অপর একটি শব্দ শঙ্কিল। মরণশঙ্কিল— 'মরণশঙ্কিল পথে', জন্মদিনে ২৫।৮৬ পৃ। তু. 'মন্দির বাহির কঠিন কবাট/চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।—গোবিন্দদাস।

অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ॥ রবীন্দ্রনাথে কিছু কিছু শব্দ পাই বাংলায় যার তেমন প্রচলন নেই। কয়েকটি আবার সংস্কৃত অভিধান ছাড়া পাওয়াই যায় না। কতকগুলো শব্দ আবার যে অর্থে সুপরিচিত সেই অর্থ ছাড়া অপরিচিত আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত। অচ্ছায় (ছায়াশূন্য)— 'মুক্ত নীলাম্বরে/অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে/যে ভৈরবীগান' ; অধন (নিঃস্বতা)— 'দেশজোড়া এই অধন' ; অপেক্ষী (অপেক্ষাকারী)— 'খেয়াতরীর অপেক্ষী', 'মাতৃপ্রসাদ-অপেক্ষী' ; অবল (বলহীন)— 'অবল মানুষ বল লভে' ; অসদ্ভাব (অভাব) ; আক্ষেপ (আন্দোলন, বিক্ষেপ)— 'আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্য…' ; আরব (শব্দ) ; 'রহিয়া রহিয়া প্রলয় আরবে/বাজে ভৈরব ডঙ্ক।' আশ্রমিক (আশ্রমবাসী) ; উত্তান (উন্মীলিত)— 'উৎফুল্ল উত্তান চোখে' : তু. উত্তান নয়ন— চৈতন্যচরিতামৃত ; উন্নতি (উচ্চতা)— 'মংপুতে এলুম, উন্নতি হল প্রায় পাঁচ হাজার ফুট' ; উডুপতি (চাঁদ)— 'ভগবন উডুপতে…', ব্যঙ্গকৌতুক ৭।৩৫৯ ; একভিতে (একদিকে) কণিক (কণা) ; চিঙ্গটি (চিংড়ি)— ব্যঙ্গকৌতুক ; জগতীতলে (ধরাতলে) ; তমস (অন্ধকার)— 'সৃষ্টিলীলা প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া/দেখি ক্ষণে ক্ষণে/তমসের পরপার',/; 'তমস-ঘন-ঘেরা গহন রজনী' ; তিরস্কৃত (আচ্ছন্ন)— 'হিমালয়কে এই কুয়াশার দ্বারা তিরস্কৃত দেখে' ; নরদেব (রাজা)— 'যার লাগি নরদেব চির রাত্রিদিন তপোমগ্ন' ; পন্থ (পথ) ; রথ্যা— 'দন্তুরাকৃতি দেওয়ালের প্রাচীন বেষ্টনের অন্তর্ভাগে সংকীর্ণ রথ্যায়' ; লোপ্‌ত্র (চোরাই মাল)— 'লোপ্‌ত্রদ্রব্য' ; সুখিত (সুখযুক্ত)— 'সকল জীব সুখিত হোক', মানুষের ধর্ম ২০।৪১৭ ; সধর্মিনী (সহধর্মিণী)— 'অধ্যাপক কুরির সধর্মিনী মাদাম কুরি…'। অপ্রাপণীয়, ত্বরিত, দুর্ভর, দুর্মোচ্য, দুর্লক্ষ্য, দুর্লঙ্ঘ্য, দুষ্প্রবৃত্তি, নির্বেদ, ন্যায়পর, ব্যাকুলিত, সর্পিণী প্রভৃতি শব্দও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই শব্দগুলোর মধ্যে দুর্মোচ্য, দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্লক্ষ্য আধুনিক কালে খুব চলছে। তার কারণ এখন আমাদের ভাষায় ণ্যৎ,

যৎ, ক্যপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ গম্ভীর শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা। রবীন্দ্রনাথেও এদের প্রয়োগ খুব বেশি নয়।

অপ্রাপণীয়, ত্বরিত, দুর্ভর, দুষ্প্রবৃত্তি, নির্ভেদ, ন্যায়পর, ব্যাকুলিত, সর্পিণী— শব্দগুলোর মধ্যে ত্বরিত, দুর্ভর ও সর্পিণী-কে অভিধানের মরা শব্দ বলতে পারলে খুশি হই। শব্দগুলো সংস্কৃত অভিধান থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়ে এসেছি। এক অভিধান থেকে পরবর্তী অভিধানে অনুলিখিত হয়েছে শুধু। প্রচলিত কিনা সে কথা বিবেচনা করা হয় নি। অপ্রাপণীয় শব্দটি চলন্তিকার মতো ছোটোখাটো অভিধানে নেই। রবীন্দ্রনাথে একবার লক্ষ্য করেছি— 'অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘনিশ্বাস', পত্রপুট ২০।১৯। 'ত্বরিত' বিজয়গুপ্তে পাই; কিন্তু শব্দটি প্রাচীন হলেও এবং প্রায় অভিধানে থাকলেও প্রচলিত নয়। রবীন্দ্রনাথে— 'ত্বরিত যেন গিয়েছিলাম দোঁহে/জগৎপরপার'; 'ক্ষণিক ত্বরিত সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে'; 'ত্বরিত উত্তরমুখে খুলে দিল তরী'; 'শরৎ মেঘে ত্বরিত বরিষণে'; 'ত্বরিতে নামায়ে পাল নদী পথে ত্রস্ত তরী যত'; ইত্যাদি। দুর্ভর শব্দটি অনেক অভিধানেই আছে; কিন্তু শব্দটি কি চলে? 'শতবর্ষ পরমায়ু হইলেও আমার পাঠ্যগ্রন্থ আমার পক্ষে দুর্ভর হইয়া উঠে না।' নির্ভেদ কথাটি ছোটোখাটো অভিধানে নেই। জ্ঞানেন্দ্রমোহন অর্থ দিয়েছেন— বিদারণ, পৃথক্‌-করণ। রবীন্দ্রনাথে স্পষ্টতই অর্থ ভেদহীন, অভেদ— 'আমার বুদ্ধির সঙ্গে রাঙামুখো বাঁদরের/নির্ভেদ নির্ণয় করে/মাস্টার দিতেন কানমলা'। 'ন্যায়পর' জ্ঞানেন্দ্রমোহন বা চলন্তিকার মতো অভিধানে থাকলেও তেমন প্রচলিত নয়। বিকল্প শব্দ ন্যায়পরায়ণই সুপরিচিত। আধুনিক লেখক বা কবিদের কারো কারো লেখায় পাওয়া গেলেও প্রচলনের মূলে হয়তো রবীন্দ্রনাথই। সর্পিণী শব্দটি সর্পের স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে প্রায় সব বাংলা অভিধানেই আছে। কিন্তু শব্দটির প্রয়োগ তেমন চোখে পড়ে কি? এইসব শব্দকে মরা শব্দ ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?

নতুন অর্থে ব্যবহৃত আভিধানিক শব্দ॥ এই শ্রেণীর শব্দগুলো সবই পুরনো। শব্দগুলোর আভিধানিক অর্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অর্থের কোথাও মিল আছে কোথাও বা একেবারেই মিল নেই। সেই অমিল অর্থটি লক্ষণীয়। অগ্নিজিহ্ব-র সংস্কৃত অভিধানের অর্থ লাঙ্গলীবৃক্ষ; রবীন্দ্র-অর্থ, যার জিবই আগুন— 'কোথা লুকাইয়া ছিল হৃদয়ের মাঝে/ক্ষুদ্র রোষ, অগ্নিজিহ্ব নরকের কীট!' উপকণ্ঠ (কণ্ঠের কাছে), রবীন্দ্র-অর্থ আকণ্ঠ— 'মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা/উপকণ্ঠ ভরি'; একশেষ (বাং চূড়ান্ত), রবীন্দ্র-অর্থ 'একপ্রান্ত'— 'শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়/নদীর তীরে একশেষে'; কাকুক্তি (কাকূক্তি— বক্রোক্তি, কাতরোক্তি); রবীন্দ্র-অর্থ অতিশায়ন উক্তি; জোর দিয়ে বলা— 'আমার কবিতায় সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই তিনগুণের মধ্যে রজোগুণটাই সাহিত্যিক ল্যাবরেটরিতে অধিক পরিমাণে ধরা পড়েছে। এ রকম তাত্ত্বিক কাকুক্তি প্রমাণ করা যায় না।' কাকুধ্বনি (কাকু— শোকভয়াদিজনিত ধ্বনিবিকার), রবীন্দ্র-অর্থ 'করুণ ধ্বনি', ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ— 'তার কাকুধ্বনিতে মধ্যাহ্ন সকরুণ'; খণ্ডিতা (নায়িকাভেদ), রবীন্দ্রনাথে 'প্রাচীন সাহিত্যে' 'অংশীভূতা';— 'একে তপোবনের বাহিরে তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে…'; নীলাঞ্জন (তুঁতে);

রবীন্দ্র 'নীল মেঘ'। 'নীলাঞ্জন ছায়া…'। প্রদোষ (সন্ধ্যাকাল) ; রবীন্দ্র-অর্থ twilight— 'অপরিণত মনের প্রদোষালোকে।' 'প্রদোষ' প্রয়োগের কবির কৈফিয়ৎ, গ্রন্থপরিচয় ২২।৫২৮-২৯ দ্র.। বালুচর (বাং বালুময় চর) ; রবীন্দ্র-অর্থ 'বালুতে চরে যে'— 'এই বালুচরদের সঙ্গে জীবনযাপন কালে প্রকৃতির যা কিছু দান', 'বিশ্বভারতী' পৃ ৭৮। রুদ্রবীণা (এক রকমের বীণা) ; রবীন্দ্র 'রুদ্রের বীণা'— 'হে রুদ্রবীণা বাজো বাজো'…। রোচন (রুচি) ; রবীন্দ্র-অর্থ 'জ্যোতির্ময়'— 'তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন নবীন নির্মল বিভাতে'…। ললাটিকা (তিলক) ; রবীন্দ্র 'ললাটোদ্ভবা'— 'কন্যা ললাটিকা'। তু. বিহারীলালের 'ললাটিকা মেয়ে'। যোগ্যতা (সামর্থ্য) ; রবীন্দ্র-অর্থ 'আস্পর্ধা'— 'বেটা তোর এত বড়ো যোগ্যতা!', বউঠাকুরানীর হাট ১।৪২১। শুষ্ক (শুকনো, যে শুকিয়ে গেছে) ; রবীন্দ্র-অর্থ 'শোষিত', 'যাকে শোষণ করা হয়েছে'— 'শোষয়িতা এবং শুষ্ক…', রাশিয়ার চিঠি ২০।৩৬৭। বলাকা। আভিধানিক অর্থ বকবিশেষ ; রবীন্দ্র-অর্থ 'সার, বকের শ্রেণী'— 'রাজহংসদল আকাশে বলাকা বাঁধি সত্বর চঞ্চল' ; 'বলাকা উড়িয়া চলিবে' ইত্যাদি। উপজাতি (ছন্দ বি.) ; রবীন্দ্রনাথে tribal race অর্থে পেয়েছি। এই অর্থেই এখন চলিত হয়েছে।

অভিধানবহির্ভূত প্রাচীন শব্দ॥ কিছু কিছু শব্দ যা নতুন নয়, কিন্তু সংস্কৃত অভিধানেও ধৃত নয়। উল্লেখ্যতম শব্দ হল ক্রন্দসী। শব্দটি খুবই প্রাচীন। বেদে আছে। অথচ লৌকিক সংস্কৃতে প্রয়োগ নেই বলে সংস্কৃত অভিধানে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন উর্বশী কবিতায়— 'ওই শুন দিশে দিশে তব লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী।'

প্রচলিত অথচ 'অভিধানতিরস্কৃত'[১] শব্দ॥ অনেক শব্দ যেমন প্রাচীন অথচ অভিধানে নেই, তেমনি কিছু নতুন শব্দ সুপ্রচলিত হলেও সব অভিধানে এখনও অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কোনোদিন যখন বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক অভিধান লিখিত হবে, তখন এই সব শব্দের প্রয়োগের মহদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপে রবীন্দ্রনাথই সর্বাগ্রগণ্য হবেন। অবচেতন, ঐকতান, ঔপনিবেশিক, কথিকা, ছান্দসিক, দানবিক, দায়িক, দোদুল্য, মানবিক ইত্যাদি— এদের কোনো-কোনোটার প্রবর্তক যে রবীন্দ্রনাথ নয় তা-ই বা কে বলবে ?

কিছু কিছু শব্দ পাই প্রয়োগের বিরলতা, বিশিষ্টতা ও এককতার জন্য যেগুলো নজরে পড়ার মতো। ছিন্নভিন্ন হামেশাই দেখি কিন্তু ছিন্নবিচ্ছিন্ন অপেক্ষাকৃত বিরল ও নতুন ; সাম্প্রতিক কালে চলছে। তেমনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মও সকলেই জানেন ও ব্যবহার করেন ; কিন্তু সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্ম-র ব্যবহার কমই দেখা যায়। প্রসঙ্গত বলতে পারি এইভাবে সাদৃশ্যে তৈরি শব্দ রবীন্দ্রনাথে বেশ কিছু আছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাদৃশ্যে অংশপ্রত্যংশ রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়। কতকগুলো শব্দ পাই যেগুলো বাংলায় সাধারণত সমাসবদ্ধ হয়ে অন্য কোনো শব্দের সঙ্গে ব্যবহার হয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেগুলো এককভাবেই প্রয়োগ করে গেছেন।

১ শব্দকথা ১২।৩৭৮।১৩

অর্থী— 'অর্থী প্রার্থী বাদী প্রতিবাদী', সোনার তরী ৩।১১৭ ; বিদায়-অভিশাপ ৪।১৩৩। অবধান —'লেশমাত্র অবধান প্রকাশ না করিয়া…', নৌকাডুবি ৫।৩১৫, ৩৫২। অহিত— 'অহিত আসিয়া পড়ে', ধর্ম ১৩।৪২৪। আলোচক— 'পরবর্তী আলোচকগণ নব নব দৃষ্টান্ত ও তুলনা…', শব্দকথা ১২।৫৫৪। গার্হস্থ্য— 'গার্হস্থ্য অকল্যাণের আকর হয়ে ওঠে', শান্তিনিকেতন ১৩।৫২৯। ঘোষণা— 'ঘোষণার উপায় কী?', সাহিত্য ৮।৩৭৮। তারণ— 'কাহার সোনার তরী করিল তারণ?', প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪।৩৩২। নিত্য— 'নিত্য যখন নৈমিত্তিকের কাছে…', শিক্ষা ১২।৩২৬। বিজড়িত— রামমোহন ১৭।৪। বিতণ্ডা— 'দুই তরফে রীতিমত বিতণ্ডা উপস্থিত হইল', গোরা ৬।২৩৫। বিরহিত— 'সেই বন্ধুত্ব হইতে বিরহিত জীবনকেই…', গোরা ৬।১৭২। মন্থন— 'একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল', প্রজাপতির নির্বন্ধ ৪।২৭৯। রক্ষণ— 'সবে করহ রক্ষণ/কন্যারে আমার', মালিনী ৪।১৬১। স্মিত— 'মালতীর স্মিত সম্মতিতে', সানাই ২৪।১২৫।

অর্থী প্র-উপসর্গ যোগেই সাধারণত দেখা যায়। এখানে অর্থী-প্রার্থীর মধ্যে কবি প্রভেদ করেছেন। কিন্তু বিদায়-অভিশাপে অর্থীর একক প্রয়োগ আছে। অর্থপার্থক্য সেখানে উদ্দেশ্য নয়।

সংকর শব্দ॥ সংকর শব্দগুলোর একটা ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব আছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংকর শব্দ— কামানধূম্র (১৩।৩৭১), খেলাপ্রাঙ্গণ, খোঁয়ারিগ্রস্ত (মাতাল), জোছনামত্ত, দারিদ্র্যঘর, পর্ণঘর, মা-সম্ভাষণ, শয়নঘর, শাহরিক, সভাঘর, সমাধিঘর, স্বয়ম্মাস্টার।

বিদেশী ভাব ও ভাষার প্রভাবে গঠিত শব্দ॥ অন্তঃকর্ণ, অগ্নিশ্বসিত, অনলনিশ্বাসী, অনলশ্বসনা, তৃপ্ত করা, নীলরক্তবান, বাতাস, মুকুটিত, রূঢ়িক, হিমহস্ত— শব্দগুলো বিদেশী প্রভাবে গঠিত বা ব্যবহৃত। অন্তঃকর্ণ শব্দটি inner earএর অনুকরণে গঠিত। অনলনিশ্বাসী, অনলশ্বসনা, অনলশ্বসিত শব্দ তিনটিও fire breathingএর প্রভাবে সৃষ্ট। নীলরক্তবানে তো blue blood অতিস্পষ্ট। 'পঞ্চম অঙ্কে আমরা হঠাৎ আর এক বাতাসে আসিয়া পড়িলাম।' এখানে atmosphere সজ্ঞানেই কবির মনে প্রভাব বিস্তার করেছে। মুকুটিত তো সরাসরিই crownedএর অনুবাদ। 'গুরুভার রক্তহীন হিমহস্তে তার/ আলিঙ্গন করেছে সে হৃদয় তোমার!'/ ; কি 'কে ছুঁইল দেহ মোর/ হিমহস্তে তার?'/ এইসব প্রয়োগ থেকে বুঝতে পারি ইংরিজি coldএর প্রভাবেই হিমহস্ত তৈরি। ইংরিজিতে coldএর বিচিত্র প্রয়োগ আছে। তৃপ্ত করা অবশ্যই to satisfyএর প্রভাবে রচিত বা প্রযুক্ত। 'সেইটে নিয়ে তিনি কতকগুলি লোকের কৌতূহল তৃপ্ত করছেন।' আগে চলত কৌতূহল নিবৃত্ত করা।[২] এই সমস্ত কিন্তু অনিবার্য বা অপরিহার্য কারণেই ঘটে যায়। এক ভাষার সঙ্গে অন্য মনের মিলনে অন্য ভাষার উপর তার প্রভাব না পড়ে পারে না। এই প্রভাবে লাভ বই ক্ষতি কী? এতে তো ভাষাই সমৃদ্ধ হয়। মনের উপর নতুন ভাবের প্রভাব

---

২ 'দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা বাঁশি।' 'দূরস্মৃতি' long memoryর প্রভাবজাত কিনা বলতে পারি না।

পড়ে ; নতুন ভাবের পক্ষে পুরনো ভাষায় কুলোয় না। সেই জন্যই ভাষার এই স্থিতিস্থাপকতা। ইংরেজির প্রভাবেই তো রবীন্দ্রনাথকে অদ্বয়-বিবাহ, কদুৎসাহী, কর্ণবধিরকর, বধিরকর, ক্ষুধাকর, দ্বৈধব্য, প্রিয়চারী, বহিঃসীমা, বিশ্বস্বহ প্রভৃতি শব্দ বানাতে হয়েছে। আর তাতে আমাদের শব্দভাণ্ডার নতুন নতুন ফসলে ভরে উঠেছে। যে-কোনো জীবন্ত ও সমৃদ্ধ ভাষার এ একটা প্রাণলক্ষণ।

সমাসবদ্ধ শব্দ ॥ সমাসপ্রবণতা রবীন্দ্রনাথের ভাষার একটি ধর্ম। অনেক বড়ো বড়ো সমাসও রবীন্দ্রনাথে অমিল নয়। এই রকম কয়েকটি সমাস— অজেয়শক্তিশালী, অতিপেলববেদনাশীতল, আনন্দনর্তনপর, উদগ্রবুদ্ধিমান, ঘটকক্ষবধূ (তু. শিশুক্রোড়া জননী), ঘননিঃশ্বসিতমুখ, দুর্লভদ্রাক্ষা-গুচ্ছলুব্ধ, নিভৃতঅন্তঃপুরচারী, নিরুদ্ধনটনোৎসাহ, পরমদুঃখকর, বহুনায়কসংকুল, মাংসলপৃথুলদেহ, সখিবাৎসল্যবশে, সজ্জিতসুন্দরদেহে, লজ্জিতনম্রমুখে, অতৃপ্তআশা, অসম্পূর্ণসুখ (বিভা)। এ ছাড়াও উপর্যুপরি বিশেষণপ্রয়োগে কর্মধারয় সমাসও অজস্র পাওয়া যায়। যেমন— অটলনির্ভর, অটলনিষ্ঠ, উদারউদাসীন, উদারনির্মল, ক্ষুব্ধক্ষুণ্ণ, ক্ষুব্ধবিরক্ত, দলিতপিষ্ট, দলিতবিদলিত, দারুণসহিষ্ণু, দুর্মূল্য-দুর্গম, দুর্গমবিস্তীর্ণ, বলিষ্ঠভীষণ, বিচ্ছিন্নক্ষুব্ধ, বিচ্ছিন্নবিক্ষিপ্ত, বিরলনির্মল, বিপুলবিস্তীর্ণ, বিলাসবিরল, হতভাগ্যদরিদ্র। বলাই বাহুল্য, বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ততা, দার্ঢ্য, সংহতি ও ভাবগাম্ভীর্যের জন্য সমাস অপরিহার্য। সাম্প্রতিক কালের ভাষায় এই সমাসপ্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু তাই বলে সমস্ত সমাসই নির্বিচারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার যোগ্য নয়। কোনো-কোনোটি গঠনসৌষ্ঠবে এতই অতুলনীয় যে তাদের ভোলা যায় না। অমিতভাষণ, অমিতমানব, অমিতায়ু, আনতাঙ্গী, করুণাঘন, ক্ষমাসুন্দর, ক্লান্তবর্ষণ, গতবৃষ্টি, গন্ধবাসিত, গন্ধবিধুর, জাগরক্লান্ত, দৃষ্টিদীপ্ত, দেহহীন, পথমুক্তি, প্রণয়ভীরু, বাক্যদীন, বিজ্ঞানদীন। এগুলোর মধ্যে কোনো-কোনোটি আমাদের এত অন্তরঙ্গ যে দেখামাত্র বা শোনামাত্র অনিবার্যভাবে কোনো কোনো পংক্তি মনে উঠবে : 'শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,/করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।' 'রূঢ়দীপের আলোক লাগিল ক্ষমাসুন্দর চক্ষে', 'দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে', 'প্রণয়ভীরু ষোড়শী/চরণে ধরি করিত মিনতি'। দেহহীন শব্দটি শুধুই একটি অতিসাধারণ সমাসমাত্র নেই ; বিশেষ একটি ভাবানুষঙ্গ লাভ করেছে।

পৌনঃপুনিক শব্দ ॥ পৌনঃপুনিক শব্দ বলতে আমি সেই সব শব্দকে বোঝাতে চাইছি যা পুরনো, হাল আমলের নয় ; কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে যার পৌনঃপুনিক প্রয়োগ দেখতে পাই। এই ধরণের শব্দের মধ্যে অতলস্পর্শ, অপঘাত, অভিঘাত, সকরুণ ও সদাব্রতের নাম করতে পারি। এই শব্দ কটি বারবার রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখতে পাই। এই পৌনঃপুনিক আবির্ভাব কি শুধু নিষ্কারণেই? আমার মনে হয় এরা বিশেষ মানসতন্ত্রের স্বাক্ষর বহন করে। অন্তত এদের প্রতি কবির আত্যন্তিক আসক্তি তো সুস্পষ্ট। কবি অন্যান্য সমার্থক শব্দের চেয়ে এগুলো বেশি পছন্দ করতেন। সেই পছন্দের অন্যতম কারণ হয়তো শব্দগুলো গালভরা এবং জোরালো। যে কারণে মাইকেল 'যাদঃপতিরোধ যথা চলোর্মি আঘাতে' লিখেছিলেন, সেই জোরের জন্যই হয়তো রবীন্দ্রনাথেরও আঘাত-এর চেয়ে অভিঘাত-এর প্রতি এত টান। এই জন্যই অনাসক্ত-র চেয়ে নিরাসক্ত-র দিকে

তাঁর ঝোঁক এত প্রবল। শব্দগুলো আজকের দিনে আর তেমন অপরিচিত নয়, কোনো-কোনোটা তো অতিপরিচিত। তা হলেও কে জানে হয়তো আরও অনেক বিষয়ের মতো রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়েও আমাদের উত্তমর্ণ।

শব্দবিকৃতি॥ রবীন্দ্রকাব্যে অনেক বিকৃত শব্দের সাক্ষাৎ ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই শব্দ-বিকৃতি অন্ত্যমিলের জন্য। কোথাও বা মিলের সঙ্গে মিলেছে কৌতুক। কৌতুকহাস্যের জন্য প্রচুর শব্দবিকৃতি আছে 'খাপছাড়া'য়। খাপছাড়ার হুসীশ্বর-মসীশ্বর, দইবাহিক-সইবাহিক, গরিষ্ঠ-দ্রড়িষ্ঠ-নড়িষ্ঠ ইত্যাদি। বৈলাতী যমদৌতিক হাস্যরসের জন্য বিকৃত। মিলের জন্য বিকৃত শব্দ— অবগাহনি, উতালা, উদ্‌ভ্রান্তিক, উন্মাদনি, কাঁদুনিক, গাহনি, চেহো, দাহনি, দুবাটিখানিক— মানিক, নির্বাঁধুনিক, নৈরাশা, পরশনি, পুতলা, প্রবাসযাত্র, বৈলাতী মাজনা, মৈতালি, সাজনা, সাধনি, সিচন। এই শব্দগুলোর অধিকাংশের শেষে আ, ই যোগ বা বর্জন করে শব্দের রূপান্তর সাধন করা হয়েছে। মিলের জন্য নয় এমন বিকৃত শব্দ— অনাবশ্য, দোদুল্য, নিমীল (নয়নে), নিরন্ত, পিপীলি, যমদৌতিক, শ্রুতিমধু্। এর মধ্যে দোদুল্য শব্দটি ব্যাবহারিক শব্দকোষে আছে।

সংস্কৃতীকৃত শব্দ॥ শব্দের সংস্কৃতীকরণ বা পবিত্রীকরণও রবীন্দ্রনাথের একটি বৈশিষ্ট্য। সম্ভবত বিশেষ মানসতন্ত্রের জন্যই এটা ঘটেছে। কারখানা, মল এইসব শব্দ তাঁর 'জন্ম-রোমান্টিক' মনকে পীড়া দিয়েছে। এজন্য কারখানা না লিখে কর্মশালা লিখতে পারলেই যেন তিনি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। কারখানা যে একেবারে ব্যবহার করেন নি তা নয়। যেখানে কারখানার তুচ্ছতা জ্ঞাপনই লক্ষ্য সেখানে তা অকুণ্ঠভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'বউ আসে চতুর্দোলা চ'ড়ে/আমকাঁঠালের ছায়ে,/ গলায় মোতির মালা, সোনার চরণচক্র পায়ে।'— আকাশপ্রদীপ ২৩।৮৪,৮৬। এখানে নিঃসন্দেহে রোমান্টিকতাপ্রিয়তার ছোঁয়া লেগে মল হয়েছে চরণচক্র। 'বাজুবন্ধ বা চরণচক্র' (লোকসাহিত্য ৬।৬৪০।৯) ; 'সিঁথি থেকে চরণচক্র পর্যন্ত গয়নার অভাব নেই' (যাত্রী ১৯।৪৭৭।১৬)— এ দুই ক্ষেত্রেও মল ছাড়া অন্য অর্থ করা যায় কি ? দরখাস্তের বদলে এক জায়গায় দরখাস্তপত্রিকা (১০।৬২০।১১) পাই। সম্ভবত সাধুভাষার তৎসমশব্দসংকুল বাক্যের গুরুত্বরক্ষার জন্যই পত্রিকা সংযোগ করতে হয়েছে। আবেদনপত্র বললে দরখাস্তর মধ্যে যে অর্থচ্ছটা[৩] আছে তা স্ফুটতর হয় না। অথচ শুধু দরখাস্ত কেমন নিতান্ত তুচ্ছ ও আটপৌরে ঠেকে। তাই এত প্রসাধন। পত্র-জাতীয় শব্দে পত্রিকা যোগ রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও করেছেন। যেমন প্রশ্নপত্রিকা। কিন্তু সেটা শুদ্ধীকরণের নমুনা নয়। সংস্কৃত ভাষায় এইরকম পত্রী বা পত্রিকা-পরপদান্ত শব্দ তো আছেই। রবীন্দ্রনাথও অভয়পত্রী ব্যবহার করেছেন এই অভয়েই।

এই পর্যায়ের আরও কয়েকটি শব্দ— অসিতচর্ম, উষ্ণবাক্য, কীটানুসন্ধান, কৈশিকাকর্ষণ, গ্রাম্যতা (গেঁয়োমি), চতুশ্চরণ (চার পা— 'ধরি তব চতুশ্চরণ'), প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল, ভোজ্যাবশেষ,

৩ পরিচয় ১৮।৫১৫ পৃ

ভর্তৃখাদিকা, ভাঙাবাদ্যসম, মুখবক্রকরা, পিতৃপুরুষের সাধ্য, শ্বেতচর্মী, শ্বেতাস্য, নাসিকাসীটকার, সাহেবশাবক, হস্তীঅশ্ব, হীহীকার।

আঞ্চলিক শব্দ ॥ দু-একটি আঞ্চলিক শব্দ যে রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে এতে আর আশ্চর্য কী। কিন্তু একেবারে অতিসাধারণ আঞ্চলিক শব্দ আমাদের কোনো কৌতূহল জাগায় না। যেমন 'ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান।'[৪] কিন্তু দু-একটি শব্দ অর্থ ও রূপের জন্য উল্লেখ্য। কৃষি শব্দটি কৃষিকার্য অর্থে চলে। অথচ কৃষক অর্থে রবীন্দ্রপ্রয়োগ সম্ভবত কোনো অঞ্চলবিশেষের। 'পশুপাল কৃষী ও শিল্পীর দ্বারা তাহাকে পরিবর্তিত করিয়া'— সমাজ ১২।৪৮৩। জ্ঞানেন্দ্রমোহন শব্দটিকে প্রাদেশিক বলেছেন। সম্ভবত রূপের দিক থেকে গ্রাম্ভারি শব্দটি রহস্যজনক। শব্দটি বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত। অর্থ গম্ভীর বা serious.— 'পলিটিক্স এবং অন্যান্য গ্রাম্ভারি বিষয় নিয়ে পুরুষেরা নাড়াচাড়া করুন'...— য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১।৫৭১। শব্দ দুটি রবীন্দ্রনাথে একবারই লক্ষ্য করেছি।

হিন্দি শব্দ ও ধাতু ॥ হিন্দি শব্দ ও ধাতু দু-একটা তো বাংলাতে চলে গেছে। যেমন—ভাগ্। 'তন্দ্রাজড়িমা ভাগিল পলকে/সন্ন্যাসীবর জাগিল চমকে'/, কি 'কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি/দুইজনা দুইজনে'। এইসব অতিপরিচিত বা 'প্রহাসিনী'র 'নাসিকের পত্রে'র হিন্দি শব্দের সম্পর্কেও আমি বলছি না। এ ছাড়াও দু-একটি শব্দ বা ধাতু আমরা কবিতা ও গদ্যে দেখতে পাই। উতার্ ও বুলা ধাতু ও তুরুন্ত শব্দ এর মধ্যে উল্লেখ্য। 'কণ্ঠ হতে উতারিয়া যৌবনের মালা'; 'সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া/ মুগ্ধ সে মুখখানি...'; 'উতারো ঘোমটা তব'। 'উদ্দাম বেগে ধাই তুরন্ত'। 'ভিক্ষায় কাজ নাই এখন কুত্তা বুলাইয়া লইলে বাঁচি।'

সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দ ॥ সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আবাল্য পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রসাহিত্যের মতো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ও শব্দে সংস্কৃতের প্রভাব স্পষ্ট। উপনিষদ, কাদম্বরী, মেঘদূত প্রভৃতি বইয়ের অনেক শব্দ রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যেই প্রসঙ্গক্রমে কাদম্বরী ও মেঘদূতের অনেক শব্দের ব্যবহার দেখি। যেখানে শব্দগুলো নিছক অনুবাদ হয়ে ব্যবহার হয়েছে সেখানে অর্থের দিক ছাড়া তার অন্য কোনো মূল্য নেই। কিন্তু কবি যেসব স্থলে শব্দগুলো স্বাধীনভাবে ব্যবহার করেছেন সেখানে একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। বাংলা অভিধানে শব্দগুলোর সব পাওয়া যায় না। আবলিত, আবৃষ্টিসংরম্ভঃ, উদ্ধূয়মান, কুথা, প্রকৃতিবল্লভা, বেপথুমতী, সাচীকৃত— এই শব্দ ক'টির বেপথুমতী ও সাচীকৃত অনেক অভিধানে পাওয়া যায়। সাচীকৃত কেন থাকে? সাচীকৃত-র বাংলায় ব্যবহার কই? বেপথুমতী বাংলায় চলে। কবে থেকে চলছে জানি না। রবীন্দ্রনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে অথবা কুমারসম্ভব থেকে পেয়েছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীরা সম্ভবত শব্দটি কুমারসম্ভব থেকেই আহরণ করেছিলেন।

উপনিষদের এই শব্দগুলো রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায়— অপাপবিদ্ধ (ঈশ। ৮), অসম্ভূতি (ঈশ। ১২), ইষ্টাপূর্ত (কঠ। ৮), চন্দ্রাতারক (কঠ। ১০১), দুশ্চরিত (কঠ। ৫৩), পরিভূঃ

৪ 'সোনার তরী', রবিরশ্মি, প্রথম খণ্ড

(ঈশ। ৮) পূষন্ (ঈশ। ১৫), প্রতিবোধবিদিত (কেন। ২।৪), প্রতিরূপ (কঠ। ৯।৫), প্রমুক্ত (কঠ। ১১), প্রৈতি (কেন। ১), মৃত্যুপাশ (কঠ। ১৮), সমনস্ক (কঠ। ৬২), সম্ভূতি (ঈশ। ১২), স্বয়ম্ভূ (কঠ। ৭২)। এর মধ্যে কোনো কোনো শব্দ আমাদের খুবই পরিচিত ; শব্দগুলোর উপনিষদ ছাড়াও স্বতন্ত্র প্রয়োগ আছে। তবুও এগুলোকে উপনিষদের বলছি এজন্যে, শব্দগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে উপনিষদের মধ্য দিয়েই। শব্দগুলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ কথার সত্যতা সুস্পষ্ট। প্রৈতি সম্পর্কে একটু বলার আছে। এটি শব্দ নয় ; ধাতু—প্র + এতি (গচ্ছতি)। রবীন্দ্রনাথ energy ও impulseর প্রতিশব্দ হিসেবে শব্দ রূপে কাজে লাগিয়েছেন। যথাক্রমে শান্তিনিকেতন ১৪।৪৫৮ পৃ, গ্রন্থপরিচয় ১২।৬৩৯। মেঘদূতের প্রভাব রবীন্দ্রনাথকে এতদূর প্রভাবিত করেছিল যে তিনি শুধু মেঘদূতের শব্দ ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন নি, অনুকরণে নতুন শব্দও তৈরি করেছেন। 'অস্তঙ্গমিত'-র অনুকরণে 'দূরঙ্গমিত' তৈরি। 'আমি এখন তিনকুড়ি বছরের পরপারে, নিরতিশয় দূরঙ্গমিত হয়ে বসে আছি', চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড ৪৪।৬। এমনি 'পল্লীবৃদ্ধ' শব্দটি যে 'গ্রামবৃদ্ধে'র দেখাদেখি তৈরি তা দেখামাত্রই চেনা যায়। 'চোখের বালি'তে 'পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল'-র সঙ্গে মেঘদূতের 'সেই যে অবন্তীতে গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন এবং বাসবদত্তার কথা বলিত' প্রসঙ্গের মিল আছে। 'নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুলগ্রামচৈত্যাঃ'— 'গ্রামবৃক্ষসকল বায়সাদির নীড়নির্মাণে আকুল হবে।' এই 'আকুল হবে'-র ছায়া রবীন্দ্রনাথের বাক্‌বন্ধেও (phraseology) আছে। রবীন্দ্রনাথে 'আকুল করবে' বহুবার পাওয়া যায়। 'পুষ্পচয়িনী'র (বিচিত্রিতা ১৭।২৮) গঠনে পুষ্পলাবীর প্রভাব সহজেই অনুমান করতে পারি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমাসপ্রবণতাও সংস্কৃত-সাহিত্য-পাঠের ফলশ্রুতিস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রভাবজাত।

অপরিচিত শব্দ, ধাতু, প্রবাদ॥ এইবার এমন সব শব্দ, ধাতু, প্রবাদ প্রভৃতির আলোচনায় আসছি, যেগুলোকে নতুন না বলে অপরিচিত বলতে চাই। এইসব শব্দ, ধাতু বা প্রবাদকে নতুন বলা সমীচীন নয়। বাংলা ভাষার এমন কোনো অভিধান আজ পর্যন্ত নেই যাতে সমস্ত শব্দের ঐতিহাসিক ক্রমে ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যায়। কাজেই রবীন্দ্রনাথে অপরিচিত কোনো শব্দ দেখেই আচম্বিতে নতুন বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। 'ক্রন্দসী'কে এই রকম নতুন ব'লে জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রমাদে পড়েছেন। উদাহরণত নিঃশক্তি শব্দটার উল্লেখ করতে পারি। শব্দটি সচরাচর দেখা না গেলেও রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্যে পাওয়া যায়। নারায়ণদেবের মনসামঙ্গলেই শব্দটি আছে। তাই সমস্ত বাংলা সাহিত্য তুলনামূলকভাবে পড়ে মত দিতে হবে নইলে পদে পদে ভ্রান্তির সম্ভাবনা। বর্তমান অবস্থায় তা সম্ভবও নয় ; এক-আধ দিনে বা দুটি-একটি জীবনেও সাধ্য নয়। তবুও কোনো কোনো অভিধানকার সাহস করে কোনো কোনো শব্দ 'রবীন্দ্র' বলে চিহ্নিত করেছেন। এইভাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্রমোহন অনেক ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। কিন্তু দুএকটি ক্ষেত্রে হয়তো ঠিকভাবেই সনাক্ত করেছেন। যেমন পাতি, বাক্যনবাব। কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি'— বলাকা ১২।৯। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৃণাঙ্কিত ও

বাক্যনবাব শব্দদুটি 'রবীন্দ্র' বলে চিহ্নিত করেছেন। তৃণাঙ্কিত— 'তৃণাঙ্কিত তীরে', চিত্রা ৪।৯৭। বাক্যনবাব-এর বেলায় দুজনের রায় মিলে যাচ্ছে, তবু নিঃসন্দেহে বলা শক্ত শব্দটি রবীন্দ্রনাথের কিনা। এইসব কারণেই নতুন কথাটির দুর্নিবার প্রলোভন ত্যাগ করে অপরিচিত বেছে নিয়েছি।

অপরিচিত ধাতু ॥ উৎস্রাব্ ও উদ্‌বার্ ধাতু দুটি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'এই সাধনায় বিশ্ব-কবির/আনন্দবীণ বাজে,/আপনারে দেয় উৎস্রাবিয়া/আপন সৃষ্টি-মাঝে।' 'অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি/তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।' 'অমৃতকে উদ্‌বারিত করবার জন্য…।' 'আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর…।' 'উদ্‌বারিল গন্ধ তার'।

অপরিচিত সংযোগমূলক ধাতু ॥ রবীন্দ্রনাথে কিছু সংযোগমূলক ধাতু পাই যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। এগুলো হল—

কর্ ধাতুযোগে— সভ্যতা কর্; কাট্ ধাতুযোগে— সংকোচ কাট্, সংস্কার কাট্; কাড়্ ধাতুযোগে— বিশ্বাস কাড়্, মন কাড়্; কুড়া ধাতুযোগে— লাজ কুড়া; গড়্ ধাতুযোগে— অপরাধ গড়্, কীর্তি গড়্, রুটি গড়্, সম্বন্ধ গড়্; জম্ ধাতুযোগে— রস জম্, সভা জম্; ফাঁদ্ ধাতুযোগে— অন্নঋণ ফাঁদ্, ইতিহাস্ ফাঁদ্, কথা ফাঁদ্, কাজ ফাঁদ্, কীর্তি ফাঁদ্, খেলা ফাঁদ্, ঘরদুয়ার ফাঁদ্, দুর্গ ফাঁদ্, ধর্মমত ফাঁদ্, ভিত ফাঁদ্, ভিত্তি ফাঁদ্, ভূমিকা ফাঁদ্, সংসার ফাঁদ্, সভা ফাঁদ্; বাঁধ ধাতুযোগে— বাহিনী বাঁধ, সংকল্প বাঁধ্; ভাঙ্ ধাতুযোগে— অবসাদ ভাঙ্, দ্বিধা ভাঙ্, বিশ্বাস ভাঙ্, ভাবনা ভাঙ্, রূপক ভাঙ্, সংকোচ ভাঙ্, সমাস ভাঙ্, সম্বন্ধ ভাঙ্; মার্ ধাতুযোগে হাসি মার্; রচ্ ধাতুযোগে— শয়ন রচ্; সাধ্ ধাতুযোগে— চাঁদা সাধ্, বাক্য সাধ্; পা ধাতুযোগে— অনুরোধ পা। এ ছাড়া আকর্ষণ কর্ এই সংযোগমূলক ধাতুর কর্মরূপে প্রাণ, ভাব, সত্য প্রভৃতি পাই। ঐরকম ভঙ্গ দে-ধাতুর যোগে এই সব বাগধারা পাই, খেলায় ভঙ্গ দে, তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দে, রসে ভঙ্গ দে।

অপরিচিত নামধাতু ॥ বাংলা ভাষায় নামধাতুর অভাবমোচনের জন্য মাইকেলের দুঃসাহসিক চেষ্টা মেঘনাদবধের পাতায় পাতায় মুদ্রিত। সাধারণ লোকের মুখের ভাষাতে, বিশেষত যারা খেত-খামারে কাজ করে তাদের আটপৌরে কথায় বার্তায় নামধাতুর অজস্রতা বিস্ময়কর। অথচ সাহিত্যের ভাষা বা ভদ্রলোকের কথাবার্তায় নামধাতুর একান্ত অভাব। প্রত্যেক কবিই তাঁর কাব্যে প্রয়োজন-মতো নামধাতুর সৃষ্টি করেছেন। মাইকেলের তুলনায় রবীন্দ্রনাথেও নামধাতু কিছু কম না। তফাৎ এই মাইকেলের নামধাতু যেমন চোখে ঠেকে রবীন্দ্রনাথের নামধাতু তেমন নজরে বাধে না। ভাষার সঙ্গে কেমন স্বাভাবিকভাবে খাপ খেয়ে আছে।

সমস্ত তালিকা এখানে দাখিল করা সম্ভব নয়। কয়েকটির উল্লেখ করছি— অঙ্কুরিছে, অঞ্জলিয়া অতন্দ্রিত, অধীরিয়া, অপসারি, অর্জিল, অস্ফুটিত, আকুঞ্চিয়া, আক্রমিতে, আঘাতিল, আবর্তিয়া, আবরিয়া, উচ্ছ্বাসিয়া, উজ্জ্বলিয়া, উদাসিয়া, উদিয়াছে, উদ্ঘাটিবে, উন্মাদিয়া, উন্মীলিছে, উপেক্ষিতে, উর্বরিয়া, উলসি, কম্পিয়াছে, কলুষিবে, কুসুমিয়া, কুহরিছে, কূজিছে, ক্রন্দিয়া, ক্ষরিয়া, খড়খড়ায়িত,

গুঞ্জে, গুঞ্জরিছে, গ্রন্থিয়া, ঘনায়িত, চঞ্চলিয়া, চমকি, চিন্তিছে, চিরায়মান, চিরায়মানা, চুমিয়ে, চেতাইল, জিনিতে পার্, ঝংকার, তরজে, তরঙ্গিল, তরঙ্গিয়া, তলাশিয়া, থমকি, দীপিতেছে, দীর্ঘায়মান, দীর্ঘায়মানা, ধ্যায়, ধ্বনিতেছে, নন্দিত, নন্দিয়া, নমিয়া, নিঃশেষিয়া, নিঃসরিছে, নিঃসারিত, নিঃস্পন্দিত, নিঃস্যন্দিত, নিঃস্বনিছে, নিক্ষেপিয়া, নির্ঝরিত, নির্দেশিয়া, নিশ্বসিত, নিশ্বাসিয়া, নীরবিত, নীরবিল, পসারো, পাকালিয়া, পাকিয়ে, পিঞ্জরিত, পিয়াসিত, প্রণমো, প্রতীক্ষিয়া, প্রভাতিল, ফোঁসে, বরণিতে, বহু-শাখায়িত, বাঁকায়ো, বাহির, বিকাশিয়া, বিদলিয়া, বিদীরিয়া, বিদীরিল, বিদ্যুতিয়া, বিপ্লাবিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিল, বিভাসিল, বিশ্বাসিয়া, বিসর্জিত, বিসর্জিয়া, বিসর্জিয়াছিনু, বিস্ফারি, বিস্ফারিয়া, বেষ্টিব, ব্যথিবে, ব্যাকুলিছে, ভাতিছে, ভানে, ভাষিছে, মঞ্জরী, মন্দ্রিত, মন্দ্রিয়াছিল, মন্দ্রিল, মর্মরায়মাণ, মর্মরিত, মর্মরে, মুকুলিয়া, মুখরিয়া, মুঞ্জরিয়া, মুঞ্জরিল, মূর্ছা, মেঘক্রীড়িত, মেঘায়িত, মোহিছে, ম্লানায়মান, রাঙিয়ে, রঞ্জিল, রটি, রাঙাইব, রাঙিছ, রোমাঞ্চিয়া, লোভায়, লোলুপায়মান, শ্বসিয়া, সচকিবে, সচকিয়া, সঞ্চিয়া, সঞ্চিতে, সঞ্চিয়া, সমাপিবে, সমীরিত, সমুচ্ছ্বাসি, সম্ভবে, সম্ভাষে, সরসিয়া, স্তব্ধি, স্পন্দিয়া, হিল্লোলিয়া। এই তালিকায় পূর্ববর্তীদের দু-চারটে নামধাতুও আছে। বস্তুত না বলে দিলে সেগুলো আমাদের রবীন্দ্রনাথের বলেই মনে হবে, রবীন্দ্রনাথে সেই সব নামধাতু এত বার বার পাই। 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'। এই মন্দ্রিত মাইকেলে আছে। তেমনি আক্রমিছে বা মুঞ্জরে বিহারীলালে পাই। খড়খড়ায়িত-র মতো শব্দ সংস্কৃতে অপ্রতুল নয়। ভেকঃ মকমকায়তে। রবীন্দ্রনাথ গদ্যেও এমন দুএকটি নামধাতুর ব্যবহার করেছেন যেগুলো সাধারণত পদ্যেই ব্যবহার হয়। যেমন অবহেলে ('আধ্যাত্মিক শিখরে অবহেলে চড়িয়া বসিয়া আছি।'), জিনিতে পার্ ('অন্যে তাহাকে জিনিতে পারে না।')।

অপরিচিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছ ॥ দু-চারটে অপরিচিত বিশিষ্টার্থক শব্দগুচ্ছও রবীন্দ্রনাথে পাই। আমরা অদৃষ্টের খেলা বলি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথে পাই 'অদৃষ্টের খেলেনা।' শুধু কি তাই? 'অদৃষ্টের কারখানা'ও আছে। 'আমি যে ডুবি নাই সে নিতান্তই…অদৃষ্টের কারখানা।' এমনি আছে ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়ানো। 'নিজের দায়ই সামলাতে পারি নে— তার উপর আবার ভগবান— কী বলে— ঢাকের উপর ঢেঁকি চড়িয়েছেন।'

অপরিচিত যুগ্মশব্দ ॥ সচরাচর চোখে পড়ে না এমন ক'টি যুগ্মশব্দ— অক্ষয়-অমর, অনুচর-পরিচর, অন্তরাল-ব্যবধান, আক্ষেপ-অভিযোগ, আক্ষেপ-বিক্ষেপ, আঘাত-অপঘাত, আসক্তি-অনুরক্তি, আসঙ্গ-প্রসঙ্গ, কিনার-কিনারা, গর্ত-গাড়ি, গর্ত-গুহা, জেতা-বিজেতা, ঠিক-ঠিকানা, দীপ-বাতি, বাদ-বিবাদ, বাদ-বিরোধ, বিলাপ-পরিতাপ, ভাবে-অনুভাবে, মায়া-ছায়া, যোগ-যাগ, শরণ-ঠাঁই, শিষ্টতা-শীলতা, সাধু-সাধক, স্বজন-পরিজন।

অপরিচিত যুগ্মশব্দের মত অপরিচিত বিপরীতার্থক শব্দও বেশ কিছু চোখে পড়ে। অকারী, সকারী; অকাল-অপক্ব (অকাল-পক্ব); অক্রিয় (সক্রিয়); অক্রিয় (নিষ্ক্রিয়); অগ্রসরণ-অনুসরণ; অধস্তন-উচ্চতন; অধুনাতনী-সনাতনী; অনাগমন (আগমন); অনুরূপ-

বিরূপ ; অন্তবান-অন্তহীন ; অন্তঃপুর-বহির্ভবন ; অন্তর্জগৎ-বহির্জগৎ ; অপগমন-আগমন ; অবরোহী-আরোহী ; অবিশেষ-বিশেষ ; অমূর্তপূজা, মূর্তিপূজা ; অলোভ, লোভ ; অসম্ভূতি-সম্ভূতি ; অস্থান-স্বস্থান ; আত্ম-অনাত্ম ; আত্মপর ; আত্মবিসর্জন-আত্মপ্রতিষ্ঠা ; আত্মীয়-পর ; আত্মীয় পরকীয় ; আধুনিকী বা সনাতনী ; আপন-পর ; আভিমুখ্য-বৈমুখ্য ; আরম্ভ-অবসান ; আরাম-ব্যাঘাত ; আশ্রয়-অনাশ্রয় ; উৎপত্তি-বিলুপ্তি ; উদ্যোগ-বিশ্রাম ; উপচয়, অপচয় ; উপরিবর্তী-তলবর্তী ; উপহৃত-প্রত্যাহৃত ; উহ্য বা ব্যক্ত ; ঋণ-প্রতিঋণ ; একরাষ্ট্রশাসন-যুক্তরাষ্ট্রশাসন ; কর্তব্য-অকর্তব্য ; কর্ম-বিশ্রাম ; কর্মপ্রিয়-চিন্তাপ্রিয় ; কিয়দংশ-সর্বাংশ ; গত-সমাগত ; গতি-প্রত্যাগতি ; গোচর-অগোচর ; গৌরে-শ্যামে ; ঘরে-পরে ; জীব-অজীব ; জ্ঞাতি-অজ্ঞাতি ; তিরোগমন, আগমন ; দল-বেদল ; দীর্ঘপ্রাণ-স্বল্পপ্রাণ ; ধনী-অধনী ; নিশাচর-আলোকচর ; পণ্ডিত-অপণ্ডিত ; পরাসক্তি-আত্মকর্তৃত্ব ; পাওনা-অপাওনা ; পার্থিব-আধ্যাত্মিক ; প্রতিমুখী, অভিমুখী ; প্রবর্তক-নিবর্তক ; প্রয়োগ-সংবরণ ; প্রসাদে বা অপ্রসাদে ; প্রসাদ-বিরাগ ; বচন-অনির্বচন ; বন্ধন-অবন্ধন ; বহির্জগৎ-মানসজগৎ ; বহির্দৃষ্টি-অন্তর্দৃষ্টি ; বাক্য-অবাক্য ; বিচিত্র-অবিচিত্র ; বিনতি-উন্নতি ; ব্যবহিত-অব্যবহিত ; ব্যক্ত-অব্যক্ত ; ভাষা-অভাষা ; মূঢ়-জ্ঞানী ; মৃত-জীবিত ; রূপ-বিরূপ ; রেখা এবং অরেখা ; রোগ এবং অরোগ ; শাসয়িতা-শাসিত ; সংশয়-বিশ্বাস ; সমাপ্তি ও সমারম্ভ ; সশেষ-অশেষ ; সাধুতা-হীনতা ; সামিষ-নিরামিষ ; সার্বভৌমিক-প্রাদেশিক ; সার্বভৌমিক-স্বদেশবদ্ধ ; সজন-নির্জন ; সজন-বিজন ; সুখ-অসুখ ; সুখকর ও অসুখকর ; সুবিধাকর ও অসুবিধাকর ; সুবাধ্য, দুর্বাধ্য ; সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষ ; সুযোগ-কুযোগ ; স্পষ্টত বা অস্পষ্টত ; স্মৃত-বিস্মৃত ; স্বকাল-পরকাল ; স্ববশ-পরবশ ; স্বার্থ-পরমার্থ ; হরণ-পূরণ ।

অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিত তস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ॥ সাধারণত প্রচলিত নয় এমন কটি তস্-প্রত্যয়ান্ত পদ— অজ্ঞানত, অধিকাংশত, অলক্ষ্যত, অস্পষ্টত, আমূলত, তত্ত্বত, প্রকাশ্যত, সামান্যত, স্বরূপত ।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ॥ রবীন্দ্রনাথের স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলোর মধ্যে কতকগুলো সংস্কৃত ব্যাকরণ বিধিমতে অবৈধ, কিন্তু নতুন নয় । আর কতকগুলো একেবারে অপরিচিত বলে মনে হয় ।

অবৈধ ও অপরিচিত কয়েকটি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ— অধীনী, অধুনাতনী, অবিচারিণী, অভিসারিণী, আধুনিকী (আধুনিকাও আছে), আনমননী, কবিযশঃপ্রার্থিনী, এলোকেশিনী, কাপালিনী, কৃষ্ণসারনি, খঞ্জনি, চণ্ডালিনী, চিরসুখিনী, জলার্থিনী, জাতসাপিনী, জীবপালিনী, জীবনশালিনী, তাপসিনী, ধন্বন্তরিনী, নর্তিনী, নিঃসঙ্গিনী, পতঙ্গিনী, পথবাসিনী, প্রবাসিনী, প্রয়াসিনী, প্রশ্নকারিণী, বন্ধুনী (স্ত্রীবন্ধু) বাঘী, বিংশশতকিয়া, বিজয়া (‘প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া’), বিবাগিনী, ব্যাঘ্রিনী, মুসলমানিনী, মৃত্যুঞ্জয়ী (শক্তি), রঙ্গিনী (অখিল মানসস্বর্গে অনন্তরঙ্গিনী/ হে স্বপ্নসঙ্গিনী), শুশ্রূষাকারিণী, শ্যামাঙ্গিনী, সভাপত্নী, সহপাঠিকা, সাগরী, সাথিনী, সুকণ্ঠিনী, সুকেশী, সেবাকারিণী, সৌভাগ্যদায়িনী, স্তুতিবাদিনী, স্বপ্নচারিণী, স্বাতন্ত্র্যচারিণী । এদের মধ্যে অবিচারিণী, কবিযশঃপ্রার্থিনী, চিরসুখিনী, জলার্থিনী, জীবনশালিনী, পথবাসিনী, প্রবাসিনী, প্রয়াসিনী, প্রশ্নকারিণী, শুশ্রূষাকারিণী, সেবাকারিণী, সৌভাগ্যদায়িনী, স্তুতিবাদিনী,

স্বপ্নচারিণী, স্বাতন্ত্র্যচারিণী, শব্দ ক'টি সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত শব্দহিসেবে শেষে ঈ যোগে স্ত্রীলিঙ্গ গঠিত হয়েছে। গঠনের দিক থেকে কিছু নূতনত্ব নেই; কিন্তু খুব প্রচলিত নেই। অন্য শব্দগুলোর মধ্যে অভিসারিণী স্থলে অভিসারিকা, এলোকেশিনী স্থলে এলোকেশী, খঞ্জনীর চেয়ে খঞ্জনা, চণ্ডালিনীর চেয়ে চণ্ডালী, তাপসিনীর চেয়ে তাপসী, সহপাঠিকার চেয়ে সহপাঠিনী, বেশি প্রচলিত। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি স্মর্তব্য: 'বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গে "ইনি" "ই" পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাঁচ মানে না। সে বাঙালি হইয়া আর এক পদার্থ হইয়া গেছে। তাহার চেহারাও বদল হইয়াছে।·· সংস্কৃত বিধানমতে সে কোথাও স্ত্রীলিঙ্গে আকার মানে না, এইজন্য সে অধীনাকে অধীনি বলে।'— রচনাবলী ১২।৫৭০। এই উক্তির সমর্থনে অধীনী, কৃষ্ণসারনি, চণ্ডালিনী, জাতসাপিনী, জীবপালিনী, তাপসিনী, ধন্বন্তরিনী, নর্তিনী, নিঃসঙ্গিনী, পতঙ্গিনী, বিবাগিনী, ব্যাঘ্রিনী, মুসলমানিনী, শ্যামাঙ্গিনী সাথিনী, সুকণ্ঠিনী— উপস্থাপিত করা যেতে পারে। উপরের শব্দগুলোর মধ্যে অধীন, কৃষ্ণসার, চণ্ডাল, তাপস, ধন্বন্তরি, ব্যাঘ্র, শ্যামাঙ্গ, সুকণ্ঠ— শব্দ ক'টিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম স্পষ্টত লঙ্ঘিত। ধন্বন্তরি (পুং)। স্ত্রীলিঙ্গে ধন্বন্তরী। শুধু বানানে তফাৎ। আমাদের বাংলা প্রত্যয়-ঘেঁষা মন এতে সায় দিতে চায় না। এতে শব্দ গালভরা হয় না। হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈর উচ্চারণে বাংলায় ইতরবিশেষ না থাকায় কানেও ভাল লাগে না। তাই ধন্বন্তরিনী। বন্ধুনী বন্ধুপত্নী অর্থে গ্রাম্যভাষায় চলে। রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় ফিমেল ফ্রেণ্ড্-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বাংলায় কিন্তু এই অর্থে বান্ধবীই চলছে। বাঘী বিরল প্রয়োগ। ঘনরামে আছে। বিজয়-এর স্ত্রীলিঙ্গ বিজয়া। কিন্তু এ প্রয়োগ ভাষার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। আমরা বিজয়ী ও তার স্ত্রীলিঙ্গে বিজয়িনীই ব্যবহার করে থাকি। হয়তো পদ্যে ছন্দের খাতিরেই 'আজ্ঞা'র বিশেষণ হিসেবে বিজয়া করতে হয়েছে। এইসঙ্গে বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয় সম্পর্কে কবির আর একটি স্মরণীয় উক্তি মনে হল— 'আকার-যুক্ত স্ত্রীবাচক শব্দ সংস্কৃত থেকে বাংলা ধার নিয়েছে······কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে আ প্রত্যয় বাংলায় নেই। সংস্কৃতে আছে জানি, এত বেশি জানি যে, আকারান্ত শব্দ দেখবামাত্র তাকে নারী-শ্রেণীয় বলে মনে করি।'— রচনাবলী ২৬।৪২৫। কবিও কি এই কারণেই ছড়া[৫], তাকিয়া ইত্যাদিকে স্ত্রী বলে মনে করেছেন? হয়তো স্ত্রী কল্পনা করেছেন। মুসলমানের স্ত্রী তো মুসলমানী। কিন্তু য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে (রচনাবলী ১।৫৪৪) পাই— 'একজন মুসলমানিনী সেজেছিলেন।' সম্ভবত শ্রুতিমাধুর্যের ও শুদ্ধীকরণপ্রিয়তার জন্যই অভিমানিনীর সাদৃশ্যে গঠিত। পরবর্তী কালে এই ধরনের স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ অনভিপ্রেত মনে করেছেন। '"ইংরেজি" বা "মুসলমানি" শব্দে যে ই-প্রত্যয় আছে সেটা যে সংস্কৃত নয়, তা জানাবার জন্যই অসংকোচে হ্রস্ব ইকার ব্যবহার করা উচিত। ওটাকে ইন্-ভাগান্ত গণ্য করলে কোন্ দিন কোনো পণ্ডিতাভিমানী লেখক "মুসলমানিনী" কায়দা বা "ইংরেজিনী" রাষ্ট্রনীতি বলতে গৌরব বোধ করবেন এমন আশঙ্কা থেকে যায়।'— রচনাবলী ২৬।৪২৭।

৫ রচনাবলী ৬।৫৮০ (গৃহচারিণী, অকৃতবেশা, অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলি)

কতকগুলো স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ শুধুই মিলের জন্য রচিত। তেমনি কতকগুলো আবার শুধুই গালভরা হয়, শুনতে গম্ভীর হয় বলেই স্ত্রীলিঙ্গরূপে গঠিত। মিলের জন্য রচিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ— অতলা ('ব্যথা অতলা'), অশঙ্কিনী, কঞ্জিনী, কলকলিনী, কলকিঙ্কিণী, চঞ্চলিনী, ছলছলিনী, দাহনা, নটিনী, নিরুদ্দেশা, পড়োশিনী, পাগলপরানী, পুষ্পচয়িনী, বঞ্চিনী, বিদ্যুৎবাহনী, বিবাগিনী, বিশ্বপ্লাবিনা, মঞ্চিনী, মলিনী, যাপনা, রোচনা, রোদনা, সূক্ষ্মরেখিনী। এর মধ্যে অশঙ্কিনী, কলকিঙ্কিনী, দাহনা, নটিনী, পড়োশিনী, পুষ্পচয়িনী, সূক্ষ্মরেখিনী— এগুলো শুধুই মিলের জন্য নয়। অর্থকে ছাড়িয়ে মিল প্রকট হয় নি ; যেমন হয়েছে— অতলার ক্ষেত্রে : 'তুলিয়ে দিলে ব্যথা অতলা'। 'পরান-পুতলা'র সঙ্গে মিলের জন্য অতলকে ব্যথার বিশেষণ হিসেবে গণ্য করে আ প্রত্যয় যোগে স্ত্রীলিঙ্গ করতে হয়েছে। বাংলায় এসব স্থলে স্ত্রীত্বসাধন প্রকৃতিসিদ্ধ নয়। নটিনী, পুষ্পচয়িনী একান্ত মিলের জন্যই নয়, এই কারণে যে অন্ত্যমিল ছাড়াও শব্দ দুটির অন্যত্র প্রয়োগ পেয়েছি। বাংলা ইনী-প্রত্যয়বশেই হয়তো নটিনী জিবে এসে যায়। পুষ্প চয়ন করে যে এই অর্থে পুষ্পচয়ী (-য়িন্) থেকে ঈ-প্রত্যয় যোগে পুষ্পচয়িনী।

আরও কয়েকটি স্ত্রীপ্রত্যয়ান্ত শব্দ— দম্ভিকা, পরিপ্রেক্ষণী, প্রেক্ষণী, ভ্রমণী, মঞ্জিরা, সরণী, স্তম্ভিকা। এগুলোর শেষে যে ইকা, ঈ, আ প্রত্যয় আছে তা স্বার্থে স্ত্রীপ্রত্যয় বলতে হয়। দম্ভিকা, স্তম্ভিকা হাস্যরসের জন্য দম্ভ, স্তম্ভের স্ত্রীকরণ। 'নারীসমাজের তিনি তোরণের স্তম্ভিকা।/সয় নাকো তাঁর দ্বিতীয় কাহারো দম্ভিকা।/' পরিপ্রেক্ষণী, প্রেক্ষণী ইংরেজি পার্স্পেক্টিভের অনুবাদ। পরি-প্রেক্ষণ, প্রেক্ষণ বললেও চলত। তবে প্রচলিত প্রেক্ষণ বা পরিপ্রেক্ষণ-এর সঙ্গে সামান্য তফাৎ করার জন্য হয়তো ঈ-কার যোগ। ভ্রমণী, সরণী -তেও স্বার্থে ঈ প্রত্যয়। ভ্রমণ, সরণ (পথ)-এর সঙ্গে কোনো অর্থপার্থক্য নেই। বাংলায় শব্দকে মোলায়েম করার জন্য স্ত্রীত্ববিধান সার্বজনীন বললেই হয়। শুধু তাই বা কেন ? গুরুগম্ভীর, গালভরা করার জন্য স্ত্রীপ্রত্যয় প্রবণতা দেখা যায়। চয়নিকা, চলন্তিকা, সঞ্চয়িতা, সঞ্চিতা, হসন্তিকা, আধুনিকী, আরও কত তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখানে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের অভিমত উল্লেখযোগ্য— 'বিশেষণে স্ত্রী-প্রত্যয়ের ব্যবহার দিন দিন কমিয়া যাইতে থাকিলেও স্ত্রী-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক বাড়িয়া যাইতেছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রে একরূপ অকারণেই স্ত্রীপ্রত্যয়ের ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উদাহরণ— শতবার্ষিকী, স্মৃতি-বার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী, জন্মবার্ষিকী, চয়নিকা, চলন্তিকা, রবিদীপিতা, বিবরণী প্রভৃতি।...বাঙালি গালভরা শব্দ ব্যবহার করিতে চায়— এজন্য শেষের স্বরকে দীর্ঘ করিতে পারিলে সুবিধা হয় এবং এ সুবিধা স্ত্রীলিঙ্গের ঈ প্রত্যয়ে পাওয়া যায় বলিয়াই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ব্যবহারে তাহার আগ্রহ— এ বিষয়ে সে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য।'— ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি পৃ ১০।

'গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধারমুখী' ; প্রভাতসংগীত ১।৭৩। দিবা যদিও অব্যয়, তবু স্পষ্টতই এখানে স্ত্রীরূপে কল্পিত। এই কল্পনার অধিকার সকল কবিরই আছে।

অপরিচিত শব্দ ॥ এই পর্যায়ের শব্দগুলোর অনেকগুলোই হয়তো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। দু-একটির

প্রাচীন প্রয়োগও আছে। স্বল্পপরিচিত আভিধানিক এবং অপরিচিত অনাভিধানিক এই শব্দগুলোর অনেকগুলোর গঠন কৌতূহলোদ্দীপক। শব্দগুলো হল— অচেত, অচেতনতা, অচেতনা, অত্যুৎসাহিক, অদ্বয়বিবাহ, অধঃসরণ, অধঃসাৎ, অধনী, অনাগারিক, অনির্বচন, অনুদেশ, অনুপন্থী, অনুসঙ্গী, অন্তঃকর্ণ, অন্তঃস্মিত, অন্তর্গূঢ়, অন্তর্দংশ, অন্তর্মনস্ক, অন্নপায়ী, অন্যায়ী, অপকীর্তন, অপদৃষ্টি, অপসঞ্চয়, অপ্সুদীক্ষা, অবজ্ঞননকর, অবতত, অবসাদক, অসংযমিত, অভয়পত্রী, অভিষেচন, অভুগ্ন, অভ্যুৎপাত, অল্পাশী, অশঙ্কিনী, আকিঞ্চন্য, আগামিক, আজ্ঞেয়িক, আতপ্ত, আত্মরাজকতা, আনম্র, আনুকৌলব (অনুকূলের ছেলে), আনুচর্য, আমন্থর, আয়ত্তিগম্য, আর্তিচ্ছেদ, উৎপূর্ণ, উৎশিষ্ট, উৎসুক্য, উদরায়ণ (পেটুক), উদ্‌গাথা, উদ্ভিজ্জাশী, উদ্‌ভ্রান্তিক, উপগ্রাম, উপচক্র, উষ্ণীষবন্ত, একালীয়তা, ঐকত্রিক (collective), কল্পুৎসাহী, কন্যাদায়িক, কর্ণবধিরকর, কর্মিক, কল্যতন, কাপালিনী (স্ত্রী কাপালিক), কিরীটিকা, কিশোরিকা, কুশ্রাব্য, খনিক, খনিত, খেলনক, গিরিব্রজ, গুণবন্ত, গৃহনিরীশ্বরী, গোঁজামিলন, গৌরিমা, চঞ্চলিত, চরণচক্র, ছন্দরাজকতা, জাঠরিক, দলচর, দাপনযূপ, দুরঙ্গমিত, নাভিকুণ্ডল, নিরাপত্তি, নিরাসক্ত, নিশাচর্য, পুর্ণিত, প্রিয়চারী, বায়নাবিক, মধুসন্ধায়ী, মাংসপেশল, মুকুটিত, রচনাকঞ্চু, রহঃসখী, রাঙিমা, রূপকল্প, রূপকার, রূপভাবক, লালিম, সন্দেহী, সভ্যনামিক, সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ। এই তালিকার অনাগারিক পালি শব্দ। অর্থ গৃহহীন, সন্ন্যাসী। চঞ্চলিত নিধুবাবু-তে আছে। 'চিত্ত অতি চঞ্চলিত।'

প্রচলিত অশুদ্ধ শব্দ॥ এই পর্যায়ের শব্দগুলো হয় গঠনে ভুল, নয় ভুল অর্থে প্রচলিত। এগুলোকে অশুদ্ধ বা ভুল বলে আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। রবীন্দ্রনাথে এ-জাতীয় শব্দ লক্ষ্য করার যোগ্য। শব্দগুলোর মধ্য থেকে কোনো সূত্র খুঁজে বার করতে পারলে ভাষার অন্তঃপ্রকৃতি সহজেই বোঝা যায়। এই শ্রেণীর যেসব শব্দ রবীন্দ্রসাহিত্যেও দেখা যায় তা হল— অনুবাদিত, অন্তঃশীলা, অসংযমিত, অস্তপ্রায়, অস্তমান, অস্তসূর্য, আঙ্গিক, আবরিত, আয়ত্তাধীন, আরক্তিম, আহরিত, উদ্‌গিরিত, উন্মেষিত, গর্জমান, চলমান, জীবন্ত, ধাবমান, প্রবহমান, ব্যাকুলিত, ভাসমান, ভ্রাম্যমাণ, মুহ্যমান, সকৃতজ্ঞ, সক্ষম, সচল, সম্মিশ্রণ, সম্মিশ্রিত, সলজ্জিত, সশঙ্কিত, সিচন, সিঞ্চন, সিঞ্চিত, সূর্যাস্ত, সূর্যাস্তচ্ছটা, সূর্যাস্তাভা, সৃজন, সৃজিত, স্তিমিত। এর মধ্যে কয়েকটি খুবই প্রচলিত। গঠন অথবা অর্থের দিক থেকে যত অভিযোগই থাক, অন্যান্য আরও অনেক শব্দের মতো এগুলো ভাষা থেকে বরখাস্ত করা আজ আর সম্ভব নয়। এদের শুদ্ধীকরণও এখন সম্ভব নয়। বাঞ্ছনীয়ও নয়।

ইংরেজি শব্দের অনুবাদ॥ 'সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে কিছুদিন সন্ধানের কাজ' করে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শব্দের একটি অনুবাদ-তালিকা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৪র্থ সংখ্যা। ১৩৩৬) প্রকাশ করেন। সেই তালিকার মুখবন্ধে কবিকে বলতে শুনি— 'বাংলাভাষায় গদ্য লিখতে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধরে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সে উপলক্ষে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতর খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বারবার

ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসংগত অভ্যাসে সেটা সংগতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয় যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে।'

রবীন্দ্রনাথকে যে অনেক শব্দ বানাতে হয়েছে, তার অন্যতম কারণ, প্রধানতম নয়, ইংরেজি শব্দের অনুবাদ। এইভাবেই আমরা এই সব সুন্দর ও চমকপ্রদ শব্দ পেয়েছি। Amiable = প্রিয়চারী, appetizing—ক্ষুধাকর, দ্বৈধব্য = bigamy, bird of passage—পান্থপাখি, camp-follower—আনুযায়িক, departure—তিরোগমন, exaggeration—অমিতভাষণ, jingoism—সমরোৎসাহ, monogamy—অদ্বয়বিবাহ, omnibus = বিশ্ববহ, popularity—জনাদর, programme—অনুষ্ঠানপত্র, sapling—তরুকা, undulating—ঊর্মিল, zealot—কট্টুৎসাহী।

এই শব্দগুলোর ইংরেজি ও বাংলার মাঝখানে যেগুলোতে = চিহ্ন আছে, সেইখানে কবি ইংরেজি শব্দটিও বাংলা শব্দের পাশাপাশি দিয়েছেন বুঝতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাবানের কাছ থেকে আমরা যে পরিমাণ আশা করি, তার চেয়ে অনেক কম পেয়েছি ইংরেজি শব্দের বাংলা অনুবাদ। এর একমাত্র কারণ মনে হয়, তাঁর অসামান্য স্বীকরণশক্তি। মহৎ প্রতিভার লক্ষণই এই সর্বভুক্ স্বীকরণ। তিনি সব-কিছু নিজের মতো করে প্রকাশ করতেন। তাই সাহিত্যের এত আলোচনা করে থাকলেও তাঁর লেখায় ইংরেজি পরিভাষার তর্জমা খুব কমই পাই। এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যের পরিভাষাই বা কটা পাই। শকুন্তলা ও টেম্পেস্ট্ আলোচনা প্রসঙ্গেই বা তিনি কটা পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর কারণ সমালোচনাও তাঁর আর যে-কোনো রকম রচনার মতো স্বকীয় ধারায় অভিব্যক্ত হত। এমন কি টি. এস. এলিয়টের Journey of the Magiর অনুবাদেও তাঁর এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। শুধু একটি শব্দের অনুবাদ খুবই প্রত্যক্ষ। Watermill—জলযন্ত্র (পুনশ্চ ১৬।৯৬)। আসলে বস্তুটি যে ভাষাতেই নেই। তাই বানাতে হয়েছে। কিন্তু তবু কত সুন্দর আর স্বাভাবিক হয়েছে।

অভিপ্রেত শব্দ॥ পৌনঃপুনিক শব্দ প্রসঙ্গে বলেছি কোনো বিশেষ শব্দের দিকে টান কবির এক ধরনের মানসতন্ত্রের পরিচয় বহন করে। অভিপ্রেত শব্দেও তাই বুঝি। ঘুঘুর চেয়ে কপোত, চরিত্রর চেয়ে চারিত্র পছন্দ করতেন। বাধা বা বন্ধন-এর চেয়ে বন্ধ বেশি লিখেছেন। তার কারণ রোমান্টিকতা? প্রচলিত শব্দের তুচ্ছতা ও দীনতা রবীন্দ্রনাথকে পীড়া দিত। সাহিত্যসমালোচনার বদলে সাহিত্যবিচারের পক্ষপাতী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কেননা রবীন্দ্রনাথের বিচার আর প্রচলিত সমালোচনা একেবারে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সাহিত্যবিচারও শিল্প। সেই শিল্পে ত্রুটি প্রদর্শন তেমন অঙ্গ হতে পারে না। সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ আর সর্বাঙ্গসুন্দর-এ যেমন তফাৎ দেখেছেন, তেমনিই কি সাহিত্যসমালোচনা আর সাহিত্যবিচারে তফাৎ করেছেন?

অনভিপ্রেত শব্দ॥ কতকগুলো শব্দের প্রতি তাঁর যেমন টান ছিল, তেমনি কতকগুলো শব্দ তিনি পছন্দ করতেন না। মূলত সেগুলো ইংরেজি শব্দের জোড়া-তাড়া-দেওয়া কাজ-চলা গোছের

তর্জমা। এই সব শব্দের কয়েকটি হল কৃষ্টি, বাধিত করা, বাধ্যতামূলক। তাসের দেশে— অবদান, কৃষ্টি, সম্পাদকীয় স্তম্ভ, বাধ্যতামূলক— শব্দ কটির প্রতি কটাক্ষ করা হয়েছে। কৃষ্টি (culture), স্তম্ভ (column), বাধ্যতামূলক (compulsory)-এর বদলে রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছিত শব্দ সংস্কৃতি (কোথাও প্রকর্ষ, চিত্তোৎকর্ষ), বীথিকা ও আবশ্যিক। 'বাধ্যতামূলক কথাটা আমি সইতে পারি নে।' চিঠিপত্র ৫।৭৩ পৃ। 'নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে বাধ্যতামূলক শিক্ষা।'— শব্দচয়ন, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৪।৪র্থ সংখ্যা। 'আধুনিক বাংলা লেখায় কুশ্রাব্য নাম দিয়েছে কৃষ্টি।'— মানুষের ধর্ম ২০।৩৭৮। 'আধুনিক খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে চাঞ্চল্যজনক', ২৬।১২। তা ছাড়াও আছে বাধিত করা প্রভৃতি।

ঈশ্বরের উপাধি ॥ ঈশ্বরোপলব্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যের অপরিহার্য উপাদান। সেই উপলব্ধি ঈশ্বরের নানা অভিধায় ব্যক্ত। এগুলোর অধিকাংশই নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি ও শান্তিনিকেতনে দেখা যায়। অক্ষরপুরুষ, অন্তরতর, অপাপপুরুষ, জীবননাথ, জীবনস্বামী, জীবনেশ্বর, জীবিতেশ্বর, পরমপ্রাণ, বসুধেশ্বর, বিশ্বরাজ্যেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, ভুবনেশ্বর, রাজরাজেশ্বর ইত্যাদি।

পূর্বসূরীর ঋণ ॥ 'অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়।' এই স্বীকরণের আগে রবীন্দ্রনাথকেও অনুকরণ করতে হয়েছে। কিন্তু বেশি নয়, বেশি দিনও নয়। 'তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী' (বাল্মীকিপ্রতিভা ১।২১৮ পৃ) পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাপতির সেই অমর পংক্তি মনে পড়বে— 'তিমির দিগ্‌ভরি ঘোর যামিনী,/অথির বিজুরিক পাঁতিয়া',/। 'যাও লক্ষ্মী অলকায়, যাও লক্ষ্মী অমরায়,/ এ বনে এসো না এসো না— /এসো না এ দীনজন কুটিরে।' (বাল্মীকিপ্রতিভা ১।২২৪) আর বিহারীলালের সারদামঙ্গলের (কাব্যসংগ্রহ পৃ ২১৩) 'যাও লক্ষ্মী অলকায়,/যাও লক্ষ্মী অমরায়,/এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর।"/— এ দুয়ের সাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। বিহারীলালের 'যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে'ই রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্যের (৮।৫৪) 'কন্যা ললাটিকা।' কাব্যে বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের গুরু। রবীন্দ্রনাথের উপর বিহারীলালের প্রভাব শব্দের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। তুলনীয়— অকলুষা, অধিনী (অধীনী), অফুট, আক্রমিছে, আঘাতিত, আলিঙ্গয়ে, আশয়, উপগ্রাম, উপচিত, উষসী, কপোতী, কিস্তুত, কুক্ষি (বগল), চারিভিতে, জড়িমা, দীপিকা, নৌকাডুবি, প্রজ্বলিত, প্রতিনমস্কার, প্রফুল্লিত, বিলোচন (চোখ), বিলসিত, রঙ্গভূম, রোরুদ্যমান, লোকন করা, সঘনে, সুদুর্ভর, সুদুর্লভ। বিলোচন বিহারীলালে 'চোখ'; আর রবীন্দ্রনাথে 'শিব'। গোচর— শ্রুতিগোচর, জাল— কুন্তলজাল, তিমিরজাল, মেঘজাল, রশ্মিজাল, ডোর— প্রেমডোর, -পুট ও -সংঘ উত্তরপদান্ত শব্দ সৃষ্টিতে বিহারীলালের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বিহারীলালে পাই— শোত্রপুট, রবীন্দ্রনাথে— অধরপুট, কর্ণপুট, চক্ষুপুট; বিহারীলালে— চন্দ্রসংঘ, মেঘসংঘ, শ্বাপদসংঘ, রবীন্দ্রনাথে— জনসংঘ, প্রজাপতিসংঘ, মনুষ্যসংঘ, সবুজের সংঘ, সুরসংঘ। মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণদেবের এই শব্দ ক'টি রবীন্দ্রনাথে পাই— অবধান করা, উপহাস্য, নাগপাশ, নিকরুণ, নির্বল, নিসক্তি (নিঃশক্তি), নিসঙ্ক (নিঃশঙ্ক), বহুতর, সকরুণ, সানন্দিত। আসলে শব্দগুলো প্রাচীন।

মনসামঙ্গলের কবি বিজয়গুপ্তের সঙ্গে মিল দেখি— অবিরোধে, অকরুণ, আশ্বাসিয়া, কৌতুকী, ত্বরিত, নাগপাশ, নিরাহারে, বহুতর, একভিতে, চারিভিতে, চেতাইয়া, সঘনে, সকরুণস্বরে, হিতকারী, পূর্ণিত।

প্রাচীন সাহিত্য খুঁজলে এমন অনেক মিলই চোখে পড়বে। আর তা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, ভাষার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী ; ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ভুঁইফোঁড় নন।

প্রবর্তক কে ॥ এখানে এমন কতকগুলো শব্দের তালিকা পেশ করছি যেগুলো আজ আমাদের খুবই পরিচিত ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথে সেগুলো দেখলেই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে প্রবর্তক কে ? অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতো এই সব শব্দের প্রবর্তনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথই কি আমাদের উত্তমর্ণ ?

অধ্যক্ষ (ডিরেক্টর, ১৩০২), অন্তরায়ণ (internment, ১৩৩৬), অপভাষা (slang, ১৯২৮। ১৩৩৫), উদ্বর্তন (survival ১৩২৪ ; কিন্তু শব্দকলপদ্রুমে আছে— আবটান ইতি ভাষা। কবে থেকে survival অর্থ পরিগ্রহ করল ?), উপজাতি (tribal race, ১৯৩৪), কথিকা (১৩২৭), ছান্দসিক (১৩৩৮), জনসংঘ (১৩০৯, যদিও বিহারীলালে আছে, তবু এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই হয়তো প্রচলনের কৃতিত্বের দাবিদার), জনাদর (জ্ঞানেন্দ্রমোহনের উদ্ধৃতি ভারতবর্ষ ১৩৩২। রবীন্দ্রনাথ ১৩৩২), জাগতিক (১৩০১,), জীবনদেবতা (১৩০২), ঝোঁক (accent, ১৩২১), ধর্মগোলা (১৩১৪), নৈর্ব্যক্তিক (১৩১৩), পরিপ্রেক্ষণী (১৩৪৮), পরিপ্রেক্ষণিকা (১৯৩৫), পরিপ্রেক্ষিত (১৩০০), প্রতিনমস্কার (১৩০০। বিহারীলালে আছে।), প্রজাতন্ত্র (১৩০৮), বিশেষ সংবাদদাতা (১৩৩৪-১৩৩৫), ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য (১৩১৩), ভাবালুতা (দিলীপকুমার রায় ১৩৩৩, সবুজপত্র ১৩৩১। সাহিত্যের স্বরূপ ১৩৪৭ ; আগে আছে কিনা লক্ষ্য করি নি।), মাধ্যমিক (১৩১৩), মহাজাতি (১৩০৮), রূপকল্প (১৩৪১), রূপকার (১৩৩৪), লোকসাহিত্য (১৩১৪)। এই শব্দগুলোর অনেক শব্দই নতুন নয়। কিন্তু না হলেও এই সব শব্দ কবে থেকে প্রচলিত হতে শুরু করেছে। মোহিতলাল তাঁর আধুনিক সাহিত্যের ভূমিকায় লিখেছেন, 'ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শব্দটি আমারই রচিত, দেখিলাম চলিতেছে।' তাঁর রচনা 'রবীন্দ্রনাথে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে (জয়ন্তী-উৎসর্গ উপলক্ষ্যে লেখা। ১৩৩৮) তৎপূর্বে তাঁর কোনো লেখায় আছে কি না জানি না। শব্দটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর ধর্ম বইয়ে (১৩।৪২৬) বহু আগেই individualismএর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করেছেন ১৩১৩ সালে।

মহাজাতিসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের বহু আগেই মহাজাতির কল্পনা রবীন্দ্রনাথের মনে এসেছিল, শব্দটির রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রয়োগকাল দেখলেই তা বোঝা যাবে।

উদ্ধৃতিগুলির পরে অনেক ক্ষেত্রে যে-সংখ্যা মুদ্রিত আছে তা রবীন্দ্র-রচনাবলীর খণ্ড ও পৃষ্ঠা-নির্দেশক ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে তৃতীয় একটি সংখ্যায় ছত্রও নির্দেশ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রপ্রতিভার বৈচিত্র্য

শ্রীসোমনাথ মৈত্র

রবীন্দ্রযুগে বাঙালী হয়ে জন্মলাভ করে আমাদের কতকগুলো সুবিধে হয়েছে, কিছু অসুবিধেও হয়েছে। সুবিধে হয়েছে এই যে, প্রথমতঃ, বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে পেয়েছি বলে রবীন্দ্রসাহিত্যের সকল ঐশ্বর্যের দ্বার আমাদের কাছে খোলা, এত বড় সম্পদে আমাদের জন্মাধিকার। অন্যভাষী যে-সমুদ্রের তীরে দু-চারটে নুড়ি কুড়িয়ে বেড়ায় এবং সাধনার ক্লেশ সহ্য করার শক্তি বা ইচ্ছে নেই বলে যে অমৃতসাগর থেকে চিরবঞ্চিত থেকে যায়, তার সকল সুধা আমাদের জন্যে ধরা রয়েছে, পান করলেই হল। দ্বিতীয়তঃ, এ যুগে জন্মে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা ও গ্রহণ করা সহজ হয়েছে, কেননা প্রতি নিশ্বাসে তাঁর সর্বব্যাপী প্রভাব নিজমধ্যে প্রবেশ করেছে, তাঁর ভাবে ভাবিত করে তুলেছে, তাঁর চোখে জগৎকে দেখতে শিখিয়েছে। কালের দূরত্ব এই সহজে বোঝা ও সানন্দে গ্রহণের অন্তরায় হতে পারত।

অপরপক্ষে অসুবিধে হয়েছে এই যে হিমালয় দেখার পর আর ছোটখাটো পাহাড়পর্বত চোখেই পড়ে না। রবীন্দ্রসাহিত্যের সঙ্গে আবাল্যপরিচয়ের ফলে মনের মধ্যে সাহিত্যের একটা মান অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছে। তাই যা সত্যিকারের বড় নয় সেই সব লেখা নিয়ে মাতামাতি করা রবীন্দ্রসাহিত্যরসে পুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এতে কিছু অসুবিধে আছে। কারণ, যা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকা হয়ত চলত তা বিস্বাদ লাগে, খাপছাড়া বা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ মনে হয়; তাতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার মত বেশি কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

তা হোক, এতে খেদ করবার আসলে কিছুই নেই। রবীন্দ্ররচনার উপভোগ এত বড় জিনিস, তার সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় এত বড় লাভ, যে ছোটখাটো ক্ষতিক্ষত তার তুলনায় ধর্তব্যই নয়।

অবশ্য সম্যক্ পরিচয় সহজ কথা নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যের এত বিপুল বিস্তার যে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা শ্রমসাধ্য এবং দীর্ঘসময়সাপেক্ষ। সাহিত্যের যত রকম বিভাগে আজ পর্যন্ত লেখা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যেকটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, অসংখ্য চিঠিতে তাঁর প্রকাশ যেন নিঃশেষ হতে চায় না। সাহিত্যে এমন সর্বতোমুখী কৃতিত্বের তুলনা কোথাও নেই। তবে এ কথা সত্য যে তাঁর যে-কোনো রচনা মূল্যবান হলেও, তাঁর অদ্বিতীয়তা গীতিকবিতায়। ইংরেজির মাধ্যমে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের যেটুকু পরিচয় পেয়েছি তা থেকে বলা যায় যে সে-সাহিত্যে নাটকে বা উপন্যাসে তাঁর সমকক্ষ, এমন-কি তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, লেখকের কথা আমরা জানি; তা ছাড়া ছোটগল্পে বা প্রবন্ধে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ হলেও তার তুলনা কোথাও মেলে না বলা যায় না। কিন্তু জগতের গীতিকবিদের তিনি রাজা। এত সংখ্যক এত উৎকৃষ্ট কবিতা ও গান আর কেউ

রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯১১

শিল্পী শ্রীঅতুল বসু

লিখেছেন বলে তো জানা নেই। শেক্‌স্‌পীয়রের নাটকগুলি সম্পর্কে একটা কথা শোনা যায় যে বিশ্বের নাট্যসাহিত্যে এহেন quantity of quality, উৎকর্ষের পরিমাণ, আর কুত্রাপি দেখা যায় না; এতগুলি এত উৎকৃষ্ট নাটক আর কেউ কখনো লেখেন নি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এ কথা বলা চলে যে গীতিকবিতায় ও গানে তাঁর quantity of quality এত বেশি যে আজ পর্যন্ত তাঁর কাছাকাছিও আর কোনো কবি পৌঁছেছেন কিনা সন্দেহ।

কাব্যের মূল্যবিচারের রীতির বিস্তারিত আলোচনার স্থান এ নয়। নিতান্ত সংক্ষেপে এ কথা বলা যেতে পারে যে সমালোচনা-শাস্ত্রের কোনো আইনকানুন বা ঐ জাতীয় বাইরের কোনো মাপকাঠি দিয়ে গ্রহণযোগ্য কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না, যেহেতু কাব্যের মর্মে পৌঁছবার রাস্তা শাস্ত্র নয়, রসিকচিত্ত। তাই ইংরেজ কবিপ্রবর ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিকে বোঝা সম্বন্ধে বলেছেন—

You must love him ere to you
He will seem worthy of your love.

— ভালো লাগা উচিত কিনা তা বিচার করার আগেই তাকে ভালোবেসে ফেলা চাই। যিনি যথার্থ কাব্যরসিক, কাব্যে শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে তাঁর চিত্ত মার্জিত ও সুসংস্কৃত; সুতরাং তাঁর রুচি সুন্দর এবং রসবোধ সহজ ও অভ্রান্ত হওয়াই সম্ভব। বুদ্ধি দিয়ে রসের বিচার তিনি করেন না, কেননা তিনি চান সৌন্দর্যের অখণ্ডানুভূতি, রসোপলব্ধির সমগ্রতা, বিশ্লেষণে যা পাওয়া যায় না। তিনি বোঝেন যে

Our meddling intellect
Misshapes the beauteous form of things,
It murders to dissect.

সব দেশেই কাব্যরসিকেরা কাব্য থেকে চেয়েছেন একটা সামগ্রিক আনন্দ ও বিশুদ্ধ আবেগ, অন্তরের গভীরে একটা সুখদুঃখের মন্থন। যে কাব্যে তা পেয়েছেন তাকে পরমধন বলে বুকে করে রেখেছেন। কাব্যে যাঁরা খোঁজেন তত্ত্ব, যাঁরা তা থেকে চান ধর্মপ্রেরণা বা জাতীয়তার উন্মাদনা, তাঁরা কাব্যেতর কোনো জিনিসের সন্ধানী। তাই রবীন্দ্রকাব্যে গভীর কি তত্ত্বকথা আছে, ঈশ্বরভক্তি বা দেশভক্তি তাতে জাগায় কিনা, নৈতিক পাথেয় তাতে কি পরিমাণে আছে— রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে 'এহ বাহ্য'। কারণ দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সত্ত্বেও কাব্য কাব্যহিসেবে অপূর্বও হতে পারে, অসারও হতে পারে। রবীন্দ্রকাব্যে সমাজচেতনার প্রকাশ, উপনিষদের বাণীর সঙ্গে সাদৃশ্য, বা আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের তত্ত্ব বা বিজ্ঞানের তথ্যের উল্লেখ নিয়ে বেশি মাথা ঘামালে, রবীন্দ্রকাব্যের পূর্ণ উপভোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হব।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কবিতায় সেই মন্ত্রশক্তি আছে যা শ্রবণ বা উচ্চারণ মাত্র মোহিত করে দেয়। সে-সব কবিতার মানে বোঝবার জন্যে প্রাণপাত করতে হয় না, তাদের বাক্যের অর্থে ও সংগীতে একেবারে নিবিড় মিলন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষা ঈষৎ বদল করে তাদের সম্বন্ধে বলা যায়-

You will love them ere to you
They will seem worthy of your love.

অর্থাৎ তাদের পরিচয়পত্র পরীক্ষার পূর্বেই তারা মনের সদর দরজা পেরিয়ে একেবারে হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছয়। পরে হয়ত বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আশ্চর্য শিল্পচাতুর্য রয়েছে তাদের বাক্যবিন্যাসে বা ধ্বনিযোজনায়। কিন্তু সেটা হল পরের কথা; গোড়ার কথা হল এই যে তাদের কাছে কোনো কৈফিয়ত তলব করার আগেই তারা আমাদের হৃদয় অধিকার করে বসে, তাদের ভাব ও সংগীতের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য দিয়ে। কোনো অধ্যাপকের ব্যাখ্যা, কোনো গবেষকের গবেষণার অপেক্ষামাত্র না রেখেই তারা আমাদের মুগ্ধ করে, পরিচিত প্রকৃতি ও মানবজীবনের অপরূপতার দিকে আমাদের চোখ খুলে দেয়।

২

সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রতিভার উজ্জ্বলতম প্রকাশের আভাস মাত্র দিয়ে তার অন্যান্য দিকের কিছু আলোচনা এখন করা যাক। যদিও তাঁর মত সাহিত্যপ্রতিভা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে বিরল, তথাপি এ কথা তাঁর সম্পর্কে বলা চলে যে তাঁর সাহিত্যকীর্তির চেয়েও তিনি মহৎ। বয়স যখন তাঁর কম ছিল তখন এক সময়ে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে বাংলার নিভৃত শান্তিময় পল্লীপরিবেশে একান্ত ভাবময় কবিত্বময় জীবন কাটিয়েছেন, কাব্যপাঠে ও কাব্যরচনায় তাঁর দিনগুলি কানায় কানায় পূর্ণ করে দিয়েছেন; কিন্তু এত অল্পে সুখলাভ ছিল তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাতে তাঁর প্রতিভার স্ফুরণ সম্ভব ছিল না। নব নব ক্ষেত্রে সৃষ্টির তাগিদ তাঁকে চিরদিন চালিয়েছে, কোনো সফলতায় তৃপ্ত হয়ে থেমে যেতে দেয় নি। তাই যেখানে আকাশের আলো থেকে, বহুবিস্তৃত প্রান্তর থেকে, তাঁর চিত্ত অমৃত গ্রহণ করেছে, যেখানে কাব্যরচনায় মগ্ন থেকে আর যে-কেউ জীবন সার্থক মনে করত, সেই নিভৃত সুন্দর পল্লীবাসে রবীন্দ্রনাথের মন ভরল না। সে-সময়কার একটা চিঠিতে লিখেছেন বিচিত্র রকমের কাজ তিনি হাতে নিচ্ছেন এবং অনুভব করছেন যে বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে কাজের মধ্যেই পুরুষের যথার্থ চরিতার্থতা। প্রকৃতি থেকে মানবের ক্ষেত্রে আপনাকে ব্যাপ্ত করে সকলের সঙ্গে যুক্ত হবার আবেগ এই সময়ে তাঁর চিত্তকে ব্যাকুল করে তুলল, নির্জনতার শান্তি ও আরাম ছেড়ে তিনি কর্মজীবনের সংগ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বারে বারেই এই ভাবে তাঁর জীবনের এক-একটি অধ্যায়ে দাঁড়ি পড়েছে, সম্পূর্ণ নূতন অন্য পর্ব শুরু হয়েছে। বয়স যতই তাঁর বেড়েছে বিচিত্র কর্মভার তিনি ততই গ্রহণ করেছেন, শত রকমের চিন্তা, কাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর দিয়ে তাঁর প্রতিভাকে নূতন বিকাশের পথে চালিত করেছেন। তাঁর মধ্যে এত বিচিত্র শক্তির সমাবেশ যেমন বিস্ময়কর সেই শক্তিসমূহের প্রয়োগে এত শৃঙ্খলা, এত শিল্পীসুলভ নৈপুণ্য তেমনি বিস্ময়কর। ব্যক্তিত্বের এমন সুডৌল পূর্ণতার দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দেখা যায়

তাঁর বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে সামঞ্জস্যের ধারণা করতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখা দরকার। তাঁর কবিকৃতির সঙ্গে তাঁর অন্যান্য কাজের একাত্মতা উপলব্ধি

করা প্রয়োজন। এজন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী ভালো করে জানা চাই। জানা অবশ্য কঠিন, কারণ তাঁর জীবনী এতদিন পর্যন্ত একরকম ছিলই না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বিপুল প্রয়াসে সে অভাব বহুলাংশে দূর করেছেন তাঁর অসংখ্য-তথ্য-সমৃদ্ধ রবীন্দ্রজীবনীতে। এ বইয়ের শুধু পাতা উল্টে গেলেও বোঝা যায় যিনি এ জীবনীর বিষয় তিনি কি আশ্চর্য মানুষ ছিলেন। একজন মানুষের পক্ষে এত রকমের কাজ হাতে নেওয়া এবং সুসম্পন্ন করা, এত অসংখ্য লোকের নিত্যসংস্পর্শে আসা, এত নূতন পন্থায় পথপ্রদর্শক হওয়া— ধারণা করাও কঠিন। অথচ অবিচলিত শান্তি ও পরিপূর্ণ প্রসন্নতা বজায় রেখে এই অসংখ্য ও বিবিধ কর্মের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর জীবনের রথ চালিয়ে গিয়েছেন, ধুলোও ওড়ান নি, চাকার ঘর্ঘর শব্দে চারিদিক সচকিত করেও তোলেন নি। তিনি ছিলেন শুধু কাব্যেই নয়, জীবনেও কবি।

৩

তাঁর প্রতিভার সাহিত্যেতর কয়েকটি বিশিষ্ট প্রকাশের কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা এবারে করব। প্রথমে ধরা যাক শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা, এবং তার থেকে কালক্রমে বিশ্বভারতীর উদ্‌ভব। যে শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের স্কুল-কলেজে প্রচলিত তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন যে লক্ষ্যে ও উপায়ে তা আমাদের একান্ত অনুপযোগী, তাতে না হয় প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষা, না হয় মনুষ্যত্বের স্ফুরণ। তাই আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষাকে বর্তমানের উপযোগী করে আশ্রম পরিবেশে সে শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব তিনি নিলেন। দেশবাসীর কাছে এমনকি অনেক বন্ধুবান্ধবের কাছেও তিনি উৎসাহ বা সহায়তা পান নি। অতি সামান্যভাবে মাত্র গুটিকয়েক ছাত্র ও সহকর্মী নিয়ে তিনি বোলপুরের উন্মুক্ত প্রান্তরে এই অধুনা বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। এখানে যে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা তিনি করলেন এবং যাতে নিজে সক্রিয় অংশ নিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন তার লক্ষ্য ছিল পূর্ণতা, মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাই শুধু পুঁথিগত বিদ্যার ব্যবস্থা করে তিনি ক্ষান্ত হন নি, তার সঙ্গে চিত্রবিদ্যা, সংগীত, অভিনয়, খেলাধুলো, নানারকম হাতের কাজ, আশেপাশের গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগস্থাপন ও গ্রামোন্নয়ন প্রভৃতি প্রয়াসকে সমান উৎসাহ দিয়েছেন। প্রথম থেকেই তাঁর সংকল্প ছিল যে 'আশ্রমের ছেলেরা চারিদিকের জগতের অব্যবহিত সম্পর্কে উৎসুক হয়ে থাকবে— সন্ধান করবে, পরীক্ষা করবে, সংগ্রহ করবে।' এ লক্ষ্য সাধনে দেশের কাছ থেকে তিনি আনুকূল্য পান নি, বরং পেয়েছিলেন তাচ্ছিল্য বা উপহাস। কিন্তু কোনো বাধা তাঁকে বিরত করতে পারে নি— অর্থাভাব, প্রিয়জনের মৃত্যু, ঔদাসীন্য, কিছুতেই তিনি বিচলিত হন নি। অবশেষে একদিন এল যখন তাঁর প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ গুণীজন তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাজে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন, এবং তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তব হয়ে উঠল বিশ্বভারতীর সৃষ্টিতে। এ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথেরই উপযুক্ত, কারণ বিশ্বভারতীর ভিতে দিয়ে রচিত হয়েছে জগতের একটি মিলনতীর্থ।

৪

রবীন্দ্রনাথকে যখন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গান-রচয়িতা বলা হয় তখন তাঁর গানের কথার সৌন্দর্য মনে করেই সাধারণতঃ এ উক্তি করা হয়। কিন্তু হাজার দুয়েক গানের কথাই শুধু তিনি রচনা করেন নি, সেসব গানের সুরকারও তিনি। ছেলেবেলা থেকে তাঁদের বাড়িতে সে সময়কার সব বড় গায়কের গান শোনার সুযোগ তাঁর হয়েছিল ; তা ছাড়া য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ঘটেছিল। বাড়িতে এই দেশী বিদেশী সংগীতচর্চার আবহাওয়ায় তিনি বাল্যকাল থেকে মানুষ ; এবং বাংলা দেশের একান্ত নিজস্ব বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালী প্রভৃতি সুরও তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেছিল। সুতরাং সুরকার হবার যোগ্যতার বুনিয়াদ তাঁর পাকা করেই তৈরি হয়েছিল। যাকে তাঁর 'উচ্চাঙ্গ' সংগীত বলা হয়, তাঁর প্রথম দিকের সেই গানগুলিতে মৌলিকতা অবশ্য কম, কারণ সেগুলি সাধারণতঃ তৎকালীন ওস্তাদদের কণ্ঠে শ্রুত বিখ্যাত হিন্দিগানের সুরে বসানো। কিন্তু পরবর্তী কালের তাঁর গানের সুরে ও ঢঙে এমন আশ্চর্য নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য, যে তাঁকে ভারতবর্ষের আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা বলতে দ্বিধা হবার কথা নয়। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে আমাদের রাগরাগিণীর কাঠামোতে তাঁর সকল গানই বিধৃত। কিন্তু তিনি বাঁধা পথ ছেড়ে সুরের অপূর্ব নূতন সংমিশ্রণ ও গাইবার অভিনব রীতি তাঁর গানে প্রবর্তিত করেছেন। তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি আমাদের মার্গসংগীতের বিধিনিষেধকে অতিক্রম করলেও, তাঁর রসবোধ ও রুচি গানে তাঁর নিত্যনব সৃষ্টিকে সৌন্দর্য ও সুষমা দিয়েছে। তাঁর গান বাদ দিয়ে বাঙালীর জীবনই চলে না। সুখের দিনে তাঁর গান দিয়ে আমরা উৎসবের আনন্দবর্ধন করি। শোকের দিনে তাঁর গান আমাদের মনকে শান্ত করে, দুঃখের তিমিরে মঙ্গলের আলোক জ্বেলে দেয়। ছয় ঋতুর পালা তাঁর গানে মুখরিত। স্মরণীয় এমন কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের হয় না, প্রাণে এমন কোনো তীব্র অনুভূতি জাগে না, যা তাঁর কোনো-না-কোনো গানের সুর আমাদের মনে করিয়ে না দেয়। নিজ দেশবাসীর জীবনে আর কোথাও কোনো গীতকারের এত বড় প্রভাবের কথা শুনি নি।

বহুদিন আগে লেখা ছিন্নপত্রের একটা চিঠিতে পাই : 'ঐ চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে, তার প্রতি আমি হতাশ প্রণয়ের লুব্ধ দৃষ্টিপাত করে থাকি।' যৌবনে যার প্রেমে বঞ্চিত হয়ে হতাশ হয়েছিলেন, সত্তর বছর বয়সে সে বিদ্যাকে আয়ত্ত করে তার প্রসাদ তিনি লাভ করলেন। এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। শেষ জীবনে তিনি প্রকাশের এই একটা নূতন পথ পেয়ে গেলেন, আর কি উৎসাহে সে পথ দিয়ে বিচিত্র ও অপ্রত্যাশিত সৃষ্টির পর্ব শুরু হল। তাঁর অবচেতন মনের কোন অতল থেকে বেরিয়ে এসে কলমের আঁচড়ে আর তুলির টানে অদ্ভুত সব রূপ ফুটে উঠতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের ছবির মূল্যবিচার করতে যাওয়া আমার সাধ্যের অতীত, তাই এ সম্বন্ধে বিখ্যাত চিত্রকর শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের অভিমতের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করাই সমীচীন মনে করি। তিনি বলেছেন—

অবচেতনা ও আকস্মিক সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্য, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য প্রয়োজন শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা।···রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে কিন্তু ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এ ক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্য হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝবার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতেই।···বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছে ঘেঁষতে পারে নি··· রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য।

৬

রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার দু-একটা দিকের সামান্য পরিচয় দেওয়া গেল। তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখে গিয়েছেন শুধু তাঁর বিবিধ রচনার বিপুল সম্ভারে নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনেও। তিনি ছিলেন যুগস্রষ্টা, একটা সারা জাতিকে তিনি গড়েছেন। অন্ধকে দিয়েছেন আলো, মৃতজনকে দিয়েছেন প্রাণ। আলস্য ও আত্মপ্রসাদের তামসিকতা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার করে তাদের তিনি দিয়েছেন সত্যদৃষ্টি, কর্মোদ্যম ও আনন্দ। তাদের মুখে দিয়েছেন ভাষা, কণ্ঠে সুর, প্রাণে আশা, চরিত্রে আত্মসম্মানের বলিষ্ঠতা। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের মিলন ঘটিয়েছে। দূরবিদেশী পরকে করেছে আপন জন। তিনি ছিলেন জগৎপথের পথিক, যে পথ দিয়ে যখন চলে গিয়েছেন সেখানেই তাঁকে যে দেখেছে, তাঁর কথা যে শুনেছে সে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে ; বিদ্যাভিমান জাত্যভিমান ঐশ্বর্যের অহংকার ভুলে তাঁর কাছে মাথা নত করে মানুষের মহত্ত্বের কাছেই জানিয়েছে প্রণতি ; তাঁর দেবোপম রূপে ও ব্যবহারের অনুপম দাক্ষিণ্যে, তাঁর কথায় ও কাজে, জীবনে যা শিব ও সুন্দর তারই অম্লান মহিমার পেয়েছে পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প

শ্রীঅজিত দত্ত

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা বহুমুখী। ছোটগল্পে তাঁর প্রতিভার এই বহুমুখীনতার সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কবি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংগীতরচয়িতা, নাট্যকার, কাহিনীকার, ভাষাশিল্পী এবং সমাজ ও স্বদেশের বহুবিধ ক্ষেত্রে আমাদের চিন্তানায়ক— সর্বত্রই তাঁর প্রতিভা-বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। তাঁর কবিতা অনেকসময় গান হয়ে উঠেছে, গানগুলি যুগপৎ কাব্যে ও সুরে ঝংকৃত। কাব্যে তিনি নাটকীয়তা এনেছেন, আবার তাঁর এক-একটি নাটক যেন এক-একটি কবিতা। সমাজ, স্বদেশ ও মানবতার ক্ষেত্রে তাঁর গভীর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর বিভিন্ন সময়ের বহু কবিতায় ও উপন্যাসে ছড়ানো। গদ্যে ও পদ্যে ভাষা ও ছন্দে তিনি বহুবৈচিত্র্য এনেছেন। কিন্তু তাঁর ছোটগল্পের মতো একাধারে, একই কাঠামোর মধ্যে, কাহিনী-গ্রন্থন ও চরিত্র-সৃষ্টি, নাটকীয়তা ও কবিত্ব, সমাজ-স্বদেশ ও বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি ও তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্য-বেদনার এমন অপূর্ব উদ্‌ঘাটন এবং মানব-মনস্তত্ত্বের এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে অন্যত্র দূরের কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিরল।

এর অর্থ নয় যে, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব তাঁর অন্যান্য ক্ষেত্রের কৃতিত্বকে অতিক্রম করে গেছে ; এর অর্থ শুধু এই যে, ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রতিভার সমন্বিত রূপটি যত সহজে চোখে পড়ে, তেমন সহজে অন্য কোথাও দেখা যায় না।

'ভিখারিণী', 'ঘাটের কথা', 'রাজপথের কথা', ও 'মুকুট' বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার আরম্ভ ও প্রধান কাল মানসী সোনার তরী চিত্রার সমসাময়িক। এ সময়ের গল্পগুলি তাঁর নিজেরও বিশেষ প্রিয় ছিল। সমসাময়িক কাব্যগ্রন্থগুলিতে যে প্রকৃতিপ্রেম ও সৌন্দর্যপ্রীতি এবং সর্বোপরি ভাবকল্পনার যে ছন্দোময় রূপটি প্রকাশিত, ছোটগল্পগুলিতে তার কোনোটিই দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এ-সমস্তই কাহিনীর আবরণে আচ্ছন্ন। কাহিনী যদিও অনেকসময়ই ক্ষীণ, তবু অলস মনকে কাহিনীর কৌতূহলই আকর্ষণ করে বলে, রবীন্দ্রনাথের গল্পের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য কখনো কখনো চোখ এড়িয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করতে ভালোবাসতেন। গল্পের কল্পনায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতাও ছিল। কিন্তু তাঁর গল্পগুচ্ছের অজস্র বিচিত্র কাহিনীর মধ্যে এমন গল্প কমই খুঁজে পাওয়া যায়, যা গল্পবস্তুকে অতিক্রম ক'রে একটি ভাবব্যঞ্জনায় গিয়ে না পৌঁছয়। প্রথমজীবনে এই-জাতীয় ব্যঞ্জনাময় গল্প ছাড়া অন্যজাতীয় গল্পের কথা তিনি বোধ হয় ভাবতেনই না, কারণ, সোনার তরীর 'বর্ষাযাপন' কবিতায় তিনি সেই-জাতীয় গল্প লেখারই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন যেখানে

নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।

এই শেষ হয়েও শেষ না হওয়া, এরই নাম ব্যঞ্জনা; উৎকৃষ্ট কাব্যের এইটিই প্রধান লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি, বিশেষতঃ তাঁর গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্প, পড়া হয়ে গেলেও তার রেশটি অনেকক্ষণ মনের মধ্যে গুঞ্জন করে; শেষ হয়েও যেন শেষ হয় না।

তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর প্রতিমায় কাব্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর গল্পে 'ঘটনার ঘনঘটা' অপ্রধান। অধিকাংশ গল্পেই ঘটনা অত্যন্ত অল্প— কখনো কখনো এত অল্প যে তাকে একটি রেখাচিত্র বললেই হয়। কিন্তু একটি ভাবের ব্যঞ্জনা গল্পগুলিকে মহিমা ও শ্রী দান করে বলে ঘটনার বিরলতা বা অপ্রাধান্য পাঠকের মনে অতৃপ্তি আনে না। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে কাব্যধর্মী বলে বর্ণনা করা যায়, এমন কি কোথাও কোথাও লিরিকধর্মী বললেও অত্যুক্তি হয় না।[১]

কিন্তু দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গল্প সম্পর্কে কথাটা অনেকে অভিযোগরূপে ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প কাব্যধর্মী, অতএব তা অবাস্তব, এই রকম একটা অভিযোগের আভাস পেয়েই কবি লিখেছিলেন—

আমি বলব আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটে নি, যা-কিছু লিখেছি নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।[২]

রবীন্দ্রজীবনের যে-পর্বে 'গল্পগুচ্ছ' রচনার সূত্রপাত ও কবির গল্প-প্রবণতার তীক্ষ্ণতম প্রকাশ দেখা যায়, আগেই বলেছি সেটা মানসী সোনার তরী চিত্রার সমসাময়িক, অর্থাৎ কাব্যপ্রেরণার মধ্যাহ্ন-কাল। এ প্রবণতা মানসীর 'বর্ষাযাপন' কবিতাটিতে প্রকাশিত। ছিন্নপত্রেও সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট রেখাচিত্র— কোথাও প্রকৃতি, কোথাও পল্লীজীবন, কোথাও মানব-চরিত্র; এগুলিকে আমরা বলতে পারি গল্পের বীজ। এদেরই সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে।'[৩] এ সময়ে ছোট ছোট চোখে-দেখা দৃশ্য অবলম্বন করে গল্পরচনার দিকে যে কবির ঝোঁক এসেছিল, বস্তুতঃ জীবনটাই একটা গল্পের ছোট ছোট দৃশ্যরূপে যে তাঁর চোখে ধরা দিতে আরম্ভ করেছিল, ছিন্নপত্রের বহু স্থানে তার প্রমাণ আছে। একখানি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

এখনো অনেক দূর, অনেক ঘটনা, অনেক অন্বেষণ বাকি; এখনো কত অজ্ঞাত নদীতীরে, কত অপরিচিত সমুদ্রসীমায়, কত ক্ষীণ চন্দ্রালোকিত অনাগত রাত্রি অপেক্ষা করে আছে; তার পরে হয়তো অনেক ভ্রমণ অনেক

১ গিন্নি, কঙ্কাল, একরাত্রি, ক্ষুধিত পাষাণ

২ রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়

৩ রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়

রোদন অনেক বেদনের পর হঠাৎ একদিন 'আমার কথাটি ফুরোল, নটে শাকটি মুড়োল'— হঠাৎ মনে হবে, এতক্ষণ একটা গল্প বলছিলুম ; এখন গল্প ফুরিয়েছে···।[৪]

আবার অন্যত্র –

একটা পুরাতন গল্প এই পরিত্যক্ত পৃথিবীর উপরে শেষ হয়ে গেছে, আজ সেই-সব রাজা রাজকন্যা পাত্র মিত্র স্বর্ণপুরী কিছুই নেই, কেবল সেই গল্পের 'তেপান্তরের মাঠ' এবং 'সাত সমুদ্র তেরো নদী' ম্লান জ্যোৎস্নায় ধূ ধূ করছে।[৫]

পুনরায়—

এক-এক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে— লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।[৬]

আর-একটি চিঠিতে—

আমরা নিজেকেও অংশ-অংশ ক'রে জানি— কল্পনা দিয়ে পুরিয়ে নিয়ে একটা স্বরচিত গল্পের নায়ক ক'রে নিই মাত্র।[৭]

এ সময়ে জীবন এবং জীবনের ছোট ছোট অংশগুলি রবীন্দ্রনাথের চোখে কখনো-বা ক্ষুদ্র-বিচ্ছিন্ন কখনো-বা একটি দীর্ঘ গল্পরূপে প্রতিভাত হয়েছিল, অর্থাৎ গল্পের দিকে ঝোঁক এসেছিল সত্য, কিন্তু কবিতার প্রতি তৎকালীন আকর্ষণও রবীন্দ্রনাথের কম তীব্র নয়। এই সময়েই পল্লীর জলে-স্থলে ভ্রমণকালে প্রকৃতির, বিশ্বের ও মানবজীবনের সে সৌন্দর্যময় মূর্তিটি তিনি পরিপূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যা তাঁর কবিতার প্রাণস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। কবিতা ও গল্প এ-সময়ে রবীন্দ্রনাথকে যে সমান তীব্রতায় আকর্ষণ করেছিল সমকালীন চিঠি ও অন্যান্য রচনায় সে পরিচয় সুস্পষ্ট। কিন্তু গল্প যখন শুধুমাত্রই গদ্যরচনা, তাতে তাঁর তৃপ্তি ছিল না। একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন—

একটি কবিতা লিখে ফেললে যেমন আনন্দ হয়, হাজার গদ্য লিখলেও তেমন হয় না কেন তাই ভাবছি। কবিতায় মনের ভাব বেশ একটি সম্পূর্ণতা লাভ করে ; বেশ যেন হাতে করে তুলে নেবার মতো। আর, গদ্য যেন এক-বস্তা আল্‌গা জিনিস— একটি জায়গা ধরলে সমস্তটি অমনি স্বচ্ছন্দে উঠে আসে না ; একেবারে একটা বোঝা-বিশেষ। রোজ রোজ যদি একটি করে কবিতা লিখে শেষ করতে পারি তা হলে জীবনটা বেশ একরকম আনন্দে কেটে যায়।[৮]

গল্প ও কবিতা এই উভয়ের প্রতি সমান আকর্ষণেরই ফল রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি। কিন্তু

---

৪ ছিন্নপত্র, ১৬ জুন ১৮৯১

৫ ছিন্নপত্র, ৩ কার্তিক [১৮৯১]

৬ ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩

৭ ছিন্নপত্র, ২৮ অক্টোবর ১৮৯৪

৮ ছিন্নপত্র, ১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৮৯২

তিনি প্রধানতঃ কবি বলে, এবং ভাষার ছন্দ-ব্যঞ্জনাকৌশলটি তাঁর সহজায়ত্ত ছিল বলে তাঁর হাতে ছোটগল্পের 'একবস্তা আল্‌গা জিনিস'ও একটি কাব্যময় লঘুতা অর্জন করেছে।

এখন, রবীন্দ্রনাথের গল্পে অবাস্তবতার অভিযোগের মূল কোথায় তার অনুসন্ধান প্রয়োজন। অধিকাংশ সাহিত্যপাঠকের ধারণা যে, বাস্তবতার সঙ্গে কবিত্বের এবং আদর্শবাদের একটা বিরোধ বর্তমান। বলা বাহুল্য, এর চেয়ে ভ্রান্ত ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। সাহিত্যে বাস্তবদৃষ্টির প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবতাতেই যে-সাহিত্যের সমাপ্তি, বাস্তবকে অতিক্রম করে যা মনকে কোনো উচ্চতর গ্রামে উত্তীর্ণ না করে, সেই বস্তুবদ্ধ সাহিত্যকে কখনোই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা দেওয়া চলে না। যদি শুধু বাস্তবতাই সাহিত্যের উৎকর্ষের মাপকাঠি হত, তবে ঈশ্বর গুপ্ত শ্রেষ্ঠ কবি বলে গণ্য হতেন এবং টেকচাঁদ ঠাকুর বঙ্কিমচন্দ্রের অপেক্ষা মহত্তর যশের অধিকারী হতেন। বস্তুতঃ গল্পগুচ্ছে আমাদের পল্লীজীবন ও পল্লীসমাজের যে-ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন, তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তব— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্রের গল্পের পরিবেশ, ঘটনা ও চরিত্রের মতো তা অধিকাংশ স্থলে রোমান্টিক ভাবালুতায় বাস্তব-অতিক্রান্ত নয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীপ্রকৃতির যে-রূপ, সমাজ ও সংসারের যে পরিবেশ, নরনারী-শিশুর যে সমাবেশ দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের চোখে-দেখা এবং বাস্তব-অভিজ্ঞতাসঞ্জাত বলে তা অবাস্তব হবার কোনো উপায়ই ছিল না। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জগৎ ও জীবনও হয়তো অবাস্তবতার স্তরে চলে যেতে পারত, যদি রবীন্দ্রনাথ সে অভিজ্ঞতাগুলিকে গাঢ় রেখা ও রঙের অতিশয়তায় প্রপীড়িত করতেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সাহিত্যরচনার এই আদর্শ উল্লেখ করেছিলেন যে, 'লেখকের একটা ধর্মশপথ আছে যে, সত্য বলিব। কিন্তু সে সত্য বানাইয়া বলিব।' গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি কল্পিত হলেও, রবীন্দ্রনাথ কখনো সত্য লঙ্ঘন করেন নি।

তবুও যে এই গল্পগুলি সেকালের অনেক পাঠকের কাছে— এবং সম্ভবতঃ একালেও— কতকটা অবাস্তব বলে মনে হয়েছে, এবং রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ সমসাময়িকদের গল্পের মতো জনপ্রিয় হয় নি, তার প্রধান কারণ মধ্যবিত্ত সাহিত্যপাঠকের কাছে পল্লীর সহজ সরল পরিবেশ চিরকালই অজ্ঞাত। কেবল অজ্ঞাত নয়, ওই ঘরোয়া সুখদুঃখের ছোট ছোট ঢেউয়ে তরঙ্গায়িত পল্লীজীবনের সম্বন্ধে শহরবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের কোনো কৌতূহলই ছিল না। শিক্ষিত নাগরিকের কাছে পল্লীজীবন একান্তই রসহীন। অবশ্য সেদিনের পল্লীসমাজেও সমাজ রাষ্ট্র বিশ্বাস ও প্রথার ঘাতপ্রতিঘাতে জীবন সুখে-দুঃখে ভরে উঠত। বহু পরিবর্তনের পরও বোধ হয় আজও সে জীবন তেমনি করেই চলে। সুখদুঃখগুলি তেমনই ছোট দেখায়, ঢেউগুলি তেমনই মৃদু আঘাত দিয়েই বিলীন হয়ে যায়। পল্লীজীবনের গতি বড়ই মন্থর, ঘটনাগুলি বড়ই কৌতূহলের রসবর্জিত। পল্লীর এই পরিবেশ, এইসব মানুষ এবং তাদের সুখদুঃখ আনন্দ নৈরাশ্য সম্বন্ধে একদিন সাহিত্য-পাঠকের একটুও ঔৎসুক্য ছিল না। কারণ সেকালের শিক্ষা শহরবাসী অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা সাহিত্যের নিতান্ত সৌভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর স্বভাব-সুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি ও তরুণ বয়সের মন নিয়ে সেই পল্লীর প্রকৃতি, সমাজ এবং নরনারীর একেবারে

কাছাকাছি গিয়ে বাস করতে হল। যদিও যত কাছে তিনি যেতে চাইলেন, প্রহরীবেষ্টিত আভিজাত্য তাঁকে সে-নৈকট্য থেকে বঞ্চিত করল, তবু শহুরে রাজাবাবু গ্রামে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে পল্লীর এই সাধারণ মানুষের জীবনগুলি নাগরিক মানবের মতোই গভীর কৌতূহলময়, এদের সুখ-দুঃখেও আনন্দ-করুণার রস জমে ওঠে, যার মূল্য কোনোমতেই তুচ্ছ নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

At first I was quite unfamiliar with the village life as I was born and brought up in Calcutta and so there was an element of mystery for me.... They seemed to belong to quite another world.[৯]

ছোটগল্পগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই আবিষ্কার প্রচার করলেন ; সেই অনাবিষ্কৃতপূর্ব রসের স্বাদ আমাদের বণ্টন করে দিলেন। পল্লীর আনন্দ-বেদনার ছোট ছোট ঢেউগুলি সমুদ্রের তরঙ্গ তুলে এসে আমাদের মনে আছড়ে পড়ল—

মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বরাবর চলে এসেছে কৃষিক্ষেত্রে পল্লীপার্বণে আপন প্রাত্যহিক সুখদুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতিসরল মানবত্বপ্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে··· ।[১০]

এডওয়ার্ড টম্‌সন যথার্থই বলেছেন—

As Euripides was charged with making slaves interesting, so those who would stand on ancient ways might charge Rabindranath with making the petty griefs and joys of ryots interesting.

'গল্পগুচ্ছে' রবীন্দ্রনাথ পল্লীর মানুষ ও পল্লীর জীবনের প্রতি সাহিত্যপাঠকের কৌতূহল আকর্ষণ করেছিলেন সত্য, তবু অধিকাংশ গল্পোৎসাহীর দৃষ্টি ও রুচি স্থূল বলে, সে-আকর্ষণ কোনোদিনই তেমন তীব্ররূপে প্রকাশ পায় নি। অর্থাৎ, মুষ্টিমেয় সাহিত্যরসিকের কথা বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাঙালী পাঠকের কাছে যতটা প্রিয় বা সমাদৃত হওয়া উচিত ছিল, তা হয় নি। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চিরদিন এই গল্পগুলি আমার অত্যন্ত প্রিয় অথচ আমাদের দেশ গল্পগুলিকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে নেয় নি।'[১১] কেন নেয় নি সে যুগে তার কারণ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা রাজসিংহ প্রতাপ সীতারামের কাহিনী। বিরাট বিরাট চরিত্র, চমক্‌প্রদ কার্যকলাপ। যখন তিনি সামাজিক স্তরে নেমে এসেছেন, তখনও জমিদার কৃষ্ণকান্তের পরিবার, জমিদার নগেন্দ্রনাথ। এই সব উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত সমাজ তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর অপরিচিত ছিল না। তার উপর এই সব বড় বড় চরিত্রের বড় বড় সুখদুঃখের পাশে কোথায় লাগে তুচ্ছ রতন,

৯ *Forward*, 23 February 1936

১০ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়

১১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়

রামকানাই, রাইচরণ আর ফটিকের ছোটখাটো বেদনা। তাই, যদিও রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের তুলনায় বঙ্কিমের রচনায় বাস্তবতা বেশি ছিল না, তবু আমরা রবীন্দ্রনাথের গল্পকেই অবাস্তবতার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছি। তাই রবীন্দ্রনাথকে আত্মসমর্থনের জন্য বলতে হয়েছে—

ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে আমি যে ছোটো ছোটো গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তবজীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে। বঙ্কিম যে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' লিখেছিলেন, সে-সব কি সত্যি ছিল? সে-সব romantic situation কি তখন ঘটতে পারত?[১২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে দেখেছিলেন মনুষ্যত্বের নিরাভরণ রূপ। কিন্তু সকল আবরণ-আভরণ-বর্জিত মানুষের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের কোনো কৌতূহল নেই। একটা জোব্বা পরিয়ে উঁচু জায়গায় বসিয়ে দিলে মানুষকে মানুষ বলে মনে হয়, তার সুখদুঃখগুলিও মনে হয় অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু মানুষের একেবারে অন্তরঙ্গতম রূপটি শুধু মুষ্টিমেয় রসিক পাঠককেই আকর্ষণ করে।

বর্তমান কাল সম্বন্ধে আমরা গর্ব করি যে এ-যুগে আমাদের সাহিত্যরসবোধ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবু, একালেও পাঠ্যতালিকায় অবশ্যপঠনীয় না হলে এ-গল্পগুলির প্রতি বাঙালী পাঠকের তেমন আকর্ষণ নেই। তরুণ রবীন্দ্রনাথ সেদিন পল্লী-বাংলার যে-রূপ ও পরিবেশ তাঁর ছোটগল্পগুলিতে তুলে ধরেছিলেন, সে-সমাজ, সে-রূপ ও সে-পরিবেশ আজ বিলীন বা বিলীয়মান বলেই আধুনিক পাঠকের কাছে আর তা তেমন আকর্ষণের বিষয় বলে মনে হয় না, এরূপ একটি যুক্তি মাঝে মাঝে শোনা যায়। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণরূপে মেনে নেওয়া শক্ত। 'মানবজীবনের সেই সুখদুঃখের ইতিহাস, যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে চলে এসেছে···কখনো বা মোগল রাজত্বে কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে' — গত ষাট-সত্তর বছরে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন ও সামাজিক আলোড়ন সত্ত্বেও, তার যে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে এমন মনে হয় না। 'সেই সুখদুঃখের ইতিহাসে'র ধারা আজও তেমনি মন্থর গতিতে প্রবাহিত। সত্য বটে, আজ আর গৃহভৃত্যের কাছ থেকে সে প্রভুভক্তি ও আনুগত্য আমরা প্রত্যাশা করি না, যা সেকালে ছিল, তবু 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' রাইচরণ কি শুধু প্রভুভক্তিতেই নিজের ছেলেকে প্রভুর হাতে তুলে দিতে অনুপ্রেরিত হয়েছিল? তার সংস্কারাবদ্ধ মনের অন্ধবিশ্বাস ও বিবেকই কি তার এই দুরূহ কাজের প্রধান প্রেরণা ছিল না? 'দেনাপাওনা' গল্প রচিত হবার সত্তর বছর পরেও পণপ্রথা বা বধূনির্যাতন কি বাংলাদেশ থেকে উঠে গেছে? আজও কি পল্লীতে এক হাত জমির জন্য শরিকে-শরিকে মামলা বেধে গভীরতম প্রীতির সম্পর্কে ব্যবধান সৃষ্টি করে না? আজ বহুবিবাহ লুপ্তপ্রায় বলেই কি কোনো স্বামীপরিত্যক্তা মূক নারীর চোখের জলে পল্লীর মাটি সিক্ত হয় না?

আসল কথা গল্পগুচ্ছে এ যুগের আকর্ষণের অভাব ঘটেছে অন্য কারণে। এ যুগের যুদ্ধটা যেমন প্রকাণ্ড, ঘটনাগুলিও তেমনি বড় বড়। সমস্যাগুলি যেমন বৃহৎ, সুখদুঃখ তেমনি ব্যাপক ও বিশ্ববিস্তৃত। আজ উদ্বাস্তু-সমস্যা বিশ্বজুড়ে ঘটোৎকচের মতো বিরাজমান। তেমনি বিরাট বিশ্বের খাদ্যসমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, জনসংখ্যা সমস্যা। এ যুগের দৃষ্টি সমস্যাটার দিকে নয়, তার বিরাটত্বের দিকে

১২ রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৪, গ্রন্থপরিচয়

নিবদ্ধ। কারণ, ব্যক্তির জীবনেও বহুবিধ জীবনের সমস্যা ও হৃদয়ের সমস্যা দেখা দেয়। গল্পগুচ্ছে চিত্রিত সেই সমস্যাগুলিকে আমরা সমস্যা বলে মনে করি না। বিশ্বব্যাপ্ত সমস্যাকে আমরা সমস্যা বলে গণ্য করি। আধুনিক সাহিত্যপাঠকের অধিকাংশই উপলব্ধি করেন না যে, একজন উদ্বাস্তুর দুঃখের মধ্যেই সকল উদ্বাস্তুর সমস্যা নিহিত। যে লোকটি গৃহ সমাজ স্বজন উপার্জন এবং সকল সুখশান্তি আনন্দ থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে, তার দুঃখের গভীরতা যদি আমরা হৃদয়ংগম করি, তবেই আমরা বিশ্বের সকল উদ্বাস্তুর দুঃখ বুঝতে পারি। বিশ্বের খাদ্যসমস্যার মূল কথাটি সেই লোকটির মধ্যে নিহিত খাদ্যের অভাব যাকে তীব্র বুভুক্ষায় প্রপীড়িত করছে। রাজনৈতিক কারণে যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীপুত্র গৃহসম্পত্তি থেকে বিচ্যুত হয়, তার দুঃখ যত গভীর, বৈদ্যনাথের মতো যে স্ত্রীর অর্থগৃধ্নুতায় পত্নীপুত্র ছেড়ে গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তার দুঃখের গভীরতা সে তুলনায় কিছু কম, এমন মনে করবার হেতু নেই। এ সম্পর্কে একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করছি। Robert Liddell তাঁর *Some Principles of Fiction* বইতে লিখছেন—

> Some people...think that it does not very much matter what any individual does or suffers....What can it matter, they argue, what an imaginary person does or suffers, when the world's fate hangs in the balance? This is not so sensible an attitude as it might at first appear. The fate of the world, after all, is only important in so far as it affects the people in it....Moreover, we cannot say that two Poles, for example, can suffer twice as much as one. Suffering is not a thing that can be added up or multiplied, like horse-power. There is never more suffering at any one time in the world than the worst that can be contained in one human consciousness. If we think that it does not matter what happens to the individual, then we have no reason to think that it matters what happens to the world, for it is the individual who feels what happens to the world.

বর্তমান যুগে বিরাটাকৃতি, লক্ষ-অশ্বশক্তিযুক্ত সুখদুঃখের প্রতি আকর্ষণই গল্পগুচ্ছের মতো মানব-সুখদুঃখের সূক্ষ্ম রূপায়ণের উপভোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করছে।

গল্পগুচ্ছের উপাদান যদিও মূলতঃ বাংলাদেশের পল্লী ও তার মানবসমাজ, তবু বিষয়ানুযায়ী এগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা চলে। কিন্তু ভাব বা বক্তব্যের দিক দিয়ে তারা এতই কাছাকাছি যে সপ্তসুরে মিশ্রিত একটি ঐকতানের মতো তা হৃদয়ে অনুরণিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে 'দেনাপাওনা', 'ত্যাগ', 'মহামায়া', 'সমস্যাপূরণ', 'অনধিকার প্রবেশ', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'দুরাশা' প্রভৃতি গল্পগুলি সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রথা বা সংস্কার অবলম্বন করে লেখা, 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'স্বর্ণমৃগ', 'দানপ্রতিদান', 'প্রতিহিংসা', 'গুপ্তধন' প্রভৃতি গল্পগুলিতে অর্থ-সম্পত্তির প্রতি আসক্তিই মূল উপাদান। অনেকগুলি গল্পে— যেমন 'দালিয়া', 'ত্যাগ', 'একরাত্রি', 'রীতিমতো নভেল', 'জয়পরাজয়', 'মধ্যবর্তিনী', 'শাস্তি', 'সমাপ্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'নিশীথে', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'মণিহারা', 'নষ্টনীড়', 'দৃষ্টিদান' প্রভৃতিতে— প্রণয় ও দাম্পত্যজীবনের বিভিন্ন বিচিত্ররূপ, সমস্যা ও সংঘাত

প্রতিফলিত হয়েছে। 'পোস্টমাস্টার', 'জীবিত ও মৃত', 'ছুটি', 'কাবুলিওয়ালা', 'দিদি' প্রভৃতি কতকগুলি গল্প মানবহৃদয়ের স্নেহ-ভালোবাসার গভীরতম রূপ দেখতে পাই। এইরূপ বলা যায়, 'কঙ্কাল', 'নিশীথে', 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'মাস্টারমশায়', প্রভৃতি কতকগুলি গল্প অতিলৌকিক ঘটনা বা পরিবেশাশ্রিত, 'সম্পত্তিসমর্পণ', 'বিচারক', 'পুত্রযজ্ঞ' প্রভৃতিকে আমরা অতিনিষ্ঠুর গল্প বলে বর্ণনা করতে পারি ; এতে অসংযত মানবপ্রবৃত্তির নগ্নরূপটি দেখানো হয়েছে। আবার কতকগুলি গল্পে শিশু বা বালকবালিকাই প্রধান চরিত্ররূপে দেখা দিয়েছে ; যেমন, 'পোস্টমাস্টার', 'গিন্নি', 'আপদ', 'অতিথি', 'ছুটি' প্রভৃতি। অনেক গল্প এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না, আবার অনেক গল্প একাধিক শ্রেণীতে গণনা করা যেতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প এরূপ বিষয়ানুযায়ী শ্রেণী বা দলে বিভক্ত করা অর্থহীন। কারণ রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিষয়ের কোনো প্রাধান্য নেই, সেটা পরিধেয়ের মতো আবরণ মাত্র। তাঁর সকল গল্পের মূল কথা মানবজীবন ও মানবহৃদয়ের দ্বন্দ্বসংঘাত আশানৈরাশ্য আনন্দবেদনা। মানুষের মনে একই সঙ্গে বিরাজ করছে স্নেহ মমতা ভালোবাসা, অন্য দিকে ঈর্ষা অভিমান লোভ। এই উভয়ের ঘাতপ্রতিঘাতে মানুষের হৃদয়ে যে বেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে সেইখানেই ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি নিবদ্ধ। ছোটগল্প রচনাকালেও এর ব্যতিক্রম হয় নি। তা যদি না হত, তবে পল্লীজীবন অবলম্বন করে এমন অপূর্ব গল্প তিনি রচনা করতে পারতেন না। কারণ, দূর থেকে পল্লীর পরিবেশ ও জীবনযাত্রা তিনি দেখেছিলেন সত্য, কিন্তু পল্লীবাসীর দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি জানবার হয়তো তিনি তেমন সুযোগ পান নি। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে পল্লীর প্রকৃতি ও পরিবেশ ধরা দিয়েছে ; পল্লীর মানুষের সহজ সরল ও স্বল্প-উপকরণ জীবনও তাতে প্রতিফলিত, কিন্তু পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ঘরকন্নার কাজ এবং দ্বন্দ্বকলহের খুঁটিনাটি বিবরণ সেখানে নেই, কিংবা খুবই অল্প আছে। বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলির বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগ এইখান থেকেই উদ্ভূত। ছোট ছোট খুঁটিনাটি সত্যকে আমরা সত্য বলে মনে করি, কিন্তু বড় সত্যকে আর সত্য বলে মনে হয় না। ফুল্লরা যে বাসনের অভাবে মাটিতে গর্ত করে ফেন খায়, এটা মুকুন্দরামের বাস্তবদৃষ্টির একটা জাজ্বল্যমান প্রমাণ বলে মনে হয়, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের অভাব-অনটন অনশন-অর্ধাশনের সহস্র দুঃখ সত্ত্বেও ফুল্লরা যে তার স্বামীর ভালোবাসায় ভাগাভাগি করতে চায় না, ফুল্লরার জীবনের এই বৃহত্তম সত্যটা চোখ এড়িয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে কিভাবে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ বাস্তবতার পরিবর্তে পল্লীমানবের জীবনের বৃহত্তর সত্যগুলি প্রকাশিত হয়েছে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে তা পরিস্ফুট হবে। রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের প্রথম ছোটগল্প 'দেনাপাওনা'র বিষয় পণপ্রথা। এ বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যে বহু বহু গল্প উপন্যাস নাটক লেখা হয়েছে। সে-সব রচনা আমাদের দৃষ্টি একটি সামাজিক প্রথার কুফলের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ, সে-সব রচনায় সংস্কারকের মনোভাব প্রাধান্য পেয়েছে। অপর পক্ষে 'দেনাপাওনা' গল্পে একদিকে মানুষের গৃধ্নুতা ও নিষ্ঠুরতা এবং অপরদিকে অসহায় নারীর বেদনার কারুণ্যের দিকেই আমাদের মন আকৃষ্ট হয়। প্রথম গল্প 'দেনাপাওনা'তেও সামাজিক প্রথার দিকে যতটুকু দৃষ্টি পড়ে,

এ শ্রেণীর অন্যান্য গল্পে তাও পড়ে না। যেমন 'ত্যাগ' গল্পে হেমন্ত-চরিত্রের মধ্য দিয়ে সামাজিক সংস্কারমুক্তির একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনই মুখ্য হয়ে ওঠে নি, প্রেম ও করুণা যে প্রবলতম সামাজিক সংস্কারকে অতিক্রম করার স্পর্ধা রাখে, এ কথাটাই প্রধানরূপে ফুটে উঠেছে। তেমনি 'মহামায়া' গল্পটি জাতিভেদ বা সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নয়, বস্তুতঃ সামাজিক প্রথার কুফল প্রচার যে এ ক্ষেত্রে নিতান্তই গৌণ তার প্রমাণ, এই গল্পে প্রচলিত সংস্কার ও প্রথার যিনি প্রধান সমর্থক সেই ভবানীচরণ স্বল্পাঙ্কিত হলেও নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায় বিসর্জন নাটকের রঘুপতিরই মতোই শ্রদ্ধেয়। এ গল্পের মূল কথা এই যে, আমরা যাকে প্রেম বলি, তার অর্ধেক ভাব এবং অর্ধেক রূপে গঠিত হয়। প্রেমাস্পদের চোখ থেকে রূপ যখন লুপ্ত হল, তখন প্রেম আশ্রয়চ্যুত হয়ে ভেঙে পড়তে পারত, এবং সেটাই হত মহামায়ার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। এইজন্যই, সেই চূড়ান্ত ট্র্যাজেডির থেকে বাঁচবার জন্যেই, মহামায়াকে রাজীবের গৃহ ছেড়ে যেতে হল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সে রাজীবের মনেও সেই ট্র্যাজেডির 'সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন' রেখে দিয়ে গেল। এইরূপ 'সমস্যাপূরণ' ও 'অনধিকার প্রবেশ' দুটি গল্পে ধর্মের আচারনিষ্ঠার দুটি ভিন্ন রূপ দেখানো হয়েছে। প্রচলিত ধর্মাচারনিষ্ঠ মানুষের কাছে আচারবর্জিত উচ্চতর মানবধর্ম অনেক সময় অধর্ম বলে মনে হতে পারে, তাই হৃদয়বৃত্তিতে হীন হয়েও সামাজিক মানুষ কখনো কখনো আচারনিষ্ঠার গর্ব করে, এই কথাটাই 'সমস্যাপূরণে' প্রধান, অপর পক্ষে জীবে প্রেম ও করুণার শক্তি যে আজন্মপালিত আচার সংস্কারকেও অতিক্রম করে, 'অনধিকারপ্রবেশে' সেই শক্তিরই স্বরূপ দেখতে পাই। 'ব্যবধান' ও 'স্বর্ণমৃগ' উভয় গল্পেই এই কথাটা প্রধান যে মানুষ অর্থ-সম্পত্তিকে সবচেয়ে কাম্য মনে ক'রে জীবনের মহামূল্যবান প্রীতি ও স্নেহমমতায় বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মানবজীবনে গভীর ট্র্যাজেডি ডেকে আনে। এইজন্য দ্বিতীয় গল্পটিকে দাম্পত্য জীবনের গল্প না বলে প্রবৃত্তি ও আবেগের দ্বন্দ্ব বলে বর্ণনা করলেই বোধ হয় ঠিক হয়। মানবহৃদয়ের প্রীতি-প্রেম-স্নেহের তুলনায় অর্থসম্পত্তির মূল্য যে কত তুচ্ছ, সে কথা আরো স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে অন্য একটি গল্পে— 'গুপ্তধনে'। এ গল্পটির— এবং আমার মনে হয় এর নামকরণেরও— প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, যে-ঐশ্বর্য দুর্গম দুষ্প্রাপ্য স্থানে লুকোনো আছে, তাকে খুঁজে বার করা যত কঠিন, যে-ঐশ্বর্য আমাদের চোখের উপর সর্বদা বিরাজিত থেকেও লুক্কায়িত, তার আবিষ্কার তারো চেয়ে দুরূহ। প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনের ঐশ্বর্যই বিশ্বের মহত্তম গুপ্তধন।

পৃথিবীতে এখন কি গোধূলি আসিয়াছে। আহা, সেই গোধূলির স্বর্ণ! যে স্বর্ণ কেবল ক্ষণকালের জন্য চোখ জুড়াইয়া অন্ধকারের প্রান্তে কাঁদিয়া বিদায় লইয়া যায়।...গ্রামের ঘরের অতি তুচ্ছতম ব্যাপার আজ মৃত্যুঞ্জয়ের কল্পনাদৃষ্টির কাছে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।...সেই জীবন, সেই আকাশ, সেই আলোক, পৃথিবীর সমস্ত মণি-মাণিক্যের চেয়ে তাহার কাছে দুর্মূল্য বোধ হইতে লাগিল।...মৃত্যুঞ্জয়ের হাত ধরিয়া সন্ন্যাসী তাহাকে সেই গভীর কূপের সম্মুখে লইয়া গেলেন। তাহার হাতে সেই লিখনপত্র দিয়া কহিলেন, "এখানি লইয়া তুমি কী করিবে?"

মৃত্যুঞ্জয় সে পত্রখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

এই 'গুপ্তধন' গল্পটি এবং আরো কয়েকটি গল্পে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে ঘটনা কত অপ্রধান। গল্পলেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ই প্রথম লক্ষ্য করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি 'ঘটনাবিরল, রসপ্রধান।' এবং 'Emotionএর স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্প ঘটনা-বিরল বললেই যথেষ্ট হয় না, কোথাও কোথাও সেগুলি ঘটনাবহুল হলেও ঘটনা কখনোই প্রাধান্য পায় নি, হৃদয়াবেগ ও ভাবব্যঞ্জনাই প্রাধান্য পেয়েছে। 'গুপ্তধন' গল্পটিতে ঘটনার কোনো অভাব নেই, এমন কি গোয়েন্দা-কাহিনীর মতো রহস্যের আকর্ষণও এখানে অনুপস্থিত নয়। কিন্তু যে পাঠকের মন ওই রহস্যের রোমাঞ্চেই নিবদ্ধ হবে, সে এ গল্পের রসলোকে প্রবেশ করতে পারবে না।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের এই ভাবপ্রাধান্য আরো কয়েকটি গল্পে খুব উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত। যেমন, 'জীবিত ও মৃত'। মানুষ যে ভালোবাসাকে অবলম্বন করেই মাত্র বেঁচে থাকে, এ গল্পে সে কথাটি অতি সূক্ষ্মরেখায় বর্ণিত হয়েছে। কাদম্বিনী শ্মশান থেকে তার সই যোগমায়ার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল বটে, 'কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না, মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান।' কিছুকাল সেখানে থাকার পরও মুহূর্তের জন্যও তার মনে এ সংশয় জাগ্রত হল না যে সে বেঁচে আছে। সখী-গৃহত্যাগের দিনও সে সখীকে সম্বোধন করে বললে, 'সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আর আমি বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।' কিন্তু শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসার পর যে মুহূর্তে তার একমাত্র ভালোবাসার ধন এবং জীবনের অবলম্বন খোকা তাকে কাকিমা বলে ডাকল, সে মুহূর্তে খোকার ভালোবাসার মধ্যে সে তার জীবনের অনুভূতি ফিরে পেল। সকলের সম্মিলিত ঘোষণার প্রতিবাদ করে সে 'তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি নাই। আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব, আমি মরি নাই।...এই দেখো, আমি বাঁচিয়া আছি। বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।' এর পর, দ্বিতীয়বার তার একমাত্র স্নেহের অবলম্বন খোকার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর, মৃত্যু ছাড়া তার আর কোনো পথ ছিল না।— জীবনধারণের আর কোনো সার্থকতাই তার ছিল না, তাই তাকে মরে প্রমাণ করতে হল যে সে মরে নি।

দৃষ্টান্ত-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ গল্প বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে সেখানে গল্পবস্তুর সঙ্গে ভাবব্যঞ্জনার এক অপরূপ মিশ্রণ ঘটেছে। 'জীবিত ও মৃত' গল্পটির উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

আমার তখনকার দিনে ভোররাত্রিতে উঠে অন্ধকার ছাদে ঘুরে বেড়ানো প্রভৃতি অনেকরকম কবিত্ব ছিল। একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙে যেতেই উঠে পড়লুম, ভেবেছিলুম আমার সময় হয়েছে, আসলে কিন্তু তখন দুপুর রাত।... খানিক দূরে আসতেই আপিসঘরে না কোথায় ঢং ঢং করে দুটো বেজে গেল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, ভাবলুম, তাই তো, এই গভীর রাত্রে আমি সারা বাড়িময় এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। হঠাৎ মনে হল আমি যেন

প্রেতাত্মা, এ বাড়ি haunt করে বেড়াচ্ছি।…ideaটা আমাকে পেয়ে বসল, যেন একজন জীবিত মানুষ সত্য-সত্যই নিজেকে মৃত বলে মনে করছে।[১৩]

কাজেই দেখা যাচ্ছে এ গল্পের মূল কল্পনা কবির বাস্তব-অভিজ্ঞতাপ্রসূত। রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র এবং লিপিবদ্ধ উক্তির মধ্যে এরূপ আরো কয়েকটি গল্পের উৎস-কল্পনা খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-জাতীয় অভিজ্ঞতা থেকে যা সৃষ্টি হয়েছে সেটা গল্পের কায়ামাত্র। সে-দেহে ভাবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ। তাই গল্পগুলির কাহিনী, ঘটনা বা পটভূমিতে বিন্দুমাত্র অবাস্তবতা না থাকলেও, শেষ পর্যন্ত এই গল্পগুলি পাঠককে ভাবের রসলোকে উত্তীর্ণ করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে পল্লীজীবন ও মানবজীবনের যথার্থ চিত্রের সঙ্গে ভাবব্যঞ্জনার এই অপূর্ব সমন্বয়ের জন্যই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে পৃথিবীর সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনন্য বলে গণনা করা যায়।

এই অনন্যতার মধ্যেই মহৎ প্রতিভার পরিচয় নিহিত। কথাসাহিত্য জীবনেরই প্রতিরূপ সত্য, কিন্তু মানুষের মানস দর্পণে জীবন বহুবিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মানবজীবনের অতি অকৃত্রিম ও অন্তরঙ্গ যে-রূপটি প্রকাশিত হয়েছে, সে-রূপ রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কবিমানসেরই প্রতিফলন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প-রচয়িতারা অনেকেই জীবনের গভীর স্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, নিগূঢ় জীবনসত্যকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, তবু প্রত্যেকেই বিশিষ্ট, প্রত্যেকেই অনন্য। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পকে গল্পের কোনো বিশেষ জাতি বা শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। পৃথিবীর অন্য কোনো মহৎ ছোটগল্প-রচয়িতার সঙ্গেও তাঁর নাম শ্রেণীবদ্ধ করাও সংগত মনে হয় না। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও উপন্যাসের অনুকরণ এবং অনুসরণ বাংলা সাহিত্যে অতি প্রচুর এবং অতি স্পষ্টরূপে দেখা দিলেও, তাঁর গল্পগুলি আজও সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পরবর্তী গল্পলেখকেরা অনেকেই পল্লীর সমাজ ও পল্লীর মানবগোষ্ঠীকে তাঁদের গল্প-উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু পল্লীমানব ও পল্লীপ্রকৃতির এরূপ অন্তরঙ্গ রূপ, এবং সেই উপাদানে গঠিত এ-জাতীয় ব্যঞ্জনাময় কাহিনীর ধারা পরবর্তী ছোটগল্প-রচয়িতাদের দ্বারা অনুসৃত হওয়া সম্ভব হয় নি। রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্তী দুজন প্রধান গল্পলেখক, প্রমথ চৌধুরী ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয় গল্প লিখেছেন। প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্পে মননের প্রাধান্য তাঁর গল্পগুলিকে প্রায় প্রবন্ধের স্তরে টেনে নিয়ে গেছে, অন্যদিকে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পকে ঘটনাপ্রধান করে তুলেছেন। অথচ বাংলা কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথে এক-একটি ছোটগল্পের কাহিনী পরবর্তী অনেক গল্প-উপন্যাসের প্লট-কল্পনার মূল প্রেরণা বলে অনুমান করা যায়। কিন্তু কাহিনী মূলতঃ এক হলেও তাদের উপস্থাপনে (treatment) কত প্রভেদ! রবীন্দ্রনাথের নিজেরই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্বের[১৪] গল্পগুলিকে এ বিষয়ে অনেকটা স্বতন্ত্র বলে

১৩ শ্রীসীতা দেবী, পুণ্যস্মৃতি

১৪ সবুজ পত্র যুগের ও পরবর্তী গল্পগুলি

গণ্য করা যায়। তাঁর শেষের দিকের গল্পে যে ভাব অপেক্ষা বক্তব্য, ব্যঞ্জনা অপেক্ষা স্পষ্টতা বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল, পলাতকাই তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। পদ্যে লিখিত হলেও পলাতকার কাহিনীগুলি গল্পগুচ্ছের প্রথম পর্বের গল্পগুলির মতো কবিত্বসমৃদ্ধ নয়। সেই কারণেই পলাতকার বহু বহু অনুকরণ হয়েছিল, কিন্তু কবির ছোটগল্পের অনুকরণ সম্ভব হয় নি।

বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের গল্পগুলিই আমাদের আলোচ্য। এ গল্পগুলি বিভিন্ন দিক থেকে বিচার ও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এখানে তার দু-একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে।

সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টির সুনিপুণ কৃতিত্বের একটা ব্যাপক ও মহৎ আবেদন আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই আবেগপ্রধান গীতিকবিতার অপেক্ষা স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টিকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আমরা মানুষের ভাবের আকৃতি অনেক পেয়ে থাকি এবং তা ভুলতেও বেশি সময় লাগে না। কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে মানুষের মূর্তি যেখানে উজ্জ্বল রেখায় ফুটে ওঠে সেখানে ভোলবার পথ থাকে না।

পরিসরের বিস্তৃতি, কালের ব্যাপ্তি ও ঘটনার বাহুল্যহেতু উপন্যাসই চরিত্রসৃষ্টির উপযুক্ত ক্ষেত্র, এ কথা সত্য হলেও ছোটগল্পেও চরিত্রচিত্রণের কৃতিত্ব প্রকাশ সম্পূর্ণ সম্ভব, কেবল তার পদ্ধতি ভিন্ন। ছোটগল্পের স্বল্পপরিসরে চরিত্রের বিকাশ দেখানো সম্ভব হয় না, কিন্তু চরিত্রকে উদ্‌ঘাটিত করে দেখানো যেতে পারে। মানবচরিত্রে এমন অনেক লুকোনো দিক থাকে, যা সাধারণতঃ চোখে পড়ে না। কোনো বিশেষ একটি ঘটনায় অথবা কোনো-এক বিশেষ আচরণে মানবচরিত্রের অনাবিষ্কৃত দিকগুলি প্রকাশিত হয়ে পড়ে। দেখা যায়, এই ব্যক্তিটি সম্বন্ধে এতক্ষণ যে ধারণা পোষণ করা গিয়েছিল সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তখন নূতন আলোকে সে-চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত হয়। এ-ধরণের চরিত্রচিত্রণকে আমরা বলতে পারি মানবচরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন। এ-জাতীয় চরিত্র-সৃষ্টি যে ছোটগল্পে কেবল সম্ভব তাই নয়, এক শ্রেণীর ছোটগল্পে এ-ধরণের চরিত্ররহস্যের উদ্‌ঘাটনই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'কাবুলিওয়ালা', 'দানপ্রতিদান', 'শাস্তি', 'অনধিকার প্রবেশ', 'ঠাকুরদা' প্রভৃতি গল্পগুলিতে মানবচরিত্রের অনাবিষ্কৃত প্রদেশে আলোকপাত করে কয়েকটি চরিত্রকে নূতন রূপে দেখানো হয়েছে বলে এগুলিকে ক্ষুদ্র পরিসরে চরিত্রসৃষ্টি-নৈপুণ্যের অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলে গণনা করা যায়। রামকানাই এমন একটি বিশেষত্ববর্জিত সামান্য মানুষ, যার অনুরূপ পল্লীবাসী নিরীহ গৃহস্থ আমরা সর্বদাই দেখতে পাই, কিন্তু দেখেও দেখি না। এই মানুষটি এতই নগণ্য যে, তার স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত তাকে মানুষ বলে গণ্য করে না, এবং তার মতামতে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব আরোপ করে না। কিন্তু, এই অতি ভালোমানুষ নিরীহ দুর্বল নগণ্য ব্যক্তিটি যখন তার সাক্ষ্য দেওয়া শেষ করে মূর্ছিত হয়ে পড়ল, তখন সে আর আমাদের চোখে বিশেষত্ববর্জিত নগণ্য নিরীহ ব্যক্তি বলে

প্রতিভাত হল না, সামান্যতার নির্মোকমুক্ত হয়ে সে এক অসামান্য চরিত্ররূপে দেখা দিল। সেইরূপ, রুক্ষ নিরক্ষর কাবুলিওয়ালা যখন তার ঢিলা জামাটার ভিতর থেকে একটুকরো ময়লা কাগজের উপর সযত্নে রাখা তার মেয়ের ছোট্ট হাতের ছাপটি বার করে আনল, তখন একমুহূর্তে আমরা তার প্রকৃতির রুক্ষতার কথা ভুলে গিয়ে তাকে একজন সন্তানবৎসল স্নেহময় কোমল-করুণ চরিত্র বলে গ্রহণ করলাম। 'দানপ্রতিদান' গল্পের শশিভূষণ প্রথমাবধি একটি বর্ণহীন নিষ্ক্রিয় চরিত্র। এ গল্পে ছোট ভাই রাধামুকুন্দই সজীব ও সক্রিয়। কিন্তু শশিভূষণের মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যখন জানা যায় যে, এই নীরব নিষ্ক্রিয় চির-অনুদ্বিগ্ন ব্যক্তিটি পূর্বাবধি কনিষ্ঠের সকল প্রবঞ্চনা জানা সত্ত্বেও সুখে-দুঃখে সম্পদে-দারিদ্র্যে সমান ক্ষমাশীলতায় ভাইকে স্নেহ দান করেছে, এমন কি লজ্জা পাবে বলে সে তার ভাইকে কোনোদিন জানতেও দেয় নি যে তার কোনো কাজই অজ্ঞাত নয়, তখন পশ্চাদ্বর্তী ও প্রচ্ছন্ন এই চরিত্রটি তার বর্ণহীনতার আবরণ খুলে উজ্জ্বল রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। চাষী-বৌ চন্দরার অভিমান তার চরিত্রে যে অনমনীয় দৃঢ়তা এনে দিল, কে জানত একটা মূর্খ অল্পবয়স্কা চাষার মেয়ের মধ্যে তা থাকা সম্ভব? নয়নজোড়ের কৈলাসবাবুর পৌত্রী কুসুমের সামান্য দুএকটি আচরণের মধ্য দিয়ে কেবল কৈলাসবাবুই হাস্যাস্পদ চরিত্র থেকে একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত করুণ চরিত্রে পরিবর্তিত হলেন না, কুসুমের চরিত্রটিও এক অভাবিত মহিমায় মণ্ডিত হয়ে দেখা দিল—

আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমকে কোনো অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্নদৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্যপদার্থের মতো দেখিতাম— ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম, এই গৃহকোণে ঐ বালিকামূর্তির অন্তরালে একটি মানবহৃদয় আছে।

এই গল্পগুলিতে চরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটনই একমাত্র লক্ষ্য; কাহিনী এ-সব ক্ষেত্রে গৌণ। এদের মধ্যে এক দিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্রের অতি গভীর স্তরে তাঁর দৃষ্টিকে প্রেরণ করেছেন, অপর দিকে তেমনি বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নূতন শৈলীর (technique) অবতারণা করেছেন। গল্পের শেষে সহসা এক-একটি চরিত্রের অনাবিষ্কৃত কোনো দিকের উদ্‌ঘাটনের ফলে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের উপসংহার অনেক সময় অপ্রত্যাশিতের চমক আনে। অথচ, চমকপ্রদ উপসংহারই যে-সকল গল্পের প্রধান আকর্ষণ, সে-সব গল্পের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এ গল্পগুলির বিস্তর প্রভেদ। ও হেনরি প্রমুখ কোনো কোনো গল্পলেখকের অনেক গল্পের উপসংহারে বিস্ময়ের চমকই প্রধান আকর্ষণ। ঘটনার কোনো অভাবিতপূর্ব মোচড়ে হঠাৎ যে বিস্ময়ের চমক লাগে, পাঠকের মন তাতেই আকৃষ্ট হয়। সমালোচকেরা গল্পের এ-জাতীয় উপসংহারকে চতুর উপসংহার বা trick ending বলে অভিহিত করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিস্ময়ের চমক থাকলেও তাদের সে-শ্রেণীতে গণনা করা চলে না। কারণ, তাঁর গল্পে অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় ঘটনার উপর নির্ভরশীল নয়, সেগুলি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই প্রতিপন্ন করে।

গল্পগুচ্ছে প্রকৃতির বিশিষ্ট ভূমিকা সম্বন্ধেও দুএকটি কথা মনে হয়। রবীন্দ্রকাব্যে ও রবীন্দ্র-

সাহিত্যে সর্বত্রই বিশ্বপ্রকৃতি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্যের উপাসনা করেছেন, তার অর্ধেক বিশ্বপ্রকৃতি এবং অর্ধেক বিশ্বমানবের সমন্বিত রূপে গঠিত। রবীন্দ্র-সাহিত্যে নিসর্গ ও মানব কেবল পাশাপাশি বিরাজিত নয়, উভয়ে মিলে একটি সৌন্দর্যসত্তা। এই দুই পরস্পরের পরিপূরক, পরস্পরের প্রতি নিত্যপ্রভাবশীল। গল্পগুচ্ছ রচনাকালেই রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও মানুষের ঘনিষ্ঠতম সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাদের অন্তরঙ্গতম রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই এ গল্পগুলিতে প্রকৃতি কেবল পশ্চাৎপট রূপেই বিরাজ করে না, মানব-মন এবং মানুষের কার্যকলাপের উপরও একটি অনতিপ্রকট কিন্তু অপ্রতিরোধনীয় প্রভাব বিস্তার করে। 'শকুন্তলা' আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেও প্রকৃতি অনেক সময় সেরূপ একটি পার্শ্বচরিত্রের মতো মানবজীবনের·গতির উপর গভীর প্রভাব নিয়ে বিরাজ করে। প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছিলেন, 'প্রকৃতিকে প্রকৃত রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক, এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা···এ তো অন্যত্র দেখি নাই।' রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পেও বহিঃপ্রকৃতির সজীব প্রত্যক্ষ ব্যাপক ও অন্তরঙ্গ রূপটি আমরা পরিপূর্ণরূপে দেখতে পাই। যেমন, 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে'র ট্র্যাজেডির মূলটি প্রকৃতির এক অপরূপ আকর্ষণ ও শিশুমনস্তত্ত্বের সমন্বয়ে গঠিত—

শিশুর মন কদম্বফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্‌ খল্‌ ছল্‌ ছল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্‌-এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু-প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।·· দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

'ত্যাগ' গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে, স্বামীস্ত্রীর আসন্ন বিচ্ছেদের পূর্বমুহূর্তের পরিবেশটি এইরূপ—

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে। আর, আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কী-একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

সে-রহস্য কি মানবহৃদয়ের, হেমন্তের হৃদয়ের নয়? এবং হেমন্তের পরবর্তী বিদ্রোহের পশ্চাতে এই পরিবেশ কতটা ক্রিয়াশীল ছিল, তাও কি অনুধাবনযোগ্য নয়? এইরূপ, 'একরাত্রি', 'ছুটি', 'সুভা', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি গল্পে মানবজীবন ও তার হৃদয়াবেগ, মানুষের আচরণ ও তার ভাগ্যের উপর প্রকৃতির একটি নিগূঢ় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'ছুটি' গল্পে ফটিক যে কেবল তার মাতৃস্নেহ থেকেই বঞ্চিত হয়েছিল তা নয়, সে তার পরিচিত পল্লীপরিবেশ থেকে এমন জায়গায় স্থানান্তরিত হয়েছিল, যেখানে

ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ-কীট
নাইকো ভালোবাসা নাইক খেলা।

এই উভয়বিধ বঞ্চনাই তার জীবনের ট্র্যাজেডিকে এত বেশি করুণ করে তুলেছে। 'সুভা' গল্পে সুভার দৃষ্টিকে রুদ্ধ করে কবি তার হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছেন, যেখানে বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য আসা-যাওয়া। বস্তুতঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসির মতো সুভা প্রকৃতিরই কন্যা, মূক প্রকৃতির সঙ্গে সে একাত্ম। এইজন্যই কুটিল-কঠোর মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তার সংঘর্ষজনিত করুণ পরিণতি অনিবার্য ছিল। এই প্রকৃতি-দুহিতার সরলতা তপোবনপালিতা শকুন্তলার সরলতার সঙ্গে তুলনীয়, এবং সভ্যতাচতুর আধুনিক দুষ্মন্তের কাছ থেকে তার প্রত্যাখ্যানও তাই নিতান্তই স্বাভাবিক। এ-ভাবটি বোধ হয় সবচেয়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে 'পোস্টমাস্টার' গল্পে। বস্তুতঃ, প্রাচীন সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলার যে ভাষ্য করেছেন, পোস্টমাস্টার যেন তারই উদাহরণ। পোস্টমাস্টারবাবু কলকাতার ছেলে। 'জলের মাছকে ডাঙায় তুলিলে যে রকম হয়, এই গণ্ডগ্রামের মধ্যে আসিয়া পোস্টমাস্টারেরও সেই দশা।' পল্লীর এই নির্জন প্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিবেশে তার নাগরিক মনের কোনোই অবলম্বন নেই, তাই পল্লীতে সে জীবন্মৃত।

যদি আরব্য উপন্যাসের কোনো দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লব-সমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

এরূপ ক্ষেত্রে, পল্লীপ্রকৃতি যখন এই গৃহচ্যুত প্রবাসী নাগরিককে কোনোই সান্ত্বনা দিতে পারল না, তখন স্বভাবতঃই মানুষের যে-সঙ্গটুকু সে পেল, তাই তার কাছে একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল। অপরপক্ষে রতন সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতিপালিতা, শকুন্তলারই মতো তার সরলতা স্বভাবগত, 'তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুন্দর করিয়া বাঁধিয়াছে।' এই চিরকাল স্নেহবঞ্চিত পিতৃমাতৃহীন অনাথা বালিকা যখন এই নিঃসঙ্গ পোস্টমাস্টারের কাছ থেকে সামান্য স্নেহটুকুর স্বাদ পেল, তখন তার কোমল সরল ক্ষুদ্র হৃদয়টি পরিপূর্ণভাবে পোস্টমাস্টারকেই একান্তভাবে আশ্রয় করল। উভয়ের প্রতি উভয়ের আকর্ষণের মূলই পৃথক। পোস্টমাস্টারের আকর্ষণ তার নাগরিক মনের উপর পল্লীপ্রকৃতির সাময়িক প্রভাবজনিত, তাই তার মধ্যে কোনো গভীরতা কোনো স্থায়িত্ব নেই।

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছ-পালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল, যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপর আসিয়া লাগিতেছে; এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার

মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন, এবং ভাবিতেছিলেন এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্ত-সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি। ...পোস্টমাস্টার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ডাকিলেন, "রতন"।

রতনের প্রতি পোস্টমাস্টারের এ-আকর্ষণ শকুন্তলার প্রতি দুষ্যন্তের আকর্ষণের অনমুরূপ নয়। নাগরিক দুষ্যন্তের শকুন্তলার প্রতি আকর্ষণের মূলে ছিল তপোবন-পরিবেশ ও শকুন্তলার রূপ। রতনের প্রতি পোস্টমাস্টারের আকর্ষণের মূল সেরূপ পল্লীপ্রকৃতি-পরিবেশ ও নিজের নিঃসঙ্গতা। কোনোটিরই মূল অন্তরসঞ্জাত নয়, যোগাযোগ-নির্ভর; তাই কোনো আকর্ষণই স্থায়ী হল না। অপরপক্ষে শকুন্তলা ও রতন উভয়েরই অন্তরে প্রকৃতির অকৃত্রিম সরলতা, তাই তাদের ভালোবাসা অকৃত্রিম, গভীর ও স্থায়ী। শকুন্তলার আলোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকবৎসর পরে (১৩০৯) কালিদাসের কাব্যের যে অন্তর্নিহিত ভাবটি কবি বিশ্লেষণ করেছিলেন, সে ভাবটি তার আগেই তিনি পোস্টমাস্টার গল্পে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেইজন্য পোস্টমাস্টার গল্পটিকে শকুন্তলা কাব্যের কবিকৃত আধুনিক ভাষ্য বলে গণনা করা যায়।

উপন্যাসের চরিত্র ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

'উ প ন্যা স লে খ ক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন'— সীতারাম উপন্যাসের এক জায়গায় বঙ্কিমচন্দ্র এই মন্তব্য করেছিলেন। অন্তর্বিষয় বলতে এখানে তিনি ঠিক কী বুঝিয়েছিলেন, তার অনুসন্ধানে পাঠককে বেশিদূর যেতে হয় না। ঐ শব্দে তিনি যে একটি নিটোল সারগর্ভ কথাবস্তুকেই বুঝেছিলেন, সে কথা অন্যত্র তাঁরই প্রদত্ত একটি স্বীকৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে—

> The novel is to me the most difficult work of all, as it requires a good deal of time and undivided attention to elaborate the conception and to subordinate the incidents and characters to the central idea. [১]

তত্ত্বগত সারমর্মের বশবর্তী করে আনতে গিয়ে ঘটনা ও চরিত্রের যে শিল্পগত লাঞ্ছনা ঘটে, তা বঙ্কিমচন্দ্রেরও অবিদিত ছিল না। তাই তাঁর জীবনে এমন এক সময় এল, যখন তিনি উপন্যাস রচনায় বীতরাগ হলেন এবং সেই অস্বস্তিকর সাহিত্যবাহন ত্যাগ করে সোজাসুজি তত্ত্বকথনে মনোনিবেশ করলেন।

উপরের অনুচ্ছেদের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র চরিত্র আঁকতে পারেন নি। তাঁর আঁকা মানবমানবীর প্রদর্শনী থেকে অনেককেই আমরা মনে রেখেছি, মর্যাদা জ্ঞাপন করেছি। সেই সব চরিত্র যে আমাদের স্মৃতিধার্য, তার কারণ তাদের শিল্পী-জনকের তুলির টানের বলিষ্ঠতা। প্রতাপের মতো পুরোবর্তী নায়ক কিংবা চাঁদ শাহ ফকিরের মতো প্রচ্ছন্ন পার্শ্বচরিত্র— দ্রঢ়িষ্ঠ তুলির আঁচড়ে প্রতিটি আলেখ্যই স্পষ্ট। এবং স্পষ্টতা যেমন তাদের চিত্র-লক্ষণ, স্পষ্টতাই আবার তাদের চরিত্রের সীমা। অর্থাৎ, রচয়িতার অভিভাবকোচিত সচেতন নিয়ন্ত্রণে প্রায়শই তারা সংযত, অংশতঃ উন্মোচিত এবং অকালেই নিজ-নিজ জীবনবোধে উপনীত। ই. এম. ফর্স্টরের বিভাজিত প্রবাদপ্রতিম সেই চরিত্রবিভাগের কথা মনে এনে বলছি, বঙ্কিমচন্দ্র সরল স্বভাবের (flat character) মানুষই এঁকেছেন, জটিল প্রকৃতির (round character) চরিত্রসৃজন তাঁর প্রবণতা ও কৃতিত্বের বহির্ভূত ছিল। তিনি হলেন বাংলা সাহিত্যের ভিক্টোরীয় পর্বের লেখক, যিনি সতীর্থবৃন্দের মতোই চরিত্র-অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নির্দিষ্ট করে ফেলেন, তার দুএকটি প্রধান বৃত্তির মধ্যে তাকে বিধৃত

---

১ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি, *Bengal : Past and Present,* 'April-June, 1914 p 275। শ্রীজয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের *A Critical Study of the Life and Works of Bankimchandra* গ্রন্থে পত্রটি উদ্‌ধৃত আছে।

করে দেন। আর যিনি 'মিড্-ভিক্টোরিয়ান' বলে আত্মবিদ্রূপে বিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে উপলক্ষ করেই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম জটিল চরিত্রের জন্য দরজা খুলে দিলেন—

বিনোদিনী ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্র কাড়িয়া দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ হাতাহাতি-কাড়াকাড়ির পর পরাভূত বিনোদিনীর অঞ্চল হইতে মহেন্দ্র বইখানি ছিনাইয়া লইয়া দেখিল— বিষবৃক্ষ। বিনোদিনী ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাগ করিয়া মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।[২]

চোখের বালির রচনাবলী-সংস্করণের সূচনায় এই কালান্তরের ব্যাখ্যাসূত্রে বলেছেন—

আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না।··· ঠিক করতে হল, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরায় বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।

লক্ষ্য করতে হবে 'তাদের আঁতের কথা' বলতে রবীন্দ্রনাথ চরিত্রসমূহের অন্তরের কথা বা অন্তর্দ্বন্দ্বই মনে করেছেন। ঘটনার ধারাবিবরণী অথবা ভাষ্যজ্ঞাপনস্পৃহা ত্যাগ ক'রে ব্যক্তিচরিত্রের কাছে এই প্রত্যাবর্তনের দিক থেকে তিনি যুদ্ধোত্তর ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে একপরিবারভুক্ত।

ঐতিহাসিক তথ্যক্রমের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, বউঠাকুরানীর হাট আর রাজর্ষির লেখক বঙ্কিমের অনুগামী। কিন্তু যাঁরা বঙ্কিমের প্রভাবেই উক্ত দুটি গ্রন্থকে সীমাবদ্ধ করে দেখেন, সবিনয়ে তাঁদের কাছে দুএকটি প্রশ্ন নিবেদন করি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনায়াসসাধিত রোমান্সের রক্তিমা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে কোথায়? কাহিনীবিন্যাসে রোমান্সের যে-উৎকণ্ঠা এই গ্রন্থ দুটিতে স্পন্দমান, পরিণামী শান্ত রসের চাহিদায় তা কি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথেই অগ্রসর হয় নি? বউঠাকুরানীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে প্রকৃতি একটি প্রধান চরিত্র। অন্ততঃ গীতাঞ্জলির যুগ পর্যন্ত সর্বাতিশায়ী এবং সর্বময়ী অর্থে প্রকৃতিই রবীন্দ্রনাথের পরমা শক্তি। প্রকৃতির মধ্যেই বিরুদ্ধ শক্তি-সংঘর্ষের পর্যবসান ঘটে, তারই মধ্যে অপরাপর চরিত্র তাদের আপেক্ষিক সীমারেখা লুপ্ত করে দেয়। রক্তপিপাসু রাজপ্রাসাদকে পিছনে ফেলে উদয়াদিত্য যখন ভোরের আকাশে তাকালেন, প্রকৃতির প্রভাব সেখানে একমাত্র—

প্রকৃতির এই বিমল প্রশান্ত পবিত্র প্রভাত-মুখশ্রী দেখিয়া উদয়াদিত্যের প্রাণ পাখিদের সহিত স্বাধীনতার গান গাহিয়া উঠিল। মনে মনে কহিলেন, "জন্ম জন্ম যেন প্রকৃতির এই বিমল শ্যামল ভাবের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি, আর সরল প্রাণীদের সহিত একত্রে বাস করিতে পারি।"[৩]

---

২ চোখের বালি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩৮৮

৩ বউঠাকুরানীর হাট। রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫১৪-১৫

নক্ষত্ররায় যে গোবিন্দমাণিক্যকে হাতের মুঠিতে পেয়েও শীতল শোণিতে হত্যা করতে পারলেন না, তার মূলে প্রকৃতির আদ্যাশক্তির অমোঘ প্রভাব—

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মতো আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন "দাঁড়াও"!

নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল, রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল— সেই মুহূর্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল— নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটি শব্দ নাই। কেবল সেই 'দাঁড়াও' শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল— সেই 'দাঁড়াও' শব্দ যেন তড়িৎপ্রবাহের মতো বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে, শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতোই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্ররায়ের মুখের দিকে মর্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, "নক্ষত্র, তুমি আমাকে মারিতে চাও?"[৪]

উপরের দুটি উৎকলন, আরো একটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছি। উদ্দেশ্যটি আর কিছুই নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম পর্বের রবীন্দ্রনাথেরও যে-একটি স্পষ্ট পার্থক্য আছে, সেটি প্রমাণ করা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাঙ্‌নির্দিষ্ট একটি ভাবের দিকে দৃষ্টি রেখে অধিকাংশ চরিত্র গড়ে তুলেছেন, আর রবীন্দ্ররচিত চরিত্রবর্গ পরিণতির মুখে এসে— রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে— 'বৃহৎ একটি ভাবের' কাছে আত্মবিসর্জন করেছে। হয়তো প্রথম পর্বের রচনায় রবীন্দ্রপ্রণীত চরিত্রসমূহের ঐ আত্মসমর্পণ অনেক অপীড়িত, সাবলীল। কিন্তু রচয়িতার পিতৃসুলভ কর্তৃত্ব কখনো তাদের আড়ষ্ট করে নি। তিনি শুধু তাদের জন্য একটি শুভেচ্ছা পোষণ করেছেন, তাদের কারো-কারো বিপথগামিতা নিয়ে মনে মনে যে উদ্বিগ্ন হন নি, এমনও নয়। তৎসত্ত্বেও, তাদের গতিবিধি তিনি রেখায়িত করে দেন নি। চোখের বালির রচনামুহূর্ত যে ক্রান্তিকারী, এ কথা আজ আর তথ্যসমেত প্রতিপন্ন করার প্রয়োজন নেই। যে-মুহূর্তে চোখের বালি রচিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে পরিচিত তথ্যভূমিটি আবার এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রদোষসন্ধ্যা এবং বিশ শতকের প্রত্যূষপ্রহর য়ুরোপীয় ভূখণ্ডের মানসে যে-আতঙ্ক সঞ্চার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ তা থেকে নিজের জন্য নিরাপদ একটি দূরত্ব নির্বাচন করে নেন নি। চীন ও জাপানের যুদ্ধ এবং বুঅর যুদ্ধের আক্ষরিক দর্পণ না হোক, অন্তঃসাক্ষ্য বহন করছে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য। যে-শতাব্দীর সূর্য রক্তমেঘে অস্ত গেল, নৈবেদ্যের একাধিক কবিতায় তার স্নায়ব প্রতিক্রিয়া গ্রথিত হয়ে আছে। এক দিকে কবির নিজস্ব চরিত্র, অন্য দিকে পঙ্কস্নাত যুগ, অনিবারণীয় ঘটনাচক্র; এ-দুয়ের টানাপোড়েনে নৈবেদ্যের কবিতাগুলি আলোড়িত। এবং

৪ রাজর্ষি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৪০১

নৈবেদ্যকালীন রচনা চোখের বালিতে একই দোটানা, একই টানাপোড়েনের অন্য অভিক্ষেপ। সেখানেও চরিত্রের উপরে আঘাত পড়েছে, চরিত্র উৎকেন্দ্রিক হতে চলেছে এবং পরিণামে বাসনা থেকে, বহির্জগৎ থেকে অচঞ্চল জীবনকেন্দ্রে ফিরেছে। নৌকাডুবিতে রবীন্দ্রনাথ ঘটনাঘনিষ্ঠ আখ্যানের একটি নক্শা আঁকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এর সমস্ত কাহিনীটিকে অনুধাবন ক'রে ঔপন্যাসিক নিজেই অন্যরকম বলেছেন—

একালে গল্পের কৌতূহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনা-গ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।...ট্র্যাজেডির সর্বপ্রধান বাহন হয়ে রইল হতভাগ্য রমেশ— তার দুঃখকরতা প্রতিমুখী মনোভাবের বিরুদ্ধতা নিয়ে তেমন নয় যেমন ঘটনাজালের দুর্মোচ্য জটিলতা নিয়ে।[৫]

অধোরেখ অংশটিতে একটু যেন দ্বিধা আছে। প্রকৃত পক্ষে, নৌকাডুবিতে ঘটনা এসে চরিত্রের উপর হঠাৎ নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রথমে প্রাপ্য মনোযোগ চেয়েছে এবং অতঃপর শুধু চরিত্রের অভ্যন্তরে প্রতিমুখী মনোভাবের সংগ্রামই চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে :

...যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবন-সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল তখনই নানা বিরুদ্ধ ঘাতপ্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকার ধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া, জাগ্রত হইয়া উঠিল।[৬]

রমেশ রবীন্দ্রচরিত্রশালার প্রতিনিধি কোনোমতেই নয়, কিন্তু সে নিশ্চয়ই পাঠকের একটি অন্তরঙ্গ নস্ট্যাল্‌জিয়া। রমেশের আকাঙ্ক্ষা ও নির্বাণ, অন্বেষণ ও অন্তিম নিয়তির মধ্যে শুধু জীবন-বোধ নয়, জীবন আছে। এবং সব মিলিয়ে একটি চরিত্র আছে, যা ঘটনার ক্রীড়নক নয়, অন্তর্লীন ঘটমানতায় যা বিবর্তমান। ব্যক্তিবিশেষত্বই তার প্রস্থানভূমি, প্রত্যাবর্তনের নিশানা।

অথচ, ব্যক্তিবিশেষকে ভারতবর্ষ একমাত্র ও চূড়ান্ত বলে গণ্য করে না, এবং বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষেরই প্রকাশ, এ কথা গোরা বলেছে। এটুকু শুনেই যাঁরা গোরা-চরিত্রকে ডকুমেণ্টারি তথ্য-চিত্রের বাহন হিসেবে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়েন, গোরা পড়তে গিয়ে তাঁরা বারংবার প্রতিহত হবেন। অন্তত টমাস এ কেম্পিসের *Imitation of Christ* নামক ধর্মগ্রন্থে মনোনিবেশের চেষ্টা করতে দেখে সুচরিতাকে ব্যক্তিত্ববর্জিত একটি মহিলা হিসেবে মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়। বৃহৎ ভাবের কাছে আত্মসমর্পণ, পূর্বোক্ত এই বৈশিষ্ট্য গোরা উপন্যাসে আর-একটি উপসর্গ নিয়ে এসেছে, সে হল অতিকথন বা over-motivation। কিন্তু ঘটনা এবং চরিত্রের ক্রম-বর্ধিষ্ণু দূরত্বকে মেলাবার জন্যও গোরা উপন্যাসখানি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এর পরে শুধু চরিত্র, শুধুই চরিত্রের অস্তিত্বের সমস্যা। ঘটনা একটা কোথাও ঘটছে, কিন্তু সে শুধু বহির্দেহলিতে, অন্দরমহলের প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে চরিত্র নিজের মুখোমুখি বসে আছে।

একালের একজন সমালোচক তাঁর প্রাসঙ্গিক অভিযোগ সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন—

৫ নৌকাডুবি, সূচনা। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড

৬ নৌকাডুবি। রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড পৃ ২৪৫

…গোরার পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে আমরা যেন এই তৃপ্তিকর সমগ্রতার সন্ধান পাই না। ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিল-গ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই-একটি রঙিন ও সূক্ষ্মসূত্রকে পৃথক্‌করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে।[৭]

সমালোচক যাকে পৃথকীকরণের চেষ্টা বলেছেন, তা সম্ভবত disintegrationএর প্রতিশব্দ। এবং গোরা-পরবর্তী উপন্যাস ঘরে বাইরের প্রসঙ্গে তৎকালীন একজন সমালোচক সে কথাই বলেছিলেন, আরো কঠোর ভঙ্গিতে—

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিখিলেশকে পরিবারবিমুখ করিয়া, আত্মসর্বস্বময় করিয়া, সংকীর্ণতার বেড়াজালে তাহাকে বন্দী করিয়া, তাহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতের নহে।[৮]

নিখিলেশ পরিবারবিমুখ বা আত্মসর্বস্ব না হোক, disintegrated। সমাজ থেকে সে অবচ্ছিন্ন, ধ্যানধারণার নিঃসঙ্গ মৌলিকতায় তাকে প্রায় 'সমাজচ্যুত' বলা যেতে পারে। সত্যই সে ভারতীয়তার যান্ত্রিক একজন প্রতিভূমাত্র নয়। এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতি তার এমন কোনো আসক্তি নেই যা তার মানবস্বভাব আচ্ছন্ন করতে পারে :

আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি, কিন্তু তাড়াতাড়ির সুবিধের জন্য ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখতেই বাহাদুরি, কিন্তু আসলে ওটা দুর্বলতার গোঁজামিলন।

নিখিলেশের এই কথাটা যে নিছক অধ্যাত্ম পূর্বসংস্কারের অভ্যাসে বলা হয় নি, তার ভিত্তি যে একান্ত মানবিক সৌন্দর্যচিন্তা ও শিল্পসংবিতের মধ্যে, তার একটি নজির রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' নামক সমালোচনাগ্রন্থ থেকে উদ্‌ধৃত করছি—

সৌন্দর্যসৃষ্টি করাও অসংযত কল্পনাবৃত্তির কর্ম নহে। সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না। একটুতেই আগুন হাতের বাহির হইয়া যায় বলিয়াই ঘর আলো করিতে আগুনের উপর দখল রাখা চাই। প্রবৃত্তি-সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পূরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।[৯]

নিখিলেশের চরিত্রের মর্মকথা এখানেই অনুস্যূত হয়ে আছে। নিখিলেশ প্রবৃত্তিকে পুরো মাত্রায় জ্বলে উঠতে দেয় নি, সঞ্চালিত করে দিয়েছে মাত্র। সুতরাং যাঁরা সন্দীপকে প্রবৃত্তি এবং নিখিলেশকে নিবৃত্তি বলেন, তাঁরা বাহির-দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রবৃত্তির প্রকাশ্য অত্যাচার নিখিলেশে নেই, এবং প্রবৃত্তির অঙ্গার থেকে উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গকে সে প্রশ্রয় দেয় নি, কিন্তু তার অর্থ এই

---

৭ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃ ১৪২

৮ 'সাহিত্য', আষাঢ়, ১৩২৫, পৃ ২২৯-৩০। 'রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার ধারা' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীআদিত্য ওহদেদার অংশটি উদ্‌ধৃত করেছেন।

৯ 'সৌন্দর্যবোধ', সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, পৃ ৩৫৭

নয় যে সেই প্রাণদ উত্তাপটুকুকে সে স্বীকার করে না; স্বীকার সে করেই, কিন্তু তার উপর একটি শর্ত আরোপও করে বলে, 'প্রবৃত্তির সঙ্গে একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায়, তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায় না।'

অর্থাৎ নিখিলেশ আগে থেকে চিহ্নিত হয়ে নেই; তার স্বগতোক্তির স্রোতোরাশি এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের তমঃপুঞ্জ পার হয়ে সে চলেছে এবং চলতে চলতে বুঝেছে, 'ছোটো জায়গা থেকে বড়ো জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা।' এই ঝোড়ো রাস্তার অন্য নাম experience যার মধ্য দিয়ে নিখিলেশ যথার্থ innocenceএ পৌঁচেছে। ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রথমে যে-নিখিলেশকে দেখি, তার সঙ্গে শেষের নিখিলেশের পার্থক্য নেই তা নয়; শেষের নিখিলেশ অনেক রক্ত অনেক স্বাস্থ্য ঝরিয়ে কৃশ, ক্লান্ত এবং তার সেই কৃশতা এবং ক্লান্তির মধ্য থেকে তার ভিতরে যে-বিশ্বাস জেগে উঠেছে তাকে বলতে পারি দ্বিতীয় বিশ্বাস। শান্ত রস তার চরিত্রের একটি আপাতলক্ষণ, একটি আবরণ, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ বা চারিত্র নয়।

চতুরঙ্গ ও ঘরে বাইরে প্রায় সমকালীন। কালক্রমের বিচারে চতুরঙ্গ ঘরে বাইরের ঈষৎ আগে লেখা হলেও, ভাবগত আধুনিকতার দিক থেকে তা ঘরে বাইরে অপেক্ষা অগ্রসর বলে ঘরে বাইরে আলোচনার পরেই চতুরঙ্গ-প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করছি। বিশ্লেষণের দিক থেকে সুবিধার্থেও ভাবক্রমটির উপরেই এখানে জোর দিচ্ছি। চতুরঙ্গ উপন্যাস, নানা দিক থেকেই, আমাদের সময়ের অন্যতম একখানি আধুনিক উপন্যাস। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রেক্ষণীতে বলাকা ও চতুরঙ্গ একসঙ্গে মিলিয়ে পড়লে পাঠকের কাছে অনেক সংকেত উন্মোচিত হতে পারবে। যে বুনো হাঁসের দল ডিম পেড়েছিল, ঘর বেঁধেছিল, তারা শুধু বলাকায় নেই, চতুরঙ্গেও আছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাস বা প্রচলিত নাস্তিক্যে যারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারা চতুরঙ্গে আবার অন্য-কোনোখানে অগ্রস্রিয়মাণ। যুক্তিনির্ভর পজিটিভিজ্‌ম থেকে ভক্তিনির্ভর বৈষ্ণব ধর্মের পথিক শচীশ যে শেষ পর্যন্ত কোথাও স্থিত হল না, স্থগিত হল না— তার কারণ, উপন্যাসের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা এর মধ্যে আরো বিপ্লবী হয়ে উঠেছে। 'যে সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি ক'রে তোলে আমি সেই সত্যের দীক্ষা নিয়েছি'— নিখিলেশ বলেছিল। শচীশের সত্যও অন্তরের সত্য। পার্থক্য, শচীশের আন্তর সত্য অন্তর্জগতে পর্যাপ্ত ও পরিস্ফুট হতে চায়, বাহিরের ঘটনা-পরিবেশকে নিয়ে তার করণীয় কিছুই নেই। শচীশের মধ্যে চরিত্রের বিবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণাটি চূড়ান্ত momentum বা গতিরূপ লাভ করেছে। বিবর্তন, না জন্মান্তর বলব? রবীন্দ্রনাথ নিজের উপান্ত্য পর্যায়ের রচনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন—

All of us have different incarnations in this very life. We are born again and again in this very life. When we come out of one period, we are as if born again.[১০]

১০ *Forward*, 23 February, 1936। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের শেষে শ্রীপুলিনবিহারী সেন -সংকলিত তথ্যপঞ্জী থেকে উদ্‌ধৃত।

শচীশের মৃত্যু ঘটেছে অনেকবার, জন্মও। ছোটো ছোটো জন্মমৃত্যুর সীমানায় নানা শচীশের একখানি মালা। এই মালা যার প্রাপ্য, সেই দামিনীর শত জন্মান্তরও আধুনিক চরিত্রের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। বিমলা ও দামিনী সতীর্থা, দুজনেই পরিণামী সমুদ্রের দিকে গেছে, আপেক্ষিক স্বচ্ছন্দ ও সংকীর্ণ ধারণা পার হয়ে-হয়ে। কিন্তু দামিনী বিমলার চেয়ে আরো আশ্চর্য, তার তরঙ্গের বেগ ও বিস্তার আরো অনেক বেশি। পঞ্চভূতের 'নরনারী' রচনায় নারীকে 'প্রলয়কারিণী কার্যশক্তি' বলা হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে, 'রমণী যদি একবার বহির্বিপ্লবে যোগ দেয়, নিমেষের মধ্যে সমস্ত ধূ ধূ করিয়া উঠে।' দামিনী বহির্বিপ্লবে যোগ দিয়েছে এবং তার ফলে তার পরিবেশ নয়, তার নিজের জীবনই নিমেষের মধ্যে ধূ ধূ ক'রে উঠেছে। দামিনী সেই মানবী, পুরুষচরিত্রের মতোই যে নিজেকে অনিঃশেষ খুঁজেছে, বিপর্যস্ত হয়েছে এবং যার মধ্যে জীবজিজ্ঞাসা ও দিব্য অতৃপ্তি মিলে গেছে। তার কাছে পরবর্তী সোহিনীও রক্তাল্পতায় বিবর্ণ।

'সর্বাপেক্ষা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary)' বলে যে-বিচারক চতুরঙ্গকে অভিযুক্ত করেন তিনি মানবচরিত্রকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করান। মানবচরিত্র, বিশেষতঃ পুরুষচরিত্র সর্বদাই অসম্পূর্ণ এবং অ-নির্ধারিত। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর শেষের দিকের রচনায় এ-প্রসঙ্গে যে কথা বলেছেন তা তাঁর এই পর্বের উপন্যাসকে বুঝতে সাহায্য করে—

পুরুষের কর্মপথে এখনও তার সন্ধানচেষ্টার শেষ হয় নি। কোনো কালেই হবে না। অজানার মধ্যে কেবলই সে পথ খনন করছে, কোনো পরিণামের প্রান্তে আজও সে অবকাশ পেলে না। পুরুষের প্রকৃতিতে সৃষ্টিকর্তার তুলি আপন শেষ রেখাটা টানে নি। পুরুষকে অসম্পূর্ণই থাকতে হবে।[১১]

অতঃপর এই নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ চরিত্রায়ণের মুহূর্তে নিজেকেই দিয়েছেন। এবং সৃষ্টিকালে আরো একটি সমস্যা উত্থাপন করেছেন যা চরিত্রের মসৃণ স্থাপত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত— সে হল অবচেতনার সমস্যা। এখানে ফ্রয়েড বা ইয়ুং-এর প্রভাব খোঁজার সুযোগ এসে পড়ে, কিন্তু তা তত্ত্ব-তুলনার পর্যায়ে পড়বে বলে সে-প্রলোভন সংবরণ করছি। এখানে রবীন্দ্রনাথের দুঃসাহসী আধুনিকতা লক্ষ্য ক'রে আমরা শুধু বিস্মিত স্তম্ভিত হতে পারি। প্রতিদিনের নির্মিত ও নির্মীয়মাণ মানবচরিত্রকে অন্ধকার অবচেতনা এসে যে নিরাকার করে তুলতে পারে, নির্বস্তুক উপাদানে ফিরিয়ে দিতে পারে, গিরিগুহাগাত্রে শিলালেখের মতো উৎকীর্ণ ক'রে সেই সত্যকে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। কয়েকটি অনিবার্য দৃষ্টান্ত—

১. তার পরে কিসে আমার পা জড়াইয়া ধরিল। প্রথমে ভাবিলাম কোনো একটা বুনো জন্তু। কিন্তু তাদের গায়ে রোঁয়া আছে— এর রোঁয়া নাই। আমার সমস্ত শরীর যেন কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। মনে হইল একটা সাপের মত জন্তু, তাহাকে চিনি না। তার কী রকম মুণ্ড, কী রকম গা, কী রকম লেজ কিছুই জানা নাই— তার গ্রাস করিবার প্রণালীটা কী ভাবিয়া পাইলাম না। সে এমন নরম বলিয়াই এমন বীভৎস, সেই ক্ষুধার পুঞ্জ।—চতুরঙ্গ

১১ যাত্রী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, ঊনবিংশ খণ্ড, পৃ ৩৭৯

২. যেখানে কোনো ডাকের কোনো সাড়া, কোনো প্রশ্নের কোনো জবাব নাই ; এমন একটা সীমানাহারা ফ্যাকাশে সাদার মাঝখানে দাঁড়াইয়া দামিনীর বুক দমিয়া গেল। এখানে যেন সব মুছিয়া গিয়া একেবারে গোড়ার সেই শুকনো সাদায় গিয়া পৌঁছিয়াছে। পায়ের তলায় কেবল পড়িয়া আছে একটা 'না'।—চতুরঙ্গ

৩. পরস্পরের আঁচলে চাদর বাঁধা ওরা যখন চলে যাচ্চে সেই দৃশ্যটা, আজ, কেন কী জানি, বিপ্রদাসের কাছে বীভৎস লাগল। প্রাচীন ইতিহাসে তৈমুর জঙ্গিস্ অসংখ্য মানুষের কঙ্কাল-স্তম্ভ রচনা করেছিল। কিন্তু ঐ যে চাদরে-আঁচলের গ্রন্থি, ওর সৃষ্ট জীবন্মৃত্যুর জয়তোরণ যদি মাপা যায় তবে তার চূড়া কোন্ নরকে গিয়ে ঠেকবে। কিন্তু এ কেমনতরো ভাবনা আজ ওর মনে।—যোগাযোগ

৪. একরকম জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, সে-জাত কিছুতে ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে এমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে এমন নয়। অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল ব'লে মোতির মা এই রহস্য নিজের মধ্যে বোঝবার সময় পায় নি— কিন্তু কুমুর ভিতর দিয়ে এই কথাটা সে নিশ্চিত করে অনুভব করলে। তার গা-কেমন করতে লাগল। ও যেন একটা বিভীষিকার ছবি দেখতে পেলে, যেখানে একটা অজানা জন্তু লালায়িত রসনা মেলে গুঁড়ি মেরে বসে আছে, সেই অন্ধকার গুহার মুখে কুমুদিনী দাঁড়িয়ে দেবতাকে ডাকছে।—যোগাযোগ

শৈবলিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অন্ধকার গুহার মধ্যে নিয়ে গিয়ে আবার অনায়াসে উত্তীর্ণ করিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ, পক্ষান্তরে, চরিত্রকে অস্তিত্বের সমস্যার কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন, নিষিদ্ধ সেই অগ্নিপ্রপাতকে এড়িয়ে তাকে পালাতে দেন নি। এমন-কি, বিপ্রদাসের মতো সুস্থ সুন্দর যুধিষ্ঠিরকেও তিনি সংশয়বিদ্ধ করেছেন, বিধিবহির্ভূত চিন্তার নরকে নিয়ে এসেছেন। আর কুমুদিনীকে, তিনি নিষ্ঠুরতম নিয়তির মতো কৌতূহলে, গভীর গুহার দিকে নম্র বেদনায় অগ্রসর দেখেও আশু কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি। (যোগাযোগ উপন্যাসের পরিণাম অবশ্য রবীন্দ্রনাথেরই সচেষ্ট প্রবর্তনার ফল, কিন্তু ততক্ষণে কুমুদিনী-চরিত্র সম্পূর্ণ আকার নিয়েছে।) এই সূত্রে একটি কথা অশোভন হবে না। বিপ্রদাস না থাকলেও কুমুদিনী-চরিত্রের মূল সূত্রটি হারিয়ে যেত না। বিপ্রদাসের কাছে গীতা আর কুমারসম্ভব সে পড়েছে, এবং বিপ্রদাসের সাহায্যেই তার জীবন-দর্শন ও মনের গড়নটি দেখা দিয়েছে। কিন্তু বিপ্রদাস তার অনুজার মুক্তিদাতাও বটে। বিবর্তনের মুহূর্তে কুমুদিনী একা, যেমন একা আশ্রম থেকে স্বনির্বাসিত শকুন্তলা। এবং কুমুদিনী-চরিত্র সেই অস্তিত্বের বিপন্নতার মুখেই ফুটে উঠেছে। তার ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা তার চরিত্রকে আরো অনেক ঋদ্ধ করেছে, সম্ভাবনায় উন্মীলিত করেছে। সেখানে বিপ্রদাসের কোনো করক্ষেপ নেই। এই প্রসঙ্গটিকে আরো প্রসারিত করে এ কথা বলা হয়তো সম্ভব, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের তুলনায় তাঁর নাটকে চরিত্রের এই স্বাধীন বিবর্তন খণ্ডিত। তাঁর উপন্যাস এই অর্থে অনেক নাটকীয়। চরিত্রের স্বাধিকার ঘটনার কাছে অভিভূত না হলেও ঘটনাই তার পরিণতি নিয়ে আসে। স্বাধিকার যত প্রকট, ট্র্যাজেডি ততই তীব্র। চার অধ্যায় সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলেছেন—

নরনারীর ভালোবাসার গতি ও প্রকৃতি কেবল যে নায়কনায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপরে নির্ভর করে তা নয় চার দিকের ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও। নদী আপন নির্ঝরপ্রকৃতিকে নিয়ে আসে আপন জন্মশিখর

থেকে, কিন্তু সে আপন বিশেষ রূপ নেয় তটভূমির প্রকৃতি থেকে। ভালোবাসারও সেই দশা, এক দিকে আছে তার আন্তরিক সংরাগ ও আরেকদিকে তার বাহিরের সংবাধ।[১২]

এলা-অতীনের নিয়তিসংকুল প্রেমের প্রবাহে একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, রবীন্দ্রনাথ 'চরিত্রের বিশেষত্ব' বলতে কোনো পূর্বনির্ণীত স্থাবর স্বভাবের কথা বলছেন না— চরিত্রের ব্যক্তিবিশেষত্ব ও নিঃশর্ত বিবর্তনের উপরেই জোর দিচ্ছেন।

এই কারণেই তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রতিটি অংশের অঙ্গাঙ্গী সংগতি যাঁরা খুঁজেছেন, ভুল বুঝেছেন। নীরজাকে যে-আদিত্য এত নিবিড় ভালোবেসেছিল, সে কি করে সরলার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারল? এবং যদি-বা সেই আকর্ষণ তার মধ্যে জেগে থাকে, তা অত আকস্মিক কেন, একটি পূর্বাঙ্কুরও তো থাকতে পারত। উত্তরে বলা চলে, চরিত্রের অন্তর্নিহিত অবচেতনের স্মৃতি দুর্মর বেগে জেগে উঠে কি রকম পরিচিত পরিবেশকে বদলে দেয়, paramnesia নামক মনস্তাত্ত্বিক সত্যে তার পরিচয় আছে। রোমান্টিক কবিদের রচনায় এটি একটি এষণা (motif) এবং রবীন্দ্রনাথ সেটিকেই এখানে ব্যবহার করেছেন। মালঞ্চ উপন্যাসের ত্রুটি তবু হয়তো এখানে যে তার মিতাখ্যান সংযম পাঠকের বিশ্বাস উৎপাদনের পথে যতটা সময় প্রয়োজন তার চেয়েও কম সময় নিয়েছে। অর্থাৎ মালঞ্চ নাটকীয়তায় আক্রান্ত। প্রায় শ্বাসরোধী। মনে হয়, দুই বোনে চরিত্রকে ঘিরে তত্ত্ববিশ্লেষণের যে তাগিদ, তা থেকে নতুন পথে যাবার জন্যই মালঞ্চ লেখা হয়েছিল।

এই সময় সংলাপের উপরে যে এত জোর পড়ল, সে-ও একই কারণে। সংলাপ চরিত্রেরই মুকুর। কিন্তু অনেক সময় প্রতিবিম্ব যেন মুখের চেয়েও প্রাধান্য পেয়েছে। আধুনিক কালের উপন্যাসে সংলাপ বা শব্দসজ্জা অত্যন্ত জরুরি একটি প্রয়োজন। একজন সমালোচক তো এমনও বলেছেন—

> Character is merely the term by which the reader alludes to the pseudo-objective image he composes of his responses to an author's verbal arrangements.[১৩]

এতদূর চরমপন্থী না হয়েও বলা চলে, রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের চরিত্রেরা শব্দকেই একটি মৌল মূল্যবোধরূপে আশ্রয় করেছে, এবং তাদের ভাষা কাব্যভাষা বা poetic diction। ভাষাশিল্পী এই চরিত্রগুলি অনেক সময় বাক্পটুতায় যুক্তির (reason) পরিবর্তে ওজর (rationalization) দিয়েছে। অমিত রায় এই শ্রেণীরই চরিত্রের পুরোধা।

এই পর্বের চরিত্রেরা জানে যে তারা পূর্ণতার পটভূমি থেকে বিচ্যুত এবং তারা সে বিষয়ে মর্মান্তিকরূপে সচেতন। মধুসূদনের প্রবৃত্তি এবং অমিতের ধীবৃত্তি দুয়েরই সীমা আছে এবং এ নিয়ে উভয়েরই মন সংকুচিত। 'এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে

১২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ ৫৪৩-৪৪

১৩ Martin Turnellএর *The Novel in France* গ্রন্থের ৬ পৃষ্ঠায় উদ্‌ধৃত C. H. Rickwordএর মন্তব্য

দিয়ে'— এ কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে অভীক এই শ্রেণীর চরিত্রেরই প্রতিনিধিত্ব করে। সমগ্র থেকে এরা বিচ্ছিন্ন বলেই সমস্তকে আঁকড়ে ধরে পেতে চায় এবং মনস্তাত্ত্বিক সংকট রচনা করে। রবীন্দ্র-নাথের ভাষায়—

Man must realize the wholeness of his existence, his place in the infinite. ...Deprived of the background of the whole, his poverty loses its one great quality which is simplicity...In literature we miss the complete view of man which is simple and yet great. Man appears instead as a psychological problem, or as the embodiment of a passion that is intense because abnormal, being exhibited in the glare of a fiercely emphatic artificial light.[১৪]

রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ পর্ব সম্বন্ধে অনেক সময় এ-অভিযোগ উঠতে পারে, যে, সরল মহিমার সেই মানুষটির সাক্ষাৎ সেখানে আর মিলছে না। এ কথা ঠিক যে abnormal বা অস্বাভাবিক চরিত্রের ভিড় সেখানে বেড়েছে কিন্তু খণ্ডিত চরিত্রের সঙ্গে পূর্ণতার দ্বন্দ্ব সংঘটনই সেসব স্থলে লেখকের উদ্দেশ্য।

'তিন সঙ্গী' উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তিনটির মধ্যেই একটি ঐক্যসূত্র আছে এবং এর মধ্যে যে-কোনো দুটি অপরটির উপকাহিনী হতে পারত। এই গ্রন্থের এক-একটি চরিত্র উপন্যাসের চরিত্রের মতোই একটি ব্যাপক পটভূমি নিয়ে গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সবশেষে শুধু একটি ছোটগল্পের চমক রেখে যায়। আরো একটি দার্শনিক সূত্র আছে, empiricism। ইতিপূর্বে তাঁর নায়কেরা সম্পূর্ণতার যে-আস্বাদ ও মুক্তির মধ্যে নিষ্ক্রমণ পেয়েছে এই পর্বে তার জায়গা জুড়েছে একরকম ক্ষণসাম্প্রতিক বোধ। তাই নবীনমাধবকে বলতে হয়—

সন্ধ্যেবেলায় বারান্দায় এসে বসলুম। খাঁচা ভেঙে গেছে। পাখির পায়ে আটকে রইল ছিন্ন শিকল। সেটা নড়তে চড়তে পায়ে বাজবে।

শুধু তাই নয়, প্রকৃতির সঙ্গে চরিত্রের সেই প্রাণসেতু এখানে আর পাওয়া যাবে না। প্রকৃতি এখানে চরিত্রকে সরিয়ে নিয়ে গেছে তার আপন চৈতন্যের ভরকেন্দ্র থেকে। নবীনমাধব ও অচিরার একটি কথোপকথনের ঈষদংশ—

'আমিই আপনার মনকে সরিয়ে এনেছি।'

'তা হতে পারে, কিন্তু একলা আপনি নন, বনের ভিতরকার এই অন্ধশক্তি। সেই জন্যেই আমি এই সরে আসাকে শ্রদ্ধা করি নে, লজ্জা পাই।'

'কেন করেন না।'

'দীর্ঘকালের প্রয়াসে মানুষ চিত্তশক্তিতে নিজের আদর্শকে গড়ে তোলে, প্রাণশক্তির অন্ধতা তাকে ভাঙে। আপনার দিকে আমার যে ভালোবাসা, সে সেই অন্ধশক্তির আক্রমণে।'[১৫]

---

১৪ 'The Relation of the Individual to the Universe', *Sadhana*, pp 9-10

১৫ তিন সঙ্গী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, পৃ ৩৬৪-৩৬৫

প্রকৃতি ও চরিত্রে নিয়তি ও পুরুষকারের এই দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের অন্তিম কথাসাহিত্যের একটি ফলক্ষণ। তাঁর চিত্রশিল্পে এই দ্বন্দ্ব যে জায়গা পেয়েছে, এখানে তা পায় নি, কিন্তু তা বলে যেটুকু পেয়েছে তাও উপেক্ষণীয় নয়।

কোনো এক বিদেশী সাময়িক পত্রের সমালোচক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথকে একবার ডস্টয়েভ্স্কির সঙ্গে তুলনা করে ছিলেন। ঘরে বাইরে উপন্যাসের সূত্রে তিনি এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করে বলেছিলেন—

শিল্পী হিসেবে যে এ দুজনের মধ্যে কোনো সাদৃশ্যরেখা টানা যায়, তা নয়। এ যেন ক্যাথিড্রাল অর্গ্যানের সঙ্গে একটি বাঁশির তুলনা। তা ছাড়া, সেই মহৎ রুশ লেখকের পটভূমিকা হল একটি গভীর খ্রীষ্টীয় জীবনবোধ। কিন্তু দুজনেই মূলত প্রাচ্যধর্মী; মানবিক মহত্ত্বের অন্তর্লীন আদর্শ সম্বন্ধে দুজনের ধারণায় অনেক মিল।[১৬]

ডস্টয়েভ্স্কির রাজসিক নায়কচরিত্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নায়কদের পার্থক্য অনেকাংশেই দুস্তর; কিন্তু Absolute বা সম্পূর্ণতার বুভুক্ষায় তারা সবাই সংকীর্ণ পথ ছেড়েছে; আবার সামাজিক সত্যকে যেমন তারা উপেক্ষা করেছে, তেমনি পূর্ণাঙ্গ জীবন-সত্যকে পাবার জন্য ঝুঁকিও নিয়েছে। অপর সাদৃশ্য, আত্মক্ষয়ী ব্যক্তি-চরিত্রের অহংকে এঁরা কেউই প্রশ্রয় দেন নি, দাস্যরসের অশ্রুময়তায় প্রেমের কাছে, পরমের কাছে তার মাথা নত করেছেন। টলস্টয়ের এপিক-সুলভ উদাসীনতা এবং— তাঁরই ভাষায়— পৃথিবীর মস্ত প্রজাপতির গুটি থেকে নিরাসক্ত প্রজাপতির মতো বেরিয়ে যাওয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে নেই। তাঁর উপন্যাস, ডস্টয়েভ্স্কির মতোই, জীবনকে ভালোবেসে জীবনের সঙ্গে জড়িত হবার শিল্প।

এখানেই স্তাঁধাল বা প্রুস্ত্-এর সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। খরবুদ্ধির সাহায্যে স্তাঁধালের যে-সব চরিত্র সমাজের বাইরে এসে সমাজকে আক্রমণ করে, রবীন্দ্রনাথের নায়কেরা তা করে না। প্রুস্ত্-এর মতোও তারা আপন অনুভূতির তন্তুজালে অন্তরীণ নয়, অথবা জীবন-বিন্যাসের বৃহৎ ব্যাপার থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে ব্যক্তিস্বাশ্রয়ী সময়-চেতনার মধ্যে বাস করে না। একই সঙ্গে আত্মলীনতা এবং আত্ম-উত্তরণ তাঁর চরিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য অথবা ঈপ্সিত লক্ষ্য।

চরিত্রের এই পরমতা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের উপহার। শরৎচন্দ্র এখান থেকেই যাত্রা সূচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর উপন্যাসের ফলশ্রুতি রসোজ্জ্বল একটি আখ্যানের সমগ্রতা, চরিত্রের নয়। দুতিনটি সমকালীন উদাহরণ বাদ দিলে, সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস চরিত্রের এই বিবর্তনকে স্বীকার করেছে কিনা সন্দেহ। হয়তো শতচ্ছিন্ন আমাদের সময়ের বাসনালোকেও এই পূর্ণাভিমুখী বিবর্তনের জন্য কোনো বেদনা কিংবা প্রত্যাশা নেই। এবং শতধা সমাজের disinte-

১৬ *The Church Times* 1.8. 1919। A. Aronsonএর *Rabindranath Through Western Eyes* গ্রন্থে উদ্ধৃত।

gration-কে মেনে নিয়েও যে বিব্রত ব্যক্তিসত্তা পূর্ণপ্রয়াণের পথে ত্বরান্বিত হতে পারে, এমন কোনো প্রবণতা শক্তিমান শিল্পীদের অধিকাংশের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে না।

সোফোক্লেস জীবনকে স্থিরভাবে আর সমগ্রভাবে দেখেছিলেন, ম্যাথু আর্নল্ডের অভিমত। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যও সমগ্র জীবনকে স্থির ও গভীর -ভাবে দেখা। এবং যেহেতু আত্মসন্ধান এবং জীবনসন্ধিৎসা রবীন্দ্রচরিত্রের মূলসূত্র, তাঁর রচিত চরিত্রাবলীতে তার আভ্যন্তরিক অভিজ্ঞান আছে। এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন, রবীন্দ্রনাথেরই মতো, সমস্ত জীবন ছেঁকে সমগ্রতার স্যমন্তক মণি অর্জন করেছে।

দা মি নী

শ্রীকানাই সামন্ত

'যে দি ন মা ঘে র পূ র্ণি মা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

রমণীহৃদয়ের এই মোহময় আকাঙ্ক্ষার সুস্পষ্ট উচ্চারণে দামিনীর দুঃখসুখ-আশাশঙ্কা-ঔৎসুক্য-আবেগ-বিচিত্র মর্তজীবনের শেষ অঙ্ক সবশেষে আসিয়া ঠেকিল, আকাশে তারার প্রদীপগুলি দূর হইতে দূরে একে-একে নিবিয়া গেল, পূর্ণচন্দ্র বনান্তরে অস্তমিত হইলেন, ও দিকে অনাদিসৃষ্টি-সলিলে-পরিপূর্ণ পুণ্যময় সোনার ঘট পূর্বসমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে দোলা লাগিয়া জাগিয়া উঠিবার আগে পরিষ্কৃত দিগঙ্গনে কে যেন কুঙ্কুমরাগ ছড়াইয়া দিল। একটি চাপা দীর্ঘনিশ্বাসে শ্রীবিলাস এই আখ্যানকথন শেষ করিলেন, কী জানি হয়তো আমাদের মতো অসাড়হৃদয় পাঠকেরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল, অথচ অপূর্ব একটি নারীচরিত্রের দুর্লভ পরিচয়-লাভে মনে মনে একটি বিশেষ সুখ ও পরিতৃপ্তির উদয় হইল না কি? দক্ষকন্যা সতী যখন স্বেচ্ছায় যজ্ঞঅনলে দেহবিসর্জন দেন, তিনিও অনুরূপ সংকল্প লইয়াই এক জীবনের লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন— তিনি দেবী, মহাদেবী, সনাতনী। দেবতা না হইয়াও, আমাদের মাটির ঘরে ক্ষুৎপিপাসাঅধীন রক্তমাংসের দেহ লইয়া কোন্ স্নেহপ্রেমমুগ্ধা তাঁরই পুণ্য পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চাহিবে না? জন্মমৃত্যুপরিচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র জীবনের সীমায় সব-কিছুর সূচনা বা শেষ এমন তো আমরা মনে করিতে পারি না। বিজ্ঞানে দর্শনে কোনোরূপ ভরসা দিক আর না-ই দিক, সুগভীর প্রীতির প্রত্যয়ে, একান্ততম নিগূঢ়তম কোনো-একটি মানব-সম্পর্কের ধারা জীবনে জীবনান্তরে প্রসারিত না করিয়া তো থাকিতে পারি না। বিশ্বসৃষ্টিতে বহু দোষত্রুটিপূর্ণ মরদেহের আশ্রয়ে এতখানি দুঃখসুখ আনন্দবেদনার উপলব্ধি যদি সম্ভবপর হইয়া থাকে, শূন্যই তাহার পরিণাম এ কথা কখনোই সত্য নয়। অন্তত, এই তো ভারতীয় সংস্কার, এই তো বাঙালি ঘরের প্রাণময়ী প্রেমময়ী রমণীর বদ্ধমূল ধারণা, রক্তের চিরচঞ্চল অণুপরমাণুর স্থির প্রত্যয়।

তবে কি দামিনী যথালব্ধ বহুবিধ সংস্কারে আবৃতা, নানা দেশাচার ও লোকাচারের গণ্ডীতে বন্দিনী, আত্মপ্রত্যয়হীনা, বুদ্ধিহীনা, সাধারণ বঙ্গললনা? তাও নয়। এতটা সংস্কারমুক্ত, স্বতন্ত্র, স্বাধীনচিত্ত পুরুষ বা স্ত্রী সব দেশে আর সব কালেই দুর্লভ— আমাদের জানা-চেনা সংসারে দুর্লভতর। ইঁহাদের অস্তিত্ব নাই বা ছিল না এরূপ না হইলেও, ইঁহাদের চিনিয়া লইবার ক্ষমতা সকলের থাকে না। ক্ষীণদ্যুতি প্রদীপের আলোকে কাঁথা সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কালে কালে সম্ভবপর

হইয়াছে, নারীজীবনের গার্হস্থ্য অগ্নিতে দৈনন্দিন পাকশাকেরও অসুবিধা হয় নাই, ক্বচিৎ কোনো উন্মাদ তাহারই প্রদীপ্ত অঙ্গার ঘরের চালে লাগাইয়া অগ্নিকাণ্ড বাধাইয়াছে হয়তো, কোনো নির্বোধ নিবন্ত চুল্লিতে ফুঁ পাড়িতে গিয়া দেখিয়াছে শুধু ধুলা— শুধু ছাই— চক্ষু রগড়াইয়া সেই ভস্ম মুঠি-মুঠি গায়ে মাখিয়া হয়তো সন্ন্যাসীও হইয়াছে— কিন্তু সে অগ্নিকে শাশ্বত হোমাগ্নিরূপে কে বা দেখিয়াছে, কে বা চিনিয়াছে? উপস্থিত দেশে কালে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র স্বরূপদ্রষ্টা রূপস্রষ্টা হিসাবে যতটা দেখিয়াছেন বা দেখাইতে পারিয়াছেন, তাহারই প্রসাদে আমাদের ন্যায় স্বভাবান্ধেরও কী-যেন অপূর্ব দর্শনে কদাচিৎ চমক লাগিয়াছে। হায়, তাহারই ফলে জন্মমরণশীল মানবজীবনের সকল রহস্যের নিরসন না হইয়া, রহস্য আরও যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপই হয়। অবোধ বুদ্ধিহীনের কাছে রহস্য কিছু নাই, কোনো বিস্ময় নাই মানবজীবনে। আছে অভ্যাস ও প্রয়োজন— সে-সবই অভাবাত্মক। চিত্তের উদ্‌বোধে, ভাবের আন্দোলনে, অন্তরে বাহিরে, বিশ্বপ্রকৃতিতে ও মানবজীবনে, যে বিস্ময় সুখ ও বেদনা পদে পদে জাগিয়া উঠে কোনো দিন কোনোখানে যেন তার সীমা পাওয়া যায় না।

যথালব্ধ জড়সংস্কারের গণ্ডীতে এই জীবনসত্যের উপলব্ধি সম্ভবপর নয়, এই অপরূপকে দেখা এবং দেখানোর কল্পনা বাতুলতা-মাত্র। সেই অর্থেই বলিতে পারি : সংস্কারমুক্ত কবিচিত্ত এবং কবিদৃষ্টি ; তেমনি সংস্কারশূন্য হউক রসিকের মন ; অথচ মনুষ্যপ্রকৃতির গোড়াঘেঁষা শাশ্বত সংস্কার যেগুলি, যেন অস্বীকার করা না হয়— তাহাতে মানবসত্যকে জানা যাইবে না, মানবধর্মের অনাচরণে জীব হিসাবে, মানুষ হিসাবে, অকৃতকাম ও ব্যর্থ হইব।

মনুষ্যপ্রকৃতির নিজস্ব এই সংস্কার অনাদি, অনন্ত এবং অনির্বচনীয়। অহেতুক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যেহেতু স্পষ্টই দেখা যায় ছোটো ছোটো জমা-খরচের হিসাব তাহাতে মেলানো চলে না। তাহার লাভক্ষতি বড়ো অপূর্ব। যেহেতু মানবজীবন আসলে প্রাণকেন্দ্রিত এবং হৃদয়বিধৃত, এই সংস্কারও প্রাণের বা হৃদয়ের— বুদ্ধিবিচার যুক্তিতর্ক দিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা বা নিরসন হইতে পারে না। অভ্যস্ত আচার-আচরণ রীতিনীতি ইহার সজাতি বা সগোত্র নহে। এই স্বাভাবিকতার স্বচ্ছন্দ প্রকাশেই কপালকুণ্ডলা সুন্দর ; কিন্তু সেই অভিনব সৌন্দর্য উদ্‌ভিন্ন করিয়া তুলিতে, বঙ্কিমচন্দ্র সমাজবহির্‌ভূত সংসারবহিষ্কৃত এক বন্যপ্রকৃতির বিজন পরিবেশ কল্পনা না করিয়া পারেন নাই। কেননা, ঋষি ও মনীষী বঙ্কিম, তাঁহাকেও যে অবিকৃত মনুষ্যপ্রকৃতির আবিষ্কারে ও স্বভাবধর্মের ধ্যান-ধারণায় বহু তপস্যা করিতে হইয়াছিল, হয়তো বহু বিনিদ্র রাত্রি জাগিতে হইয়াছিল ; সহজাত ধী ও হৃদয়বৃত্তির গুণে আপন জীবনমুকুরে নিখিল জীবনের যে স্বরূপটি দেখিবার শক্তি তাঁহার অবশ্যই ছিল, তাহার বাধাও ছিল না কি সমাজে এবং পরিবারে— অতীত ঐতিহ্যে এবং তাঁহার তৎকালীন পরিবেশে? এ দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথকে বহুগুণে ভাগ্যবান বলা যাইতে পারে। তিনি যেন জন্মাবধি হাতে পাইয়াছিলেন পরিচ্ছন্ন পরিষ্কার একখানি চিত্তপট। অন্য কাল বা অন্য জন অল্পই তাহাতে দাগ দিয়াছে। এজন্য সামাজিক স্বাদেশিক বহুবিধ সংস্কার হইতে তিনি স্বভাবতই মুক্ত ছিলেন। প্রাণের

আবেগে কিম্বা প্রীতির ধর্মে যে-সমস্ত সংস্কার তিনি কালে কালে স্বীকার করিয়াছেন, সহ্য করিয়াছেন, তাহাদের অন্তরালবর্তী সত্য সম্পর্কে তাঁহার চেতনা ও উপলব্ধি কখনোই ক্ষীণ অথবা দুর্বল ছিল না। বোধ করি এজন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি না হইলেন হিন্দু, না হইলেন ব্রাহ্ম— না হইলেন ইংরেজ-বিদ্বেষী, না হইলেন গোঁড়া 'স্বদেশী'— সচেষ্ট সচেতন দীর্ঘ জীবনের ধ্যান-ধারণায় যে জিনিষ তিনি সত্য বলিয়া, জীবনের ধন বলিয়া জানিলেন, সেটি 'মানুষের ধর্ম'। নিজের পরিচয় দিলেন—

আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

তাঁর সেই আত্মপরিচয়ে কিছু আহত অভিমান যদি বা থাকে, সত্য আছে অনেকখানি। কথাটা উঠিল, তাই ইহাও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, কবি ঐ কবিতাতেই বলিয়াছেন—

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য— আলোকের প্রকাশ,
আর, সৃষ্টির শেষ রহস্য ভালোবাসার অমৃত।...
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল
দেবলোক থেকে মানবলোকে—
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে, আর
মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।

একেই এক প্রকার 'সহজ' পথ বলা চলে, সকল অভ্যস্ত আচার-আচরণ আর অন্ধ সংস্কারের বাহিরে ইহার গতি প্রবৃত্তি এবং পরিণতি।

আরোপিত সংস্কার থাকিলেও, জীবন যখন জাগিয়া উঠে, সকল সংস্কারের স্বচ্ছ অথবা স্বচ্ছতা-প্রাপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া তাহার স্বরূপ দেখা যায়। এই স্বরূপ দেখা এবং দেখানো ইহাই সচেতন কবি ও শিল্পীর শেষ সিদ্ধি ও সার্থকতা। কিভাবে কতটা দেখা গেল, ইহাতেই বোধ করি একজন সিদ্ধ কবি বা শিল্পীর রূপরচনা হইতে আর-একজনের রূপকৃতির ভিন্নতা। আসলে, সজীব মানুষ মাত্রেই সজাতি, সগোত্র। অনন্তবৈচিত্র্যের মধ্যে সেই ঐক্যের আভাস জাগাইয়া তোলা, যে-কোনো উপায়ে হউক, যে-কোনো কবিপ্রতিভার ইহাই একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে।

ননীবালা এবং দামিনী একরূপ নহে। দুই বিপরীত চরিত্রের দুই নারী, এমন বলিলেও কেহ আপত্তি করিবেন না। কেননা, শচীশের কথায়, ননীবালা সেই নারী যে নিজে মরিয়া জীবনের পাত্র সুধায় ভরিয়া নিল, প্রিয়তমকে দিতে যদিও পারিল না ; আর দামিনী— 'মৃত্যুর কেহ নয়, সে জীবন-রসের রসিক। বসন্তের পুষ্পবনের মতো লাবণ্যে গন্ধে হিল্লোলে সে কেবলই ভরপুর হইয়া উঠিতেছে··· সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।'

বিপরীত বৈকি। তবু, জীবন অর্জন করিতে, অচিরযৌবনে দামিনীও জীবন দেয় নাই কি? দিয়াছে তা নিজেরই সংস্কারমুক্ত সহজ জীবনের গতিভঙ্গে। সহজ— কিন্তু, অভ্যাসের অথবা আরামের এতটুকু নয়। আর, ও দিকে ননীবালা, সামাজিক দৃষ্টিতে সে সমাজভ্রষ্টা, ধর্মভ্রষ্টা, পতিতা রমণী— তার

ভুলের বা অপরাধের ইহপরকালে কোনো মার্জনা নাই— কিন্তু, সত্য কি তাই? বুদ্ধিহীন বোধহীন সমাজ যেমনই বলুক, সংস্কারে অন্ধ বা আবদ্ধ দৃষ্টি তাহাকে যেমনই দেখুক, নাস্তিক জগমোহনের দু চোখে আমরা তাহার একি অম্লান অকলঙ্ক রূপ দেখিলাম—

'নিতান্ত কচিমুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপরে ধুলা লাগিলেও তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না, তেমনি এই শিরীষ ফুলের মতো মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য তো ঘোচে নাই। তার দুই কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর মতো ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ, কিন্তু এই সরল সকরুণতার মধ্যে কালিমা তো কোথাও নাই।'

জগমোহন এই অপমানিতা অবহেলিতা সন্তানসম্ভবা নারীর মধ্যে চিরকালের যে মাতৃরূপিণীকে দেখিয়াছেন তিনি যে চিরবন্দ্যনীয়া। সংসারজ্ঞানহীনা বিমূঢ়া ননীবালা এতই সহজে ভালোবাসিয়াছে, অপাত্রে এতই সহজে আত্মদান করিয়াছে যে, সেই চিরপূজ্যা মাতৃরূপে এতটুকু কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। প্রবঞ্চনার বিনিময়ে সে তো প্রেমই দিয়াছে; এই চরম সর্বনাশ তাহার হয় নাই যে, সেও প্রবঞ্চনা শিখিয়াছে, তাহারও অন্তরাত্মা পাষাণে পরিণত হইয়াছে কিম্বা মারা পড়িয়াছে। প্রতিঘাতময় প্রবল সক্রিয় তার প্রকৃতি নয়, তবু তার প্রেমে আত্মবিলোপকারিণী যে শক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল সেই কি কম আশ্চর্য? ইহার কি কোনো যুক্তি আছে? শাস্ত্র মিলাইয়া, দোষ গুণ খতাইয়া, ইহাকে ভালো অথবা মন্দ বলিবে কে? ইহা পবিত্র, ইহা সুন্দর, এ জীবনে না হইলেও জীবনান্তরে ইহার সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা অবশ্যই আছে।

বালিকা ননীবালার আন্তরিক পবিত্রতা, চারিত্রিক শুচিতা ও সৌন্দর্য, যত অল্পাক্ষরে, যেমন সহজে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন এবং দেখাইতে পারিয়াছেন, আমাদের সাহিত্যে আর কোথাও তার তুলনা দেখি না, আর বিশ্বসাহিত্যেও বোধ করি দুর্লভ হইবে। বঙ্কিম ঋষিদৃষ্টিতে এ রূপ দেখিলেও সমাজ-সংস্থিতির খাতিরে হয়তো ইহার বাঙ্ময়ী প্রতিমা -বিরচনে বিরত থাকিতেন, নয়তো কিছু কৈফিয়ৎ কিছু সতর্কতার বাণী অবশ্যই উচ্চারণ করিতেন— আর, শরৎচন্দ্রের সংস্কারেই বাধিত। শরৎচন্দ্র সমাজ-পতিতার মধ্যেও মহনীয় নারীত্বের রূপ সহজেই ফুটাইয়াছেন, কিন্তু কেন জানি না সাবধানে ইহাদের সমাজের বাহিরেই রাখিয়াছেন। হয়তো সে তাঁহার বাস্তববুদ্ধির বিশেষ পরিচয়, কিন্তু সত্যদর্শন আবিল অবরুদ্ধ থাকিয়াছে। শেষ-প্রশ্নের কমল চরিত্রে সর্ব সংস্কার ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন অশুভক্ষণে, তাহার ফল হইয়াছে সর্বনাশা। চেকভ ডস্টয়্‌ভ্স্কি রলাঁ বা টলস্টয় যাহা অবলীলায় সাধন করিতে পারিতেন আমাদের দেশে আমাদের কালে তাহা তেমন সহজে কখনোই হইতে পারে না। আর, সহজে না হইলে, হয়ও না। রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে, অকৃত্রিমভাবে, কবি বলিয়াই তা পারিয়াছেন; অন্তরে বাহিরে স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনই তাঁর একমাত্র জীবনব্রত। সেখানে তাঁর দৃষ্টি স্বচ্ছ, রূপকৃতি দ্বিধাহীন স্বচ্ছন্দ।

সমাজদৃষ্টিতে ভ্রষ্টা, পতিতা, নিরয়পথবর্তিনী ননীবালা-যে আসলে শুদ্ধ, পবিত্র, সুন্দর, রবীন্দ্রনাথ ইহা বলিয়া দিলেন না, দেখাইয়া দিলেন, আর আমরাও কৃতার্থ হইলাম। কোনো দিকে কোনো

জবাবদিহির কথাই উঠিল না। বালিকা ননীবালার দুর্ভাগ্যের সমব্যথী আমরা হইলাম, তাহার দুষ্কৃতি কোথাও দেখিলাম না।

দামিনীচরিত্রের দীপ্তচ্ছবি ফুটাইয়া তুলিতে দিনের আকাশে শুক্লা চতুর্থীর চাঁদের মতো এই অপূর্ণ নারীজীবনের চরিত্র-চিত্রণ বিশেষ উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। পৃথক্ হইয়াও, অকৃত্রিম নারীস্বভাবের সৌন্দর্যে ও প্রাণে, ভালোবাসিবার সহজ শক্তিতে, উভয়ে এক। অন্তর্নিহিত ঐক্যের বিষয় না ভুলিয়া, পার্থক্যের কথাই এখন বিশেষভাবে অনুধাবন করিতে হইবে—

'দামিনী যেন শ্রাবণের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।'

এ ছিল প্রাণের আগুন। শচীশ বলিতেছে—

'ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি— অপবিত্রের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্য যে নারী জীবন দিয়া ফেলিল, যে নারী মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর করিল। দামিনীর মধ্যে নারীর আর-এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি; সে নারী মৃত্যুর কেহ নয়'— নিরুপায়ে অথবা অভিমানে মৃত্যুর শরণ সে লয় না— 'সে জীবনরসের রসিক।' প্রাণের তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া, আঘাতে প্রতিঘাতে দুরন্ত দ্বন্দ্ব বাধাইয়া জীবনকে সে জিতিয়া লয়। 'সে কিছুই ফেলিতে চায় না; সে সন্ন্যাসীকে ঘরে স্থান দিতে নারাজ; সে উত্তুরে হাওয়াকে সিকি-পয়সা খাজনা দিবে না পণ করিয়া বসিয়া আছে।'

ননীবালা একরূপ অপাত্রে প্রেম দিয়াছিল, হিতাকাঙ্ক্ষী বাপ মায়ের হাতে দামিনী পাত্রস্থা হয় যেখানে তার অযোগ্যতা আর-এক প্রকার— সে তো ক্ষুধাতুর হীনস্বার্থ লম্পট নয়, সে দৃষ্টিহীন প্রেমশূন্য অসাড় 'স্বামীদেবতা'। দামিনীকে সে পায় নাই, যেহেতু চাহিয়া দেখে নাই। সংসারে তার মন ছিল না; গণৎকার বলিয়া দিয়াছিল 'কোন্-এক বিশেষ যোগে বৃহস্পতির কোন্-এক বিশেষ দৃষ্টিতে সে জীবন্মুক্ত হইয়া উঠিবে।' সেদিন হইতে মনে মনে সে না-মন্ত্র জপ করিতেছিল এবং কোন্-এক সুযোগে লীলানন্দস্বামীর শিষ্য হইয়াছিল। জীবন্মুক্তি! জীবনকে ডিঙাইয়া, জীবনের কোনো সর্ত কোথাও পূরণ না করিয়া, সহসা যেন মুক্তিতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়! যখের ধনে ক্রোড়পতি বড়োলোক হওয়ার যে কামনা, এ তারই মতো— মানুষের কল্পিত এই মুক্তির জন্য অন্তরের ত্যাগ লাগে না, বীর্য লাগে না, তপস্যা বলিতেও যে-কোনো ফোঁটা-তিলক-ধারী ভবিষ্যুক্ত শ্রীগুরুর চরণসেবা আর নির্দিষ্ট তিথিতে তিথিতে উপবাস, নিভৃতে বসিয়া মনে-মনে মন্ত্রআবৃত্তি-সহ জপমালিকার গুটি ঘুরানো। এ তপস্যার পনেরো-আনাই শারীরিক ও সোজা বলিয়া, আসলে ব্যর্থ। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন: মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া। মন এ স্থলে স্থানে বা অস্থানে বাঁধা দেওয়া হইয়াছে, তাহা জড়, সক্রিয় নহে।

মন্ত্র-পড়া সাত পাকের স্বামী হইলেও এই ভবতোষ দামিনীর ভরা জীবনের চৌকাঠ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে নাই, দামিনীর জানিবার সুযোগ হয় নাই তার অন্তরে কী ঐশ্বর্য, তার নারী-

জীবনের সার্থকতা কতদূর। প্রধানতঃ শৈশব ও কৈশোরের স্নেহপ্রীতিগুলি নিভৃত নারীহৃদয়ে লালন করিয়া দিন তার কাটিতেছিল ; সেখানেও সে বাধা পাইতে লাগিল পদে পদে, আঘাত পাইল। অল্প কথায় তার এই বিবরণ দিয়াছেন আখ্যানকথক—

'যে সময়ে দামিনীর বাপ এবং তার ছোটো ছোটো ভাইরা উপবাসে মরিতেছে সেই সময়ে বাড়িতে প্রত্যহ ষাট-সত্তর জন ভক্তের সেবার অন্ন তাকে নিজের হাতে প্রস্তুত করিতে হইতেছে। ইচ্ছা করিয়া তরকারিতে সে নুন দেয় নাই, ইচ্ছা করিয়া দুধ ধরাইয়া দিয়াছে, তবু তার 'তপস্যা' এমনি করিয়া চলিতে লাগিল। এমন সময় তার স্বামী মরিবার কালে স্ত্রীর ভক্তিহীনতার শেষ দণ্ড দিয়া গেল, সমস্ত-সম্পত্তি-সমেত স্ত্রীকে বিশেষভাবে গুরুর হাতে সমর্পণ করিল।'

অদ্বৈত অথবা মায়া -বাদী সন্ন্যাসীরা স্ত্রীজাতিকে দূরে রাখিয়া চলেন। কিন্তু লীলানন্দস্বামীর রসের সাধনা আর রসদেরও প্রয়োজন, হয়তো সূক্ষ্মাকার লোভও আছে, ফলে দামিনীকে দলের ভিতর লইয়া বড়ো বিপদেই পড়িলেন। এ আগুন কখন স্মিতপ্রসাদ বিকিরণ করিবে অথবা 'ভোগ' রাঁধিয়া দিবে আর কখন্ অগ্নিকাণ্ড বাধাইবে তার কিছুই ঠিক নাই। ইহাকে ত্যাগ করা যেমন যায় না, আল্‌গোছে গ্রহণ করাও তেমনি অসম্ভব।

কিন্তু, দামিনী যে সহজেই দলে ভিড়িয়া যাইত তাহাও নয়। কেননা, নির্‌গুণ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি অথবা চিন্ময় গোলোকে দিব্যদেহলাভ এরূপ কিছুতেই তাহার লোভ ছিল না। সামাজিক নিয়মে মন্ত্রপড়া স্বামী পাইয়াছে, হারাইয়াছে— তাহাতে অন্তরের অন্তরে তার একান্ত কোনো অভাববোধ হয় নাই। সে কি জানিত, কেই বা জানে, মনের মানুষকে পায় নাই বলিয়াই 'পুঞ্জ পুঞ্জ' যৌবনের আবেশে তার দেহই শুধু ফুলবন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ জীবন অপূর্ণ রহিয়াছে, নিগূঢ় অন্তর জাগিয়া উঠে নাই। এমন সময় সে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখাসম শচীশকে দেখিল এবং স্বভাবতই আকৃষ্ট হইল। হায়, এ আগুন নিজের জ্বালায় নিজে জ্বলিতেছে, কাহাকেও তার প্রয়োজন নাই, কাহাকেও সে আহ্বান করে না, অকৃপণ আলোক এবং উত্তাপ অপক্ষপাতে সর্বত্র বিকীর্ণ করিতেছে— ইহাতে ঝাঁপ দেওয়া মৃত্যুরই নামান্তর পতঙ্গ তাহা বুঝিল না। শচীশও দামিনীকে দেখিল, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কোনো বিশেষের কোনো মোহ নাই তার— তাই বলা চলে, শচীশ শুধু তার 'শোভাই দেখিল, দামিনীকে দেখিল না।' নারীর বিশ্বরূপ বা নারীরূপিণী বিশ্বপ্রকৃতি, এ-সকল তত্ত্বে যেমন দামিনীর বিশেষ রুচি থাকিতে পারে না, বাস্তববাদী শ্রীবিলাসেরও তেমনি বিরূপ প্রতিক্রিয়া। হৃদয় জিতিয়া লইবার খেলায় দামিনী আপনার অজ্ঞাতে তাহাকে দাবাবোড়ের ঘুঁটির মতো ব্যবহার করিলেও, সে জড় বা হৃদয়হীন নয়, সে যে দামিনীকে ভালোবাসিয়াছে। 'চারি দিকের আকাশে একটা চঞ্চলতার হাওয়া উঠিল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ ভিতরে ভিতরে খেলিতে লাগিল।' এই গল্পের কথক শ্রীবিলাস আক্ষেপ-সহকারে বলিতেছেন—

'নারীহৃদয়ের রহস্য জানিবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হইল না।··· যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে, যে

লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে ; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না, যে মানুষ ভাবের সূক্ষ্মতায় এমন মিলাইয়াছে যেন নাই বলিলেই হয়। মেয়েরা স্বয়ম্বরা হইবার বেলায় তাদেরই বর্জন করে যারা ··· মাঝারি মানুষ। নিজের ব্যবহারে আমাদের লাগায়, এবং হয়তো-বা আমাদের শ্রদ্ধাও করে, কিন্তু—'

শ্রীবিলাস কথাটা আর শেষ করেন নাই। শ্রীবিলাসকে দামিনী শুধু যে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিয়াছে এটাই সত্য নয়, বিশ্বস্ত বন্ধু বলিয়াও গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই— কিন্তু হায়, সেই কি যথেষ্ট!

এখানে চতুরঙ্গের আখ্যায়িকাটি সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে এমন সংহত ভাবে সে কাজ সারিয়াছেন যে, যেভাবে 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি' লেখা হইয়াছিল সেই-ভাবেই সব্যাখ্যা সকল বিবরণ দিতে গেলে 'গোরা'র অপেক্ষা বৃহৎ উপন্যাস হইতে পারিত। এ যেন চীনামাটির টবে জাপানী রীতির মহীরুহ, যথাস্থানে ছাড়া পাইলে ইহার শাখা-প্রশাখা-সকল আকাশ স্পর্শ করিত, শিকড় প্রবেশ করিত পাতালে বা নাগলোকে। বিস্তার করেন নাই, সে ভালোই— অন্য একটি উপমা দিয়া বলি, ইহার স্ফাটিক সংহতির সর্ব অঙ্গ হইতে আলো ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। ভাব, ভাষা, উপমা, চিত্র এবং চরিত্রের অঙ্কন, ঘটনার বিবৃতি, তাৎপর্য— সকল বিষয়েই ভিতরের এত প্রাচুর্য আর আকারের এমন পরিমিতি সুবিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যে আর কোথাও আমরা দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। এ সময় পর্যন্ত, তৎকালপ্রচলিত লেখার ভাষা আর কথ্য ভাষা কী যে নিত্য-ব্যবহার্য সে বিষয়ে কবি মনস্থির করিতে পারেন নাই। যুগের হাওয়ায় পরিবর্তন আসিয়াছে সে ভালোই, প্রসঙ্গক্রমে তবু বলিয়া রাখি— যে ভাষায় 'জীবনস্মৃতি' লেখা, যে ভাষায় আবার 'চতুরঙ্গ' লেখা হইল, তাহা এমন সহজ, সাবলীল, হার্দগুণসম্পন্ন যে, তাহাকে কোনোক্রমেই কৃত্রিম বলা যায় না। ন্যায়ের তর্কে বলিতে হইলেও, আন্তরিক প্রতীতিতে অন্যরূপ বলে। ক্রিয়াপদগুলি স্বরবহুল কি সংহত কোনো পাঠকের তাহা মনে থাকে না ; ভাষা যে ভাবের উপযোগী, ভাবেরই অত্যন্ত অনুগত বশীকৃত বাহন —এইটুকু শুধু মনে থাকে। ইহার তুলনায় ক্রিয়াপদ বা সর্বনামের তনুতা-সত্ত্বেও বীরবলী ভাষা কতকটা কৃত্রিম বৈকি, কেননা কথার সঙ্গে সঙ্গে কথনের কৌশলটি ভালোভাবেই জানান দেয়— পরে হয়তো কৌশলটারই প্রশংসা মনে থাকে, কথা ভুলিয়া যাই— ফলতঃ উহা ড্রয়িংরুমের ভাষা (বৈঠকখানা বলিতেও বাধিয়া গেল, সে-যে সেকালের ব্যাপার), শহুরে চাল-চলন জীবনযাত্রার ভাষা— সরলতা বা স্বচ্ছতা উহার বিশেষ লক্ষণ নয়। কেহ ভুল বুঝিবেন না— ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের বিশেষত্বের উপর ভাষার প্রসাদ বা অপ্রসাদ -গুণ নির্ভর করে না এইটুকুই আমাদের বক্তব্য। (ছিন্নপত্র কি অকৃত্রিম নয়? অথবা রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ আরও অজস্র রচনা?) লেখকের মানসিক গঠন ও ভাবই ভাষাকে বিশেষত্ব দিতে পারে, তাহার উল্টাটি কখনো হয় না।

চতুরঙ্গ প্রসঙ্গে আর-একটি কথাও এখানেই সারিয়া লওয়া চলে। ১৩২১ বৈশাখে শ্রীপ্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় সবুজ পত্রের সূচনা হইল 'ওঁ প্রাণায় স্বাহা' এই চমকপ্রদ মন্ত্রে। ঐ সংখ্যার শেষে কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখিলেন—

এই সবুজের ছত্রতলে
যৌবনে দাও রাজটিকা।

চিরনূতনের চিরযুবা প্রতিনিধি -রূপে সে রাজটিকা ললাটে গ্রহণ করিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। সবুজ পত্রের একেবারে প্রথম সংখ্যা হইতেই তাঁহার গল্প কবিতা কখনো বা প্রবন্ধ অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহার ভাব ভাষা বক্তব্য, যেন সকলই নূতন। গল্পের কথাই ধরা যাক—হালদার-গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা, সবুজ পত্রের সাতটি সংখ্যায় এই সাতটি গল্প শেষ করিয়া অষ্টম সংখ্যায় লিখিলেন জ্যাঠামশায়। চতুরঙ্গের সুসম্পূর্ণ কল্পনা তখনো তাঁহার মনে আসিয়াছিল তাহার কোনো প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। ননীবালার করুণ-সুন্দর জীবনের অবসানে দু ফোঁটা অশ্রুর তর্পণে এ প্রসঙ্গ চিরতরে সমাপ্ত হওয়ার বাধা ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কয়টি সংখ্যায় 'শচীশ' 'দামিনী' 'শ্রীবিলাস' শিরোনামে ঐ একই কাহিনীর অনুবৃত্তি চলিল-যে এজন্য কবিকে 'দায়ী' করা চলে না। অর্থাৎ, তিনি সংকল্প-গ্রহণ-পূর্বক এই অবিচ্ছিন্ন ঘটনাধারার অনুসরণ করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন এমন নয়, জ্যাঠামশায় গল্পের সজীব চরিত্রগুলি তাঁহার লেখনীকে কোনোক্রমেই ক্ষান্ত হইতে দেয় নাই, অন্য ঘটনা অন্যান্য চরিত্র আসিয়া জুটিয়াছে। এ তো লেখা নয়, লেখানো। আবার, 'দামিনী' গল্পের শেষে খানিকটা পরিশিষ্ট যোগ করিয়া শ্রীবিলাসের যাহা-কিছু সুখ দুঃখ, যাহা-কিছু বক্তব্য, সেখানেই ভালোভাবে শেষ করা হইয়াছিল, তাহা গ্রন্থ দেখিয়া, বিশেষতঃ সবুজ পত্র দেখিলে, নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। শেষ কথা শ্রীবিলাস এই বলিলেন : অনেক দিন পরে আমাকে এই আবার দামিনীর প্রয়োজন হইল। সেই প্রয়োজন এখনো চলিতেছে। দুইজনে সমস্ত গুছাইয়া লইতেছি॥— পাঠক ১৩২১ মাঘের সবুজ পত্র দেখিবেন (পৃষ্ঠা ৬৯২-৯৩)— যে-কোনো কাহিনী ঠিক এই ভাবেই শেষ হইয়া থাকে। কিন্তু, না, মাঘের পূর্ণিমা আবার ফাল্গুনে পা বাড়াইল, আদিগন্ত সমুদ্রে অশ্রুর জোয়ার জাগিয়া উঠিল, দামিনীর জীবনে নববসন্তের সূচনাই হইল, শেষ কোন্ জীবনান্তরে তাহারই একটু ইঙ্গিতে অথবা ব্যঞ্জনায় কবি এই আখ্যানধারা বিশ্বজীবনের সিন্ধুসংগমে শেষ করিলেন।

দামিনীর গুরু হওয়ার যোগ্যতা লীলানন্দস্বামীর ছিল না, কেননা গুরু হওয়ার লোভ তাঁহার ছিল। দামিনীর স্বাভাবিক আকর্ষণ শচীশের দিকে, যে শচীশ দীপ্ত প্রাণের জ্বালায় অহর্নিশ জ্বলিতেছে— জানে না তার উত্তাপ এবং আলোক কোথায় কতদূর ছড়াইয়া পড়িল। এ আগুন অলৌকিক আর এ আকর্ষণ শুধু নক্ষত্রশিখায় ঝাঁপ দিবার দুরাকাঙ্ক্ষা —এ কথা দামিনীকে বুঝিতে

হইল অনেক দুঃখে। এক দিনে বুঝিতে চায় নাই, সমস্ত প্রাণপ্রকৃতি বিদ্রোহিণী হইয়া উঠিয়াছে, তবু যাহা চিরদূরের তাহার উদ্দেশে প্রণামে নত হওয়া ভিন্ন আর কোনো পথ ছিল না। দামিনীর সাহিত্যচর্চা কিছুটা থাকিলেও, রবিঠাকুরের কাব্যে রুচি কতদূর ছিল জানি না, নহিলে শচীশকে মনে মনে ডাকিয়া বলিত : ওগো মোর না-পাওয়া গো!

দামিনীর তরুণ জীবনে তবু সে-ই সকল পাওয়ার অধিক হইয়াছিল।

'সমুদ্রের মধ্যে একটা অন্তরীপ। একেবারে নির্জন নিস্তব্ধ ; নারিকেলবনের পল্লববীজনের সঙ্গে শান্তপ্রায় সমুদ্রের অলস কল্লোল মিশিতেছিল।'— সেদিনের সেই অপূর্ব দিনান্তটি পাঠকের মনে আছে কি ?—

পথে যেতে তোমার সাথে মিলন হল দিনের শেষে।
দেখতে গিয়ে সাঁজের আলো মিলিয়ে গেল এক নিমেষে।
দেখা তোমায় হোক বা না হোক
তাহার লাগি করব না শোক—
ক্ষণেক তুমি দাঁড়াও, তোমার চরণ ঢাকি এলো কেশে।

গান থামিল। 'আকাশ-ভরা সমুদ্র-ভরা সন্ধ্যার স্তব্ধতা নীরব সুরের রসে একটি সোনালি রঙের পাকা ফলের মতো ভরিয়া উঠিল। দামিনী মাথা নত করিয়া প্রণাম করিল; অনেক ক্ষণ মাথা তুলিল না, তার চুল এলাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।'

কিন্তু, কাহার পায়ে মাথা লুটাইয়া দিল দামিনী, জানে কি? অশান্ত হৃদয় কি শান্ত হইল? মর্তজীবনের চিরতৃষা চিরক্ষুধা কি ঘুমাইয়া পড়িল? কর্মক্লান্ত মানুষ যে রাতে অকাতরে ঘুমায়, গুহার আঁধারে সে তখন আবার জাগিয়া উঠে; হয়তো জানে কী চায়, কাহাকে চায়— তবু জানে না যে কেন চায়। তাহার লোমশ স্পর্শে, তাহার ভিজা-ভিজা নিশ্বাসে, তাহার অক্টোপাশ-তুল্য লালায়িত বিসর্পিত বন্ধনে বাঁধা পড়িতে গিয়া, সহসা যে জাগিয়া ওঠে, মনে করে— এ একটা আদিম যুগের অজানা জন্তু, ইহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, মন নাই, আছে একটা অহেতুক অতৃপ্য ক্ষুধা; ইহার কবলে একবার পড়িলে আর রক্ষা নাই। কথা মিথ্যা নয় এবং পূর্ব দিগন্ত হইতে আলো আসিয়া গুহার আঁধার দূর করিয়া না দিলে, সবটাই দুঃস্বপ্ন মনে করিবারও কোনো উপায় নাই। শচীশের কথা বলিতে পারি না, দামিনীর জীবনে এটি কোনো দুঃস্বপ্ন নয়, এটি এক বিশেষ অভিজ্ঞতা, এটি তার নূতন জীবনের সূচনা। নরদেবতার পদপাতে অহল্যাপাষাণী পুনরায় প্রাণ পাইয়াছিল, তেমনি এক প্রিয়পদাঘাতের দীক্ষায় মায়াবিনী আদিম প্রকৃতির মন্ত্রে আবদ্ধ পশুত্বের পাশমোচন হইল, অচেতনে চেতনার সঞ্চার দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যায়িকাছলে শুধু রেখাচিত্রই আঁকিয়া গিয়াছেন, পুরাপুরি রঙ লাগান নাই, অথবা স্থূল রূপের নতোন্নতভাব ফুটাইয়া তুলেন নাই। অথচ রূপের সেই রেখাগুলি জীবন্ত, প্রাণ-স্পন্দিত; তাহাদের সীমায় সীমায় সুসম্পূর্ণ গঠনের ব্যঞ্জনা, মূর্ততার অভ্রান্ত উদ্দীপন।

আদিপ্রকৃতি অন্তরে হার মানিলেও, সেই পরাভবস্বীকারে তাহার গোপন পরিতৃপ্তি ও কৃতার্থতা থাকিলেও, বাহিরে স্বতই তাহা ফুটিয়া উঠিল কি ? তা নয়। তেমন হইলে এই জীবননাট্যের রস জমিয়া উঠে না, লীলা অস্থানে শেষ হইয়া যায়। কাজেই শচীশ শ্রীবিলাস দামিনীকে লইয়া— গৌণ ভূমিকায় লীলানন্দস্বামীও আছেন—নানা ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া এ আখ্যান বিধিনির্দিষ্ট পরিণামে কবে পৌঁছিত তাহা বলিতে পারি না। এমন সময় এক দুর্ঘটনা ঘটিল— স্বামীজির কীর্তনের দলে নবীন একজন গায়ক, তাহার স্ত্রী একদিন আত্মহত্যা করিয়া বসিল, তৎপূর্বেই যথোচিত আচারে স্বামীর গোপন প্রণয়ের পাত্রীকে, নিজেরই ভগিনীকে, এ গৃহের নবতর বধূরূপে বরণ করিয়া তুলিয়া লইতে ভুলিল না। এ যেন সমস্ত পুরুষজাতিকে আর স্ত্রীজাতিকে ধিক্কার দেওয়া, ঘরে ঘরে প্রেমহীন দাম্পত্যসম্পর্কের ছলনাকেই লজ্জা দেওয়া।

আর, ও দিকে ঐকান্তিক ভাবভক্তির চর্চা, নির্ভাঁজ রসতত্ত্ব এবং রসের ধর্ম— তাহারই বা সার্থকতা কী ? 'দামিনী কহিল, আমাকে বুঝাইয়া দাও, তোমরা দিন রাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন। তোমরা কাকে বাঁচাইতে পারিলে ?··· তোমরা দিন রাত 'রস' 'রস' করিতেছ, ও ছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে ? তার না আছে ধর্ম, না আছে কর্ম, না আছে ভাই, না আছে স্ত্রী, না আছে কুলমান ! তার দয়া নাই, বিশ্বাস নাই, লজ্জা নাই, শরম নাই !'

শচীশ ইহার কী উত্তর দিতে পারে ! বেদনাহত দামিনী হয়তো কিছু অত্যুক্তি করিল। কিন্তু, কর্ম নয়, জ্ঞান নয়, শুধু ভাব এবং ভক্তির চর্চা— দেশে কালে পরিব্যাপ্ত মানুষের সুবিশাল ইহলোকের সঙ্গে যোগ নাই বলিলেই হইল, কেবল চিন্ময় কোনো গোলোক বা বৈকুণ্ঠের ধ্যানে বুঁদ হইয়া থাকা— ইহার যে ব্যর্থতা কতদূর আর সমুদয়-সমাজ-ব্যাপী তামস প্রতিক্রিয়া কী ভীষণ, রবীন্দ্রনাথ তাহা মর্মে মর্মে বুঝিয়াছিলেন, দামিনী যদি বা তাঁর নাম কানে না শুনিয়া থাকে কোনোদিন, তবু বুঝিল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায়। সে যেন বলিয়া উঠিল—

> যে ভক্তি তোমারে লয়ে ধৈর্য নাহি মানে,
> মুহূর্তে বিহ্বল হয় নৃত্যগীতগানে
> ভাবোন্মাদমত্ততায়, সেই জ্ঞানহারা
> উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছলফেন ভক্তিমদধারা
> নাহি চাহি নাথ !···

শঙ্কিত চকিত প্রাণে সে বুঝি বলিতে চায়—

> সকল ক্ষীণতা মম করহ ছেদন
> দৃঢ়বলে, অন্তরের অন্তর হইতে
> প্রভু মোর !···

ভকতিরে বীর্য দেহ
কর্মে যাহে হয় সে সফল, প্রীতি স্নেহ
পুণ্যে ওঠে ফুটি।

শচীশকে আর্তকণ্ঠে মুখ ফুটিয়া বলিল—'তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ওই-যে মেয়েটা মরিল রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাহাকে মারিল।··· প্রভু, জোড়হাত করিয়া বলি, ওই রাক্ষসীর কাছে আমাকে বলি দিয়ো না। আমাকে বাঁচাও।'

ভিতরে-বাহিরে-সমান-ভয়ংকরী যে প্রবৃত্তির মুখোষ আজ একেবারে খুলিয়া গিয়াছে, তারই উদ্যত গ্রাস হইতে বাঁচিবার ব্যাকুলতায় দামিনী শচীশকে বলিল, 'তুমিই আমার গুরু হও, আমি আর কাহাকেও মানিব না।··· দামিনী শচীশের পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া অনেক ক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিল। গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল, তুমি আমার গুরু, তুমি আমার গুরু, আমাকে সকল অপরাধ হইতে বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও।'

ঘটনাক্রমে শ্রীবিলাস এখানে উপস্থিত ছিল, দামিনী তাহাকে দেখে নাই। ঘটনাক্রমেই কাতর প্রাণের অর্ধস্ফুট প্রার্থনা কানে শুনিয়াছে— তার কিম্বা শচীশেরও তা শুনিবার কথা নয়। সে মুহূর্তে দামিনীর প্রাণপ্রিয় ইষ্ট বা গুরুদেব তাহার ভিতরেই ছিল অথবা বাহিরে সে তা বলিতে পারে না। মুখে কিছু উচ্চারণ করিতেছে তাহাও সে জানিত না।

এই ঘটনার পরে এই তিনটি প্রাণী লীলানন্দস্বামীর মণ্ডলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং শচীশের আত্মসন্ধানের বা সত্যদর্শনের সাধনাও অতিশয় তীব্র হইয়া উঠিল— কখন্ স্নান, কখন্ আহার, কখন্ কোথায় স্থিতি, তাহার কোনো ঠিক-ঠিকানা নাই। স্নেহপ্রীতিপ্রবণ রমণীহৃদয়ের ব্যাকুলতা তার সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের চেষ্টায় বারে বারে আহত ও প্রতিহত হয়, কিন্তু কাতরতাপূর্ণ বিরক্তি-উৎপাদন ভিন্ন অন্য কোনো কাজ হয় না। কখনো দ্বিপ্রহরের অসহ্য বিশাল দিগ্‌দাহের মধ্যে অন্নের থালা সাজাইয়া, কখনো তমিস্রস্রোতপ্রবাহিত প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের রাত্রে স্নেহার্ত মাতৃহৃদয় মাত্র সঙ্গে লইয়া, এই পূজারিনি, এই স্নেহপ্রেমময়ী যার অনুসরণ করে কোনো দিকে তার কোনো নাগাল পাইবার উপায় নাই যে। অন্তর্যামী গুরু তাহাকে যে পথে নিশিদিন ছুটাইতেছেন তার মানচিত্র আজ পর্যন্ত কোনো শাস্ত্রকার বা দর্শন-বিজ্ঞানের পণ্ডিত ছকিয়া রাখে নাই। অবসরসময়ে সে হয়তো, নদীর জলটি যেখানে 'নীলে নীল, ধারে ধারে চঞ্চল কাদাখোঁচা লেজ নাচাইয়া সাদা-কালো ডানার ঝলক দিতেছে, কিছু দূরে চখাচখির দল' প্রচুর কোলাহল করিয়াও 'কিছুতেই পিঠের পালখ মনের মতো সাফ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না', সে-সব দেখিয়া শচীশ আপন চিত্তবিনোদন করে। সেখানে দামিনীকে দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত শচীশ বলে, 'এখানে কেন ?···

খাবার আনিয়াছি।···

খাইব না।···

অনেক বেলা হইয়া গেছে।

শচীশ কেবল বলিল, না।···

আমি নাহয় একটু বসি, তুমি আর-একটু পরে—

শচীশ বলিয়া উঠিল, আহা কেন আমাকে তুমি—

হঠাৎ দামিনীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গেল। দামিনী আর-কিছু বলিল না, থালা হাতে করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। চারি দিকে শূন্য বালি রাত্রি বেলাকার বাঘের চোখের মতো ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল।'

স্নেহার্ত হৃদয়ের এ দুঃখ কোনো পুরুষ কোনোদিন বুঝিবে না। 'শচীশের শরীরের জন্য তুমি এত ভাবো কেন' —শ্রীবিলাসের এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে যে স্ত্রীজাতি ; 'ওই শরীরটাকেই তো দেহ দিয়া, প্রাণ দিয়া, গড়িয়া তোলা' মেয়েদের স্বধর্ম। যাকে ভালোবাসে, স্নেহ করে, তার শরীরের কষ্ট দেখিলে কি মন কাঁদিয়া উঠিবে না!

এখানে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, শচীশ দামিনীর কে? আমরা যতদূর বুঝিয়াছি, অন্তরঙ্গ উপলব্ধিতে শচীশ তার স্বামী, পুত্র, পিতা, গুরু এবং ইষ্টদেবতা সবই। হৃদয়ের এ রহস্য বুদ্ধি দিয়া বুঝা কিম্বা বুঝানো যায় না, লোকাচারে দেশাচারে অথবা নীতিধর্মে ইহার কোনো বিধিনিষেধ থাকিতে পারে না— আমরা নম্রহৃদয়ে ইহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

সব সময়েই আপন নির্মম ব্যবহারে শচীশ-যে দামিনীকে আঘাত করে এমনও নয়। কখনো দ্বিপ্রহর রাত্রে দামিনী ও শ্রীবিলাসকে ডাকিয়া তুলিয়া, অন্তরের অন্তরে বিদ্যুৎচ্চকিত অপূর্ব এক উপলব্ধির বিস্ময় ও পুলকের বেগ সাম্‌লাইয়া লইতে চেষ্টা করে। তখন যে ভাষায় যে কথা সে বলে, আনন্দউদ্‌বেলিত কবিবাক্যের সঙ্গেই তার তুলনা, অর্থাৎ উহাকে শ্রুতিগম্য এক প্রকার স্বগতউক্তি বলা চলে। দামিনী কিছু না বুঝিয়াও শিহরিত পুলকিত হয়, মুগ্ধা হরিণী যেমন বাঁশির ভাষা বুঝে না, ভাবেরই আকর্ষণে ঘাড়টি তুলিয়া নিষ্পলক চাহিয়া থাকে।

তবু স্নেহপ্রেমের সদাজাগ্রত এই খবরদারি, ভক্তিশ্রদ্ধার অকথিত আরাধনা, শচীশের বেশিদিন সহ্য হইল না ; বলিতে হইল, 'যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড়ো দরকার— আর-কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া করো, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।'

সে রাত্রে ঠিক কী ঘটিয়াছিল শ্রীবিলাস তাহা জানে না। কিছু দেখিয়া, কিছু অন্ধভাবে অনুমান করিয়া তার 'মনে হইল, আমার দুর্ভাগ্য বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আমার গলা টিপিয়া ধরিতেছে।' কিন্তু, পরদিন প্রভাতে দামিনীকে দেখিয়া, নিজের সত্য বা কল্পিত সকল দুঃখই সে ভুলিয়া গেল। 'সে কী চেহারা! কাল রাত্রে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য কেবল এই মেয়েটির উপরেই আপনার সমস্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গেছে।···দামিনী বলিল, শ্রীবিলাসবাবু, তুমি আমাকে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিবে চলো।' এ যে কী কঠিন ত্যাগ শ্রীবিলাসের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। তবু 'যাওয়াই ভালো। পাহাড়টার উপর ঠেকিতে ঠেকিতে নৌকাটি যে চুর্‌মার হইয়া গেল।' পথে শচীশকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীবিলাস কিছু

'কড়া কথা', সত্য কথা, শুনাইবার উপক্রম করিয়াছিল। 'দামিনী রাগিয়া বলিল, ···তুমি কেবল আমারই দুঃখের দিকে তাকাও, আমাকে বাঁচাইতে গিয়া তিনি যে দুঃখটা পাইয়াছেন সে দিকে বুঝি তোমার দৃষ্টি নাই? সুন্দরকে মারিতে গিয়াছিল, তাই অসুন্দরটা বুকে লাথি খাইয়াছে। বেশ হইয়াছে, বেশ হইয়াছে, খুব ভালো হইয়াছে।'— এই নিষ্ঠুর পদাঘাতেই ক্ষুধা-রাক্ষস মারা পড়িয়াছে, শিবসুন্দরের চিরউপাসিকা নারী জাগিয়া উঠিয়াছে— ভাবনা-কল্পনার-অতীত সত্যে ও সৌন্দর্যে দামিনীর জীবন ধন্য হইয়াছে। অন্যের তাহা জানিবার কথা নয়।

জীবনের আসল ঘটনাগুলি ঘটিয়া যায় অন্তর্লোকে, লোকলোচনের অগোচরে।

যা হোক, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দায় -সমেত বাহিরেও একটা জীবন আছে। দামিনীর আশ্রয় কোথায়, দামিনীর দিন কাটিবে কী লইয়া, কাদের সেবায় স্নেহে ও সাহচর্যে? সামাজিক দৃষ্টিতে সে তো পদে পদে অপরাধী হইয়া আসিয়াছে, তার নিন্দায় তো তার আত্মীয়স্বজনের কান পাতিবার জো নাই— সুতরাং, মাসি-পিসি ভাই-ভাজ সকলের ঘরেই তার জন্য স্থানের বড়ো অকুলান। লীলানন্দ-স্বামীর কাছে, অবশ্য, ফিরিয়া যাওয়া চলে— মঠধারী সাধুসন্ন্যাসীরা অনেকটা সামাজিক স্তুতিনিন্দার ঊর্ধ্বে, যথেষ্ট চতুর হইলে তাঁরা অনেকটা বিষ হজম করিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে দলবৃদ্ধি করিতে পারেন। কিন্তু সেই কি দামিনীর, আজিকার দামিনীর, জীবনের সম্ভবপর সার্থকতা? সে কি কপটাচার হইবে না? নিজেকে হীন করা হইবে না? এই দ্বিধা সংশয় সংকটের মুখে শ্রীবিলাস সাহস করিয়া একটা আর্জি উপস্থিত করিল। দামিনীকে বলিল, 'যদি আমার মতো মানুষকে বিবাহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে—

···ওকি কথা বলিতেছ শ্রীবিলাসবাবু! তুমি কি পাগল হইয়াছ?

···মনে করো-না পাগলই হইয়াছি। পাগল হইলে অনেক কঠিন কথা অতি সহজে মীমাংসা করিবার শক্তি জন্মায়।··· আমি সংসারে অত্যন্ত সাধারণ মানুষদের মধ্যে একজন— এমনকি আমি তার চেয়েও কম, আমি তুচ্ছ। আমাকে বিবাহ করাও যা, না করাও তা, অতএব তোমার ভাবনা কিছুই নাই।

দামিনীর চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। সে বলিল, তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।

আরও কিছু ক্ষণ ভাবিয়া দামিনী বলিল, তুমি তো আমাকে জানো।'

শ্রীবিলাস বলিলেন, 'তুমিও তো আমাকে জানো।

এমনি করিয়াই কথাটা পাড়া হইল। যে-সব কথা মুখে বলা হয় নাই তাহারই পরিমাণ বেশি।'

দেশী বা বিদেশী কোর্ট্‌শিপের কোনো আদর্শে ইহাকে ভালোবাসা-বাসি অথবা মন-জানাজানির সংগত বিবরণ বলা চলে না। অথচ ইহাই সত্য, ইহাই পরস্পর-পরিচয়ের গভীর ফল্গুধারার সহসা আলোকে আত্মপ্রকাশ— ইহাতে মোহময় ও রমণীয় কোনোরূপ ছলা-কলা নাই, তার প্রয়োজনও নাই। আর বিধবাবিবাহ উচিত কি অনুচিত— শচীশকে দামিনী ভালোবাসে, পূজা করে, চিরজীবন

অন্তরের সিংহাসনে রাখিয়া পূজা করিবে সন্দেহ নাই, এ অবস্থায় শ্রীবিলাসের ঘর করিয়া সে দ্বিচারিণী হইবে কি না— এ-সকল প্রশ্নও উঠিল না। চিরন্তন মনুষ্যপ্রকৃতি বিশেষ-দেশ-কাল-গত সামাজিক আচার-বিচারের সহিত সর্বত্র সংগতি রাখিয়া চলে না, কখনো বিচিত্র ছলনার অন্তরালে নিগূঢ় থাকে, কখনো সত্যের সাহসে আত্মপরিচয় দিতেও দ্বিধা করে না— কবি বা ঋষি সর্বদা সেই চির-প্রকৃতিকে বা সত্যকেই বহুমান দিয়া থাকেন, ইহাতে ভালোই বলো আর মন্দই বলো।

অতঃপর এই গল্পের বক্তা শ্রীবিলাস বলিতেছেন, 'অভাবনীয় পরিহাসে মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি। সৃষ্টিকর্তার সেই আনন্দের উচ্চহাস্য এবারকার ফাল্গুনে' কলিকাতার এক 'ভাড়াটে বাড়ির দেয়াল-ক'টার মধ্যে বার বার ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠিল।... এবারে' দামিনীর 'সমস্ত জগৎ সংকীর্ণ হইয়া সেইটুকুতে আসিয়া ঠেকিল যেখানে আমিই কেবল একলা। কাজেই আমাকে সম্পূর্ণ চোখ মেলিয়া দেখা ছাড়া আর উপায় ছিল না। আমার ভাগ্য ভালো, তাই ঠিক এই সময়টাতেই দামিনী আমাকে যেন প্রথম দেখিল। অনেক নদীপর্বতে সমুদ্রতীরে দামিনীর পাশে পাশে ফিরিয়াছি— সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতালের ঝড়ে রসের তানে বাতাসে আগুন লাগিয়াছে, 'তোমার চরণে আমার পরানে লাগিল প্রেমের ফাঁসি' এই পদের শিখা নূতন নূতন আখরে স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে। তবু পর্দা পুড়িয়া যায় নাই।' পরস্পরকে দেখা হয় নাই। 'কিন্তু, কলিকাতার এই গলিতে এ কী হইল! ঘেঁষাঘেঁষি ওই বাড়িগুলো চারি দিকে যেন পারিজাতের ফুলের মতো ফুটিয়া উঠিল।'

যথাকালে বিবাহ হইল। তাহার পূর্বে যথোচিত মন্ত্রণা করিয়া 'দুইজনে দুই হাত ধরিয়া শচীশকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করিয়া' আনিল। 'ছোটো ছেলে খেলার জিনিষ পাইলে যেমন খুশি হয়' শচীশের ভাবটা সেইরূপ। সে কিছুতেই চুপিসাড়ে কাজ সারিতে দিল না। 'বিশেষত, জ্যাঠামশায়ের সেই মুসলমান-পাড়ার দল যখন খবর পাইল তখন তারা এমনি হল্লা করিতে লাগিল যে পাড়ার লোকে ভাবিল, কাবুলের আমির আসিয়াছে, বা অন্তত হাইদ্রাবাদের নিজাম।'

শেষে শ্রীবিলাস আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, 'কলিকাতার এই শহরটাই যে বৃন্দাবন, আর এই প্রাণপণ খাটুনিটাই যে বাঁশির তান, এ কথাটাকে ঠিক সুরে বলিতে পারি এমন কবিত্বশক্তি আমার নাই। কিন্তু দিনগুলি যে গেল সে হাঁটিয়াও নয়, ছুটিয়াও নয়, একেবারে নাচিয়া চলিয়া গেল।

'আরও একটা ফাল্গুন কাটিল। তার পর আর কাটিল না।

'সেবারে গুহা হইতে ফিরিয়া আসার পর দামিনীর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হইয়াছিল... সে কাহাকেও বলে নাই। যখন বাড়াবাড়ি হইয়া উঠিল তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, এই ব্যথা আমার গোপন ঐশ্বর্য, এ আমার পরশমণি— এই যৌতুক লইয়া তবে আমি তোমার কাছে আসিতে পারিয়াছি— নহিলে আমি কি তোমার যোগ্য?'

ডাক্তারে সব-শেষ 'মন্ত্রণা দিল, হাওয়া বদল করিতে হইবে।... দামিনী বলিল, যেখান হইতে ব্যথা বহিয়া আনিয়াছি আমাকে সেই সমুদ্রের ধারে লইয়া যাও— সেখানে হাওয়ার অভাব নাই।

'যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারের ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী' শ্রীবিলাসের 'পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না— জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।'

আপাতত এখানেই এক স্বতন্ত্র সুন্দর নারীজীবনের কয়েকটি গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের দিনগণনা শেষ হইল। প্রথমে পিতৃগৃহে, পরে স্বামীপরিবারে, সাধুর মঠে, তাহার জীবন কাটিয়াছে। সে যে বিশেষ কেহ বা বিশেষ কিছু এ কথা জানিতে তার বহু বিলম্ব হইয়াছে— কেননা, মানুষ প্রথমতঃ গৃহে বা পরিবারে জন্মায়, সংসারের অতিক্ষুদ্র গণ্ডীতে থাকে ; সে যে বিশ্বপ্রকৃতির কোলে জন্মিয়াছে, সে যে মনুষ্যপ্রকৃতির চিরন্তন সত্যকে সকল-বাহ্যিক-সংস্কার-মুক্ত হৃদয়ে ও বুদ্ধিতে জানিয়া বুঝিয়া তবেই সার্থক হইতে পারে, এ কথা কেহ তাহাকে বলে না। আপন জীবনের বেগে দামিনীর আপন স্বরূপ ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে ; তাহাতে সুখ যেমন ছিল, দুঃখেরও সীমা ছিল না —তার রূপ বড়োই অপরূপ, অতুলনীয়। প্রথম পরিচয়ে বড়োই জানা, চেনা, বাস্তব এবং রাগদ্বেষে ও রক্তমাংসে গঠিত নারী বলিয়া তাহাকে জানি ; সেই বাস্তবতা বা প্রত্যক্ষতা তার কোনোদিনই ঘুচে না, অথচ ক্রমে দেখিতে পাই তাহাতে রহস্যের শেষ নাই— তেমনি সৌন্দর্যের, সত্যের। 'শেষের কবিতা'র অমিত ঘড়ায়-তোলা জল আর দিঘির প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, যে জলে রন্ধন-পান চলে আর যে জলে মন সাঁতার কাটিতে পারে— সেটা কতটা ভাবুক মনের কবিত্বকল্পনা আর কতটা সত্য ঠিক বলা যায় না। লাবণ্যের শেষের কবিতায় বরং দৃঢ়তর প্রত্যয় ও গভীরতর উপলব্ধির আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ইহারা সকলেই অনেক-বই-পড়া আর অনেক-স্বপ্ন-কল্পনা-চারী নাগরিক নরনারী— ইঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। দামিনীর পরিমিত জীবনের অনেকটাই যদিবা চাঁপাতলার গলিতে কিম্বা শ্যাম-পুকুর স্ট্রীটে কাটিয়া থাকে, সত্যই তাকে শহুরে মেয়ে বলা চলে না। সে মুখেও কিছু বলে নাই। মুখে বলিবার বিষয়ই নয়। তবু তারই জীবনে ঐ অপরূপ তত্ত্ব নিঃশব্দে অগোচরে সত্য হইয়াছে, সার্থক হইয়াছে। শচীশ ও শ্রীবিলাসকে লইয়া তার ক্ষুদ্র জীবনের পরার্ধ এবং অপরার্ধ— লৌকিক এবং অলৌকিক— একটি প্রায়-সম্পূর্ণ বৃত্ত অঙ্কিত করিয়াছে। বিশাল রবীন্দ্ররচনালোকে এমন নারীচরিত্র আর আমাদের চোখে পড়ে নাই।

'শেষ কথা কে বলবে'। অন্তত শ্রীবিলাসের তরফ হইতে আরও কিছু বলিবার আছে।

দামিনীর মৃত্যুর পরে শ্রীবিলাস যে জরাজীর্ণ পুরাতন নীলকুঠিতে আশ্রয় নিল, যেখানে 'কোন্‌-এক মুসলমান গোমস্তার গোর, তার ফাটলে ফাটলে ঘন ঝোপ করিয়া ভাঁটিফুলের এবং আকন্দের

গাছ উঠিয়াছে, একেবারে ফুলে-ভরা— বাসর-ঘরে শ্যালীর মতো মৃত্যুর কান মলিয়া দিয়া দক্ষিনা বাতাসে তারা হাসিয়া লুটোপুটি করিতেছে'— সেখানে নিভৃতে বসিয়া বসিয়া সে জীবনের প্রত্যক্ষবৎ সদ্যঅতীতের ধ্যানধারণা হইতে বুঝিল নিজে সে গৃহী ছিল না আর সন্ন্যাসও তাহার পক্ষে পরধর্ম। সে যাকে লাভ করিয়াছিল সে গৃহিণী ছিল না, গৃহলোপের সঙ্গে সঙ্গেই মায়া হইয়া গেল না। 'সে শেষ পর্যন্ত দামিনী।' মৃত্যুর পরেও শ্রীবিলাসের জীবনে বর্তমান। 'কার সাধ্য তাকে মায়া বলে?' অন্য লোকের ঘর ভাঙে, ঘরণী বিদায় লয়, বৈরাগ্যের উদয় হয়— কেননা, তাদের 'ওসব যে হাতে-গড়া জিনিষ, ঝাঁট পড়িলেই পরিষ্কার হইয়া যায়।'

শ্রীবিলাসের জীবনে দামিনী, দামিনী মাত্র। চিরপুরাতন, চিরনূতন নারী। কবি হইলে শ্রীবিলাস অবশ্যই বলিতে পারিত— সরল গদ্যে বলিয়াছে বৈকি—

'তুমি-যে তুমিই ওগো,
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।'

রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি

শ্রীবিনয়েন্দ্রমোহন চৌধুরী

এ কথা নূতন করিয়া বলা একেবারেই অনাবশ্যক যে, রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি আকর্ষণকেও কবি শুধু-যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যরূপে পাইয়াছেন তাহা নয়, ভারতীয় সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি হইতেই ইহাকে তিনি লাভ করিয়াছেন। প্রকৃতির প্রতি তিনি যে-নাড়ীর টান অনুভব করিতেন একমাত্র মাতৃস্নেহের সঙ্গেই সেই টানের তুলনা হইতে পারে। প্রকৃতির সঙ্গে নিগূঢ় যোগের পরিচয় প্রাচীনতম সাহিত্য হইতে শুরু করিয়া কালিদাস পর্যন্ত ভারতীয় কবিদের মধ্যে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান। কিন্তু প্রাচীন কবিদের রচনায় প্রকৃতি যে গভীর ভাবুকতা ও অধ্যাত্মস্পর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেই লক্ষণকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও প্রকৃতি এ যুগের বাস্তবধর্মী কল্পনার সহায়ক হইয়াছে। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির মধ্যে গভীরতার সহিত ব্যাপ্তি, মগ্নতার সহিত সূক্ষ্মতা আনিয়া ইহার পরিসর বাড়াইয়া দিয়াছেন। জীবনের প্রারম্ভে 'জল পড়ে পাতা নড়ে'[১] আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের অনুভূতির স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; প্রকৃতি তাঁহার নিঃসঙ্গ জীবনে আমরণ আনন্দলোকের বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছে; পরিণত বয়সে প্রকৃতির কোলে ফিরিবার জন্য বার বার তিনি আকুলতা প্রকাশ করিয়াছেন—

যে জননীর কোলের পরে
জন্মেছিলি মর্ত্য-ঘরে
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।

১ Suddenly I came to a rhymed sentence of combined words, which may be translated thus— 'It rains, the leaves tremble.' At once I came to a world where I recovered my full meaning...The rhythmic picture of the tremulous leaves beaten by the rain opened before my mind the world which does not merely carry information, but a harmony with my being. The unmeaning fragments lost their individual isolation and my mind revelled in the unity of a vision. —Rabindranath, *The Religion of Man*, pp. 95-96

বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি
ফিরে ফিরে চাইবি আপন মাকে।[২]

সমস্ত জীবন রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিজননীকে চাহিয়াছেন, তাহার উৎসবের সঙ্গে তাল রাখিয়া পদক্ষেপ করিয়াছেন—

ছয় ঋতু ধায় আকাশতলায়
তার সাথে আর আমার চলায়
আজ হতে না রইল ব্যবধান।[৩]

এই ব্যবধান রবীন্দ্রনাথের জীবনে কখনো ঘটে নাই। প্রবাসে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস স্টেট হইতে চিঠি (১৩ অক্টোবর ১৯৩০) লিখিয়াছেন—

এই সময়ে আমি আছি বহু দূরে, একটুও ভালো লাগচে না। বর্ষার সমারোহ বনে বনে আকাশে আকাশে জমেছিল, কদম্ববন নতুন করে প্রফুল্ল হোলো। কিন্তু আমি নতুন গানের ডালি নিয়ে দাঁড়ালুম না। শারদোৎসবের সময় হয়েছে— শিউলিতলায় সৌন্দর্যের সদাব্রত, আকাশে শুভ্রমেঘের আলস্যমন্থরতা, বাতাসে হিমের আভাস, তালবনের শিখরে শিখরে আলোকের পরশপাথর ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলেচে। আমি শারদার কাছে সংগীতের বায়না নিয়ে বসে আছি অথচ আসরে পৌঁছতে পারলুম না। আমার এক বছরের পার্বণী সব বাদ পড়ে গেল।

প্রকৃতিপ্রীতি রবীন্দ্রনাথে শুধু কাব্য বা কাব্যের উৎস বলিলে স্বল্পভাষণ হইবে। তাঁহার জীবনের মূল, প্রাণের শিকড় প্রকৃতির গভীরে বিস্তৃত।[৪]

এই একান্ত প্রকৃতিপরায়ণতার জন্যই রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্য, বিশেষ করিয়া গল্পসাহিত্য— যেখানে সামাজিক মানুষ লইয়া কবির কারবার— একটা সমগ্রতা এবং পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

২ পূরবী, 'মাটির ডাক'

৩ পূরবী, 'মাটির ডাক'

৪ প্রকৃতির প্রতি যে নাড়ীর টান যে মাতৃস্নেহের কথা উল্লেখ করিয়াছি রবীন্দ্র-রচনা হইতে তাহার নিদর্শন আহরণ করা বাহুল্য তবু, প্রকাশের উদ্দেশ্য লইয়াই যে-চিঠি লিখিত হয় নাই এই রকম দুটি চিঠি উদ্ধৃত করি—

'শিলাইদহ, ২০ অগস্ট ১৮৯২।…এখানকার রৌদ্রে আমার সেই ছবি দেখার বাল্যস্মৃতি ভারি জেগে ওঠে। এর যে কী মানে ঠিক ধরতে পারি নে, এর সঙ্গে যে কী একটা আকাঙ্ক্ষা জড়িত আছে ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন এই বৃহৎ ধরণীর প্রতি একটা নাড়ীর টান। এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর কত দেশ-দেশান্তরের জল-স্থল-পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম— তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ডভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে।…'— ছিন্নপত্র

সার্থক গল্প নিছক গল্প হিসাবে যে-সাহিত্যিক মূল্য দাবি করিতে পারে, রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষের জগৎ প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া যে ব্যাপ্তিলাভ করিয়াছে তাহাতে সেই মূল্যের ব্যাপকতা এবং গভীরতা অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।[৫]

পুনরায়—

'শিলাইদহ, ৯ ডিসেম্বর ১৮৯২।...আমি বেশ মনে করতে পারি, বহু যুগ পূর্বে যখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না। বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত ক'রে ফেলছে— তখন আমি এই পৃথিবীকে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘনশ্যাম ছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নবযুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্প অল্প মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন "একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য-অঞ্চল" প'রে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন। আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি— বহুসন্তানবতী মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাবছেন, আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না; আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকে যাচ্ছি...'— ছিন্নপত্র

৫ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *Creative Unity* গ্রন্থে সেক্সপীয়ারের নাটকে প্রকৃতির স্থান সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

It cannot be said that beauty of nature is ignored in his writings, only he fails to recognize in them the truth of the interpenetration of human life with the cosmic life of the world.

সেক্সপীয়ারে এই সত্যের স্বীকৃতি সম্ভব হয় নাই "owing to the tradition of his race and time" (পৃ ৬০)। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যোগ বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান। এই ঐতিহ্য ইউরোপীয় সাহিত্যে আসিয়াছে বিলম্বে। "Evolution of the use of landscape in fiction" রুশোর সময় হইতে—

In Rousseau's "New Heloise" there was a new force at work which the readers of that singular romance were not slow to recognize. It was the part which nature herself played in the story. The mountain, the lake, the stream, were there not merely for adornment, but as an integral part of the story itself...In the fiction of Chateaubriand and of Victor Hugo, of George Sand, of Balzac, of Maupassant, of Pierre Loti, there is everywhere to be traced that influence which was so apparent in the 'New Heloise.'— Bliss Perry, *A Study of Prose Fiction*, p 160.

ভিন্ন ভাষার কথাসাহিত্যের সঙ্গে তুলনা না করিয়া রবীন্দ্রনাথেরই স্বল্পসংখ্যক প্রকৃতিস্পর্শহীন গল্পের সঙ্গে প্রকৃতিযুক্ত গল্পের তুলনা করিলে এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে রসসৃষ্টিতে প্রকৃতির স্থান এবং ব্যবহার কি সেই আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। জীবনে বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রচুর গল্প লিখিয়াছেন; স্থান, কাল এবং মেজাজের পার্থক্যের তাহাদের সুর এবং রস বিভিন্ন এবং বিচিত্র। এই প্রবন্ধে সীমাবদ্ধ পরিসরে আলোচনায় প্রকৃতির দিক দিয়া সমৃদ্ধ 'সাধনা'-যুগের (১৮৯১-১৮৯৫) গল্পগুলি অবলম্বন করা হইল।[৬] এই যুগের সাহিত্যরচনার প্রতি রবীন্দ্রনাথেরও পক্ষপাত ছিল[৭]; আর এই যুগে গল্পই তাঁহার অন্যতম প্রধান রচনা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে না।

২

কথাসাহিত্যের উপাদান মোটামুটি তিনটি— চরিত্র, ঘটনা এবং পারিপার্শ্বিক। গল্পের স্থান কাল সমাজ ইত্যাদি পারিপার্শ্বিকের অন্তর্ভুক্ত। পারিপার্শ্বিক শুধু পারিপার্শ্বিক হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে এমন কোনো কথা নাই, শিল্পীর প্রতিভার উপর প্রয়োগের বৈচিত্র্য এবং সার্থকতা নির্ভর করে। রবীন্দ্রনাথের গল্পসাহিত্যে পারিপার্শ্বিক হিসাবে প্রকৃতি— 'সাধনা'-যুগে নদীমাতৃক উত্তর ও পূর্ব বঙ্গের প্রকৃতি— একটা মস্ত জায়গা জুড়িয়া আছে। গল্পগুচ্ছের প্রধান ঋতু বর্ষা। রবীন্দ্রসাহিত্যে, তাঁহার গানে বর্ষার স্থান সর্বোচ্চে; এই বর্ষার রাজসমারোহ উত্তর এবং পূর্ব বঙ্গের বৈশিষ্ট্য। 'সাধনা'-যুগের গল্পেও বর্ষা যতখানি স্থান জুড়িয়া আছে, অন্য কোনো ঋতুর পক্ষে তাহা সম্ভব হয়

৬ যদিও 'সাধনা' বাহির হইবার পূর্বেই কয়েকটা গল্প 'হিতবাদী' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল, তথাপি এ প্রবন্ধে সেই গল্পগুলিকেও সাধনা-যুগের অন্তর্গত বলিয়াই ধরা হইয়াছে।

৭ 'The letters translated in this book span the most productive period of my literary life...' Rabindranath Tagore, *Glimpses of Bengal*, selected from the letters of Sir Rabindranath Tagore 1885-1895, Introducation.

এই যুগের গল্পগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি—

"My later stories have not got that freshness, that tenderness of earlier stories"

"I am very suceptible to environment and until and unless I am in the midst of a certain type of atmosphere I cannot produce any artistic work. During my youth whatever I saw appealed to me with pathos quite strong and therefore, my earlier stories have a greater literary value because of their spontaneity."

"I enjoyed the surrounding scenery and the beauty or rural Bengal. The river system of Bengal, the best part of this province, fascinated me. . So when I re-read these short stories of mine they bring back to me vividly the beautiful atmosphere of those earlier short stories." দ্র. শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' পুস্তকে শ্রীপুলিনবিহারী সেনের তথ্যপঞ্জী

নাই।— পারিপার্শ্বিক এই প্রকৃতিকে বহুবিচিত্রভাবে ব্যবহার করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পের রস ঘনীভূত করিয়াছেন। প্রকৃতির পটভূমিকায় গল্পের অবতারণা করিয়া চিত্ররূপে অলংকাররূপে প্রকৃতিবর্ণনা করিয়াছেন। আবার প্লটের প্রয়োজনেও প্রকৃতির ব্যবহার হইয়াছে। মানবহৃদয়ের ভাবাবেগের সঙ্গেও প্রকৃতিকে নানাভাবে যুক্ত করিয়াছেন— কোথাও প্রকৃতির দর্পণে মানবচিত্ত প্রতিফলিত করিয়াছেন, কোথাও বা প্রকৃতির সাহায্যে চিত্তবেগ সঞ্চার করিয়া চরিত্রের উপর আলোকপাত করিয়াছেন। মানুষের সুখদুঃখের প্রতি প্রকৃতির সহানুভূতি এবং ঔদাসীন্য, এমন কি অবহেলার ইঙ্গিতও অনেক গল্পে পাওয়া যাইবে। এক কথায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'the truth of the interpenetration of human life with the cosmic life of the world' রবীন্দ্রনাথের গল্পে অপর্যাপ্তভাবে বর্তমান; গল্পের প্লট, ঘটনা এবং চরিত্রের সঙ্গে কত বিচিত্রভাবে তিনি প্রকৃতিকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করিয়া রসসমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

পটভূমিকায় প্রকৃতিবর্ণনা এবং চিত্রালংকারের দৃষ্টান্ত প্রায় সমস্ত গল্পেই ছড়াইয়া আছে। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে আজন্ম কলিকাতাবাসী পোস্টমাস্টার পানাপুকুর এবং জঙ্গলে পূর্ণ উলাপুর গ্রামে নবনিযুক্ত হইয়া আসিলেন। সেখানে

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোলকরতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত— যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবিহৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোস্টমাস্টার ডাকিতেন—'রতন!'

'মুকুট' গল্পে যুদ্ধাবসানে যুদ্ধক্ষেত্রে

রাত্রে চাঁদ উঠিয়াছে। অন্যদিন রাত্রে সবুজ মাঠের উপরে চাঁদের আলো বিচিত্রবর্ণ ছোটো ছোটো বনফুলের উপরে আসিয়া পড়িত, আজ সেখানে সহস্র সহস্র মানুষের হাত পা কাটামুণ্ড ও মৃতদেহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—যে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ উৎসের জলে সমস্ত রাত ধরিয়া চন্দ্রের প্রতিবিম্ব নৃত্য করিত, সে উৎস মৃত অশ্বের দেহে প্রায় রুদ্ধ— তাহার জল রক্তে লাল হইয়া গেছে। কিন্তু দিনের বেলা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যেখানে মৃত্যুর ভীষণ উৎসব হইতেছিল, আহতের আর্তনাদ অশ্বের হ্রেষা রণশঙ্খের ধ্বনিতে নীল আকাশ যেন মথিত হইতেছিল— রাত্রে চাঁদের আলোতে সেখানে কী অগাধ শান্তি কী সুগভীর বিষাদ।·· সাড়াশব্দ নাই, প্রাণ নাই, চেতনা নাই, হৃদয়ের তরঙ্গ স্তব্ধ। এক দিকে পর্বতের সুদীর্ঘ ছায়া পড়িয়াছে— এক দিকে চাঁদের আলো। মাঝে মাঝে পাঁচ-ছয়টা করিয়া বড়ো বড়ো গাছ ঝাঁকড়া মাথা লইয়া শাখাপ্রশাখা জটাজূট আঁধার করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

'মধ্যবর্তিনী' গল্পে

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল জলে প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে

এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্‌ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়নগৃহের নির্জন অন্ধকারে জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মতো ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল।

'সমস্যাপূরণ' গল্পে তুলির দুএক টানে প্রকৃতির পটভূমিকায় কর্মব্যস্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত—

ছোটো একটা নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় কতক ডাঙায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানিই সবচেয়ে বেশি, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুঁতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অনতিবিলম্বে এই হাটেই অছিমদ্দি ব্যাঘ্রগর্জনে বিপিনবাবুকে আক্রমণ করিয়াছিল।—এই বর্ণনার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে যে সূক্ষ্মতার সহিত বাস্তব জীবন ও প্রকৃতিকে আঁকা হইয়াছে, তাহার সহিত মূল ঘটনার কোনো যোগ আছে বলিয়া মনে হয় না। ইহাদের সার্থকতা একান্তই পরিবেশসৃষ্টিতে। সেই পরিবেশ কখনও মূল ঘটনা ধারার অনুকূল কখনও প্রতিকূল—উভয় ক্ষেত্রেই পাঠকমনে বৈপরীত্য অথবা আনুকূল্যের দ্বারা রসসঞ্চার হইয়া থাকে।

প্রধানতঃ গল্প এবং ঘটনার পটভূমিকা হিসাবে প্রকৃতির সহায়তা গ্রহণে, চিত্রসৌন্দর্যে এবং পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের বর্ণনার সূক্ষ্মতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ছোট গল্পে বাংলা সাহিত্যে এক নূতন ধরণের কথাশিল্প সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সূক্ষ্ম বাস্তব বর্ণনা যেমন নূতন, তেমনই এই বাস্তবই চিরন্তনী প্রকৃতির সনাতন লীলায় স্থাপিত হইয়া নির্বিশেষের ব্যঞ্জনা আনিয়াছে। পাঠকেরা লৌকিক দৃশ্যচেতনালোক হইতে অবিলম্বে রসলোকে স্থানান্তরিত হন। ইহাই মহৎ সাহিত্যের সার্থকতা। গল্পের সংহতি ব্যাহত না করিয়া পারিপার্শ্বিকের এই বিস্তার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলিকে এমন একটি সমগ্রতা এবং পরিপূর্ণতার রূপ দিয়াছেন যাহার দৃষ্টান্ত গল্পসাহিত্যে বিরল। এই প্রকৃতিই ব্যক্তিরূপ ধরিয়াছে 'অতিথি' গল্পে। তারাপদ প্রকৃতিরই সন্তান, সেখানেই তাহার যথার্থ স্থান। চিত্রগৌরবে এবং শিল্পকুশলতায় অপূর্ব একটি দৃষ্টান্ত 'অতিথি' গল্প হইতে উদ্ধৃত হইল—

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল।…বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতিমাতাকে যেন উদ্‌বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্ধ্বে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূরদিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোনো-এক রূপকথার সোনার কাঠির স্পর্শে সদ্যোজাগ্রত নবীন সৌন্দর্যের মতো নির্বাক নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্‌ভ, আলোকে উদ্‌ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ।

এই বর্ণনার সার্থকতা শুধু বর্ণনাতেই নিঃশেষ হয় নাই, তারাপদ-চরিত্রের রহস্য বুঝাইতে, পাঠকের চিত্তে তাহা বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য করিয়া তাহাকে বাস্তবতা দান করিতে এই বর্ণনার প্রয়োজন ছিল— তারাপদর প্রসন্ন উদার স্বভাব এই প্রকৃতিরই প্রগল্‌ভ বিস্তারে প্রতিফলিত হইয়াছে।

'অতিথি' গল্পে প্রকৃতি-বর্ণনা যেমন মূল গল্পের ভাববস্তুগ্রহণে সহায়ক হইয়াছে, 'পোস্টমাস্টার' গল্পে আবার তেমনি প্রকৃতি-বর্ণনা বৈপরীত্যের দ্বারাই কাহিনীর রসটিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পোস্টমাস্টারের বদলির দরখাস্ত না-মঞ্জুর হওয়ায় তিনি যখন কাজে জবাব দিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন তখন রতনের ডাক পড়িল—

উদ্‌বেলিতহৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, 'দাদাবাবু, আমাকে ডাকছিলে?'
পোস্টমাস্টার বলিলেন, 'রতন, কালই আমি যাচ্ছি।'
রতন। কোথায় যাচ্ছ দাদাবাবু?
পোস্টমাস্টার। বাড়ি যাচ্ছি।
রতন। আবার কবে আসবে?
পোস্টমাস্টার। আর আসব না।
রতন আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না।··· অনেকক্ষণ আর কেহ কোনো কথা কহিল না।

ইহার পর মাত্র দুইটি বাক্যদ্বারা এই পরিস্থিতির করুণ নীরবতাকে যে ব্যাপক এবং গভীর রূপ দিলেন তাহা অনতিরিক্ত অথচ আশ্চর্য—

মিটমিট করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং এক স্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

প্রকৃতি এখানে আশ্চর্য সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় প্রায় সাংকেতিকতার পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনা এবং মানুষ তাহার চতুর্দিক, এমন কি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন নয়, তাহাদের যোগেই তাহার জীবন সম্পূর্ণ এবং গল্পও সার্থক শিল্পমণ্ডিত।

৩

মানব-জীবন এবং চরিত্রের সঙ্গে যোগস্থাপনের একটি উপায়রূপে অনেক গল্পে প্রকৃতি হইতে উপমা সংগ্রহ করিয়া রবীন্দ্রনাথ মানবহৃদয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। বোবা মেয়ে সুভার সঙ্গে প্রকৃতির অশেষ মিল—

তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর— অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মতো···এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মতো একটা বিজন মহত্ত্ব আছে।···প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়।···নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর— সমস্ত মিলিয়া চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি, ইহাও বোবার ভাষা— বড়ো বড়ো চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে-ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস। এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখিরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ

সমস্ত কাজকর্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজনমূর্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত…।

মহামায়ার

যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মতো কাঁচা সোনার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নীরব, এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

বোবা সুভা যেমন বোবা প্রকৃতির মতো, তেমনি অতিথি গল্পের তারাপদ প্রকৃতির বরপুত্র। সে

হরিণশিশুর মতো বন্ধনভীরু, আবার হরিণেরই মতো সংগীতমুগ্ধ।… কেবল সংগীত কেন, গাছের ঘন পল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলই তাহাকে উতলা করিত।

সংগীতের মোহে তারাপদ পাঁচালির দলে প্রবেশ করিল এবং দলাধ্যক্ষ

তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখির মতো প্রিয়জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখি কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যূষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

নূতন আশ্রয় লাভ করিয়া তারাপদ নৌকার ছাদের উপর বসিয়া নদীর দুই তীরের দৃশ্য দেখিতে লাগিল—

পর্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের খেত, গাঢ় শ্যামল আমনধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সংকীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জল স্থল আকাশ, এই চারিদিকে সচলতা সজীবতা মুখরতা, এই ঊর্ধ্ব-অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ চিরস্থায়ী নির্নিমেষ বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল; অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না।… তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্বদাই সচল হইয়া আছে; এইজন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মতো সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন…। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে, কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ… সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য।

শুধু প্রকৃতির সঙ্গে গল্পে বর্ণিত চরিত্রের সাদৃশ্য দেখানো এবং প্রকৃতির সাহায্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ দ্বারাই যে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যোগ দেখাইয়াছেন এমন নয়, গল্পে বর্ণিত বিশেষ অবস্থায় চরিত্রের উপর প্রকৃতির প্রভাব, আর তাহার ফলে ঘটনাপ্রবাহের গতিপরিবর্তনের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। তারাপদকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার সমস্ত আয়োজন যখন সম্পূর্ণপ্রায় তখন দেখিতে দেখিতে পূর্বদিগন্ত হইতে ঘনমেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল, চাঁদ আচ্ছন্ন হইল— পুবে-বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর

জল খলখল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল— নদীতীরবর্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে চিরিতে লাগিল। সম্মুখে যেন আজ সমস্ত জগতের রথযাত্রা—চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে; মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে; দেখিতে দেখিতে গুরু-গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল।

বিবাহদ্রব্যসহ তিনখানা নৌকা আসিল, তারাপদর মাতা ও ভ্রাতাগণও আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু তারাপদকে দেখা গেল না।···বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্বপৃথিবীর কাছে চলিয়া গিয়াছে।

বিবাহবন্ধনরূপ স্বধর্মচ্যুতি হইতে প্রকৃতির রাজবেশে আবির্ভাব শেষ পর্যন্ত তাহাকে বাঁচাইল।

প্রকৃতির সংস্পর্শে যে মানবহৃদয়ে আবেগ জাগিয়া উঠে পোস্টমাস্টার গল্পে তাহার দৃষ্টান্ত—

একদিন বর্ষাকালে মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ-তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল; রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছপালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল; মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখি তাহার একটা একটানা সুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোস্টমাস্টারের হাতে কাজ ছিল না— সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল; পোস্টমাস্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি-কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত— হৃদয়ের সহিত একান্তসংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্তি।

আবার গ্রাম ছাড়িয়া রতনকে ছাড়িয়া কলিকাতা যাইবার জন্য

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল, বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন— একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয়ের ভাবাবেগের এবং ঘটনাপ্রবাহের সুগভীর ঐক্যের কাহিনী অনেক গল্পেই ছড়াইয়া আছে। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে উপরে আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা, নিম্নে শশিভূষণ এবং গিরিবালার জীবনে সুখদুঃখ-হাসিকান্নার কাহিনী, এই দুইয়ের মধ্যে যে ঐক্য তাহা স্পষ্টভাষায় কথিত—

আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেমনি সামান্য, তেমনি ক্ষণস্থায়ী। আবার আকাশে মেঘরৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে, কিন্তু খেলার মতো দেখিতে মাত্র, তেমনি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে।···

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র-খেলার [অর্থাৎ গিরিবালা-শশিভূষণের কাহিনীর] প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

সমাপ্তি গল্পে অপূর্বকৃষ্ণ বি. এ. পাশ করিয়া কলিকাতা হইতে নদীপথে নৌকায় দেশে ফিরিতেছেন। নদীটি

এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার একখানি ছবি যদি দেখিতে পাইতাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানসনদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জল্‌জল্‌ এবং বাতাসে ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিতেছে।

'শাস্তি' গল্পে কুরিদের ঘরে দুই জা সমস্তদিন রাগারাগি চেঁচামেচি কোন্দল করিয়াছে,

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল, তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্‌ করিতেছে।

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই-প্রহরের সময় খুব এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যে ভয়ংকর ঘটনা ঘটিবে এ শুধু তাহার পটভূমিকা নয়; প্রকৃতির যে-চিত্র এখানে আঁকা হইয়াছে তাহার সঙ্গে কুরি-পরিবারে যে নিদারুণ ঘটনা শীঘ্রই ঘটিবে, এই উভয়ের মধ্যে একটা মিল একটা ঐক্যের ইঙ্গিতও রহিয়াছে। প্রকৃতিই এখানে সংকেতস্বরূপ হইয়া ভাষায় পরিণত হইয়াছে, প্রকৃতির এই বর্ণনাই গল্পের কাহিনীকে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে। 'অদূরে বর্ষার পদ্মা নব মেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে'—কুরিদের ঘরও থমথম করিতেছে এবং তাহার আবহাওয়া স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়াছে, ঝড় আসিল বলিয়া—

ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে।

মানুষের ক্ষুদ্র সংসারের সঙ্গে বিশাল প্রকৃতির এই ঐক্যের দৃষ্টান্ত গল্পগুচ্ছে প্রচুর। রাজীবের প্রণয়িনী বিধবা মহামায়াকে জোর করিয়া সহমৃতা করিতে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। এই সংবাদে

রাজীব যখন পাগলের মতো ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা নয় একটা-কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এমনি ঝড় যে রাজীবের মনে হইল, বাড়ি মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িবে। যখন দেখিল বাহ্য প্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল।

প্রকৃতি-বর্ণনাকেই ভাষা করিয়া তোলার আর একটি দৃষ্টান্ত 'ত্যাগ' গল্পটিতে। বধূগতপ্রাণ হেমন্তের সর্বনাশ হইয়াছে— গোঁড়া হিন্দুসমাজে বাস করিয়া না-জানিয়া বালবিধবাকে বিবাহ করিয়া জাতিচ্যুত হইয়াছে, তাহার কাব্যময় সৌন্দর্যময় দাম্পত্যজীবন প্যারিশংকরের একটি আঘাতে টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সেই সর্বনাশের প্রতিচ্ছবি বুকে ধারণ করিয়া দেখা দিয়াছে—

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচুগাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশিতে পাইয়াছে।

মানুষের জগতের সঙ্গে প্রকৃতির এইরূপ নিগূঢ় যোগের নিবিড় সহানুভূতির অসংখ্য উদাহরণ রবীন্দ্রনাথের গল্পে কবিতায় ছড়াইয়া আছে। মানবচরিত্র এবং ভাবাবেগের সঙ্গে, এককথায় মানুষের জগৎসংসারের সঙ্গে প্রকৃতির জগৎকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রীভূত প্রাণের স্পন্দনকে এমন সূক্ষ্ম কলা-কৌশলের সঙ্গে গ্রথিত করিয়া যে অপূর্ব রসসৃষ্টি করিয়াছেন তাহার একটি অপূর্ব আশ্চর্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে মেঘ ও রৌদ্র গল্পের উপসংহারে।

একদিকে প্রকৃতি এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাণের সঙ্গে মানবসংসারের ঐক্যের ছবি যেমন প্রচুর তেমনি অন্যদিকে মানবসমাজের প্রতি তাহার সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি প্রকৃতির ঔদাসীন্য এমন কি অবহেলা প্রদর্শনের দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। প্রায়শ্চিত্ত গল্পে একান্ত পতিগতপ্রাণা, প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বিন্ধ্যবাসিনীর অপদার্থ স্বামী রাত্রিতে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দার কাঠের সিঁড়ি দিয়া বাগানে নামিয়া প্রাচীর ডিঙাইয়া পলায়ন করিয়াছে ; প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গে চিঠিতে সেই সংবাদ জানিতে পারিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর চোখে সমস্ত জগৎ যখন অন্ধকার হইয়া দেখা দিয়াছে তখন 'শরতের উৎসবহাস্যরঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল।'

শাস্তি গল্পে নিরপরাধ চন্দরাকে হত্যার অভিযোগে

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের মতো নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

হত্যাপরাধে অভিযুক্ত চন্দরার স্বামী ছিদাম

বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মতো বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে— তাহাদের কোনোরূপ আইন-আদালত নাই।

প্রভুপুত্র শিশু খোকাবাবু ভৃত্য রাইচরণের সাময়িক অনুপস্থিতিতে বর্ষার দুরন্ত পদ্মার তীর হইতে ঝপ্ করিয়া নদীতে পড়িল। অল্পকাল পর ফিরিয়া তীরে শিশুকে না দেখিয়া রাইচরণের

শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল।...প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল 'বাবু— খোকাবাবু— লক্ষ্মী দাদাবাবু আমার।'

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোনো শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছল্‌ছল্ খল্‌খল্ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।

৪

গল্পের প্লট রচনায় এবং ঘটনার গতিনিয়ন্ত্রণেও রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সাহায্য লইয়াছেন। প্রকৃতির এই ভূমিকার কল্পনায় রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতা অসাধারণ। মানুষের জীবনে প্রকৃতির উপস্থিতি কেবল কবিত্বের প্রয়োজনে নয়। কবির লেখনীতেও প্রকৃতির প্রয়োগ কেবল কাব্যরস সৃষ্টির জন্য নয়, মানুষের মনের জগতেও প্রকৃতির প্রভাব বিস্তৃত হইয়া কাহিনীর জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃতিও মানবচরিত্রের মতই যেন ব্যক্তিধর্মপূর্ণ এবং সংসারক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ অভিনেতা। মানুষের জীবনে প্রকৃতির প্রভাবকে দৈবঘটনা হিসাবে ব্যবহার সাহিত্যে বিরল নহে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় প্রকৃতির জগৎ মানবের জগৎ হইতে এমন স্বতন্ত্র নহে যে তাহার প্রভাবকে দৈব মাত্র বলা চলে। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানুষের জীবন ও প্রকৃতির জীবন মিশিয়া আছে বলিয়াই এই প্রভাব স্বাভাবিক। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মিলিবে আপদ গল্পে। এই গল্পের আরম্ভ—

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ এবং বিদ্যুতের ঝিকিমিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মতো দিগ্‌বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কলশব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড়ো বড়ো গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্ করিয়া হাহুতাশসহকারে দক্ষিণেবামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

মনে হইতে পারে শুধু গল্পের পটভূমিকা হিসাবে ঝড়ের এই অবতারণা। কিন্তু শুধু পটভূমিকা নয়, প্লটের প্রয়োজনেও এই ঝড়— এই ঝড়ের ফলে নৌকাডুবি হইয়াই গল্পের নায়ক নীলকান্ত শরৎবাবুর চন্দননগরের বাগানবাড়িতে আসিয়া উঠিল এবং আশ্রয় পাইল, গল্পও শুরু হইল।

'নিশীথে' গল্পের নায়ক জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর জীবনের ট্রাজেডির সঙ্গে অগভীর প্রেমের, মিথ্যাচরণের শাস্তি দক্ষিণাবাবুকে সমস্ত জীবন ভরিয়া বহন করিতে হইয়াছে। গল্পে অপরাধ এবং শাস্তি শুরু হইয়াছে গঙ্গাতীরের ঐ বাগানে, জ্যোৎস্নালোকিত নিশীথে।

মধ্যবর্তিনী গল্পে সদ্য ব্যাধিমুক্তা হরসুন্দরী গদ্যময় কাব্যরসহীন জীবনের মধ্যে হঠাৎ একদিন উন্মুক্ত শয়নকক্ষের দরজা দিয়া বসন্তকালের হাওয়ার সঙ্গে চাঁদ প্রবেশ করিয়া তাঁহার এতদিনকার শান্তিপূর্ণ সুখের জীবন বিপর্যস্ত করিয়া দিল—

গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপর শীর্ণ হইয়া আসে তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে, তখন যেমন প্রভাতের সূর্যালোক তাহার তলদেশ পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকে, বায়ু-

স্পর্শ তাহার সর্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিকদর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলি যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সংগীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এই আনন্দময় অনুভূতির ঔদার্যে হরসুন্দরীর মনে স্বামীর প্রতি নূতন করিয়া প্রেমের সঞ্চার হইল এবং যখন

একদিন রাত্রে ভাঙা প্রাচীরের উপরিবর্তী খর্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যাবেলার গুমট ভাঙিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, 'আমাদের তো ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর-একটি বিবাহ করো।'

প্রথমটা ঘোর আপত্তি করিয়া অবশেষে নিবারণ বিবাহ করিল। অতএব মধ্যবর্তিনী গল্পের নাট্যদ্বন্দ্বের সম্ভাবনা দেখা দিল প্রকৃতির প্রভাবে শীর্ণ, সদ্য ব্যাধিমুক্ত হরসুন্দরীর উদ্বেল হৃদয়ের আত্মবিসর্জনে। এইরূপে পারিপার্শ্বিকের অস্তিত্ব এবং প্রভাবে মধ্যবর্তিনী গল্প গতিলাভ করিয়াছে।

'মহামায়া' গল্পেও প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি অবতারণা প্লটের প্রয়োজনে। ঝড়বৃষ্টির জন্যই চিতানল নিবিয়া গেল, মহামায়ার হাত-পা'র বাঁধন খসিয়া গেল, অর্ধদগ্ধ অবস্থায় প্রাণ লইয়া চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়া রাজীবের সহিত মিলিত হইতে পারিল। আবার যখন 'একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষে দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল' তখন সেই জ্যোৎস্নারাত্রির মোহের প্রভাবে রাজীব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল এবং মহামায়ার মুখদর্শন করিতে উদ্যত হইয়া তাহাকে চিরতরে হারাইল। প্রকৃতি তাহার চিত্তের সমস্ত আবেগ জাগাইয়া দিয়া নিজের জীবনের ট্র্যাজেডি নিজেই ডাকিয়া আনিতে তাহাকে কেমন করিয়া সাহায্য করিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশে—

আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মতো নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মতো উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল— মুখ নত করিয়া দেখিল— মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, হায়, এ কী! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল, দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোমটা টানিয়া রাজীবকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এখানে প্রকৃতি এবং মানবহৃদয়ের বর্ণনা কাব্যের

সৌন্দর্যে অনির্বচনীয়, রাজীব-চরিত্রের বাস্তবতা এবং মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া সত্য, এবং গল্পটিকে অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পৌঁছাইয়া দিয়া সার্থক।

'জীবিত ও মৃত' এবং 'একরাত্রি' গল্পে অনন্যসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের সঙ্গে প্রকৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। জীবিত কাদম্বিনী নিজেকে তাহার মৃত প্রেতাত্মা মনে করিতেছে এবং গল্পে বর্ণিত জগতে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রকাশ্য দিবালোকে সূর্যালোকিত পৃথিবীতে গা-ছমছম-করা ভূতের গল্প জমে না, তাই 'জীবিত ও মৃত' গল্পের জগৎ শ্রাবণরাত্রির বর্ষণ এবং নিবিড় অন্ধকারে আবৃত— গল্পের মনস্তত্ত্বটি যেমন অস্বাভাবিক তেমনি সেই অস্বাভাবিকতার প্রতিরূপ হইয়াছে দুর্যোগের রাত্রি অথবা ঘন অন্ধকার। প্রকৃতির এই বর্ণনার মধ্যে একটি নিঃসঙ্গ নারী মৃত্যুর ভ্রম লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে— ইহাতে গা-ছমছম-করা ভৌতিক পরিবেশটি নিবিড় হইয়া আসিয়াছে। এই গল্পের সময় 'মাসখানেক', স্থান শ্রাবণের বর্ষান্ধকার রাত্রি দ্বারা আবৃত এবং বাদলের বাতাসে চঞ্চল এবং বিপর্যস্ত। বর্ষার ঘনান্ধকার রজনী এমন সুন্দর সার্থকভাবে গল্পবস্তুর সঙ্গে গ্রথিত করিয়া ভয়ংকর সুন্দর রসসৃষ্টির দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রসাহিত্যেও বিরল।

'একরাত্রি' গল্পটির পরিণতি এবং নায়কের ব্যর্থ জীবনের একমাত্র সার্থকতা সম্ভব হইয়াছে প্রলয়কালের বিশাল ঝড় এবং সমুদ্রের বন্যার সাহায্যে। সেই বন্যাই তাহার শৈশবের সাথী কল্পলোকের প্রিয়তমাকে জীবনে একবারের মতো, শেষবারের মতো, একাকিনী একান্তভাবে নায়কের পাশে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা, কোন্-এক জন্মান্তর, কোন্-এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া, এই সূর্যচন্দ্রালোকিত লোক পরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল ; আর, আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ংকর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে— এখন কেবল আর-একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক। স্বামীপুত্র গৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক। আমি এই একরাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

প্রকৃতির এই বিরাট ভয়ংকর সুন্দর রূপের প্রকাশ শুধু কাব্যের আনন্দ পরিবেশনের জন্যই সৃষ্টি হয় নাই ; 'একরাত্রি' গল্পে নায়কের জীবনে অনন্ত আনন্দের আস্বাদ দিয়া গল্পটিকে একটি সুন্দর ফলবান পরিণতি দান করিয়াছে বলিয়াই এই প্রলয়কালের ঝড় এবং তাহার অতুলনীয় বর্ণনা এই গল্পে সার্থক রূপ ধারণ করিয়াছে। উভয়ের চিরবিচ্ছেদের জ্বালাকে প্রকৃতিই অমৃতোপম মাধুর্যে রূপান্তরিত করিয়া ভিন্নতর পরিণতি লইয়া আসিয়াছে।

৫

রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি বর্ণনা শুধু স্বয়ংসম্পূর্ণ, যথাযথ অথচ চমকপ্রদ নয়— শিল্প হিসাবেও সমগ্রতার দিক দিয়া গল্পের রসসৃষ্টিতে ইহার দান অসাধারণ। শুধু প্রকৃতিবর্ণনার আনন্দেই নয়, গল্প রচনায় প্লটের উদ্ভাবনে এবং বিস্তারে, গল্পকে গতিদান এবং সার্থক অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে পৌঁছানোর প্রয়োজনে, চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য, পটভূমিকাস্থাপনে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য, গল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকল্পে, নানা বিচিত্র ভাবে প্রকৃতির অবতারণা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'সাধনা'-যুগের গল্প যে বাস্তবতা এবং সমগ্রতা -গুণে বাংলাদেশের বিশেষ অঞ্চলের নরনারীকে সর্বকালীন বিশ্বজনীন মানুষে পরিণত করিয়া বিশ্বসাহিত্যে অমর করিয়াছে তাহার তুলনা শুধু এদেশের সাহিত্য কেন বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। এই সমগ্রতা এবং বাস্তবতা অনেক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছে পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির সার্থক প্রয়োগে। শুধু রবীন্দ্রদর্শনের খাতিরে নয়, শুধু রবীন্দ্রকাব্যসুলভ সৌন্দর্যবর্ণনার জন্য নয়, কথাসাহিত্যশিল্পের আঙ্গিকের প্রয়োজনে, শিল্পে বাস্তবতা এবং সমগ্রতার প্রয়োজনে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গল্পে প্রকৃতিকে যুক্ত গ্রথিত করিয়া রসঘন করিয়াছেন এবং সুমহৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্তরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। এমন অসাধারণ, প্রকৃতিযোগে সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ, শিল্পগুণে সার্থক গল্প পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই সুলভ নয়।